অভিজিৎ সেনের উপন্যাস: বিষয়বৈচিত্র্য ও শিল্পরীতি

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে

পিএইচ. ডি. (আর্টস) উপাধিপ্রাপ্তির জন্য উপস্থাপিত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক

সুশীল মালিক

নিবন্ধভুক্তি সংখ্যা : A00BE1201017

বর্ষ : ২০১৭-২০১৮

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক গোপা দত্ত

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০০৩২

২০২২

Certified that the Thesis entitled

"অভিজিৎ সেনের উপন্যাস: বিষয়বৈচিত্র্য ও শিল্পরীতি"

Submitted by me for award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under Supervision of Ex. Professor Dr. Gopa Datta, Department of Bengali, Jadavpur University. And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the

Gopa Datta

Supervisor 1|4|22

Retd. Professor
Bengali Department
Jadavpur University
Kolkata - 700 032

Sushil Malik

Candidate 01/04/2022

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

২০১২ সালে পাঠক্রমের দৌলতে অভিজিৎ সেনের কথাসাহিত্যের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচিত হই এবং তাঁর কথাসাহিত্য পাঠের আগ্রহ অনুভব করি। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে একটি সাক্ষাৎকার নেওয়ার সুবাদে লেখকের সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ পাই। তখনই স্থির করি, ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে অভিজিৎ সেনের কথাসাহিত্য নিয়ে গবেষণা করব। কথাসাহিত্যিক অভিজিৎ সেনের গল্প উপন্যাসের আখ্যান নির্মাণের বৈচিত্র্য দেখে মনে হয় গোটা পৃথিবীকে তিনি কথাসাহিত্যে হাজির করেছেন, তাতে অসংখ্য মানুষ তাদের আনন্দ-বেদনা নিয়ে উপস্থিত। প্রথমে অভিজিৎ সেনের গল্প নিয়ে ২০১৫ সালে এম.ফিল করার সুযোগ হয়। এই সময় থেকেই অভিজিৎ সেনের সঙ্গে প্রতিটি ফোনালাপ রেকর্ড করার অনুমতি পাই। ফলে তাঁর থেকে পাওয়া প্রচুর তথ্য সঞ্চয় করতে শুরু করি। পরবর্তী উদ্দেশ্য ছিল অভিজিৎ সেনের উপন্যাস নিয়ে গবেষণা করার। ২০১৭ সালে সেই ক্ষণ উপস্থিত হয়।

লেখক অভিজিৎ সেন তাঁর নানান ব্যস্ততা সত্ত্বেও আমার প্রতিটি জিজ্ঞাসার উত্তর ও ২০১২ সাল থেকে ২০২১ সাল অবধি তিনটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, তাঁর মূল্যবান সময়ের ভাগ পেয়ে আমি তৃপ্ত ও কৃতজ্ঞ। গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্রে তাঁর প্রতি কোনো পক্ষপাত দেখাতে না পারলেও প্রতি মুহূর্তে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জাগ্রত রেখেছি। সৌভাগ্যক্রমে তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে পেয়েছি অধ্যাপক গোপা দত্তকে, যাঁর সু-পরামর্শ, উৎসাহ, স্নেহ গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনার প্রতি পদে পাথেয় হয়েছে। কাজের একাধিক ভুলভ্রান্তিতে তিনি এতটুকুও বিরক্ত না হয়ে ভুল শুধরে দিয়ে পরম স্নেহে সঠিক পথ নির্দেশ করেছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক বরেন্দু মণ্ডল মহাশয় তাঁর নানান ব্যস্ততার মধ্যেও সময় দিয়ে আমার অভিসন্দর্ভের ভ্রান্তি সংশোধনে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। এঁদের সকলের কাছে আমি অনেক কৃতজ্ঞ এবং বিনম্রচিত্তে শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ও বাংলা বিভাগীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি আমার পরিশ্রমকে লাঘব করেছে। বিশেষভাবে সাহায্য করেছে বাংলা বিভাগের কিছু গবেষক। এছাড়াও নানানভাবে সবসময় পাশে থেকেছে বাবা-মা, জ্যাঠামশাই, সৌভিক ও নয়ন এদের সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করছি।

জাঙ্গীপাড়া, হুগলি

সুশীল মালিক

পদ্ধতিবিজ্ঞান

এই অভিসন্দর্ভটিকে রূপ দিতে ভূমিকা, মূল আলোচনা, উপসংহার, গ্রন্থপঞ্জি ও পরিশিষ্ট এই কয়েকটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ছোটোগল্প ও উপন্যাস সংগ্রহ করা হয়েছে যা এই অভিসন্দর্ভে আকর গ্রন্থ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে বিভিন্ন সমালোচনামূলক গ্রন্থের পাশাপাশি পত্র-পত্রিকা এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। আলোচনার ক্ষেত্রে মূলত বর্ণনামূলক গবেষণা পদ্ধতি (Descriptive Research Method) ও ব্যাখ্যামূলক গবেষণা পদ্ধতি (Explanatory Research Method) অবলম্বন করা হয়েছে। এবং বিশেষ ক্ষেত্রে তুলনামূলক পদ্ধতিও (Comparative Method) অনুসরণ করা হয়েছে। কালপুরুষ ১৪ ফ্রন্টে অভিসন্দর্ভটি মুদ্রিত হয়েছে, উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে ১২ ফ্রন্ট ও ইনডেন্ট রাখা হয়েছে তাই কোটেশন চিহ্ন ব্যবহার করা হয়নি। অভিসন্দর্ভ রচনায় উদ্ধৃতি ছাড়া সমস্ত ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির *আকাদেমি বানান অভিধান* নির্দেশিত বানানবিধি অনুসরণ করা হয়েছে। MLA হ্যাণ্ডবুক এর পদ্ধতি মেনে গ্রন্থপঞ্জি তৈরি করা হয়েছে।

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	**১ - ৩**
প্রথম অধ্যায়	**৪ - ১৬**
অভিজিৎ সেন: ব্যক্তিপরিচয় ও সাহিত্যভাবনা	
দ্বিতীয় অধ্যায়	**১৭ - ৫৯**
সত্তর দশক, সমকালীন ঔপন্যাসিক ও অভিজিৎ সেন	
তৃতীয় অধ্যায়	**৬০ - ২৩৫**
অভিজিৎ সেনের উপন্যাস: আখ্যান নির্মাণ	
চতুর্থ অধ্যায়	**২৩৬ - ৩৬২**
অভিজিৎ সেনের উপন্যাস: বিষয়বৈচিত্র্যের অন্যদিক	
পঞ্চম অধ্যায়	**৩৬৩ - ৪০২**
অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের শিল্পরীতি	
উপসংহার	**৪০৩ - ৪০৫**
গ্রন্থপঞ্জি	**৪০৬ - ৪১৪**
পরিশিষ্ট	**৪১৫ - ৪২৪**

ভূমিকা

বাংলা কথাসাহিত্যে অভিজিৎ সেন (জন্ম- ১৯৪৫) একটি অন্যতম মুখ। সর্বকালে লেখকদের ভাবনার অলিন্দে সময় অর্থাৎ সামাজিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রবেশ করলেও তাকে স্পষ্টরূপে সাহিত্যের পাতায় রূপ দিতে সবাই সাহস দেখাতে পারেননি, যাঁরা দেখিয়েছেন অভিজিৎ সেন তাঁদেরই একজন। সাহিত্যে কেবলই মধ্যবিত্তের জীবনচিত্র ও সস্তা প্রেমের গল্প রচনার সংক্রমণ অভিজিৎ সেনকে গ্রাস করেনি। বরং সমস্ত ইন্দ্রিয় মেলে পৃথিবীকে দেখছেন তিনি। জগতের আপামর মানুষের গোটা জীবনকে দেখেছেন, এসব থেকেই তাঁর সাহিত্যভাবনা তৈরি হয়েছে। যার প্রকাশ অভিজিৎ সেনের লেখা আঠাশটি উপন্যাস ও দেড় শতাধিক গল্পে। অভিজিৎ সেনের গল্প উপন্যাসে এত বৈচিত্র্য যা তাঁর সময়ের খুব কম লেখকের লেখাতেই দেখা গেছে। অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের বিষয়বৈচিত্র্য অন্বেষণে করতে গিয়ে দেখা গেল, উপন্যাসগুলির মধ্যে তিনি ইতিহাস, জমিকেন্দ্রিক কৃষকের সংগ্রাম, সাম্প্রদায়িকতা ও মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি, নকশাল আন্দোলন ও তার পরবর্তী বাংলার রাজনীতি, প্রেম যৌনতা, নারীপাচার, আঞ্চলিকতা, মিথ-লোকবিশ্বাস, নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনযাপন একাধিক বিষয়কে ধরেছেন। অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের বিষয়বৈচিত্র্য ও শিল্পরীতি আলোচনার পূর্বে ব্যক্তিপরিচয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ তাঁর বোহেমিয়ান জীবন তাঁর সাহিত্যভাবনা অর্থাৎ গল্প উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে একটা বোধ তৈরি করেছে। ভূমিসংস্কার, নকশাল আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের মতো সত্তর দশকের অস্থির ইতিহাসের প্রসঙ্গ এবং তার আগের তেভাগা আন্দোলন, সাম্প্রাদায়িক দাঙ্গা ও দেশভাগের প্রসঙ্গ অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে অভিজিৎ সেনের উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে। পাশাপাশি তাঁর সময়ের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কথাসাহিত্যিকদের উপন্যাসে কোন কোন বিষয় উঠে এল এবং অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের সঙ্গে তাঁদের বিষয়গত সাদৃশ্য আছে কিনা তাও দেখার। আলোচনার সুবিধার্থে বিষয়বস্তুর নিরিখে অভিজিৎ সেনের উপন্যাসগুলিকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ইতিহাস, জমির লড়াই, দাঙ্গা, নকশাল আন্দোলন ও সত্তর পরবর্তী রাজনীতি, মুক্তযুদ্ধ, প্রেম ও যৌনতা, নারীপাচার ইত্যাদি বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে। বিষয়ের দিক অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের বৈচিত্র্য এত বেশি যে, পরবর্তী অধ্যায়েও কয়েকটি উপন্যাস আলোচনা করা হয়েছে, যেগুলি একক বৈশিষ্ট্যের অর্থাৎ পূর্ববর্তী অধ্যায়ের কোনো পর্বে ধরা যায়নি। এছাড়াও অভিজিৎ সেনের উপন্যাসে সাপ প্রসঙ্গ, নদী বর্ণনার

প্রবণতা, চরিত্র নির্মাণের ধরন, আঞ্চলিকতা, লোকবিশ্বাস ও মিথ আলাদাভবে চোখে পড়ার মতো। বিষয়বৈচিত্র্যের পাশাপাশি শিল্পরীতির ক্ষেত্রেও অভিজিৎ সেন মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসের চরিত্রচিত্রণ, প্লট নির্মাণ, বর্ণনারীতি, ভাষার ধরন, বিশেষ করে চরিত্রগত সংলাপ ব্যবহারের দক্ষতা, উত্তরবঙ্গের উপভাষা, উপন্যাসে সঙ্গীতের ব্যবহার, অলংকার প্রয়োগ এসব আঙ্গিকগত দিককে ধরা হয়েছে। গবেষণাপত্রের শেষে পরিশিষ্ট অংশ রাখা হয়েছে যাতে বিভিন্ন সময়ে লেখকের সঙ্গে তাঁর জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে টেলিফোনে ও মুখোমুখি যে কথোপকথন হয়েছে তাকেই সাক্ষাৎকারের আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়াও উপন্যাসগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা করে পত্রিকা ও গ্রন্থে প্রথম প্রকাশের তথ্য দেওয়া হয়েছে।

পূর্বে প্রকাশিত বিকাশ শীলের সম্পাদনায় *জনপদপ্রয়াস* পত্রিকায় 'অভিজিৎ সেন সংখ্যা' যাতে তাঁর গল্প ও কয়েকটি উপন্যাস নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে *জনপদপ্রয়াস* অভিজিৎ সেনের সাহিত্যের তলকে ছুঁয়েছেন। এছাড়াও *নিসর্গ, মল্লার, চিহ্ন* পত্রিকার নেওয়া সাক্ষাৎকার এবং মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের *গোষ্ঠীজীবনের উপন্যাস* গ্রন্থে সংযোজিত একটি সাক্ষাৎকার এবং অঞ্জন সেনের নেওয়া সাক্ষাৎকারে অভিজিৎ সেনের সাহিত্য ও সমাজভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। স্বপ্নময় চক্রবর্তী (১৯৫১) অভিজিৎ সেনের *ধর্মাযুধ* উপন্যাস নিয়ে লিখেছেন, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭) *রহু চণ্ডালের হাড়* উপন্যাস নিয়ে লিখেছেন 'অভিজিৎ সেনের হাড়তরঙ্গ' প্রবন্ধ, এই প্রবন্ধে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস অভিজিৎ সেনের আরও কয়েকটি উপন্যাস নিয়েও কিছু কথা বলেছেন। এইসব সাহিত্যিক ছাড়াও অমিয় দেব, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিজিৎ সেনের গল্পগ্রন্থ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। গোপা দত্ত 'অভিজিৎ সেনের কথাজগৎ' এবং তপোধীর ভট্টাচার্য 'অভিজিৎ সেন-এর ঔপন্যাসিক সন্দর্ভ' প্রবন্ধে লেখকের মূল উপন্যাসগুলির প্রাণকেন্দ্রকে ধরেছেন। সত্যবতী গিরি ও পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো প্রাবন্ধিক অভিজিৎ সেনের উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করেছেন। এছাড়াও রাহুল দাশগুপ্ত অভিজিৎ সেনের বিভিন্ন গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করে থাকেন। বাংলাদেশেও তাঁর সাহিত্য নিয়ে বেশ চর্চা আছে। এসব আলোচনার উপাদান এই অভিসন্দর্ভকে শরীর পেতে সাহায্য করেছে। বর্তমানে অভিজিৎ সেনের কথাসাহিত্য ব্যাপকভাবে আলোচনায় আলোয় এসেছে। তবে তাঁর কথাসাহিত্য নিয়ে বা শুধুমাত্র উপন্যাস

নিয়ে, এমনকি অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের বিষয়বৈচিত্র্য থেকে কোনো একটি বিশেষ উপাদান নিয়ে বৃহৎ পরিসরে আলোচনা খুব কম হয়েছে। অদ্যবধি অভিজিৎ সেনের কথাসাহিত্য নিয়ে সমস্ত প্রকাশিত আলোচনার সোপান বেয়ে এই অভিসন্দর্ভতে অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের বিষয়বৈচিত্র্য ও শিল্পরীতি বিশ্লেষণে পৌঁছাবার প্রয়াস থাকল।

প্রথম অধ্যায়

অভিজিৎ সেন: ব্যক্তিপরিচয় ও সাহিত্যভাবনা

ব্যক্তিপরিচয়

অভিজিৎ সেনের জীবন তাঁর সাহিত্যে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। তাঁর ব্যক্তিপরিচয়ের প্রতিটা ক্ষেত্র তাঁর কথাসাহিত্যের উপাদান জুগিয়েছে। নিজের রাজনৈতিক জীবন ও চোখে দেখা সমাজের বহুস্তরের মানুষ তাঁর লেখায় স্থান পেয়েছে। এককথায় অভিজিৎ সেনের সাহিত্যে 'মানুষের মেলা' আর এই মেলায় কখনো কখনো লেখক নিজে সামিল আবার উপন্যাসের অনেক কাহিনির প্রত্যক্ষদর্শী তিনি। লেখকের বিশ্বদৃষ্টি, ইতিহাসবোধ, মানবিক বোধ তাঁর সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, সাহিত্যভাবনা তাঁরই বিস্তৃত অভিজ্ঞতার ফল। সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে যে প্রেক্ষিতটা প্রত্যেকটা লেখকের থাকা জরুরি এবং থাকেও অভিজিৎ সেনের সাহিত্যও সেই প্রেক্ষিত থেকে সরে আসেনি। জীবনপ্রবাহ থেকে সঞ্চিত উপাদানে গড়ে ওঠা এই প্রেক্ষিত থেকেই অভিজিৎ সেনের জীবন ও সাহিত্য মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের স্বতন্ত্র ধারার শক্তিশালী কথাকার অভিজিৎ সেনের জন্ম ২৮শে জানুয়ারি ১৯৪৫ সালে অবিভক্ত ভারতবর্ষের বরিশাল জেলার কেওড়া গ্রামে। তাঁর গ্রামের তিন-চার মাইল চৌহদ্দির মধ্যেই বাস ছিল ঐতিহাসিক ও লেখক তপন রায়চৌধুরীর (১৯২৬-২০১৪)। পাশাপাশি অন্য আর একটি জমিদার পরিবার ছিল, যে পরিবারে চন্ডীচরণ সেন, কামিনী রায় ও যামিনী রায় থাকতেন। খাতায় কলমে অভিজিৎ সেনের জন্মসাল ১৯৪৫ এই সাল সঠিক কিনা এ বিষয়ে তাঁর নিজের কিছু যুক্তি আছে। *স্বপ্ন এবং অন্যান্য নীলিমা* (২০০০) উপন্যাসের সরোজের জবানীতে তিনি বলেন তাঁর বয়সে কিছুটা জল মেশানো আছে। এই উপন্যাসে সরোজ যে সিংহভাগ অভিজিৎ সেন এটা স্পষ্ট বোঝা যায়। সরোজের পিসিমা বলেন 'যে-বছর রবি ঠাকুর মারা যান সে বছর তুই আর ধলু হয়েছিস।' পিসিমা রবি ঠাকুরের মৃত্যুর ব্যাপারটা মনে রেখেছিলেন বিশেষভাবে। অভিজিৎ সেনও তাঁর জন্মসাল হিসাবে ১৯৪৫, এই ব্যাপারে নিশ্চিত নন। কারণ দেশভাগ, রিফিউজি রেজিস্টারে নাম তোলা, স্কুলে ভর্তি এইসব ক্ষেত্রে কোনো গোলযোগ হবার সম্ভাবনা প্রবল

ছিল। ১৯৪৫ সালকে অস্বীকার করে তিনি ১৯৪১ অথবা ৪২ সালকেই জন্মতারিখ হবার সম্ভাবনার কথা বলেন, ১৯৪৫ কখোনই নয়। সরোজের জবানীতে লেখক দাবি করেন—

> চার এবং পাঁচের দশকে যাদের জন্মসাল দেখানো আছে, তারা যদি পূর্ব-পাকিস্তান থেকে ভারতে অথবা ভারত থেকে পূর্ব-পাকিস্তানে দেশত্যাগ করে গিয়ে থাকে, তবে তাদের বয়সের দুধে বেশ খানিকটা জল মেশানো আছে, এ কথা বেশ নিরাপদেই বলা যাবে।[১]

অভিজিতের পিতা সুধীরকুমার সেন, মাতা লাবণ্যপ্রভা সেন। সুধীরবাবুর দুই পক্ষ মিলিয়ে মোট তেরোজন সন্তান। প্রথম পক্ষের দুজন পুত্র ও একজন কন্যা। দ্বিতীয় পক্ষের ছ-জন পুত্র ও চারজন কন্যা। অভিজিৎ সেন ছিলেন বাবার ষষ্ঠ এবং মায়ের তৃতীয় সন্তান, অর্থাৎ দ্বিতীয় পক্ষের তৃতীয় সন্তান। স্বাধীনতার আগে একটি সচ্ছল পরিবারের মানুষ ছিলেন সুধীরকুমার সেন, এই সময় তাঁর পরোপকারে খ্যাতি ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর সেই স্বচ্ছল অবস্থার পরিবর্তন হয়। বাড়িতে সুধীরবাবুর আগ্রহে সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চা ছিল, শেক্সপীয়রের লেখা, বার্নাড শ, ইবসেনের নাটক পাঠ করতেন ও আলোচনা করতেন বন্ধুদের সঙ্গে এবং নাটক অভিনয়ে তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। সুধীরবাবু কিছু সময়ের জন্য শিক্ষকতাও করেছেন একটি স্কুলে। বৎসরের বিশেষ দিনগুলিতে তাঁদের বাড়িতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাচ-গান, আবৃত্তি, নাটকের মতো নানান বিষয় উপস্থাপিত হতো। এই চর্চার জের শুধু অভিজিৎ সেনের মধ্যে নয়, তাঁর সহোদর মিহির সেনগুপ্তের (১৯৪৬-২০২২) মধ্যেও পড়েছিল। *সিদ্ধিগঞ্জের মোকাম* (১৯৯৬), *বিষাদবৃক্ষ* (২০০৪) গ্রন্থের লেখক সদ্যপ্রয়াত মিহির সেনগুপ্ত এ যুগের এক উল্লেখযোগ্য কথাসাহিত্যিক ছিলেন।

অভিজিৎ সেনের পৈত্রিক পদবী ছিল 'সেনগুপ্ত', তবে নামের পরে 'সেন' লিখতে অভ্যস্ত ছিল তাঁর পরিবার। গ্রামে তাঁর বাড়ি 'সেনবাড়ি' নামেই পরিচিত ছিল। কিন্তু দেশভাগের পর যেহেতু পরিবারের সদস্যরা বিভিন্নদিকে ছড়িয়ে পড়েন তাই কেউ 'সেন' বা 'সেনগুপ্ত' লিখতে থাকেন। এঁদের বৈবাহিক ক্ষেত্রে 'সেন' পদবী কিছুটা সমস্যার সৃষ্টি করত, যেহেতু 'সেন' এই পদবী নমঃশূদ্র, সোনার বেণে সম্প্রদায়েরও হয়। কলকাতায় আসার পর তাঁদের বংশের কিছু পরিবারে 'সেনগুপ্ত' লেখাটা জরুরি হয়ে যায় আবার অনেক পরিবারে সেটা হয়নি। অভিজিৎ সেন অবশ্য 'সেন' হয়েই রইলেন অন্য কারণে, তিনি ক্লাস নাইনে পড়ার সময় কলকাতা থেকে ঝাড়গ্রামে পিসির বাড়ি গেলেন সেখানে ওনার এক পিসতুতো

দাদা একটি স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। দাদার পদবীও ছিল 'সেন' তাই তাঁর নামের পরে 'সেন' পদবী দিয়েই ভর্তি করে দেন। অভিজিৎ সেনের ছন্নছাড়া ব্যক্তিজীবনে পরিবারের দু-একজন বিশেষ ব্যক্তির প্রভাব তাঁর সাহিত্যে আছে, তাঁদের মধ্যে অবশ্যই তাঁর এক পিসিমার কথা বলতে হয়। যিনি ঠিক তাঁর পিসিমা নন, তাঁর বাবা-জ্যাঠার পিসিমা, আর গ্রামের এবং এলাকার সর্বজনীন পিসিমা। অভিজিৎ সেনের ভাই বোনেরা সবাই পিসিমা বলেই ডাকতেন। এনার কথা বলতে হয় প্রধানত দুটি কারণে, প্রথমত অভিজিৎ সেনের ব্যক্তিজীবনে পিসিমার প্রভাব আছে, *স্বপ্ন এবং অন্যান্য নীলিমা* উপন্যাসের নলিনী সেই পিসিমার প্রতিরূপ। পিসিমা সম্পর্কে অভিজিৎ সেন বলেছেন—

> আমার জীবনে এই মহিলা অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন। আমার বয়স এক বছর পূর্ণ হওয়ার পরপরই আমার পরের ভাইটি আমাকে সরিয়ে মায়ের কোল দখল করে, এসবই শুনেছি। ফলে পিসিমার আশ্রয়ে চলে যেতে হয় আমাকে।[২]

পিসিমার বিয়ে হয় এগারো বছর বয়সে আর তিনি বিধবা হয়ে বাড়ি ফিরে আসেন চোদ্দ বছর বয়সে। সেই থেকে তিনি বাপের বাড়িতে কঠোর নিয়মের মধ্য দিয়ে বৈধব্য জীবন অর্থাৎ বাকি জীবন কাটান। প্রতি মাসে বাড়িতে নাপিত এসে মাথা নেড়া করে দিয়ে যেত, সারাদিনে একবার মাত্র খেতেন। বাড়িতে অসম্ভব কর্তৃত্ব ছিল পিসিমার, অভিজিৎ সেনের বাবা কাকারা তাকে বাড়িতে বিরাট বড়ো ঠাকুর ঘর করে দেন সেখানে নানান ধরনের গুরুদেব, লক্ষ্মীনারায়ণের ও অন্যান্য দেব-দেবীর প্রতিকৃতি থাকত। মেয়েদের প্রথম বয়স যেমন পুতুলকে সাজিয়ে, যত্ন করা এসব খেলার মধ্য দিয়ে কাটে এই পিসিমার চোদ্দ বছর বয়স থেকে শেষ জীবন পর্যন্ত সেভাবেই ঠাকুর দেবতাদের সাজিয়ে, যত্ন করে কেটে যেত। এসব অভ্যাসের সঙ্গে তিনি মোহগ্রস্ত হয়ে যান, যাকে তিনি ধর্মাচার বলেই ভাবতেন। পিসিমার বাড়িতে যে অসম্ভব কর্তৃত্ব ছিল তার একটি প্রমাণ এমন, বাড়ির ছোটদের শাসনের জন্য যদি লেখকের মা-জেঠিমা দু-এক ঘা মারতেন তবে পিসিমা সেই মা-জেঠিমাকেও পিঠে দু-এক ঘা বসিয়ে দিতেন। পিসিমার ধর্মাচরণ অভিজিৎ সেন *স্বপ্ন এবং অন্যান্য নীলিমা* উপন্যাসে নলিনীর মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন। পিসিমার দ্বিতীয় পরিচয় তাঁর শ্বশুরবাড়ির দিক থেকে। বরিশালে খুব সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিয়ে হয় পিসিমার। শ্বশুর ছিলেন ডিস্ট্রিক কোর্টের জজ, এবং বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেত্রী মণিকুন্তলা সেন (১৯১১-১৯৮৭) ছিলেন এই পিসিমার ভাশুরঝি অর্থাৎ পিসিমা ছিলেন মণিকুন্তলা সেনের কাকিমা।

দেশভাগের প্রকোপে মোট এগারো জন ভাই-বোনের সঙ্গে কলকাতায় এসেছিলেন অভিজিৎ সেন। বাবা-মা ছেড়েই শিক্ষাজীবন শুরু করেছিলেন, শৈশবেই খুব ছন্নছাড়া জীবনকে মেনে নিতে হয়েছিল ফলে সেই সময় পরবর্তী জীবনযাপনের ধারাকে অনেকটাই বদলে দিয়েছে। বোহেমিয়ান জীবনে অভ্যস্থ অভিজিৎ সেনের শিক্ষাজীবন খুব 'বিশৃঙ্খল'। তাঁর নিজের কথায়—

> আমার শিক্ষাজীবন বড় বিশৃঙ্খল। ১০(দশ) বছর বয়সে পূর্ববঙ্গ থেকে কলকাতায় আসি এবং চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হই কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আবার ফিরে যেতে হয়। দ্বিতীয়বার আবার কলকাতায় এসে ক্লাস সিক্সে ভর্তি হই। ক্লাস নাইনে উঠলে ফের ঝাড়গ্রামে আমার পিসিমার বাড়িতে চলে যাই, এবং সেখান থেকেই স্কুল ফাইনাল পাশ করি। কলকাতায় সিটি কলেজ থেকে ইকোনমিক্স এ অনার্স পাশ করি এবং পড়াকালীন চাকরি পাই। পরে ইতিহাস নিয়ে এম. এ পাশ করি।[৩]

বোহেমিয়ান জীবনের সূচনা বাল্যকাল থেকেই। যার রেশ পরবর্তী কালেও থেকে যায়। এই জীবন তাঁর সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা নেয়। ১৯৬৩ সালে অভিজিৎ সেনের প্রথম চাকরি নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কোং লিমিটেডে যা ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। ১৯৭৩-১৯৭৪ সাল পর্যন্ত বালুরঘাটে একটি ব্যাংকে বছরখানেক তারপর ১৯৭৬ সালে গৌড় গ্রামীণ ব্যাংকের উচ্চপদে চাকরি পেয়েছিলেন। গৌড় ব্যাংকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। একাধিক স্থানে একাধিক কর্মক্ষেত্রে প্রচুর মানুষের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য পেয়েছেন, চোখে দেখা সেই মানুষ ও পরিবেশ তাঁর সাহিত্যের চরিত্র ও পটভূমি নির্মাণে সাহায্য করেছে। একসময় তিনি বাম রাজনীতির সমর্থক ছিলেন, কিন্তু সব মতাদর্শ অন্ধ বিচারে মেনে নেননি, বিবেচকও ছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক উপন্যাসগুলোয় সেই বিবেচনাই প্রধান হয়ে উঠেছে। অভিজিৎ সেন ১৯৬৩ সালে চাকরি ঘর ও কলকাতা ত্যাগ করে নকশালপন্থী বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। যেভাবে সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন নিয়ে হাজার হাজার যুবক সেদিন এই বিপ্লবের পথে নেমেছিল। এপ্রসঙ্গে তাঁর উক্তি—

> চাকরি ছেড়ে নকশাল বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিই ঠিকই কিন্তু আমার মোহভঙ্গ হতে বেশী সময় লাগেনি। আমার মাথার মধ্যে তখন বেশ কয়েকটি প্রশ্ন জেগেছিল। এইভাবে কোথাও কোনোও বিপ্লব হয়েছে কিনা, এই পথে সফলতা আসবে কিনা, ইত্যাদি।[৪]

নকশাল আন্দোলনের সফলতা না এলেও তাঁর এই আন্দোলনে যোগদান লেখার ক্ষেত্রে অনেকটা ভূমিকা নেয়। *হলুদ রঙের সূর্য* (১৯৯৬), *মৃত মানুষের সঙ্গে বসবাস* (২০১৭),

লাশকাটা ঘরের সামনে অপেক্ষা (২০১১) উপন্যাস এসেছিল তাঁর কলম থেকে। বাল্যকাল থেকে বোহেমিয়ান জীবনে অভ্যস্ত অভিজিৎ সেন যৌবনে বদলির কর্মজীবন এবং বামপন্থার আদর্শে রাজনীতিতে পদার্পন সর্বোপরি নকশাল আন্দোলনে যোগদান, এসবের মধ্যে ছন্নছাড়া জীবনটাকে যিনি প্রশ্রয় দিয়ে তাঁকে আরও লেখার অনুপ্রেরণা জুগিয়ে গেছেন তিনি লেখকের স্ত্রী শ্রীমতী দীপিকা সেন। অভিজিৎ সেন তাঁর গল্প উপন্যাসের নারীচরিত্রকে আলাদা গুরুত্ব দিয়ে নির্মাণ করেন অন্যদিকে তাঁর জীবনসঙ্গিনীও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে আলাদা গুরুত্ব পাবার যোগ্য। অসম্ভব ব্যক্তিত্বময়ী ও জীবনীশক্তির আধার ছিলেন দীপিকা সেন। ইনি সেইসব নারীদের তালিকায় থাকেন, যাঁর কাছে ঠকবার সম্ভাবনা নেই আবার তাঁকে ঠকাতেও সাহস হবে না, যাঁর ব্যক্তিত্বের আভায় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা এমনিই চলে আসে, 'চেহারায় একটা সম্ভ্রম জাগানো তর্জনীও যেন সদা জাগ্রত।' শরীরে হাইপারট্রেফিক মায়োপ্যাথির মতো মারণ রোগ থাকলেও কপালে চিন্তার ভাঁজ দেখা যেত না, আর মুখের হাসিকে অমলিন ভাবে ধরে রেখেছিলেন। যদিও সদ্য প্রয়াত হয়েছেন তিনি। অভিজিৎ সেন স্ত্রীর আদলে তৈরি করেছেন *কার পদধ্বনি আসে? কার?* (২০১৫) উপন্যাসের অলকাকে।

কর্মজগৎ ভিন্ন হলেও সাহিত্যের পাঠক হিসাবে অভিজিৎ সেনের পড়ার পরিধি অনেকটাই। যদিও এক্ষেত্রে লেখকের বিনয়ী বক্তব্য 'আমার পড়াশুনো লজ্জাজনক রকমের সীমিত' কিন্তু এই 'সীমিত'র উদাহরণটা এমন, 'বঙ্কিম, রবীন্দ্র, শরৎ, মানিক, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণের প্রধান উপন্যাস এবং গল্পগুলো সবই পড়া হয়েছে।'[৫] এছাড়াও প্রেমেন্দ্র মিত্রের (১৯০৪-১৯৮৮) দেড় শতাধিক গল্প, প্রমথনাথ বিশী (১৯০১-১৯৮৫), সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮০) এবং প্রবোধকুমার স্যানালের (১৯০৫-১৯৮৩) বিখ্যাত গল্প উপন্যাস, সতীনাথ ভাদুড়ির (১৯০৬-১৯৬৫) সব গল্প উপন্যাস, অমিয়ভূষণ মজুমদার (১৯১৮-২০০১) ও মহাশ্বেতা দেবীর (১৯২৬-২০১৬) প্রধান গল্প উপন্যাস সব পড়েছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২), শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (১৯৩৫), সুবোধ ঘোষ, বিমল কর (১৯২১-২০০৩) থেকে পাশ্চাত্যের লিও টলস্টয় (১৮২৮-১৯১০), আর্নেস্ট হেমিংওয়ে (১৮৯৯-১৯৬১), গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের (১৯২৭-২০১৪) সব উপন্যাস এবং ফ্রান্ৎস কাফকা (১৮৮৩-১৯২৪), উইলিয়াম ফকনার (১৮৯৭-১৯৬২), গ্রাহাম গ্রিন (১৯০৪-১৯৯১), আলবেয়ার কামু (১৯১৩-১৯৬০) আরও বেশ কিছু লেখকের পাঠক অভিজিৎ সেন। আসলে শুধু সমাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা নয়, দেশি ও বিদেশি সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য এবং তাতে প্রতিফলিত সমাজ

জীবন যে কোনো সাহিত্যিকের লেখায় বৈচিত্র্য আনবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই অভিজিৎ সেনের লেখার বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের উদ্ভাবন তাঁর অভিজ্ঞতা ও বিশ্বসাহিত্য পাঠের সুফল এটা স্পষ্ট। অভিজিৎ সেন বেশ কিছু পুরস্কার পেয়েছেন। তবে তাঁর গল্প উপন্যাসগুলি সাহিত্যের পাঠকের জন্য এক একটি পুরস্কার একথা বলাই যায়। এদিক থেকে তিনি যা পুরস্কার পেয়েছেন তার তুলনায় আমাদের দিয়েছেন বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'সুধা বসু স্মৃতি পুরস্কার' (১৯৮৯) দিয়েছেন। বিখ্যাত উপন্যাস *রহু চন্ডালের হাড়* এর জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত 'বঙ্কিমচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার' পান ১৯৯২ সালে। এই উপন্যাসটি নিউইয়র্কের Facet Books International এবং দিল্লির Abhinav Publications যৌথ উদ্যোগে ১৯৯২ সালেই ইংরাজি অনুবাদ *Magic bones* প্রকাশ করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৫ সালে 'শরৎচন্দ্র স্মৃতি পদক' দিয়েছে। এছাড়াও ২০১৭ সালে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ আকাদেমি থেকে 'সিরাজ আকাদেমি পুরস্কার' দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেছে। কর্মজীবনের সুত্রে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় ঘুরেছেন, থেকেছেন অভিজিৎ সেন। প্রথমে পার্কসার্কাস তারপর দিনাজপুর, মালদাসহ উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলা হয়ে বর্তমানে দমদমে থাকেন। তাঁর গল্প উপন্যাসের চরিত্ররা শুধু সংগ্রামী নয়, লেখক নিজেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংগ্রামী, এমনকি পারিবারিক ক্ষেত্রেও। বার্ধ্যকে উপনীত লেখক সংসারের হাল নিজে হাতে নিয়েও পরিবারে অসুস্থ স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্ব পালন করেছেন, এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন কন্যার প্রতি আজও পিতার সমস্ত কর্তব্যের সঙ্গে সাহিত্য সাধনারত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) মতো বিচ্ছেদ বেদনা যেন অভিজিৎ সেনেরও পিছু ছাড়ছে না, মাত্র কয়েকমাসের ব্যবধানে পর পর তাঁর দুই ভাইয়ের মৃত্যুর কিছুদিন পরেই তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। আশার কথা নিয়মিত না হলেও এখনো লিখে চলেছেন অভিজিৎ সেন। সমাজের অগ্রগতি ও নিম্নগতির পাশে এখনো কলম উঁচিয়ে বসে আছেন তিনি প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে। সত্তর আশির বিশেষ সময়কে শুধু নয়, বর্তমান কালকেও তিনি বিবেচক ও পর্যবেক্ষকের মতো দেখেন। আসলে কালের বিচারে প্রতিটা কালই বিশেষ। সময়ের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তারই ইতিবৃত্ত রচনা করে পাঠকের জন্য নৈবেদ্য সাজাতে এখনো প্রস্তুত তিনি।

সাহিত্যভাবনা

অভিজিৎ সেন ব্যক্তিজীবনের প্রতি বাঁকে সাহিত্যভাবনার রসদ সঞ্চয় করেছেন। যৌবন পরবর্তীকালে উত্তরবঙ্গে দীর্ঘকাল থাকার ফলে তাঁর লেখায় ওই অঞ্চলের মানুষ, তাদের ভাষা, লোককথা, লোকবিশ্বাস, সংস্কার ইত্যাদির সঙ্গে ভূমি, ইতিহাস, রাজনীতি, মুক্তিযুদ্ধ, দাঙ্গার মতো বিষয় মুখ্যরূপে উঠে এসেছে। সাহিত্যক্ষেত্রে খ্যাতির হিসাব না করেই, মেইন স্ট্রীম যাকে বলে তার সংজ্ঞা তছনছ করে নতুন ধারায় গা ভাসালেন অভিজিৎ সেন। তাঁর 'গল্প বিষয়ে ভাবনাচিন্তা' ও 'উপন্যাস ভাবনা' প্রবন্ধ দুটিতে তিনি সেই নতুন ধারার কথা বলেছেন। কল্পরাজ্যকে বেশি প্রশ্রয় না দিয়ে বহমান জীবনে দেখা মানুষের ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন তিনি। অখ্যাত পত্রিকাতেই তাঁর অধিকাংশ লেখা প্রকাশ হতে থাকে।

জগৎ সংসারে সব ক্ষেত্রের সংগ্রামশীল মানুষের জীবন ও সমগ্র অস্তিত্বকে সাহিত্যে ধরেছেন অভিজিৎ সেন। সভ্যতার ইতিহাসে এইসব মানুষ যে অস্তিত্বহীন নয়, এখনো প্রাণ নিয়ে বেঁচে আছে একথা তাঁর চরিত্ররা জানান দেয়। বিশেষত পুরুষের পাশে তাঁর গল্প উপন্যাসের নারীরা সংকটের মুখে কঠিন লড়াইয়ে সামিল হয়েছে। যেমন, বিদ্যা (*বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর*), রাজেশ্বরী (*ছায়ার পাখি*), কাঞ্চনমালা (*নক্ষত্র নদী ও নারী*)। জীবনে লড়াইয়ের অপর মেরুতে আছে এক অনাবিল উন্মাদনা, প্রবল প্রাণশক্তি। সেই উন্মাদনায় মানুষ সংগ্রাম করে যেভাবে অভিজিৎ সেনের সাহিত্যের কুশীলবরা করেছে বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে। মানুষের জীবন-জীবিকা নিয়ে লেখা হয়েছে, হচ্ছে কম নয়। কথাসাহিত্যের জন্মলগ্ন থেকে আজ অবধি পরিবর্তন পরিমার্জনের মধ্য দিয়ে সেই ধারা অব্যাহত আছে। পরিবর্তমান ধারায় অভিজিৎ সেন অনবদ্য, অনবদ্য তাঁর লেখনী। আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় বৈচিত্র্যের নতুন সংযোজন তিনি। বাংলা উপন্যাস জুড়ে মধ্যবিত্ত জীবনের ধারাবাহিক পর্ব থেকে আলাদা হয়ে গেছে তাঁর গল্প ও উপন্যাসের বিষয়। অভিজিৎ সেনের গল্প সম্পর্কে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

> অভিজিৎ সেনের গল্প সহজে ফুরোয় না, গন্ডির বাইরে নিয়ে যায় আমাদের, একটা রেশ থেকে যায় শেষের পরেও। শুধু বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য নয়, রচনাভঙ্গির নৈপুণ্যই(এবং সে-ও আবার কখনও একরকম নয়) আমাদের মনে দাগ কেটে যায়।[৬]

তবে শুধু গল্প নয় তাঁর সব লেখাই এমনটা দাবি করে। উত্তরবঙ্গের ভাষা, মানুষ, প্রকৃতি যেভাবে এসেছে তাঁর লেখায়, মানুষের সমগ্র জীবনকে দেখার ভঙ্গি তাঁকে সত্তরের অভিনব

কথাকারের মর্যাদা দেয়। 'দেবাংশী', 'মানুষের পিছন দিক', 'ধানপোকা', 'আইন-শৃঙ্খলা,' 'ঈশানীমেঘ', 'ক্ষেত্রপাল' ইত্যাদি গল্পের এবং *রহু চণ্ডালের হাড়* (১৯৮৫), *বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর* (১৯৯৫) প্রভৃতি উপন্যাসের অধিকাংশ অংশ জুড়ে আঞ্চলিক ভাষা, জীবনযুদ্ধ ও মানুষের সমস্ত রকমের প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন। অর্থাৎ বিশেষ মানুষের কথা বিশেষ ভাষাতেই সহজে বুঝে নিতে পাঠকের অসুবিধা হয়নি। *রহু চন্ডালের হাড়* উপন্যাসটিতে বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা, যাযাবর সম্প্রদায় যখন যেখানে বাস করেছে, সেখানের ভাষা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন লেখক। উত্তরবঙ্গের অনেকগুলি জায়গার ভূগোল ও ইতিহাস এই উপন্যাসে আছে। এ প্রসঙ্গে তপোধীর ভট্টাচার্য বলেছেন—

> উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ সমাজের অনাবিষ্কৃত প্রায়-অন্ধকার পরিসরে যেভাবে তিনি আলোকসম্পাত করে চলেছেন, তার তুলনা বিরল। সবচেয়ে বড় কথা, লোকায়ত ব্রাত্য সমাজের কথা যে তৃতীয় বিশ্বের প্রাগ্রসর সৃষ্টি চেতনার উপজীব্য হয়ে উঠেছে, এর তাৎপর্য সামান্য নয়।[৭]

অভিজিৎ সেন গল্প ও উপন্যাস উভয়ক্ষত্রেই এই কাজ করে চলেছেন। তাঁর সাহিত্য পাঠক হৃদয়ে নতুন চেতনার বীজ বপন করেছে। কারণ তিনি শুধু লেখক নন, সাংবাদিক, সমালোচক, ইতিহাসবিদের ভূমিকাও পালন করেছেন। বর্ণনার নিজস্ব ভঙ্গি, বিশেষ শব্দ ব্যবহারের প্রতি ঝোঁক, ছোটো ছোটো সংলাপ এবং পটভূমির ক্ষেত্রে গ্রামকে প্রাধান্য দিয়েছেন লেখক। সত্তর দশকের লেখকদের গ্রাম সম্পর্কে যে প্রবণতা তা অভিজিৎ সেনের প্রায় সব লেখায় উপস্থিত। কাহিনির বুনট দৃঢ় করে অনেক লেখায় ব্যাংককর্মী রূপে লেখকের নিজের অবস্থান এবং মহৎ ব্যক্তিত্বের রঙ চড়িয়ে নয়, বাস্তব ক্ষেত্র থেকে রূপকের বাইরে লেখকের উপস্থিতি তাঁর লেখার বাস্তবতাকে জীবন্ত করে তুলেছে।

মানুষ শুধু বিশ্বাস আর সংস্কারকে ধারণ করে থাকেনি বরং যুগ যুগ ধরে বহন করে চলেছে। অভিজিৎ সেনের সাহিত্যভাবনায় একটা বড় জায়গা মানুষের বিশ্বাস-সংস্কার, লৌকিক-অলৌকিক দিক। সাহিত্যে মিথের ব্যবহার আখ্যান নির্মাণেও করা হয়েছে। অভিজিৎ সেন লোককথাকে সচেতনভাবেই শিল্পসার্থকতা দান করেছেন। আসলে ভারতীয় সংস্কৃতিতে অলৌকিক বিশ্বাসের ব্যাপারটা মজ্জাগত, এ প্রসঙ্গে অভিজিৎ সেন নিজেই বলেছেন—

আমাদের লৌকিক অস্তিত্ব বা লোকায়ত সংস্কৃতির প্রভাব যখন আড়াইশো বছরের ইউরোপীয় শিক্ষাতেও নির্মূল হয়নি, তখন বুঝতে হবে অনেক বেশি শক্তিশালী সেই শিকড় মাটির অনেক গভীরে।[৮]

মানুষের মন থেকে সংস্কারকে আলাদা করে দেখার সময় বোধহয় এখনো আসেনি। অন্তরে বাসা বেঁধে থাকা জাতিগত সংস্কারও সুযোগ পেলেই মাথাচাড়া দেয়। ব্যক্তিবিশেষে ‘ব্রাহ্মণ্য’ গল্প *আঁধার মহিষ* (১৯৯৩) উপন্যাসে এবং গোষ্ঠীগতভাবে *নাগমঙ্গল* (২০১৯) উপন্যাসে দেখা গেছে। আবার মানুষের অলৌকিক বিশ্বাসের ভূমি যে কত কঠিন তা ‘পাথরে জলের বিন্দু’, ‘মাটির বাড়ি’, ‘জেহাঙ্গী’র মতো গল্প থেকে বোঝা যায়। অলৌকিক কুহেলী বাস্তবতাকেও আচ্ছন্ন করে ফেলে।

লোভের রাজনীতি কীভাবে সবলের পোষণ আর দুর্বলের শাসন করে তা অভিজিৎ সেনের মতো রাজনীতি সচেতন লেখক ভালোই জানতেন। কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে বিশ্বাসী সৎ রাজনৈতিক কর্মীর অন্তঃদ্বন্দ্ব, স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণার কথা বলেছেন তিনি। পরবর্তীকালের লেখাগুলোয় ‘বিস্ফোরণের পরে’, ‘কর্কটক্রান্তি’, ‘আইনশৃঙ্খলা’, *অন্ধকারের নদী* (১৯৮৮), *বর্গক্ষেত্র* (১৯৮১), *ছায়ার পাখি* (১৯৯৩) ইত্যাদি গল্প ও উপন্যাসে রাজনীতি নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনে যেভাবে বিপদ ডেকে আনে এবং গ্রামবাংলার পরিবর্তনে রাজনীতি যে ভূমিকা পালন করে তা উঠে এসেছে। আবার সত্তরের রাজনীতির এক বিশেষ পালাবদল নকশাল আন্দোলনের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ প্রভাব তাঁর ‘মহাবৃক্ষের আড়াল’, *লাশকাটা ঘরের সামনে অপেক্ষা, স্বপ্ন এবং অন্যান্য নীলিমা* প্রভৃতি রচনায় লিপিবদ্ধ করেছেন। সমাজ-জীবনের একাধিক অবস্থানের মানুষ তাঁর দেখার জগতে বাস করে সমগ্র জীবন নিয়ে। আবার ইতিহাসের কাহিনি নিয়ে তাঁর ভাবনা বিশ্লেষণাত্মক, অন্বেষণ মুখর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি ইতিহাসের কাহিনি উপন্যাসে উপস্থাপন করেন *মৌসুমি সমুদ্রের উপকূল* (২০০৭) *রাজপাট ধর্মপাট* (২০০৮) প্রভৃতি উপন্যাস তার দৃষ্টান্ত।

জন্মলগ্ন থেকে আজ অবধি বাংলা কথাসাহিত্য বিষয় ও আঙ্গিকগত পরিবর্তনের পথ ধরে নতুন শরীর পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) হয়ে জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭), সুবোধ ঘোষ, প্রেমেন্দ্র

মিত্র, বনফুল (১৮৯৯-১৯৭৯) এবং পরবর্তীকালের সাহিত্যে ব্যাপারটা স্পষ্ট। নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পরিবর্তনের ফলে কথাসাহিত্য নবরূপ পেয়েছিল, পরবর্তীকালের লেখকরা এই পরিবর্তনের পর্বটাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেছেন। 'নতুন প্রজন্ম বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে এক নতুন দিক উন্মোচন করল, মহাশ্বেতা যাকে ব্যপ্তি দিলেন এবং পূর্ণতর করলেন' এই পূর্ণতাকে প্রাপ্তি করেই অভিজিৎ সেন পরিবর্তমান সাহিত্য ধারায় গা ভাসিয়েছেন। স্বাধীনতা পরবর্তীকালের অস্থির দেশ কাল এই সময়ের সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। আর একটু সময় পার করে এসেছে সত্তর দশক, এই দশকের সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতির বার্তাবহ হিসাবে সাহিত্যের সব রূপকেই কমবেশি সক্রিয় দেখা গিয়েছিল। এই সময়ের যে সমস্ত সাহিত্যিকরা সময়টাকে গায়ে মেখে সমাজের ক্ষয়ক্ষতির হিসাব করতে বসেছিলেন, মানুষের জীবনচিত্রে অস্থিরতা লক্ষ্য করেছিলেন তাদের মধ্যে অভিজিৎ সেনও একজন। দেশভাগের ফলে এই বঙ্গে চলে আসা সত্তর দশকের লেখক অভিজিৎ সেনের সামনে সময়ের একগুচ্ছ ইতিহাস, যা তাঁর সমগ্র সাহিত্য রচনাতে প্রকট হয়েছে। সময়ের আলোকে জীবনের চালচিত্র নিঁখুতভাবে ধরেছেন তিনি। কর্মজীবনের তাগিদে পশ্চিমবঙ্গের অনেক জেলায় ঘুরেছেন অভিজিৎ সেন, বলা ভালো থেকেছেন কমবেশি। 'বাংলার গ্রামের প্রতি সহজাত টান' থেকেই তিনি নানান ধরনের মানুষের সঙ্গে মিশেছেন অন্তরঙ্গভাবে, পেয়েছেন আনন্দ ও অভিজ্ঞতা। তাই আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের আকাশ যখন নক্ষত্রখচিত, রঙে রূপে উদ্ভাসিত তারই মাঝে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে কথাসাহিত্যের আকাশে মেলে ধরেছেন অভিজিৎ সেন। গ্রামাঞ্চলের 'জমি আশ্রয়ী মানুষ', ধর্ম, রাজনীতি, লোকসংস্কৃতি, ইতিহাস, কিংবদন্তী, প্রেম তাঁর কথাসাহিত্যের কথ্যবস্তু। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের জীবনচিত্র যেমন তাঁর সাহিত্যে জায়গা পেয়েছে অপরদিকে অভিজিৎ সেনের জীবনের বহুবিধ অভিজ্ঞতা তাঁকে সাহিত্য রচনার রসদ জুগিয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে নকশাল রাজনীতির সাথে যুক্ত থাকার কারণে ওই পথের চড়াই-উৎরাই, অন্তঃসারশূন্যতা সবই ছিল তাঁর নখদর্পণে। এইসূত্রে বহু অঞ্চল ও বিভিন্ন ধরনের মানুষের সংস্পর্শ তাঁর সাহিত্যকে পরিণত করেছে।

অভিজিৎ সেনের চরিত্ররা বুঝিয়ে দিয়েছে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন হলেও শুধুমাত্র পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়ে শোষণ ও শাসনসহ একাধিক প্রতিকূলতা এখনো সমাজে রয়ে গেছে। গণতন্ত্রের জাল সার্টিফিকেট দিয়ে মানুষের মঙ্গল কামনায় মিথ্যা প্রতিশ্রুতির বুলি

আউরে সুবিধাবাদী কিছু নেতা নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত। শোষিত সমাজের ক্ষতবিক্ষত অসহায় মানুষগুলি জীবন দিয়ে, আব্রু দিয়ে চিনিয়ে দেয় আমাদের পাশে থাকা রক্তচোষা পিশাচদের। অভিজিৎ সেনের লেখায় ভিড় করে থাকা মানুষগুলি সমাজের একাধিক বৃত্ত থেকে উঠে এসেছে। জীবনযুদ্ধের একাধিক ক্ষেত্র, আর প্রতি ক্ষেত্রের একাধিক প্রতিকূলতা, একাধিক যোদ্ধা। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে লড়াইয়ের সম্মুখীন হচ্ছে মানুষ। অভিজিৎ সেনের পূর্ববর্তী সতীনাথ ভাদুড়ি, সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮), সুবোধ ঘোষ, বিমল কর, মহাশ্বেতা দেবী, কমলকুমার মজুমদার (১৯১৪-১৯৭৯), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, দেবেশ রায় (১৯৩৬-২০২০), শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (জন্ম-১৯৩৫) প্রমুখ কথাসাহিত্যিকের লেখার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে সত্তর দশকের লেখকদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট একটু বিস্তৃত। সতীনাথ ভাদুড়ি ও মহাশ্বেতা দেবীর মতো লেখকেরা নিম্নবিত্ত সমাজ থেকে তাঁদের আখ্যানের নায়ককে খুঁজে নিলেন, এঁদেরই পথ ধরলেন একালের অভিজিৎ সেন। আসলে মার্জিত রুচিশীল জীবন ও কাহিনি নিয়ে সাহিত্য রচনার প্রয়াস তাঁর ছিল না, মানুষকে যথাযথ সামাজিক অবস্থানে ধরবার চেষ্টা করেছেন যৌনতার পরিমণ্ডল হলেও তা ত্যাগ করেননি। অভিজিৎ সেনের সমসাময়িক ভগীরথ মিশ্র (জন্ম-১৯৪৭), নলিনী বেরা (জন্ম-১৯৫২), অমর মিত্র (জন্ম-১৯৫১), শচীন দাশ (১৯৪৭-২০১৬), অনিল ঘড়াই (১৯৫৭-২০১৪), ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় (জন্ম-১৯৪৮), আফসার আমেদ (১৯৫৯-২০১৮), নবারুণ ভট্টাচার্য (১৯৪৮-২০১৪), স্বপ্নময় চক্রবর্তী (জন্ম-১৯৫১) প্রমুখের মতো অভিজিৎ সেনের লেখা বিষয়ের বৈচিত্র্য এনেছে। শ্রেণিসংগ্রামকে এত নিঁখুত পর্যবেক্ষণ বোধহয় তাঁর মতো কেউ করেননি। 'গল্প বিষয়ে ভাবনা চিন্তা' প্রবন্ধে তিনি জানিয়েছেন শ্রেণিসংগ্রামের বিষয়বস্তু নিয়ে লিখতে তিনি কতটা আগ্রহী হয়েছিলেন। এবং শ্রেণিসংগ্রামের প্রতি একটা দায়বদ্ধতা উপলব্ধিও করেছিলেন। সাতের দশকের রাজনৈতিক টালমাটাল থেকে এই প্রভাব এসেছিল তাও তিনি স্বীকার করেছেন। তাঁর লেখায় প্রধান চরিত্র থাকল গ্রামের মানুষেরাই, বিশেষ করে গ্রামের গরীব মানুষেরাই। গ্রাম তো বটেই, এমনকি শহর ও মফঃস্বলের মানুষরাও তাঁর চরিত্র। তবে গ্রামাঞ্চলের ভূমিজীবী মানুষ পরিবার অভিজিৎ সেনের লেখায় প্রধান ভূমিকায় আছে।

অভিজিৎ সেন বলেছিলেন, 'কথাসাহিত্যকদের ব্যক্তিগত জীবন তাঁর সাহিত্যে ব্যাপক প্রভাব ফেলে।' একথা স্বয়ং তাঁর ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাঁর 'বিশৃঙ্খল' জীবন থেকে

সমাজের আপামর মানুষের সান্নিধ্য তাঁকে দিয়েছে প্রচুর অভিজ্ঞতা। যা দিয়ে তিনি কথাসাহিত্যকে রঙে রূপে সাজিয়ে তুলেছেন। কর্মজীবনের তাগিদে সারা বাংলা চষে বেড়ানো এই লেখকের, মানুষকে দেখার একটা আলাদা চোখ ছিল, সাহিত্যিকের চোখ। তাই 'তাঁর সৃষ্টির ভৌগোলিক জগৎ বিস্তৃত।' ব্যক্তিগত জীবনাচরণ তাঁর লেখার উপাদান জুগিয়েছে। ব্রজদুলাল চট্টোপাধায় বলেছিলেন—

> অশৈশব সংগ্রাম, বিশিষ্ট হয়ে ওঠার প্রবণতা, মানুষকে বোঝার চেষ্টা অভিজিৎকে ছোট থেকে করে তুলেছিল প্রকাশশীল।[৯]

চোখে দেখা মানুষের জীবনযুদ্ধ তাঁকে করে তুলেছে সুদক্ষ বিবেচক ও সমাজ সচেতন লেখক। তাঁর এই ভাবনার বহিঃপ্রকাশ তাঁর সাহিত্য। অভিজিৎ সেন বলেছিলেন—

> 'আধার মহিষ', 'সীমান্ত', 'কাক', 'কলাপাতা', 'ইমানআলি রাস্তার পাশে' ইত্যাদি উপন্যাস এবং গল্প লেখা যেন আমার এক ধরনের লড়াই।[১০]

এ লড়াই প্রথমদিকের লেখাগুলিতে যেমন ছিল পরের অর্থাৎ আটের ও নয়ের দশকের লেখায় 'শ্রেণীবিদ্বেষ', এর পটভূমিতে, 'সামাজিক অবিচার' এর ক্ষেত্রে লেখক সরব হয়েছিলেন। 'মূল্যবোধের অবক্ষয়' দেখে, 'বিপন্ন মানবিকতা' ও 'ভোগবাদসর্বস্ব আধুনিকতা' তাঁর লেখাকে শানিত করে তোলে। অভিজিৎ সেনের সাহিত্যপাঠের রেশ 'ফুরোয় না' অর্থাৎ পড়ার পরেও নানান জিজ্ঞাসা রেখে যায়। পাঠককেও বিবেচনার খোরাক দেয়।

পৃথকভাবে তাঁর গল্প উপন্যাস পাঠকের কাছে আজ অচেনা নয়, তবে শুধু গল্প উপন্যাস নয়, কিছু প্রবন্ধ ও দু-একটি নাটক রচনাও করেছেন অভিজিৎ সেন। প্রকাশিত অপ্রকাশিত নাটকগুলি হল *চক হরিনার ডাইন, আঁধার মহিষ* এছাড়াও আরও একটি পূর্নাঙ্গ নাটক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প অবলম্বনে *মেঘমল্লার*। *একজন প্রতারক* নামে একটি একাঙ্ক নাটক লিখেছিলেন তিনি। বিভিন্ন বিষয়ে কিছু প্রবন্ধ রচনাও করেছেন অভিজিৎ সেন। তবে গল্প উপন্যাসেই তাঁর প্রতিভার প্রতিফলন বেশি। বর্তমানে অভিজিৎ সেনের গল্প উপন্যাস সাহিত্যানুরাগীর চর্চার জায়গা হয়েছে।

উল্লেখপঞ্জি

১। সেন, অভিজিৎ, *স্বপ্ন এবং অন্যান্য নীলিমা, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৪৯৩

২। সেন, অভিজিৎ, 'অলৌকিক প্রতিস্পর্ধা', উদয়চাঁদ দাস ও অরিন্দম চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *দেশবিভাগ ও বাংলা উপন্যাস,* বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৫ই আগস্ট ২০০৫, পৃষ্ঠা- ১২৮

৩। অভিজিৎ সেনের সাক্ষাৎকার, গৃহীত (অপ্রকাশিত), ফেব্রুয়ারি ২০১৩

৪। পূর্বোক্ত, ফেব্রুয়ারি ২০১৩

৫। অভিজিৎ সেনের সাক্ষাৎকার, বিকাশ শীল (সম্পাদিত), *জনপদপ্রয়াস* (অভিজিৎ সেন সংখ্যা), চুচুড়া, হুগলী, বইমেলা ২০০৬, পৃষ্ঠা- ২৫

৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র, 'গ্রন্থ পরিচয় (শ্রেষ্ঠ গল্প, অভিজিৎ সেন)', *আজকাল,* ২২শে সেপ্টেম্বর ২০০৭

৭। ভট্টাচার্য, তপোধীর, 'অভিজিৎ সেন-এর ঔপন্যাসিক সন্দর্ভ', সুবল সামন্ত (সম্পাদিত), *বাংলা উপন্যাস : বীক্ষা ও অন্বীক্ষা,* এবং মুশায়েরা, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১১, পৃষ্ঠা- ২৩৪

৮। সেন, অভিজিৎ, 'মিথ ও লোককথার সম্ভাবনা', অঞ্জন সেন ও উদয়নারায়ণ সিংহ (সম্পাদিত), *মিথ সাহিত্য সংস্কৃতি,* ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৩, পৃষ্ঠা- ১৪৫

৯। চট্টোপাধ্যায়, ব্রজদুলাল, ভূমিকা, *ঈশানী মেঘ ও অন্যান্য গল্প* (অভিজিৎ সেন), ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নয়া দিল্লি, প্রথম প্রকাশ ২০০৮, পৃষ্ঠা- ix

১০। অভিজিৎ সেনের সাক্ষাৎকার, বিকাশ শীল (সম্পাদিত), *জনপদপ্রয়াস* (অভিজিৎ সেন সংখ্যা), চুচুড়া, হুগলী, বইমেলা ২০০৬, পৃষ্ঠা- ১৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

সত্তর দশক, সমকালীন ঔপন্যাসিক ও অভিজিৎ সেন

একালের কথাকার অভিজিৎ সেনের আগে পিছে বিরাজ করছে একগুচ্ছ ইতিহাস। ১৯৪৫ সালে জন্মেছিলেন তিনি, গল্প লেখা শুরু ১৯৭১-৭২ সালে এবং উপন্যাস সত্তরের মাঝামাঝি সময় থেকে। বাংলা তথা ভারতবর্ষের সামাজিক রাজনৈতিক ইতিহাসে সত্তর দশক শুধু একটি সময় নয় মানুষের রক্ত ঘামে লেখা সময়ের অভিজ্ঞান। ১৯৪৫ সালে অভিজিৎ সেনের জন্মের পরে তেভাগা আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, স্বাধীনতা, দেশভাগের মতো ঐতিহাসিক পটভূমি নির্মাণ হয়েছিল। এবং তাঁর সাহিত্যে আবির্ভাবকালে কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজন, মুক্তিযুদ্ধ, নকশাল আন্দোলন, কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ, অপারেশন বর্গার মতো সরকারি পদক্ষেপ এসবই সমাজে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। সময়ের এত পট পরিবর্তন সত্তর দশকের অনেক লেখকের মতো অভিজিৎ সেনকেও ভাবিয়েছে। প্রতিবাদী, বিচারক, বিশ্লেষক করে কলম ধরতে উৎসাহী করেছে।

সত্তর ও সত্তর পরবর্তীকালে অভিজিৎ সেনের সব রচনাই সৃষ্টি, তবে সত্তরের কিছু আগের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিচয় মেলে তাঁর সাহিত্যে। সত্তর দশকের কথা বলতে গিয়ে কিছুটা সময় পিছিয়ে জমির অধিকার নিয়ে তেভাগা আন্দোলন, ১৯৪৬ সালের দাঙ্গা, ১৯৪৭ এর স্বাধীনতা ও দেশভাগ এই বিষয়গুলির উপরেও রেখাপাত করেছেন। এই বিষয়গুলো সত্তরের অন্যান্য সাহিত্যিকদের মতো তাঁর সাহিত্যকেও প্রভাবিত করেছে। তাই সত্তর দশকের লেখকদের কাছে এই বিষয়গুলিও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। জন্মের পর থেকেই কঠোর ইতিহাসের দৃষ্টান্ত দেখতে দেখতে বড় হয়েছেন অভিজিৎ সেন। শুধু দেখেননি, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ আঁচ অনুভব করেছেন, মানুষের সঙ্গে মিশেছেন, থেকেছেন, চিনেছেন সেই সময়ের মানুষ ও সমাজকে। শৈশবে পূর্ব পাকিস্তান থেকে এদেশে চলে আসা তাঁকে সেই সময়ের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সাহায্য করেছিল। পরবর্তীকালে ভাবিয়েছে, সেই সব ভাবনাকে তুলে ধরেছেন সাহিত্যে। এই কালগর্ভে অনেক সাহিত্যিকই সেদিন কলম হাতে তুলেছিলেন, কেউ কালের ধ্বনি শুনেছেন কেউ বা না শোনার ভান করে গুণ গুণ সুরে গান ধরেছিলেন। অর্থাৎ একদিকে রোম পুড়ছে অন্যদিকে সম্রাট বেহালা বাজাচ্ছে।

যাঁরা কান ও মন পেতে সেদিন কালের ধ্বনি শুনেছিলেন অভিজিৎ সেন তাঁদের একজন। আর যাঁরা বড়ো লেখকের ঘোড় দৌড়ে সামিল হয়েছিলেন তাঁরা মুকুটে প্রাপ্তির পালক পেয়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন। মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬) আক্ষেপ করেই বলেছিলেন—

> ঘরের চৌকাঠে অবিরত রক্তপাত বিষয়ে না লিখে সুখী, পলায়নী, যৌনতাসর্বস্ব লেখা।... বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের মধ্যেই যত আত্মদান ও আদর্শবাদিতা দেখে লেখা। এ কাজ যাঁরা করেছেন, তাঁদের বিষয়ে যেন আমরা বাকি জীবন সতর্ক ও অতন্দ্র থাকি।[১]

সত্তরের প্রথমভাগে নামী ও প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাগুলোতে উঠে এসেছিলেন শক্তিশালী কিছু লেখক কিন্তু তাঁদের অনেকেই সময় থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্য সুরে গান ধরেছিলেন। সেই গানের—

> মূল সুরটাই ছিল সমকাল থেকে পালানোর এবং পশ্চিমি রোমান্টিকতা ও সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের জগতে মুখ গুঁজে পড়ে থাকার।[২]

তবে সমরেশ বসু, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১৯), শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের (১৯৩৫) মতো লেখকও সেদিন যুগের অস্থিরতাকে দেখিয়েছিলেন অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে, অন্যভাবে। কোথাও যেন একটা ভারসাম্য রাখার চেষ্টাও করেছিলেন। এঁরা অভিজিৎ সেনের অগ্রজ শক্তিশালী লেখক তবে অভিজিৎ সেন অনেক সাহসী ও স্পষ্টবাদী, নিরপেক্ষতার ভান করেননি। অনেকেই তখন নিরপেক্ষতার ভান করেছিলেন, অভিজিৎ সেন মনে করতেন 'ভীষণ নিরপেক্ষ লেখক আসলে ভীষণ চতুর।' অনেকে প্রেম-যৌনতা, মধ্যবিত্ত জীবনের একঘেয়েমিকেই রূপ দিয়েছিলেন, বলা বাহুল্য মহাশ্বেতা দেবীর আক্ষেপ ছিল এই ধরনের লেখকদের জন্য। এই সময়ের অনেক আগে থেকেই মহাশ্বেতা দেবী তৈরি হয়েছিলেন যেন পরবর্তীকালের অনেক তরুণ লেখকদের আদর্শস্বরূপ হয়ে উঠতে। কিন্তু সময়কে ধরতে অনেকে যখন পিছপা হলেও মহাশ্বেতা দেবীই এগিয়ে এসে লেখার মধ্যে সময়কে ব্যাপ্তি দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তরের সময় মানবিকতার স্বার্থে শিল্পী সাহিত্যিকরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছিলেন, ফ্যাসিবাদ বিরোধিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), বুদ্ধদেব বসুর (১৯০৮-১৯৭৪) মতো লেখকেরা এগিয়ে এসেছিলেন। সত্তর দশকের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে—

> একদিকে ক্ষয়িষ্ণু পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণে বাংলায় যৌনতা ও হিংসার ছড়াছড়ি, অন্যদিকে সমাজের সত্যকারের চেহারাকে গোপন করে মিথ্যার বেসাতি খুলে অর্থোপার্জন এবং আত্মসমর্পন। এর মধ্য দিয়ে এগিয়ে এসেছে সত্তরের গল্প-উপন্যাস।[৩]

মহাশ্বেতা দেবী যে পথ কেটেছেন সেই পথেই এগিয়েছেন অভিজিৎ সেন। শুধু অগ্রজ কথাসাহিত্যিক হিসাবে নয়, মহাশ্বেতার পাঠক হিসাবেও তিনি লেখিকার গুণগ্রাহী। অভিজিৎ সেনের সমকালীন অন্যান্য অনেক ঔপন্যাসিক সেদিন বাংলার ব্যাপক সশস্ত্র বিপ্লব থেকে মুখ ফিরিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন আবার অনেকেই বাংলায় বসে সময়ের উত্তাপ উপেক্ষা করেননি ফলে সত্তরের দুই ধারার লেখক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। অভিজিৎ অবশ্যই দ্বিতীয় গোষ্ঠীর। সত্তর দশকের ঔপন্যাসিক সম্পর্কে আলোচনার আগে এই সময়ের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত রেখাপাত করা দরকার।

তেভাগা আন্দোলন

ঠিক সত্তর দশক নয়, প্রায় দুই দশক আগে ছেচল্লিশে কৃষকের ফসলের ভাগ ও অধিকারের দাবিতে তেভাগা আন্দোলন ভারতের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সত্তরের উত্তাল আবহের পর ভুমিসংস্কার ও অপারেশন বর্গার প্রসঙ্গে তেভাগাও চলে আসে কারণ পরবর্তীকালের কৃষিকেন্দ্রিক আন্দোলনে তেভাগার রেশ থেকে গেছে। উত্তরবঙ্গের মাটিতে বাংলা তথা ভারতবর্ষের কৃষকের স্বার্থে দুটি বৃহৎ আন্দোলনের গোড়াপত্তন হয়েছিল। তেভাগা এবং নকশাল আন্দোলন। দুটি আন্দোলনের সময়ের অন্তর অনেকটাই, আর একটিতে রাজনীতি সরাসরি প্রবেশ করেনি আর অন্যটিতে রাজনীতি ছিল অন্তরে। প্রতিপক্ষ একই। সত্তর দশকের সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প সংস্কৃতির কথা বলতে গিয়ে অচিরেই ছেচল্লিশের তেভাগা আন্দোলনের কথা এসে পড়ে।

১৯৪৬-৪৭ সালে একদিকে স্বাধীনতা ও দেশভাগের ইতিহাস নির্মিত হয়েছে অন্যদিকে হিন্দু-মুসলিম কৃষকরা একই ছত্রছায়ায় নেমে এসেছে। তাদের জাত, ধর্ম, গোত্র তখন একই তারা শোষিত বঞ্চিত কৃষক। এই সময় মুসলিম লীগ স্বাধীন পাকিস্তানের লক্ষ্যে হিন্দু মুসলিমের মধ্যে দাঙ্গা তৈরির চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল। কিন্তু আশ্চর্য এই কৃষক সমাজ কোনো প্ররোচনায় পা দেয়নি। লক্ষ্য স্থির রেখে জমির লড়াইয়ে টিকে থেকেছে। দিনাজপুর, রঙপুরে যে প্রবল উন্মাদনা তৈরি হয়েছিল কৃষকদের মধ্যে তা ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে সারা বাংলায়।

সিপাহি বিদ্রোহের পর কৃষকের মধ্যে এতবড় উন্মাদনা দেখা যায়নি। যদিও ১৯৩৬-৩৭ থেকেই দিনাজপুরে কৃষক আন্দোলন আরম্ভ হয়। যখন 'ধনীর স্বার্থই দেশের স্বার্থ' হয়ে দাঁড়িয়েছিল, একদিকে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে অন্যদিকে হাজার বিঘা জমির মালিকের সংখ্যাও। কৃষকের বর্গাদারে পরিণত হওয়া ও ভূমিহীন হবার একটি সহজ পদ্ধতি ছিল। প্রথমে চড়া সুদে মহাজনের কাছ থেকে ধার তারপরে মোকদ্দমা এবং বর্গাদার উচ্ছেদ। তেভাগার লড়াইয়ে কৃষকের মূল কথা ছিল ফসলের তিনভাগের দু-ভাগ কৃষকের, একভাগ জমিদারের। ঋণ করে কায়িক পরিশ্রম দিয়ে কৃষির সমস্ত উপাদান জোগান দিয়ে জোতদারকে অর্ধেক দিলে কিছুই থাকত না ভাগচাষিদের। আধিয়ার ফসলের অর্ধেক প্রাপ্য নিয়েই বাড়ি ফিরত তা নয়, সেই অর্ধেক থেকেও জোতদার পাওনা বাবদ আদায় করে নিত। অথচ

> আধিয়ার (বর্গাদার) জোতদারের জমি চাষ করে ফসলের অর্ধেক পায়। ফসল উৎপাদন খরচ, যেমন— হাল, বলদ, বিচন, সার এবং নিজেদের খাটুনি— এই সব মিলেই ফসলের অর্ধেক পেত।[৪]

জোতদারের শুধু জমি, এটা শুধু দেওয়ার হিসাব নেওয়ার হিসাবের সঙ্গে এর কোনো সাযুজ্য ছিল না।

> ধান কাটার পর জোতদারের বা জোতদারের নির্দিষ্ট খামারে ধান তুলতে হত। অংশ ভাগের সময় আধিয়ারের অর্ধেক অংশ থেকে জোতদার তার পাওনা বাবদ আরও আদায় করত। যেমন, শ্রাবণ ভাদ্রমাসে যদি এক মন ধান কর্জা দেয় তবে ধান ভাগের সময় সুদ ও আসল হত দেড় মন। বিচন ধান যদি কর্জা দিত, তবে সুদ ও আসল দ্বিগুন হত। এর উপর ছিল মহলদারি, বরকন্দাজি, গোলাপূজারি, মুরগি খাওয়া বা হাঁস খাওয়া (জোতদারের বাড়ির হাঁস মুরগির খাওয়ার জন্য ধান), থিয়েটার (জোতদারের বাড়িতে থিয়েটার যাত্রা হবার খরচ) ইত্যাদি। এই সমস্ত আদায়ের পর কোনও কোনও আধিয়ার দুই-তিন কাঠা ধান (আড়াই সেরি কাঠা) পেত। আবার কোনও কোনও আধিয়ার কিছুই পেত না। একেবারে শূন্য হাতে বাড়ি ফিরত।[৫]

এই ভাতে মারার কল থেকে মুক্তি পেতেই সংগঠিত কৃষকরা দাবি তুলেছিল জমিদারি প্রথা ধ্বংস হোক, 'লাঙল যার জমি তার' খাজনা মকুব করতে হবে, 'জান দিব, ধান দিব না,' তেভাগা চাই, নিজ নিজ খোলানে ধান তোলো ইত্যাদি। জেলায় জেলায় এই ডাক ছড়িয়ে পড়েছিল ফলে জোতদাররা ভয় পায়। কিন্তু আগেই আমরা জেনেছি 'ধনীর স্বার্থই দেশের স্বার্থ' তাই ভারত রক্ষা আইনের দোহাই দিয়ে সরকার আর পুলিশের অকথ্য অত্যাচার শুরু

হয়েছিল কৃষকের উপর। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ, পুলিশ, জোতদার, জোতদারের ভাড়া করা গুণ্ডাবাহিনী দ্বারা বারে বারে নিষ্পেষিত হয়েছে ভূমিহীন খাদ্যহীন কৃষকরা।

অত্যাচার অবিচারে জর্জরিত কৃষককে দমাতে পারেনি পুলিশ, জোতদারের লাঠি, গুলি, জেল, আগুন, ধর্ষণের মতো দমন অভিযান। মান খুইয়েও ধান বাঁচাতে বুক পেতে লড়াই করেছিল কৃষকরা। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস একযোগে প্রতিবাদী কৃষদের বিরোধিতা করেছিল। জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হত কৃষক নেতারা লুকিয়ে আছে ভেবে। মুসলিম নেতারা ইসলাম বিপন্ন বলে পথে নেমেছিল, হাজার হাজার মানুষকে গ্রেফতার ও শয়ে শয়ে মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। এমনকি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগিয়ে আন্দোলনের গতি রুদ্ধ করতে চেষ্টা করা হলেও দমাতে যায়নি সংঘবদ্ধ কৃষকদের। কৃষকরা ধান কেটে নিজ খামারে তুলতে শুরু করেছিল, কোনো কোনো জায়গায় আন্দোলনের গতিমুখ ছিল সরলরেখায়। কিন্তু আন্দোলন বিভ্রান্ত হল তখনই যখন একদিকে 'তেভাগা চাই' এই রব উঠেছে অন্যদিকে 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' এই সুযোগকে কাজে লাগিয়েছিল জোতদাররা। বাড়ি বাড়ি তল্লাশি করত পুলিশ, সঙ্গে থাকত জোতদার আর জোতদারের পোষা বা ভাড়া করা লাঠিয়াল ও গুণ্ডা। নেতৃস্থানীয় কৃষককে না পেলে বাড়ির মহিলা ও শিশুদের উপর গুলি চালিয়ে পিটিয়ে হত্যাও করত। নকশাল আন্দোলনের ক্ষেত্রে দেখেছি শহরের শিক্ষিত যুবকরা যারা মুক্তির দশকের আশায় ঝাঁপিয়ে গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং আশ্রয়দাতা সেই নকশাল বিপ্লবীর খাওয়া চিকিৎসা এবং তাকে নিরাপত্তা দানের চেষ্টা করত। তেভাগার ফেরার কৃষকরা এভাবেই আশ্রয় পেত, এবং বাড়ির ছেলের মতোই যত্ন পেত।

তেভাগা আন্দোলনকারীদের উপর শুধু জোতদারের অত্যাচার ছিল না, পুলিশি জুলুম মাত্রা ছাড়িয়েছিল। কৃষকদের মৃত্যুমুখে পাঠাতে পুলিশ বন্দুক উঁচিয়ে থাকত সর্বদা। শিবরামের মতো কত সাঁওতাল যুবক, সমিরুদ্দিনের মতো কত মুসলমান কৃষক, যশোদার মত কত নারী পুলিশের শিকার হয়েছিল। হত্যা আর বেপরোয়া বন্দির ফল যেন বিদ্রোহের আগুনে ঘৃতাহুতি হয়েছিল, আন্দোলনের তীব্রতা আরও বেড়ে গেল। দ্রুত সেই আগুন ছড়াতে লাগল। এরই মধ্যে প্রকাশ পেল কীভাবে কৃষকদের বঞ্চনা করা হয়েছিল, ঘৃণ্য প্রতারণা করে জোতদাররা কীভাবে অর্থ প্রতিপত্তিতে ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। এই তথ্য প্রকাশ হবার পর জনমানসে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। কৃষক সাধারণ মানুষের সমর্থন লাভ

করে কিন্তু আশ্চর্য হতে হয়, যখন সরকার, প্রশাসন, আইন, ছোটো-বড়ো জোতদার সবাই কৃষককে হাতে, ভাতে, কাপড়ে মারছে তখনও সমাজের শিক্ষিত বিবেচকদের সমস্ত ইন্দ্রিয় অবশ হয়েছিল। শচীন্দ্রদুলাল চক্রবর্তীর কথায়—

> এই বিরাট আর ব্যাপক কৃষক আন্দোলন অতীতে আর এত বড় হয় নাই। আভিজাত্যের উপর এত বড় প্রচণ্ড আঘাত যে আসতে পারে, আভিজাত্যভিমানীগণ ও বুদ্ধিজীবীগণ আদৌ ধারণা করতে পারে নাই। বুদ্ধিজীবীদের এক বড় অংশ সাংবাদিক, সাহিত্যিকেরা কৃষকদের বিরুদ্ধে জোতদারদের কাজে সায় দিল। মুক্ত মন দিয়ে আন্দোলনের বিচার করবার চেষ্টা তারা আদৌ করে নাই। এক প্রচণ্ড শক্তির বিরুদ্ধে কৃষকরা একাই লড়াই করল অথচ ধনিক কৃষকরাও কৃষকদের পাশে এসে দাঁড়ায় নাই! শ্রেণীগত চেতনা উদ্ভুত হয়ে রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করার অনুভূতিও সেদিনকার শ্রমিক শ্রেণীর ছিল না।[৬]

সমাজ যাদের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ বলে বিবেচনা করে থাকে তাদের পক্ষ থেকে কৃষকের ন্যায্য দাবিতে সমর্থন না আসাটা সমাজের রূপটাকে চিনিয়ে দেয়। কৃষক যে সমাজের মূল স্তম্ভ একথা বুদ্ধিজীবীরা কিছু সময়ের জন্য ভুলে ছিল। তবুও কৃষকরা নিজেদের লড়াই নিজেরাই চালিয়ে গিয়েছিল।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশভাগ

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে, খুব সুখের ও গর্বের বিষয় সমস্ত দেশবাসীর কাছে। কিন্তু ১৯৪৭ সালে আরও একটা পদক্ষেপ নিয়েছিল রাষ্ট্রপ্রধানরা, ভারতের বুক চিরে আরও একটা রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছিল। স্বাধীনতার আগের বছরটা অর্থাৎ ১৯৪৬ সালটাকে যদি রক্তক্ষয়ী বা রক্তদর্শনের বছর বলি অত্যুক্তি হবে না। এই রক্তক্ষয় স্বাধীনতার জন্য শহীদের রক্তক্ষয় নয়, মানুষের পাশবিকতার দ্বারা রক্তক্ষয়। হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায় একে অপরকে খুন ও ধর্ষণের প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। ফলে দেশভাগ অনিবার্য হয়ে পড়ল কিন্তু তাতেও হানাহানি থামেনি। ক্ষমতালাভের লোভকে সুপ্ত রেখে মানুষের হিতকে সামনে এনে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষের মানচিত্রে কাঁচি চালিয়ে দিয়েছিল নেতারা। দেশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন খণ্ডিত হয়েছিল, আমরা-ওরা, হিন্দু-মুসলমান এইভাবে। দেশ ও মানবতা ভাগের চুয়াত্তর বছর অতিক্রান্ত হলেও মনের টানে মানুষ আজও একাত্ম হতে পারেনি। দেশভাগের পরবর্তী কয়েক বছর বিক্ষিপ্তভাবে দাঙ্গা হয়েছিল। একসময় জমিদারের বিরুদ্ধে হিন্দু মুসলিম চাষিরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছে কিন্তু এবার আর ব্যাপারটা তেমন

থাকেনি। মুসলমানের সংরক্ষণ ও সুযোগ সুবিধার দাবিদাওয়া কংগ্রেস মেনে নেয়নি ফলে কংগ্রেস ও জিন্নার মুসলিম লীগের সম্পর্কে চিড় ধরেছিল। যেহেতু অধিকাংশ জমিদার হিন্দু তাই এদের বিরুদ্ধে মুসলমান চাষির বিদ্রোহ, হিন্দুর নিপীড়ন থেকে মুক্তি এসব ব্যাপারে মুসলমান সমাজ আলাদা রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতে লাগল। আত্মসম্মান, অধিকার খুঁজতে লীগ ব্যাপক প্রচার শুরু করেছিল, মুসলিম চাষিদের মনে জমিদারি শোষণ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জন্মাল এবং উপলব্ধি করল পাকিস্তান তাদের মুক্তি দিতে পারে, জনসংখ্যা বৃদ্ধিতেও মন দিয়েছিল তারা। এসব রেষারেষি শিক্ষাক্ষেত্রেও উঠে এল, উচ্চপদে মুসলিম আসীন হতে চাইছিল, অভিযোগ করেছিল, হিন্দু দ্বারা শিক্ষাব্যবস্থা প্রভাবিত হচ্ছে। অন্যদিকে হিন্দু মহাসভা মুসলিম লীগের এই উত্থানে থেমে থাকেনি, বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতি হিন্দুর দ্বারা গৌরব পেয়েছে তাই তাকে ইসলামীকরণ হতে দিতে চায়নি। হিন্দু সংগঠনকে তারা আরও শক্তিশালী করে তোলার প্রয়াস করেছিল। এখান থেকেই হিন্দুত্ব একটা প্রতিরোধাত্মক রূপ পেয়েছিল। পরিস্থিতিটা দাঁড়াল—

> পাকিস্তান দাবির আন্দোলন যেমন প্রবল হয়ে ওঠে, তেমনি তার পাশাপাশি চলতে থাকে জঙ্গি হিন্দু আন্দোলনের প্রক্রিয়াও। সাম্প্রদায়িক ভেদরেখায় বিদীর্ণ হয়ে যায় বাংলার জনসমাজ।[৭]

মানুষের মনে জ্বলতে থাকা ক্ষোভের আগুন একদিন দাবানলের মতো কলকাতা হয়ে বিহার, পাঞ্জাব, নোয়াখালি ছড়িয়ে পড়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামে অথবা জমিদারের বিরুদ্ধে একসঙ্গে লড়াই করা হিন্দু-মুসলিম মানুষের ছবি বিলীন হয়ে গেল। শত্রুপক্ষ ছেড়ে এভাবেই গৃহযুদ্ধের নেশায় মেতে উঠেছিল মানুষ।

এরপর প্রদেশ ভাগ নিয়ে লীগ ও কংগ্রেসের মতভেদ, ওজর-আপত্তি, প্রদেশগুলোর গ্রুপ ভাগ ইত্যাদি ব্যাপারে ব্রিটিশ কতৃপক্ষ দুই পক্ষের সুবিধা অসুবিধাকে সমানভাবে ভাগ করতে বেশ অসুবিধায় পড়েছিল। এসবের মধ্যে পাকিস্তানের দাবি মুসলমানদের মধ্যে আরও প্রবল হয়ে উঠেছিল। কংগ্রেস সভাপতি জহরলাল নেহেরুর আশঙ্কা ছিল লীগ সরকার গঠন করে ফেলতে পারে, অন্যদিকে লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বা 'ডিরেক্ট অ্যাকশন' এর ডাক দিয়েছিল। সার্বভৌম ও স্বাধীন পাকিস্তান অর্জনের জন্য লীগ মুসলমানদের তৈরি হতে বলেছিল। ব্রিটিশের শাসন ও কংগ্রেসের অসযোগের ফলে অস্ত্র ধরার সময় এসেছে এমনটা মুসলমানদের বোঝানো হয়েছিল। এর ফলে ১৬ আগস্ট কলকাতায় দাঙ্গা শুরু হয়েছিল।

দাঙ্গা খুব সংক্রমিত হিংসা, বায়ুবাহিতের মতো। তাই কলকাতা থেকে একেবারে নোয়াখালিতে দ্রুত দাঙ্গার সংক্রমণ ছড়িয়েছিল। কলকাতায় মুসলিমদের উপর অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ার নোয়াখালির হিন্দুরা অত্যাচারিত হয়েছে। তারই প্রতিশোধে বিহারে মুসলিম নিধন শুরু হয়। ক্রমে তা অন্যান্য প্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

> ১৯৪৬-৪৭-এর যে টানা দাঙ্গা, যার সঙ্গে দেশভাগ তথা খণ্ডিত স্বাধীনতার একটা প্রত্যক্ষ যোগ আছে, তার সূচনা হয় নিঃসন্দেহে ১৬ই আগস্ট থেকে।[৮]

এর আগে ১৯৪৬ সালের ২৯ জুলাই বিরাট এক ধর্মঘটে হিন্দু মুসলিম একত্রে ব্যাপকভাবে যোগ দেয়, এই ঘটনা শান্তিকামী মানুষের মনে আশা জাগিয়েছিল। কিন্তু ৩১ জুলাই থেকে ১৬ আগস্টের মধ্যে পরিস্থিতিটা বদলে গিয়েছিল। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হবে এটা কাঙ্ক্ষিত কিন্তু ধর্মকে আরও ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল যাতে সাম্প্রদায়িকতা বিষিয়ে ওঠে। আল্লা পাকিস্তান চায়, আল্লা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চায়, এই রমজান মাস কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উপযুক্ত সময়, নামাজের শেষে মসজিদ থেকে এসব ফতোয়া দেশভাগের আগে দাঙ্গাকে অনিবার্য করে তুলেছিল।

কংগ্রেস ও লীগের দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্যে আরও দুটি পক্ষ ছিল, কমিউনিস্ট ও ব্রিটিশ। কমিউনিস্টরা মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের দাবিকে সমর্থন করে লীগের পক্ষে ছিল। অবশ্য এর কারণ লীগ সরকারের বন্দিমুক্তির পদক্ষেপে কমিউনিস্ট কর্মীরা রেহাই পেয়েছিল। তাই লীগ শান্তিপূর্ণ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের যে ডাক দেয় তাতে কমিউনিস্টদের সমর্থন ছিল। প্রত্যক্ষ সংগ্রামে ডাকা ধর্মঘটকে ব্যর্থ করতে হিন্দু মহাসভাও তৈরি হয়েছিল সঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ। পুলিশের চরদের মতে, হিন্দুরাও অস্ত্র জোগাড় করতে লাগল, বাড়ির ছাদে ইঁট পাথর জড়ো করে রেখেছিল। মুসলিমদের প্রচারে বোঝা গেল তাদের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ইংরেজ নয়, হিন্দুদের বিরুদ্ধে। এভাবেই দাঙ্গার মাটি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সুপরিকল্পিত ভাবেই নির্দিষ্ট দিন ঠিক করে মানুষ প্রস্তুতি নিয়েছিল। প্রস্তুতির পর্বটা ছিল ভয়ানক—

> গুণ্ডা-অধ্যুসিত বস্তিতে-বস্তিতে লীগ নিয়মিত সভা করে দাঙ্গার কয়েকদিন আগে থাকতে; প্রধানমন্ত্রী সোহরাবর্দী নিজে উপস্থিত থাকেন। কামারদের দিয়ে ছোরা-বল্লম ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করিয়ে

> নেওয়া হয়; ছোরাছুরি শান দেওয়ার কাজ চলতে থাকে। মুসলমান ছাত্রদের হোস্টেলে কেরোসিন, মেথিলেটেড স্পিরিট ও অস্ত্র জমা করা হয়। মধ্যবিত্ত হিন্দু বাড়িতে ইট-পাথর-লাঠি মজুত রাখা হয়। মারোয়ারি ব্যবসাদাররা অস্ত্র কিনে রাখে। শিখরা তৈরি হয়। দুই সম্প্রদায়ই বাইরে থেকে গুণ্ডা ভাড়া করে আনে। মুসলমানদের দোকানে দাগ দিয়ে রাখা হয়, যাতে সেগুলো লুঠপাটের শিকার না হয়। সরকারের তরফ থেকে লীগ ক্যাডারদের পেট্রোল-কেরোসিন জোগান দেওয়া হয়। মসজিদে মসজিদে সভা চলতে থাকে। বেশিরভাগ থানা থেকেই হিন্দু পুলিশ অফিসারদের গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এক কথায় পুরোদস্তুর একটা যুদ্ধের প্রস্তুতি।[৯]

এই প্রস্তুতি মতোই ১৬ আগস্টের সকাল থেকে দাঙ্গা শুরু হয়েছিল, উত্তর থেকে দক্ষিণ কলকাতা জুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে ক্রমে ছড়িয়ে পড়েছিল। মিছিল স্লোগান আর মিছিলে পাথর ছুঁড়ে আক্রমণ ও নানান গুজবের মধ্য দিয়ে দাঙ্গার আগুন ছড়িয়েছিল। একদিকে শ্লোগান 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' অন্যদিকে 'নেহী দেঙ্গে পাকিস্তান'। দাঙ্গা কারা শুরু করেছিল কারা প্রথম হত্যা লুঠপাট চালিয়েছিল এই নিয়ে মতভেদ আছে তবে আক্রমণ প্রতি আক্রমণের মধ্য দিয়ে দাঙ্গা ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল। ময়দানে লীগের নেতাদের উত্তেজক ভাষণ আর গুজবের ফলে লুঠপাট, হত্যা, বাড়িতে আগুন লাগানো আরও বেড়েছিল। লীগ সরকারের পক্ষ থেকে দাঙ্গায় যাতে পুলিশ হস্তক্ষেপ না করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল ফলে মুসলমান পক্ষ দাঙ্গায় অনুপ্রেরণা পায়। এসবের পরেও গুজব জলন্ত আগুনে ঘৃতাহুতির কাজ করে। হিন্দু মেয়েদের স্তন কেটে দেওয়া হচ্ছে, শিশুদের মাথা নিয়ে মালা করে গুণ্ডারা পড়ছে এসবে সহজেই মানুষ উত্তেজিত হয়েছিল। প্রথম দিনে দাঙ্গার রাতে গভর্নরের রিপোর্ট অনুযায়ী মৃতের সংখ্যা ১০০ ছিল, পরেরদিন তা ৩০০ পৌঁছায়। ১৮ আগস্ট মৃতের সংখ্যা কয়েক হাজারে পৌঁছে যায়। কলকাতার রাস্তাঘাট নরকের রূপ নিয়েছিল।

স্টেট্সম্যান পত্রিকার মতে এই দাঙ্গা ছিল মুসলিম লীগের রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রদর্শনী। একথা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে এই দাঙ্গার অধিকাংশ দায় লীগের ছিল এটা সজ্জনদের কথায় বোঝা যায়। লীগ সরকারের মন্ত্রী সোহরাবর্দি সেদিন অনেকটা সময় পুলিশ কন্ট্রোলরুমে ছিলেন, লীগের পক্ষের দাঙ্গাবাজদের জন্য সমস্ত সুব্যবস্থা করে দিতে। গুন্ডাদের জন্য মন্ত্রীর গাড়িতে খাবার, অস্ত্রশস্ত্র আনা এবং সরকারি গাড়িতে মিছিলের লোকদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আবার অন্য তথ্যে সোহরাবর্দী মিলিটারি নামাতে চেয়েছিল মুসলমান অঞ্চল আক্রান্তের খবর পেয়ে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার

দাঙ্গা দমনে ব্যর্থই শুধু নয়, দাঙ্গা নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যাথা ছিল না। ফলে কারও কারও মনে হয়েছিল এসব আসলে ব্রিটিশের চক্রান্ত। তারা দুই পক্ষের মাঝখানে একটা সুখী অবস্থানে ছিল। কারণ তখন—

> জোড়াতালি দিয়ে কংগ্রেস-লীগ মিলিয়ে একটা অন্তর্বর্তী সরকার বসিয়ে তার হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়াটাই তখন ব্রিটিশের লক্ষ্য ছিল; এই উদ্দেশ্যের কথা মাথায় রেখেই সে হাঙ্গামায় জড়াতে চায়নি। ইংরেজ পুলিশের ভিতর এরকম একটা মনোভাব এসে গিয়েছিল যে, ক্ষমতা হস্তান্তর যখন মোটামুটি স্থির হয়েই গেছে, তখন তারা আর শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় বেশি আগ্রহ দেখাবে না।[১০]

ইংরেজ পুলিশ তো দূর, লীগ এই দাঙ্গা নিয়ে কোনো নিন্দাও করেনি, শোনা যায় প্রথমদিকে মহাত্মা গান্ধিও (১৮৬৯-১৯৪৮) মুখ খোলেননি। তবে আমজনতা থেকে লীগ বা কংগ্রেসের হাতে গোনা এক দুজন নেতা অন্য সম্প্রদায়ের পাশে দাঁড়িয়েছিল। এমন অনেক সাধারণ মানুষের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যারা প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে আশ্রয় দিয়ে বাঁচিয়েছিল।

দাঙ্গা শুধু গুণ্ডাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, মধ্যবিত্ত বাড়ির লোকেরাও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশ নিয়েছিল, মেয়েরা যুবকদের লাঠি এগিয়ে দিয়েও সাহায্য করেছে। দাঙ্গা, রাজনৈতিক হানাহানি, দুর্ভিক্ষ যাই হোক না কেন নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই দাঙ্গাতেও ইংরেজ, লীগের ও কংগ্রেসের উচ্চস্তরীয় নেতা খুন ও জখম হয়নি। খুন জখমের সঙ্গে কোটি কোটি টাকার জিনিসপত্র লুঠ হয়েছিল, বড়ো দোকান থেকে ছোটো দোকান কিছুই বাদ যায়নি। দাঙ্গার একটা উদ্দেশ্য ছিল একে অপরকে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করে দেওয়া। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দুটি চেতনা কাজ করেছিল, মুসলিম লীগ ক্ষমতা জাহির করতে চেয়েছিল তাতে মিশে গেল ধর্মীয় বোধ আর হিন্দুর চেতনায় ছিল প্রতিরোধ তার সঙ্গে যোগ হয়েছে কলকাতা থেকে মুসলমান বিতারণের সুযোগ। তাই কেউ শিশু, বৃদ্ধ, নারী এসব দেখেনি, শুধু বিধর্মী দেখেই হত্যার নেশায় মেতে উঠেছিল।

কলকাতা যখন চারদিনের দাঙ্গায় ক্লান্ত হয়ে ঈদ আর পুজোর আনন্দহীন উৎসবে যোগ দিয়েছিল অন্যদিকে ১০ অক্টোবর নোয়াখালিতে এই দাঙ্গার রেশ চলে যায়। কলকাতা দাঙ্গার অপপ্রচার আর মৌলবাদীদের উস্কানিতে নোয়াখালির মুসলমানেরা উত্তেজিত হয়ে প্রতিশোধের নেশায় মেতে উঠেছিল। সঙ্গে হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে মুসলমান চাষির

ক্ষোভের অনুসঙ্গ যোগ হয়েছিল। খুন, লুঠপাট, আগুন লাগানোর সঙ্গে এই দাঙ্গায় যুক্ত হয়েছিল গো হত্যা, জোর করে গরুর মাংস খাওয়ানো, ধর্মান্তরণ, জোরপূর্বক বিয়ে করে হিন্দু মেয়ের ধর্ম পরিবর্তনের মতো ব্যাপারগুলো। আর ব্যাপকভাবে ধর্ষণের শিকার হয়েছিল মেয়েরা। নৃশংসতায় কলকাতার দাঙ্গাকে ছাপিয়ে গিয়েছিল নোয়াখালির দাঙ্গা। গান্ধিজি নোয়াখালি যাত্রা করেছিলেন মানুষের ভয় হতাশা দূর করতে কিন্তু তাঁর এই উদ্দেশ্য সফল হয়নি। মানুষের মধ্যে রাগ, ঘৃণা, ধিক্কার ভয় সব মিলিয়ে একটা বিপর্যস্ততা কাজ করছিল। মুসলমানদের থেকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ আর হিন্দুর থেকে হতাশার কাহিনি শুনে গান্ধিজি ফিরে এসেছিলেন। নোয়াখালিতে যেমন মৌলবাদীদের মদতে দাঙ্গা বাঁধে বিহারে তেমন হিন্দু জমিদারের প্ররোচনায় গয়া, পাটনা, ভাগলপুরে ব্যাপক দাঙ্গা শুরু হয়েছিল। কলকাতার পালটা নোয়াখালি আর নোয়াখালির পালটা বিহার। কিছুদিন পরে আবার উত্তরপ্রদেশে দাঙ্গা হয়েছিল সামান্য গন্ডগোলকে কেন্দ্র করে। রাজনৈতিক স্বার্থ বোধহয় সমস্ত নৃশংসতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বিহার, কলকাতা, নোয়াখালির দাঙ্গা লীগ ও কংগ্রেসের রাজনৈতিক স্বার্থ থেকেই সংগঠিত হয়েছিল। লীগের রাজনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে ধর্মীয় স্বার্থও ছিল।

মুসলমানরা যেমন পাকিস্তানের দাবিতে সরব হয়েছিল, হিন্দুরাও ক্রমাগত দাঙ্গা আর তাতে লীগের মদতের প্রতিকার হিসাবে বাংলাতেই পৃথক প্রদেশের দিকে ঝুঁকেছিল। অনেক শিল্পপতি বাংলা ও দেশভাগের পক্ষে ছিল। বাংলা ভাগ নিয়ে তরজা থামছিল না, সমগ্র বাংলাকে কেউ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিল, কারও মত ছিল বাংলা স্বাধীন প্রদেশ থাকুক। আসলে আকর্ষণ কলকাতাকে কেন্দ্র করে, কলকাতা ছাড়া বাংলা নিয়ে কি লাভ এমন মনে করেছে জিন্না। বাংলাভাগের ফলে চটকলগুলো পশ্চিমবঙ্গে থেকে যাবে, লাভ হবে মারোয়ারি ব্যাবসাদারদের আর হিন্দুদের। লীগ বাংলাভাগের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালায় অন্যদিকে হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেস বাংলাভাগের পক্ষে ছিল। ১৯৪৭ সালের ২০ জুন প্রাদেশিক বিধান পরিষদে বাংলাভাগের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। ফলে ব্যাপক খুশি হয়েছিল হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেস। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৫৩) মনে করেছিলেন এটা যথার্থই 'হিন্দুদের মুক্তির দিবস'। পশ্চিম বাংলাকে পাকিস্তানের বাইরে রাখা গেল, কলকাতাকে পাকিস্তান পেল না এতে লীগের নেতারা মনে করেছিল তাদের সঙ্গে অন্যায় করা হয়েছে। দাঙ্গা থেকেও মুক্তি পাওয়া গেল না। এরপরেও স্বাধীনতার দিন যত এগিয়ে আসছিল দাঙ্গা তত বাড়ছিল। আগস্টের ১২-১৩ তারিখ পর্যন্ত দাঙ্গা চলেছিল। স্বাধীনতার

প্রাক্কালে দাঙ্গার রূপ একটু আলাদা হয়েছিল, ছেচল্লিশের দাঙ্গায় ছোরা, লাঠি, মুগুর ব্যবহার করা হয়েছিল বেশি মাত্রায়, ৪৭ সালের দাঙ্গায় স্টেইন গান, পিস্তল, পেট্রোল বোমা, গ্রেনেড, অ্যাসিড ব্যবহার করা হয়েছে। এবং ছেচল্লিশের লীগ সরকারের আমলে দাঙ্গায় মুসলমান পুলিশ যা করেছিল ৪৭ এর দাঙ্গায় হিন্দু পুলিশ তাই করেছে। স্বাধীনতার পরেও অবস্থার পুরোপুরি উন্নতি হয়নি, কলকাতায় বিক্ষিপ্ত ভাবে লেগেই থাকল দাঙ্গা। গান্ধিজি খুব বিচলিত হয়ে অনশনে বসেছিলেন হিংসা বন্ধ করার অনুরোধে। তাতেও কাজ হয়নি। স্বাধীনতার পরেও অনেকটা সময় জুড়ে হিংসা চলেছিল।

শুধু ১৯৪৬ সাল নয়, দাঙ্গা হয়েছে তারপরে আর এখনো হচ্ছে। স্বাধীনতা ও দেশভাগ শুধু দাঙ্গার কারণ নয়, তাই যদি হত তাহলে স্বাধীনতার পরেও দাঙ্গার ধারাবাহিকতায় ২০০২ সালে গুজরাট দাঙ্গা এবং সাম্প্রতিক ২০২০ সালে দিল্লি দাঙ্গা হত না। মানুষ প্ররোচিত হয়ে বারে বারে নিজের ভিতরের অশুভ শক্তিকে জাগিয়ে তোলে। আসলে—

> নিজেদের স্বার্থকে জনগণের স্বার্থ হিসাবে প্রচারের উদ্দেশ্য দুই সম্প্রদায়ের কায়েমী স্বার্থই দাঙ্গাকে ব্যবহার করে হাতিয়ার হিসাবে।[১১]

আজকের যে কোনো সাম্প্রদায়িক ঘটনায় মানুষ এক মুহূর্তে পিছিয়ে গিয়ে ছেচল্লিশ সাতচল্লিশের হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার সম্পর্ককেই যেন মনে করে। অথচ এই সময়েই স্বাধীনতার দিনের উভয় সম্প্রদায় গলা মেলানো, মিলেমিশে আনন্দ করার মুহূর্তগুলো মনে করে না। চিরাচলিত যে বিভেদরেখা জন্ম-জন্মান্তরে মানুষ বয়ে চলেছে হিন্দু মুসলমানের জন্য, মুসলমান হিন্দুর জন্য। এই ভেদরেখা যত তাড়াতাড়ি মুছে যাবে মানবসমাজের মঙ্গল সাধিত হবে।

নকশাল আন্দোলন

জমির লড়াইয়ে কৃষকের পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিল শহর থেকে আসা শিক্ষিত যুবকেরা। ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙনের ফলে সি.পি.আই.এম দলটি তৈরি হয়েছে। এরা সিপিআই-কে ‘সংশোধনবাদী’ বলে বেরিয়ে এসেছিল। ১৯৬৭ সালে সি.পি.আই.এম-এর মধ্যে পুরোনো সি.পি.আই-কে দেখেছে দলের একাংশ। ফলে এদের ‘নয়া সংশোধনবাদী’

বলে সি.পি.আই.এম থেকে আর একটি অংশ বেরিয়ে এসেছে যার নাম হয় সি.পি.আই.এম.এল বা নকশাল। কমিউনিস্ট পার্টির এই শেষ দলটি ভারতীয় রাজনীতিতে সাড়া জাগিয়ে সমূলে নাড়া দিয়ে সত্তর দশকের সার্বিক ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। যদিও মার্কসবাদকে আদর্শ করলেও প্রয়োগ করতে পারেনি যথার্থভাবে। সত্তর দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করতে না পারলেও অনেক সম্ভাবনার জন্ম দিয়ে গেছে। সংসদীয় রাজনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, জোতদারের বিরুদ্ধে কৃষককে ন্যায় বিচার পাইয়ে দিতে শহরের শিক্ষিত ছাত্র যুবরা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল। মাওয়ের সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও বিপ্লব না করার ফলে কমিউনিস্টদের দলের অভ্যন্তরে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল। সংসদীয় রাজনীতিতে অনাস্থা, সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কৃষিবিপ্লবে সাফল্য এবং সি.পি.আই.এম-এর ভাবভঙ্গিকে তীব্র সমালোচনা করে বেরিয়ে এসেছিল নকশাল কর্মীরা, সামন্ততন্ত্র, আমলাতন্ত্র, পুঁজিবাদকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল এরা। ১৯৬৭ সালেই মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙনটা স্পষ্ট লক্ষিত হয়েছিল। চারু মজুমদারের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় দল অর্থাৎ নকশালরা পুঁজিবাদী ও নিজের পূর্বের 'সংশোধনবাদী' দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। দলবিরোধী কার্যকলাপের জন্য দল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল যারা তাদের মধ্যে চারু মজুমদার, কানু সান্যাল, সুশীতল রায়চৌধুরী, অসিত সেন প্রমুখ ছিলেন নকশাল দলের নেতৃমুখ। সিপিআই থেকে সি.পি.আই.এম-এর বেরিয়ে আসারই পুনরাবৃত্তি হয়েছিল সি.পি.আই.এম থেকে সি.পি.আই.এম.এল-এর বেরিয়ে আসা। যে অভিযোগে সি.পি.আই.এম বেরিয়ে এসে নতুন দল তৈরি করেছিল তারাও সেই কাজেরই পুনরাবৃত্তি করতে লাগল। বুর্জোয়াদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আপস আর বিপ্লবকে রুদ্ধ করে পাবার লোভে ডুবে গিয়েছিল। তাই বিদ্রোহকামী নকশালপন্থীরা বেরিয়ে এসেছিল।

সি.পি.আই.এম.এল ভারতীয় বিপ্লবের পথ হিসাবে জনযুদ্ধকে গুরুত্ব দিয়েছে। গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে খতম অভিযান চালিয়ে অর্থাৎ জোতদার খতম করে জমির উপর সামন্ততান্ত্রিক অভিযানকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। কৃষককে জমির অধিকার পাইয়ে দিলেই জনগণের সব সমস্যার সমাধান হবে। আর এসবই সম্ভব শুধুমাত্র বন্দুকের নলে ভর করে এমনটাই মনে করেছিল তারা। কৃষককে সঙ্গে নিয়ে এদের মূল কর্মসূচি ছিল—

(১) জোতদার জমিদারশ্রেণী জনসাধারণকে শোষণ করে যে বিশাল সম্পত্তি জমা করেছে, তা বাজেয়াপ্ত করা; (২) জোতদারের জমির ফসল ধান বাজেয়াপ্ত করা, (৩) প্রজাপীড়ক অত্যাচারী জমিদার-জোতদারকে খতম করা। শ্রেণীশত্রুর দালালদের শাস্তি দেওয়া; (৪) শ্রেণীশত্রু রক্ষাকারী ঘৃণ্য পুলিসদলকে খতম করা; (৫) জনযুদ্ধে জয়লাভ করার জন্যে গেরিলাবাহিনী ও গণমুক্তি ফৌজ তৈরি করা; এবং গ্রামাঞ্চলে কৃষক সংগ্রাম সমিতি ও শাসনব্যবস্থার জন্যে একটি বিপ্লবী সংস্থা গঠন করা।[১২]

এই কর্মসূচিতে হিংস্রতা আছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই কিন্তু উদ্দেশ্যে একটি বৃহৎ নিঃস্বার্থতা আছে। তারা মনে করেছিল 'এই পথেই আলো জ্বেলে এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে;' এই আশায় সেদিন অনেক প্রতিভাবান ছাত্র যুবক বিপ্লবের স্বপ্ন বুকে নিয়ে দিন বদলের আশায় গ্রামে ভূমিহীন দরিদ্র কৃষকের ঘরে কৃষকের মতোই থাকতে শুরু করেছিল। শুধু স্বপ্ন আর দুটি লাল বইকে সম্বল করে পথে নেমেছিল তারা। উদ্দেশ্য সফল করতে গ্রামে গণমুক্তি ফৌজ তৈরি করে জোতদার ও পুলিশকে খতম করতে থাকে।

এই খতম অভিযান বিশেষ কাজে আসেনি কারণ জোতদার খতম করে আর সমাজ সংস্কারকদের মূর্তি ভেঙে ক্ষমতা কায়েম করা সম্ভব ছিল না। সরকার নকশালদের সমূলে বিনাশ চেয়েছে, পুলিশ নকশালদের দেখলেই নৃশংস ভাবে হত্যা করেছে। আবার সি.পি.আই.এম তাদের শত্রু। পুলিশ এবং সি.পি.আই.এমের সাঁড়াশি চাপে বিভিন্ন স্থানে নকশাল ধরা পড়তে থাকে আর নির্বিচারে নিধন হতে থাকে। কোন্নগর, কাশীপুর বরাহনগর, বারাসাত, ডায়মন্ড হারবারের গণহত্যা নকশাল আন্দোলনকে একেবারে দমিয়ে দিয়েছিল। এছাড়াও পূর্বেই চারু মজুমদারের প্রতি দলের মধ্যেই বিরোধ দেখা দিয়েছিল। অভিযোগ, চারুবাবু মাওয়ের পথ ছেড়ে চে গুয়েভারা লাইন অনুসরণ করছেন। মাওয়ের মত অনুসারে মানুষ সংঘবদ্ধ হয় রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য আর চে গুয়েভারার মতে সংঘর্ষের জন্য। অর্থাৎ খতমের এই উগ্র পথ দলের অনেকেই মানতে পারেনি। চারু মজুমদার মার্কসবাদের বিচ্যুতি ঘটিয়েছেন। এমন আরও অনেক কারণে ১৯৭২ সালেই এই আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যায়। পরিকল্পিত কর্মসূচি সামলাতে ব্যর্থ হলেও নকশাল আন্দোলন দেশের সমাজ, ইতিহাস, শিল্প, সাহিত্যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব রেখে গেছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল। সময়ের নিরিখে ভারতের স্বাধীনতা লাভের ইতিহাস দীর্ঘ আর বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের ইতিহাস কম সময়ের। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবে আলোচিত হয়েছিল মুসলিম প্রধান দুটি বৃহৎ অঞ্চল নিয়ে তৈরি হবে দুটি দেশ। কিন্তু ১৯৪৭ সালে নাটকীয়ভাবেই জন্ম হয়েছে পাকিস্তানের। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে একটি বিষয়ে শুধু সাদৃশ্য ছিল, ধর্ম। বাকি অনেকগুলি বিষয়ে বৈসাদৃশ্য ছিল। খাদ্য, পোশাক, ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি ব্যাপারে। প্রথমদিকে পূর্ব পাকিস্তানের লোক সংখ্যা অনেক বেশি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে। কিন্তু সরকারি টাকার আশি থেকে পঁচাশি শতাংশ বরাদ্দ হয়ে যেত পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য। অথচ আয় বেশি হত পূর্ব পাকিস্তান থেকে। পূর্ব পাকিস্তানকে এই পর্যন্ত বঞ্চনা করার পরেও আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছিল পাকিস্তান শাসক ভাষা ও সংস্কৃতির উপর আঘাত আনতে চেষ্টা করে। ১৯৪৮ সালে আলি জিন্নাহ ঢাকায় এসে রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু একথা ঘোষণা করেছিল। এরপরেই পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এখান থেকেই বাংলা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত। সত্তর দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করার প্রক্রিয়া বাংলা তথা ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্যে যখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে তখন অন্য দিকে বেজে উঠেছিল মুক্তিযুদ্ধের দামামা।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। ভারত এই যুদ্ধের সঙ্গে সরাসরি জড়িত একথাও ভুলে গেলে চলবে না। দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে এই বাংলায় আসা অনেক লেখক তাঁদের শিকড়ের কথা অকপটে সাহিত্যে তুলে এনেছেন। কিন্তু ওই প্রান্তের লেখকরা এক্ষেত্রে অনেকটাই শাসনাধীন, কারণ ফেলে যাওয়া শত্রুদেশ অর্থাৎ হিন্দুস্থান নিয়ে কোনো আবেগ প্রকাশ করাই ছিল আইন বহির্ভূত কাজ। তাই দেশভাগ কেন্দ্রিক সাহিত্য বাংলাদেশে লেখা হতে অনেকটা সময় লেগে গিয়েছিল। শুরু থেকেই পাকিস্তানের ক্ষমতার শীর্ষে ছিল সেনাবাহিনী। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সেনাবাহিনীর হাতে পুরোপুরি ক্ষমতা নেবার পর সবচেয়ে বেশি ব্যয় সেনাখাতে হতে থাকে। এবং এখান থেকেই শুরু হয়েছিল ষড়যন্ত্র আর অত্যাচারের মূল পর্ব। হিন্দুস্থানের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তানের বড়ো শত্রু হয়ে উঠেছিল। এমনকি পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসরত অধিকাংশ অমুসলিমদের মৌলিক স্বাধীনতা হরণ করে 'শত্রু সম্পত্তি

আইন অধ্যাদেশ' জারি করেছিল পাকিস্তান সরকার। এই পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগের নেতা মুজিবর রহমান ছয় দফা দাবি ঘোষণা করেছিলেন যা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষদের সমস্ত রকম বঞ্চনা থেকে মুক্তি দেবে। এর ফলে মুজিবর রহমানকে জেলে যেতে হয়েছিল। সময়টা ছিল ১৯৬৬ সাল। এই ঘটনার পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি আরও বদলাতে থাকে। জনতা ও ছাত্র যুবকদের মধ্যে ছড়াতে থাকে আন্দোলনের আঁচ, তা ১৯৬৯ সালের মধ্যে ব্যাপক আকার নিয়েছিল। মতিউর, আসাদদের মতো ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ দেয়। আন্দোলনের চাপে পশ্চিম পাকিস্তান মুজিবর রহমানকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিল।

১৯৭০ সালে প্রথম ভোট হয়েছিল পাকিস্তানে তাতে মুজিবর রহমানের আওয়ামী লীগ ভালো ফল করেছিল। ফলে ছয় দফা দাবির বাস্তবায়ন হবার সুযোগ এসে যায়। এখান থেকে স্বাধীনতার স্বাদ পাবার উন্মাদনায় মেতে উঠেছিল পূর্ব পাকিস্তানীরা। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ সালে শহীদ দিবস পালন করেছিল এবং মার্চে এই পরিস্থিতি আরও উত্তাল হয়ে উঠেছিল। স্বাধীন বাংলাদেশের স্লোগানসহ জাতীয় পতাকা তোলা হয়েছিল বঙ্গবন্ধু মুজিবরের অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ফলে। পূর্ববঙ্গ দেশ চালনায় কোনোভাবে পাকিস্তানকে সাহায্য করেনি। ফলে যে অচলবস্থা তৈরি হয় তা কাটাতে পাকিস্তান সেনারা হত্যালীলা চালিয়েছিল। পথে নেমে আসা হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে খতম করেছে। এছাড়াও ঢাকার হিন্দুপ্রধান এলাকায় আক্রমণ করেছে। হত্যার সঙ্গে মন্দির, বাড়ি ধ্বংস করেছিল পাকিস্তানি সেনারা। মুক্তিযোদ্ধা ও বাঙালি হত্যার দীর্ঘ ইতিহাস রচনার সঙ্গে বঙ্গবন্ধু আবার গ্রেফতার হয়েছেন। ওই বছরেরই ২৬ মার্চ এসেছিল রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যার ফলে প্রায় ১ কোটি মানুষ দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। অনাহারে অনেক বৃদ্ধ ও শিশুর মৃত্যু হয়েছিল। তবে স্বাধীনতা লাভের পরেও পুরোপুরি শত্রু মুক্ত হয়নি বাংলাদেশ। ক্রমে যৌথবাহিনী সংগঠিত হয়ে আক্রমণ করে, সারাবছর ধরে শত্রুমুক্ত করতে হয়েছে বাংলাদেশকে। ভারতের সার্বিক সাহায্যের সঙ্গে মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর, হামিদুর রহমান, মোস্তাফা কামাল, রুহুল আমিন, মতিউর রহমানের মতো মুক্তিযোদ্ধাসহ বাংলাদেশের নারীদেরও বলিদান বাংলাদেশকে মুক্তির স্বাদ দিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতির হিসাব দীর্ঘ, পঁচিশ থেকে তিরিশ লক্ষ প্রাণ গিয়েছিল পাকিস্তান সেনার হাতে, প্রায় দু-লক্ষ নারী লাঞ্ছিত হয়েছিল। এতকিছুর বিনিময়ে বাংলাদেশের মানুষ তাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে উদ্ধার করতে পেরেছিল।

ভূমিসংস্কার ও অপারেশন বর্গা

পশ্চিমবঙ্গে তেভাগা আন্দোলন, নকশাল আন্দোলন, ভূমিসংস্কার ও বর্গা আইন একই জমির ফসল। তিনটির ক্ষেত্রে একটি বিশেষ যোগসূত্র জমি। পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কারের ফলে কৃষিতে প্রভূত উন্নতির সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল। সরকারি ব্যবস্থায় কৃষি উপাদানের জোগান, সেচ ব্যবস্থা, ঋণদান, উন্নত বীজ ইত্যাদির ফলে কৃষিতে আমূল পরিবর্তন এসেছিল। ফলন বাড়ে, এক-ফসলি, দো-ফসলি জমি ক্রমে তিন-ফসলি হয়ে ওঠে তাই বর্গাদাররা কিছু লাভের মুখ দেখেছিল। ভূমিসংস্কার আইনের একটি ধারায় অপারেশন বর্গা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল ১৯৭৮ সালে। এর ফলে বর্গাচাষি কিছুটা হলেও নিজস্ব জমি পায় সরকারি হস্তক্ষেপে। অন্যদিকে ফসলের উৎপাদন দেখে জোতদারের চোখ কপালে ওঠে। রত্নগর্ভা জমির প্রতি লোভ বাড়তে থাকে জোতদারের। তাই জোতদার জমি নিজ হস্তগত করতে চেয়েছে ফলে কৌশলে বর্গা উচ্ছেদের প্রক্রিয়া শুরু হয়।

১৯৫৫ সালে সংশোধিত ভূমিসংস্কার আইন সামন্ততন্ত্রকে কৃষিক্ষেত্র থেকে সমূলে উৎপাটন করার এক প্রক্রিয়া ছিল একথা স্বীকার্য। পতিত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করা, বর্গানথিভুক্তি, ঋণদান, গ্রামোন্নয়নের নানান প্রকল্প কৃষিক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন আনতে পারত। কৃষক তার নিজের ভূমি পেতে পারত, যে জমির জন্য তাদের আজীবন লড়াই করতে হয়েছিল। আসলে—

> ভূমিসংস্কার শুধু কৃষকের স্বার্থে নয়, ভূমি সংস্কারের প্রয়োজন সমগ্র সামাজিক স্বার্থে। একমাত্র ভূমিসংস্কারই ভারতীয় সমাজ ও অর্থনীতিকে ধারাবাহিক প্রগতির পথে নিয়ে যেতে পারে।[১৩]

তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রগতির এই পদক্ষেপ নিয়েছিল ঠিকই কিন্তু সেভাবে কার্যকর হয়নি। প্রচলিত ব্যবস্থাকে বদলাতে যে ভূমি তৈরি করার দরকার ছিল তা হয়ে ওঠেনি। জোতদাররা অর্থ এবং প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক আনুগত্যে ক্ষমতার অধিকারী ছিল। ফলে সরকারের পক্ষে জোতদারের হাত থেকে অনৈতিক জমি অধিগ্রহণ করে ভেস্ট করা ও সেই জমি বর্গাদারদের মধ্যে বিলি করা কঠিন হয়ে যায়। পরবর্তীকালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এলে ভূমিসংস্কারের কাজে জোয়ার আসে। সমাজকে প্রগতির পথ দেখাতে পারে একমাত্র এই কৃষক শ্রেণি, তাই সরকার সদিচ্ছায় বর্গাদারকে চাষে নিশ্চয়তা দান করতে পেরেছিল। এবং খেতমজুরসহ গ্রামীণ কারিগর ও মৎস্যজীবীদের ৮ শতক জমিতে বাস্তু প্রদান করেছিল।

এছাড়াও উৎপাদনের উপকরণ সরবরাহের সঙ্গে স্বত্বলিপি বা রেকর্ড অব রাইট হালতক করে। ফলে শুধু স্বাধীন কৃষি নয় বসত বাড়ির সমস্যারও সমাধান হয়েছে। তবে কংগ্রেস সরকারের সময় জমি বন্টনকে কেন্দ্র করে যে নাটক তৈরি হয়েছিল তাতে জোতদারের চালাকি আর তৎকালীন কংগ্রেসের উদাসীনতা প্রকাশ পায়। পরবর্তীকালে কংগ্রেস আবার ক্ষমতায় এসে জমি বণ্টনের পদক্ষেপ নিয়েছিল। যুক্তফ্রন্টের সময় যারা জমি দখল করেছে তাদের উৎখাত করার চেষ্টা করাও হয় কিন্তু কৃষকের সংঘবদ্ধ রূপ দেখে জোতদার ব্যর্থ হয়। বন্টনের প্রক্রিয়ায় কংগ্রেস চরম উদাসীনতা দেখিয়েছিল ফলে অনেক অযোগ্য লোক জমি পায়। **১৯৬৭-৭১** সালের মধ্যে ভূমিসংস্কারের সর্বাত্মক আন্দোলনের ফলে কয়েক লক্ষ একর জমি **১৯৫৫** সালের ভূমিসংস্কারের ধারা অনুযায়ী সরকার বন্টনের সুযোগ পেয়েছিল। মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ কোঙার সরকারি পদ্ধতি ফেলে কৃষক শ্রেণির নেতৃত্বে জমি দখল করে কৃষককে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করেছিলেন। কিন্তু অংশীদারদের সঙ্গে কৃষকদের বিরোধ বাঁধলে আর এই সুযোগে জোতদাররা অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাহায্যে গুণ্ডা দিয়ে জমি দখল করে নেয়। ফলে একটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। এই সময় যুক্তফ্রন্টের পতন এবং কৃষকের মধ্যে একটা রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরি হয়েছিল যা তাদের আকাঙ্ক্ষাকে শক্ত করে। **১৯৭৫** সালে জরুরি অবস্থাকালীন পাট্টা বিলিতে যে অরাজকতা দেখা দেয়, **১৯৭৭** সালে আবার বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এলে তার অনুসন্ধান করে ভূমিসংস্কার আইনে কিছু শর্ত আরোপ করেছে। **১৯৭৮** সালে অপারেশন বর্গার মধ্য দিয়ে ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষিজমি বন্টনের কাজ জোরকদমে শুরু হয়েছিল।

বর্গাআইন প্রণীত হয়েছিল **১৯৫০** সালে, কিন্তু এর ফাঁকফোঁকর আর জুলুমবাজিতে জোতদার নিজের ফায়দা ধরে রেখেছিল, ফলে এই আইনের দ্বারা প্রথমদিকে বর্গাদারের বিশেষ কিছু লাভ হয়নি। তেভাগার পরবর্তী সময়ে জোতদারের অত্যাচারের তীব্রতা বাড়ে তবুও কৃষক ও বর্গাদাররা সংগঠিত হয়েছিল। তবে কৃষকদের রক্ষার জন্য প্রশাসনের হস্তক্ষেপ খুবই দরকার ছিল। আইন প্রণয়নের পরে **১৯৫৬** সালে বর্গার অধিকার, বর্গার উত্তরাধিকার, ফসলের ভাগ, বর্গা উচ্ছেদ, শোষণ বন্ধের উপায় ইত্যাদি সংক্রান্ত নিয়ম চালু হয়েছে। কিন্তু জোতদার কৃষকদের কাগজ কলমের অদক্ষতার সুযোগ নিয়ে উচ্ছেদের মামলা দায়ের করতেই থাকে। অবশেষে **১৯৭৭** সালে ভূমিসংস্কার আইনের সংশোধনের দ্বারা কিছুটা স্বস্তি আসে বর্গাদারদের। **৭৭** এর পর বর্গাদাররা নথিভুক্তকরণের জন্য সেইভাবে

এগিয়ে আসেনি কারণ জোতদারের ভয় আর কাগজ নিয়ে সরকারি অফিসে বার বার যাতায়াতের ফলে সময় নষ্ট হয়, তাতে চাষের কাজেও ক্ষতি হয়েছিল। কিন্তু সরকারের উদ্যোগে কিছু কৃষক, বর্গাদার, সরকারি আধিকারিকসহ শিবির করে প্রায় আলোচনা চালাত। যেখানে মন্ত্রী উপস্থিত থাকতেন। এই শিবির থেকেই অপারেশন বর্গা কর্মসূচির ধারণা এসেছে। ক্রমে বর্গাদারদের ভীতি কেটে যায়। নিয়ম করে সান্ধ্য বৈঠকে কৃষক ও বর্গাদারদের সঙ্গে ভূমিসংস্কার মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী উপস্থিত থেকে কৃষকদের উৎসাহ ও নিশ্চয়তা দিতেন। ক্রমে নাম নথিভুক্তকরণ এবং ব্যাংক ও সমবায় থেকে ঋণদান, শংসাপত্র, প্রশাসনিক সুরক্ষা সবই পেয়েছিল বর্গাদাররা। **১৯৮৫** সাল পর্যন্ত জোরকদমে চলেছিল অপারেশন বর্গা কর্মসূচি। এই কর্মসূচি তখন সাড়া ফেলেছে কিন্তু প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষকরা নাম নথিভুক্ত করতে সাহস পায়নি কারণ মালিকের কাছ থেকে অসময়ে ঋণ পাওয়ার সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত হতে চায়নি। এসব সত্ত্বেও সত্তর আশির দশকে জমি মালিকরা নানা ফন্দি ফিকিরে ও বাহুবলে বর্গাদারকে জব্দ করেছিল। অর্থাৎ 'আইনে না পারি হুজ্জুতিতে পারমো' এমনটাই মনোভব। এসবের পরেও ভূমিসংস্কার ও বর্গা আইনের ফলে পশ্চিমবঙ্গের নানা প্রকার কৃষকের প্রভূত উন্নতিসাধন হয়েছে একথা অস্বীকার করা যায় না। সত্তর দশকের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অপারেশন বর্গা আইন বাংলার সর্বকালের ইতিহাসে স্থান পাবার দাবি রাখে।

সমকালীন ঔপন্যাসিক ও অভিজিৎ সেন

তেভাগার পর দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, খাদ্য আন্দোলন, ভারত-চিন সীমান্ত সংঘর্ষ, ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ, নকশাল আন্দোলন এমন একাধিক ইতিহাস রচিত হয়েছে। সত্তর দশক ও তার এক দশক আগের এইসব ইতিহাসের সাক্ষী হয়েছেন যেসব লেখক তাঁরা কেউ গা বাঁচিয়ে আবার কেউ স্পষ্টভাবে এসব নিয়ে লেখালেখি করেছেন। পরবর্তীকালে ভগীরথ মিশ্র, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, নলিনী বেরার মতো লেখকরা বিষয় ও আঙ্গিকে আরও অনেক পরিবর্তন আনলেন। তবে সময়ের মহৎ লেখকের কাছ থেকে আশানুরূপ বিষয় অনেকক্ষেত্রেই পাওয়া যায়নি বলেই অনিল আচার্য ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন—

> সন্তোষকুমার ঘোষ মূলত একজন অক্ষম পারভার্ট লেখক বলেই ইনি ভাষার ট্র্যাপিজে দেহতত্ত্ব রূপ ঝম্পদান করেন এবং পাঠকের শিরে সর্পাঘাত হয়। মূলত অবৈধ প্রেম এর বিষয় বলা যেতে পারে।... পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের চার ভল্যুমে প্রকাশিত অসংখ্য গল্প যার প্রত্যকটির চলচ্চিত্রে রূপায়িত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। দেশ-আনন্দবাজার, কৃত্তিবাস-এর দুরন্ত চ্যাংড়াদের মধ্যে দুজনকে অন্তত সফলভাবে কাজে লাগাতে পেরেছেন, কেননা এই দুজনের কলমেই কিছু 'শক্তি' ছিল।[১৪]

আরও বলেছিলেন—

> এই সময় অপর দুজন শক্তিমান লেখক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের সম্বন্ধেও তেমন কিছু বলার নেই, প্রাতিষ্ঠানিক কল্‌কের মোহে না পড়লে এদের কাছ থেকে হয়তো কিছু আশা করা যেত।[১৫]

এঁরা মূলত সত্তর দশকের প্রত্যক্ষদর্শী এবং প্রতিভাবান লেখক তাই এঁদের থেকে আশা করেছিলেন, কিন্তু নিরাশ হয়েই অনিল আচার্য এমন কথা বলেছেন। তবে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পরবর্তীকালে দেশভাগের প্রেক্ষাপটে লিখেছিলেন। অভিজিৎ সেনের অগ্রজ এঁরা তবে সত্তর দশকেও ব্যাপক লেখালেখি করেছেন। অভিজিৎ সেন সত্তরের মাঝামাঝি সময় থেকে উপন্যাস লিখছেন। তাঁর সমসাময়িক ঔপন্যাসিক অনেকেই আছেন যাঁরা সেই সময়ে এবং এখনো লিখে চলেছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে পত্রিকার চাহিদায় লেখেন। অভিজিৎ সেন পত্রিকার চাহিদা মেটাতে অনর্গল লিখে চলেননি, নিরপেক্ষতার ভান দেখিয়ে সময় থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকেননি। বাঁশি শুনিয়ে পাঠককে

আবিষ্ট রাখার চেষ্টাও করেননি। মহাশ্বেতা দেবীর মতো উচ্চ কণ্ঠে বলিষ্ঠ প্রতিবাদের ভাষা জানেন, সময়কে উপেক্ষা করে সস্তা শিল্প চর্চায় মগ্ন থাকেননি। অভিজিৎ সেনের সঙ্গে এক্ষেত্রে ভগীরথ মিশ্র, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, অমর মিত্র, আবুল বাশার (জন্ম- ১৯৫১), নলিনী বেরা, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, আফসার আমেদ, শচীন দাশ, কিন্নর রায় (জন্ম- ১৯৫৩) প্রমুখ আছেন। এঁরা সময়কে যেমন ধরতে চেয়েছেন তেমনই বিষয়গত দিক থেকেও কথাসাহিত্যের পরিধিকে বিস্তার দিয়েছেন।

বাংলা উপন্যাসে কার্যকারণ শৃঙ্খলায় জীবনের নির্বাচিত অংশ নিয়ে গল্প বলার রীতি বহু যুগ ধরে চলে এসেছে। মানুষ সেসব লেখা পড়ে নিজেদের প্রত্যাশা পূরণ করে এসেছে। তাই পত্রিকাগুলো পাঠকের চাহিদার কথাই মাথায় রেখেছিল। লেখকরা পত্র-পত্রিকা ও পাঠকের চাহিদা পূরণ করতে থেকেছে, দুটি চাওয়াই এক। আর লেখক যেটি ভুলতে বসেছিল তা হল স্বাধীনতা। তবুও প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬), সমরেশ বসুর মতো লেখকরা রাস্তা, কয়লাখনি, ফুটপাথ, বস্তিতে উঁকিঝুঁকি দিয়েছিলেন। মধ্যবিত্তের ভাবাবেগ, রোমান্টিক আবহ অন্যভাবে উঠে এসেছে, কাহিনি চলচ্চিত্রে রূপায়নের সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখেছিলেন এই সময়ের অনেক লেখক। ফলে বাস্তবতা অনেক ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত হয়েছে। এর মধ্য থেকেও প্রতিবাদী কাহিনি, চরিত্র, ভাষার চমৎকারিত্ব উঠে আসতে থাকে। যেমন সতীনাথ ভাদুড়ি আখ্যানে নতুনত্ব আনলেন *ঢোঁড়াইচরিত মানস* (১৯৪৯-৫১) উপন্যাসে। নিম্নবিত্ত সমাজের মধ্যে রামচন্দ্রকে খুঁজেছেন তাই নিম্নবর্গ থেকেই উঠে এল এই উপন্যাসের নায়ক। কাহিনিকেও লোকায়ত করেছেন লেখক। বিশ শতকের ষাটের দশক থেকে ছাঁচ ভেঙে ফেলার চেষ্টা হয়েছে, মানুষের জীবনের কাহিনি নয়, উপন্যাসের নিজস্ব সমান্তরাল কাহিনির কথা উঠেছিল শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। তারপর বিদেশি মডেল প্রত্যাখ্যান করার অভিপ্রায়, দেবেশ রায়, অমিয়ভূষণ মজুমদাররা সেই প্রয়াস করেছিলেন। উপন্যাসে আসতে থাকে লোককথা, কীর্তন, পাঁচালি, লোকগান, মঙ্গলকাব্য ইত্যাদি। বিকল্প উপন্যাস ভাবনা, আখ্যান নির্মাণে গ্রামকে নতুনভাবে চেনাতে অর্থাৎ সমাজের সঙ্গে গ্রামজীবনের দ্রুত পরিবর্তনগুলো তাঁরা দেখাতে লাগলেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া শহুরে লেখকদের গ্রাম নিয়ে লেখা উপন্যাসে যে কৃত্রিমতা আছে তা সহজেই চোখে পড়ত। ভগীরথ মিশ্র খুব সুন্দর করে বলেছিলেন প্রসঙ্গে—

ওঁদের আঁকা গ্রামগুলোকে খুবই অচেনা লাগত। কেবলই মনে হতো, কোথায় রয়েছে ওইসব গ্রামগুলি, যেখানে সবকিছুই অ্যাতো সাজানো গোছানো, মানুষগুলো পরিপাটি থাকে, প্রায়-শহুরে ভাষায় কথা বলে![১৬]

অভিজিৎ সেনও অভিযোগ করেছিলেন, পঞ্চাশের দশকের পরে বাংলার বুদ্ধিজীবী ও লেখকেরা বাংলার গ্রামজীবন সম্পর্কে বিশেষ ওয়াকিবহাল নন। বহু পূর্বের স্মৃতি আর ছুটি কাটানোর অভিজ্ঞতা নিয়ে যা লিখেছিলেন তাই পরবর্তীকালে গ্রামজীবন ভিত্তিক সাহিত্যের তকমা পেয়েছিল। এদিক থেকে সত্তরের কথাকাররা আরও একধাপ এগিয়ে গেলেন। উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের জেলাগুলোর অন্ত্যজ মানুষের জীবন-জীবিকার ঘাত প্রতিঘাত ধরে ধরে তুলে এনেছেন অভিজিৎ সেন, ভগীরথ মিশ্র, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনী বেরা, অনিল ঘড়াই, আফসার আমেদ, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, স্বপ্নময় চক্রবর্তী প্রমুখ লেখকেরা। কর্মক্ষেত্রের তাগিদে এইসব লেখকেরা যে যে জেলায় বাস করেছেন সেখানকার মানুষ, প্রকৃতি, জীবন-জীবিকা, সংস্কৃতি নিয়ে লিখেছেন। ফলে গ্রামজীবন সমগ্ররূপে উঠে এল যা আগে এত বিপুলভাবে হয়নি। বা পরিবর্তমান গ্রামজীবনের যে চিত্র এখনকার লেখকেরা আঁকছেন সেটা অনেকটাই সম্পূর্ণ এই কারণে যে, সেখানে নির্বাচিত কাহিনি নয়, সমগ্রতা দেখেছেন লেখকেরা। বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিকের গ্রামজীবন আজকের গ্রামজীবনে অনেকটাই নেই। অর্থাৎ গ্রামবাংলার কালান্তর ঘটে গেছে। যেভাবে ইতিহাসের দিকে একালের কথাকাররা নজর দিলেন, উপন্যাস নিয়ে নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। এমনকি পাঠক চাহিদার কথা মাথায় রাখেননি এঁরা, নিজস্ব বোধ বুদ্ধিকে উপন্যাস রচনায় কাজে লাগিয়েছেন। তাই সংবাদ পত্র ও পত্র-পত্রিকার কাছে কোনোরকম দায়বদ্ধতা থাকল না এঁদের। ফলে বিষয়ের বৈচিত্র্যে বাংলা উপন্যাস অগ্রসর হল ও বিভিন্ন শ্রেণির মানুষকে দেখা গেল, ভগীরথ মিশ্র, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধন চট্টোপাধ্যায়, অভিজিৎ সেন, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, কিন্নর রায়ের মতো সত্তর দশকের ঔপন্যাসিকদের লেখায়।

দেড়শ বছরের বাংলা উপন্যাসের যে ধারা বয়ে এসেছে তাতে উপন্যাস অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। পুরাতনের ঐতিহ্য রেখেই নতুন তার গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহ্যের সঙ্গে সত্তরের লেখকেরা বিষয়বস্তুতে আধুনিকতা মিশিয়ে নিয়েছেন ও সমসাময়িক পরিস্থিতির দিকে বিশেষ নজর দিয়েছেন।

খাদ্য আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, নকশাল আন্দোলনের মতো সমসাময়িক উত্তেজনাকে সত্তরের অধিকাংশ লেখক পাশ কাটিয়ে যেতে পারেননি। শুধু সত্তর নয় তার পরবর্তী সময়ের অনেক ওঠাপড়া কথাসাহিত্যে ঠাঁই পেয়েছে—

> তারপর পদ্মার মতো সময় অনেক পাড় গড়েছে আর ভেঙেছে। সত্তরের দশকে মুক্তির স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। তারপর আশি, নব্বইয়ের দশক, একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশককে প্রায় শেষ করে আনা, বামফ্রন্টের টানা তিন দশকের বেশি রাজত্ব, অপারেশন বর্গা, বিশ্বায়ন, চোখ ঝলসানো উন্নয়নের পাশাপাশি বিপুল সমস্যা ও বঞ্চনা, হাইরাইজ বাড়ি, শপিং মল, উচ্ছেদ নিয়ে বিতর্ক, আরো অনেক কিছু। যোগাযোগ ব্যবস্থার বিপ্লব, মোবাইল ইন্টারনেট, টি.ভি, ভি.সি.আর। কথাসাহিত্যের শিকড় এই মাটিতে প্রোথিত।[১৭]

সমাজ ও মানুষের জীবন থেকে নির্বাচিত ঘটনা নয়, সমগ্র সমাজ ও মানুষের জীবনের সব ঘটনাই যে সাহিত্যের বিষয় হতে পারে তা সত্তর পরবর্তী লেখকেরা দেখিয়েছেন। পরিবেশ দূষণ, পরিবেশ রক্ষা, সবুজ ও ধূসরতার দ্বন্দ্ব উপন্যাসে এসেছে। কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর মিথ, বিশ্বাস কাল্পনিক হলেও সেগুলো মানুষের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ি তা দেখিয়েছেন। এই ধারাকে ভগীরথ মিশ্র, নলিনী বেরা, অভিজিৎ সেনের মতো কথাকাররা এগিয়ে নিয়ে গেছেন। সমাজের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আবরণ সরিয়ে তাদের সমাজে পরিচিত করার ভূমিকা নিয়েছেন আবুল বাশার, আফসার আমেদের মতো লেখকরা। শৈলীগত ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পেও শৈলীর বিশিষ্টতা দেখা গেছে, তারপর বনফুলের এসেছে অভিনবত্ব। পরবর্তীকালে স্বপ্নময় চক্রবর্তী, কিন্নর রায়, কার্তিক লাহিড়ীর উপন্যাসেও গদ্যশৈলীর চমৎকারিত্ব দেখা গেছে। কিন্নর রায়, অমর মিত্র, রূপকের ব্যবহার করেছিলেন উপন্যাসে, অ্যালেগরি ফ্যান্টাসির মাধ্যমে বাস্তবতাও আনতে চেয়েছিলেন।

সত্তর দশক বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে নানাদিক থেকে পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। এমন সমাজ পরিবর্তনের উপাদান পঞ্চাশ-ষাটের দশকেও ছিল না তা নয়; দুর্ভিক্ষ, বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতা, দেশভাগ, মানুষের হৃদয় বিদারক কান্না এসব ছেড়ে অধিকাংশ সাহিত্যিক সাহিত্যের বাণিজ্যিকরণের দিকে ঝুঁকেছিলেন। কিন্তু বিষয় নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছিল সত্তর দশকের কথাসাহিত্যে। এমনটা মনে করেছিলেন এই দশকেরই অন্যতম এক কথাকার ভগীরথ মিশ্র। তিনি বলেছিলেন—

> রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, পুলিশ, প্রশাসন, পঞ্চায়েত, রাষ্ট্রীয় জুলুম, ট্রেড ইউনিয়ন, ভূত-প্রেত-ডাইন-কুঁদরা, বাবা-অবতার, মাফিয়া-মাস্তান, মাদুলি-কবচ, প্রকৃতি ও পরিবেশ, ভেড়াচরোয়া, ফাঁসুড়ে, মহারাষ্ট্রের দুর্ভিক্ষ, হাতিদের নগরাভিযান..., এক কথায় কী নয়!... সত্তর এবং তার পরবর্তী কথাশিল্পের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।[১৮]

সত্তর দশকের কথাশিল্পের বৈশিষ্ট্য এটাই। বিষয় বৈচিত্র্যের সঙ্গে লেখকের প্রকাশভঙ্গির ধরনও ভিন্ন ভিন্ন। সময়ের অলিগলি অন্বেষণ করতে থেকেছেন এঁরা, সেই খোঁজার প্রাপ্তি তাঁদের রচনার পথের পাথেয়। ভূমিসংস্কারের ফলে দীর্ঘদিনের নির্যাতিত কৃষক অনেক টানাপোড়েন সত্ত্বেও আশার আলো দেখেছিল। সমাজ পরিবর্তনের ডাক দিয়ে অনেক যুবক সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তাদের হত্যাযজ্ঞ ও তার পালটা সমাজকে স্তম্ভিত করেছিল। অন্যদিকে প্রতিবেশি পূর্ব পাকিস্তানে চলছে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, এই সংগ্রাম দেশের বাইরে হলেও ব্যাপক প্রভাব ছিল ভারতে কারণ মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় বাহিনী অংশগ্রহণ করেছিল। সত্তরের আগের দুই দশকের বাতাসে ছিল ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা ও দেশভাগের প্রতিক্রিয়াজাত উত্তাপ। সত্তর দশকের বেশিরভাগ লেখকের জন্ম ও লেখালেখির হাতেখড়ি এই সময়ের মধ্যেই হয়েছিল। ফলে তারা সময়ের উত্তাপকে ধারণ করেছিলেন, মোহিনীমায়াকে উপেক্ষা করে সৎ, সাহসী, নির্লোভী হয়ে সমাজের প্রায় অনালোচিত অনালোকিত ক্ষেত্রে পৌঁছে গিয়েছিলেন। আর এই তালিকায় সর্বাগ্রে থাকবেন মহাশ্বেতা দেবী, কারণ তিনি ষাটের দশকে যেমন প্রাসঙ্গিক সত্তর আশির দশকেও আরও বেশি প্রাসঙ্গিক। তাই তাঁকে কোনো বিশেষ দশকের বলে দেগে দেওয়া কঠিন। মহাশ্বেতা দেবী যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ির মিলিত রূপ, অভিজিৎ সেন তেমনই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ি, মহাশ্বেতা দেবীর মিলিত রূপ। অভিজিৎ সেনের সমসাময়িক অর্থাৎ সত্তর দশকের লেখকদের সম্পর্কে বলার আগে মহাশ্বেতা দেবীর সম্পর্কে বলা উচিত। কারণ সত্তরের অনেক লেখকের পথপ্রদর্শক মহাশ্বেতা দেবী। তাঁকে নারী লেখক ভেবে যদি কারও তাঁর লেখায় সাংসারিক চৌহদ্দির কথা মনে আসে তবে মারাত্মক ভুল হবে। কারণ বাংলা সাহিত্যে তাঁর মতো বলিষ্ঠ কণ্ঠ বোধহয় আর কোনও লেখকের নেই। অভিজিৎ সেন যেমন এ যুগে দাঁড়িয়ে নানান প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছিলেন ইতিহাসে ডুব দিয়ে, *রাজপাট ধর্মপাট* , *মৌসুমি সমুদ্রের উপকূল* এবং *ধর্মায়ুধ* উপন্যাসে। পূর্বে মহাশ্বেতা দেবীর মধ্যেও এমন ইতিহাস ঘাঁটার তাগিদ দেখা যায়। *ঝাঁসির*

রাণী (১৯৫৬) উপন্যাসে ঝাঁসির রাণীর জীবন, *নটী* (১৯৫৭) ও *অমৃত সঞ্চয়* (১৯৬২) উপন্যাসে সিপাহি বিদ্রোহের পটভূমি, *আঁধার মাণিক* (১৯৬৬) উপন্যাসে তিনি দেখিয়েছিলেন 'দ্বাদশ বঙ্গাব্দে, বাংলার মেয়ের সামনে গাঢ় নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।' বর্গি আক্রমনের পর বাংলার নারীদের দুর্দশা এই উপন্যাসের চিত্র। ষোড়শ শতকের পটভূমিতে *কবি বন্দ্যঘাটি গাঞ্জির জীবন ও মৃত্যু* (১৯৬৭) লেখা হয়, এতে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *কবি* (১৯৪২) উপন্যাসের নিতাইয়ের মতো কলহনের আত্ম আবিষ্কারের কাহিনি। মুণ্ডাদের দীর্ঘ বিদ্রোহের কাহিনির ঐতিহ্য খুঁজেছিলেন *অরণ্যের অধিকার* (১৯৭৭) ও *চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর* (১৯৮০) উপন্যাসে। উপন্যাসের গঠনরীতি মেনেই অতীত ঐতিহ্যকে রূপ দিয়েছিলেন মহাশ্বেতা দেবী। এ শুধু নেশা নয় চ্যালেঞ্জও বটে। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন—

> গভীর শ্রমে তিনি সমাজপট ও ইতিহাস সন্ধান করেন, ক্ষুরধার মেধায় তিনি তাকে ব্যাখ্যা করেন, বলিষ্ঠ মানবিকতায় তিনি কাহিনিকে অন্যতর দীপ্তি দেন।[১৯]

এক্ষেত্রে অভিজিৎ সেন পূর্বসূরী মহাশ্বেতা দেবীর অনুসরণে অনেকটাই সফল। তবে মহাশ্বেতা দেবীর ব্যাপ্তি অনেক বেশি, তিনি ইতিহাসের তলে বিচরণ করেছিলেন। আবার হালে ফিরে এসে সত্তরের দগদগে সময়ের চিত্রাঙ্কন করেছেন *হাজার চুরাশির মা* (১৯৭৪) ও *গান্ধারীর পর্ব* (১৯৯২) উপন্যাসে। নকশাল আন্দোলনের ভয়াবহতার পাশে মায়ের আবেগ, মনোবেদনার ওঠা-পড়া, আত্মকামী বাবার উদাসীনতাকে *হাজার চুরাশির মা*-তে লিপিবদ্ধ করেছেন। অভিজিৎ সেন এই সময়টাকে শুধু বিবেচনা নয় একেবারে অভিজ্ঞতা দিয়ে ধরেছেন *স্বপ্ন এবং অন্যান্য নীলিমা, হলুদ রঙের সূর্য, লাশকাটা ঘরের সামনে অপেক্ষা* উপন্যাসে। এছাড়াও স্বার্থের রাজনীতিকে মহাশ্বেতা দেবীর মতো দেখেছিলেন অভিজিৎ সেন, নিম্নবর্গীয় মানুষের বঞ্চনা ও অসহায়তাকে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। মহাশ্বেতা যে পথ কেটেছিলেন সেই পথেই এখনো বিচরণ করেন অভিজিৎ সেন তাই বৈসাদৃশ্যের থেকে সাদৃশ্যই বেশি তাঁদের।

এই সময়ের উল্লেখযোগ্য কথাকার ভগীরথ মিশ্র। স্বাধীনতা উত্তর কালের সমাজে ভূমি ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, রাজনৈতিক নেতৃবর্গের অসাধুতা, বেকারত্ব, কমিউনিস্টদের আদর্শ ও আদর্শ বিচ্যুতি, নকশাল আন্দোলন ইত্যাদি তাঁর কথাসাহিত্যের বিষয়। অভিজিৎ সেন যেমন বোহেমিয়ান জীবনে অনেক মানুষকে দেখেছিলেন, ভগীরথ মিশ্রের মধ্যেও ইচ্ছেমতো

বিচরণের স্বাধীনতা ছিল তাই বাল্যকাল থেকে যৌবনে অপেরা পালাগান, ছৌনাচ, শবর, কোড়া বিভিন্ন উপজাতির মানুষ এবং রাখাল বাগালদের সঙ্গে বাধাহীন মেলামেশা তাঁকে দিয়েছে অনেক অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা বাল্যকাল থেকে তাঁর মনের সিন্দুকে জমা হয়েছিল তা তিনি নিজেই বলে থাকেন। এসব তাঁর লেখাতেও এসেছে। রাজনৈতিকভাবে তিনি কমিউনিস্ট ছিলেন এবং চাকরিজীবনেও গ্রামাঞ্চলে থেকেছেন বেশি এইসমস্ত অভিজ্ঞতা তাঁর লেখাকে সমৃদ্ধ করেছে। বৃহৎ প্রেক্ষাপটে লেখা *মৃগয়া* (১৯৯৬-৯৮) উপন্যাসের বিভিন্ন পর্বে সেই সময়ের নানান চিত্র উঠে এসেছে। ভূমিসংস্কার পর্যন্ত বিস্তৃত এই উপন্যাসে শোষণের যে চিত্র আছে তা অভিজিৎ সেনও *বর্গক্ষেত্র* উপন্যাস এবং 'আইন শৃঙ্খলা', 'বিষ', 'ক্ষেত্রপাল' প্রভৃতি গল্পে বৃহৎ পরিসরে ধরেছেন। সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জোতদারের অত্যাচারের পরিসীমা এবং উপন্যাসে লৌকিকতাকে দেখিয়েছেন। কমিউনিস্ট আদর্শবাদের কথা অভিজিৎ সেন *ছায়ার পাখি* উপন্যাসে গোপালের মধ্যে কৌশলে দেখিয়েছেন। কমিউনিস্ট সম্পর্কে এই ভাবনাটা ভগীরথ মিশ্রের মধ্যেও ছিল। ছেলেবেলায় ভেড়ার পাল ও বাগালদের দেখার স্মৃতি জেগে উঠেছিল বাঁকুড়ায় থাকাকালীন পাল পাল ভেড়া দেখে, *চারণভূমি* (১৯৯৪) তারই ফসল। পশ্চিম মেদিনীপুরের লালমাটি শালবন ও আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় লেখকের জন্ম ও বেড়ে ওঠা ফলে সেখানের মানুষের বিশ্বাস, লোকাচার, কুসংস্কার যেমন ভুত-প্রেত ডাইন ইত্যাদি উঠে এসেছে তাঁর উপন্যাসে। ওঝা গুণিনদের ব্যাবসা বাড়তে থাকলে এসব নিয়ে *জানগুরু* (১৯৯৫) উপন্যাস লিখেছেন ভগীরথ মিশ্র। গ্রামীণ যে বিশ্বাসের মধ্যে মানুষ বাঁচে যাকে যুক্তি দিয়ে একেবারেই উপেক্ষা করা যায় না। অভিজিৎ সেনের অনেকগুলি গল্প উপন্যাসে ডাইন ওঝা গুণিন এসব এসেছে, যেমন *রহু চন্ডালের হাড়, বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর, নাগমঙ্গল* উল্লেখযোগ্য। সত্তর দশকের বেশ কিছু কথাসাহিত্যিক কাহিনির গুরুত্ব এনেছিলেন অন্যভাবে, তাঁদের উপন্যাস কাহিনিবিহীন নয় আবার কাহিনিসর্বস্বও নয়। এক্ষেত্রে অভিজিৎ সেনের সঙ্গে ভগীরথ মিশ্রের সাদৃশ্য আছে, যেমন উভয়েই কথাসাহিত্যে দেশজ রীতি আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলেন ইউরোপীয় সাহিত্য ভাবনা অনুসরণে ছিল আপত্তি—

> এটা মানছি যে, ছোটোগল্প ও উপন্যাসের শৈলীটি একদা ইউরোপ থেকে আমদানি করেছিলেন আমাদের ঔপনিবেশিক প্রভুরা। ভালোই করেছিলেন। আমরা সাহিত্যের দুটি বলিষ্ঠ ধারাকে পেয়েছি। কিন্তু তাই বলে আমরা আর কতকাল ইউরোপীয় সাহিত্যের বাংলা সংস্করণ লিখে যাব?[২০]

দেশীয় ভাবনায় ভগীরথ মিশ্র জোর দিলেন আঞ্চলিকতায়, ভাষার ক্ষেত্রেও তার প্রয়োগ দেখা যায়। লেখক নয়, কথকের মতোই আঞ্চলিক ভাষায় বর্ণনা করে গেছেন উপন্যাসের কাহিনি অভিজিৎ সেনের মতোই। আকারে আখ্যানে *মৃগয়া* ভগীরথ মিশ্রের মহাকাব্যিক উপন্যাস, এখানে এক শতাব্দীর বেশি সময় জুড়ে ভারতের সামন্ততান্ত্রিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যে পালাবদল হয়েছিল, তার ইতিবৃত্ত এবং মানুষের মৌলিক প্রবৃত্তি ও প্রাণীজগতের সঙ্গে উদ্ভিদ জগতের সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছেন লেখক। দেশজ উপাদান ভারতীয় ইতিহাস, লোককথা, লোকসঙ্গীত, প্রবাদ প্রবচন, ছড়া, মিথ, দেশের ভূখণ্ডের মানুষের আচার-আচরণ জীবনচর্চা, বেশভূষা এসব দিয়েই ভারতীয় ঐতিহ্যের ইমারত তৈরি করতে চেয়েছেন তাঁর কথাসাহিত্যে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সতীনাথ ভাদুড়ির যোগ্য উত্তরসাধক তিনি।

'এত বড় কলকাতা, তার চেয়ে কত বড় বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য।' কলকাতার 'পরিচয়' পত্রিকা আর বাংলা সাহিত্যে ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় জায়গা করে নিয়েছিলেন নিজস্ব দক্ষতায়, তিনি প্রথম উপন্যাসটি লিখেছিলেন **১৯৮০-৮১** সালে। স্কুল জীবনে দেখেছিলেন **১৯৬৬** সালের খাদ্যাভাব, তারপরে যুক্তফ্রন্ট, জরুরী অবস্থা, পঞ্চায়েত নির্বাচন তাই তিনি মনে করেছেন এসব বাদ দিয়ে **১৯৮০-৮১** হয় না। তাই ওই সময়কার সরকারি কর্মযজ্ঞ ও জোতদার-কৃষকের সম্পর্ক নিয়ে লিখেছেন *রামপদর অশন-ব্যসন* (**১৯৯৩**) উপন্যাস। অভিজিৎ সেন ব্যাংকে চাকরি করার সুত্রে পশ্চিমবঙ্গের ভূমিসংস্কার কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে *বর্গক্ষেত্র, ক্রান্তিবলয়* (**১৯৮৫**), *হলুদ রঙের সূর্য* প্রভৃতি উপন্যাস লিখেছেন। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ও কুলপির ভূমিসংস্কার দপ্তরে কাজ করতেন, সেই অভিজ্ঞতাও তাঁকে *রমাপদর অশন-ব্যসন* লিখতে উৎসাহী করেছিলেন। বাংলার গাঙ্গেয় ভূমি জুড়ে উত্থান-পতনের ইতিহাস, সভ্যতার ক্রমধারা, অবাধ বাণিজ্য অঞ্চল হুগলি নদীর গা ঘেঁষে এসব নিয়েই *বন্দর* (**১৯৯২**) উপন্যাস লিখেছিলেন। দক্ষিণবঙ্গের নোনাজল নোনা মাটির নোনাদ্বীপের মধ্যেও কৃষিতে উৎপন্ন ফসলে তেভাগার দাবি উঠেছিল কাকদ্বীপ, চন্দনপিঁড়ি, হরিপুর, বুধাখালিতে। সেই তেভাগা আন্দোলনের সশস্ত্র দিক, কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা, নির্যাতিত চাষি ও বিপ্লবীদের করুণ পরিস্থিতি নিয়ে লিখেছেন *স্বজনভূমি* (**১৯৯৪**) উপন্যাস। বকখালির মাছমারাদের ও শুটকি মাছ প্রস্তুতকারকদের আড়ত, সমুদ্র থেকে মাছ ধরা বাণিজ্য ও বনবিভাগের সঙ্গে দ্বন্দ্ব *চরপূর্ণিমা* (**১৯৯৫**)

উপন্যাসে আছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ভূমিপুত্র ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় এখানের মানুষের সমস্ত কিছুকে খুব ঘনিষ্টভাবে দেখেছেন। অভাবী, অল্পে তুষ্ট, সংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষগুলোর নানা দিক উঠে এলেও, চরিত্রগুলোর জটিলতা থাকলেও সেই জটিলতায় যৌনতাও ছিল কিন্তু ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় কেবল ইঙ্গিত দিয়েছেন, সেসব দেখাতে সংকোচ করেছেন। দেখালে কোনো সমস্যা ছিল না, আবার না দেখিয়েও সমস্যা বিশেষ হয়নি তবে জীবনের পূর্ণতার একটা দিক তিনি উপেক্ষা করে গেলেন, অভিজিৎ সেন এইদিক স্বাভাবিকভাবে দেখিয়েছেন তাঁকে সাহসে ভর করতে হয়নি। কারণ সমাজে মানুষের সব আবেদন ও চাহিদার মধ্যে যৌনতা একটি, একথাকে অস্বীকার করা যাবে না। *বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর, নক্ষত্র নদী ও নারী* , উপন্যাসে এবং 'মানবদেহের গৌরব' গল্পে আরও বেশ কিছু লেখায় ব্যাপারটা অকপটে এনেছেন অভিজিৎ সেন।

সাহিত্যক্ষেত্রে অভিজিৎ সেনের ঠিকানা যেমন উত্তরবঙ্গ, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের ঠিকানা দক্ষিণবঙ্গ। সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলের ছবি অনেক স্পষ্ট করে এঁকেছেন ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়। তাঁর সম্পর্কে আর এক কথাসাহিত্যিক শচীন দাশ বলেছিলেন—

> মূলত দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সমুদ্র-তীরবর্তী জল-জঙ্গল ও গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অধ্যুষিত লাট অঞ্চলের কথাকার তিনি।... ঝড়েশ্বর কখনও তাঁর এই সীমানাকে ডিঙোবার সাহস দেখাননি। ফলে দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছরের তাঁর সাহিত্যচর্চায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার লাট অঞ্চলের নদী-অম্বিত প্রান্তিক মানুষের জীবনযাপনই উঠে এসেছে তাঁর গল্প-উপন্যাসে।[২১]

ফলে একটি অঞ্চলকে তন্ন তন্ন করে ধরেছিলেন তিনি। জীবনের সত্যতা সততার সঙ্গে বাস্তবতার নিরিখে উঠে এসেছে সবকিছু। তার আগে এই বাদা ও লাট অঞ্চল নিয়ে লিখেছিলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৩-২০০১), বরেন গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩০-২০০১) তবে ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় নিজস্ব ঘরানায় এঁদের থেকে আলাদা হয়ে গেছেন। সময়ের সঙ্গে তিনি লক্ষ করেছিলেন বামপন্থীদের হাতে অপারেশন বর্গার কাজ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নদী থেকে কৃষি জমিতে নোনা জল প্রবেশ, নদীর ফুলে ওঠা, মরে যাওয়া, ভূমিক্ষয়, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার বিপর্যয়, যোগাযোগের অভাবে লাট অঞ্চল উন্নয়নের বাইরে চলে যাওয়া ইত্যাদি। কিন্তু এসব ব্যাপারকে বৃহৎ রূপ দেননি, নানা পেশার নানা ধরনের মানুষ তাঁর উপন্যাসে ঝাঁকে ঝাঁকে এসেছে কিন্তু কোনো একক চরিত্রকে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় শক্তি করে গড়ে তোলেননি।

অভিজিৎ সেন যেমন উত্তরবঙ্গের মানুষ, ভাষা, সংস্কার, কৃষি, রাজনীতি সবটাকে নিখুঁত বুঝেছিলেন তাই কলকাতায় থেকেও তিনি যেন উত্তরবঙ্গের মানুষের কলতান শুনতে পেতেন তাই তাঁর কথাসাহিত্যে উত্তরবঙ্গের মানুষ কথা বলে উঠেছে। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় বাদা অঞ্চলের নদীর কথা বলেছেন, বাংলার ভূমিকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার কথা বলেছেন, আবার নোনা অঞ্চলের মানুষ কীভাবে অবক্ষয়িত সমাজের রঙ মাখছে তাও দেখিয়েছেন। *বিনোদনের বিপণন* (১৯৯৩) উপন্যাসে দেখিয়েছেন বাদা অঞ্চলের মানুষ নিষিদ্ধ আনন্দযজ্ঞে সহজে প্রবেশ করে যাচ্ছে।

সত্তর দশকের শক্তিশালী ঔপন্যাসিক অমর মিত্র। অভিজিৎ সেনের সঙ্গে তাঁর একটি বিষয়ে সাদৃশ্য, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে কর্মসূত্রে ঘুরে অভিজ্ঞতায় বৃদ্ধ হয়েছেন। *অশ্বচরিত* (১৯৯৯) ও *ধ্রুবপুত্র* (২০০১) উপন্যাসে প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে হাল আমলের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। অভিজিৎ সেন যেমন *রাজপাট ধর্মপাট, ধর্মায়ুধ* লিখতে গিয়ে ইতিহাসের সঙ্গে রাজনীতির যুক্তিপূর্ণ সাযুজ্য রক্ষা করেছেন অমর মিত্র তাঁর *অশ্বচরিত* ও *ধ্রুবপুত্র* উপন্যাসে এমন ভাবেই ইতিহাস ও রাজনীতিকে স্থাপন করেছেন। অমর মিত্রের চেতনায় যে রাজনীতি বহমান ছিল তাকেই কি তিনি ঠাঁই দিলেন ইতিহাসের সঙ্গে। শুভময় মণ্ডল লিখেছেন—

> শুধু অশ্বচরিত নয়, ধ্রুবপুত্রও তার সারা বয়ান জুড়ে মজে আছে এক প্রগাঢ় রাজনীতিতে। গদ্যের দায় মানার সুবাদেই তারা পালন করছে এক মহত্তর রাজনৈতিক দায়।[২২]

তিনি ভিন্ন ধরনের ওপন্যাসিক, অনেকটা পরিবেশ সচেতন। *ধ্রুবপুত্র,* ও *হাঁসপাহাড়ি* উপন্যাসে খরার কথা বলেছেন। *ধনপতির চর* (২০০৭) উপন্যাসে নিরুপায় দ্বীপের চিন্তায় বিভোর হয়েছিলেন তিনি। আবার মহারাষ্ট্রের ভূমিকম্পের প্রেক্ষিতে লিখেছিলেন *নিসর্গের শোকগাথা* উপন্যাস। ইতিহাস, পুরাণ, জাদু বাস্তবতার আশ্রয়ে পরিবেশ চিন্তা থেকে একটু সরে এসেছিলেন *অশ্বচরিত* উপন্যাসে। কল্পনাপ্রবণ হয়েছেন তিনি এক্ষেত্রে, শেষের দিকে গল্পের ক্ষেত্রে তিনি ভূমিকেন্দ্রিক বিষয়ে মনোনিবেশ করেছিলেন। এক্ষেত্রে অভিজিৎ সেনের সঙ্গে তাঁর বিষয়গত দিকে একটু সাদৃশ্য থেকে যায়।

আবুল বাশার মুর্শিদাবাদে জন্মেছিলেন, লেখার ক্ষেত্রেও ওই অঞ্চলের নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনসংগ্রামের কথাই তুলে এনেছেন। ছেলেবেলা থেকেই কুকুর ছানা, গাই বাছুর, ফড়িং, টিয়াপাখি এসবে মন পড়ে থাকলেও বড় হয়েই মানুষকে এভাবে দেখতে লাগলেন।

সেইসব মানুষের কথা বিশেষ করে নারীদের কথা লিখেছেন। 'সাহিত্য লিখতে হলে নারীকে নিয়ে লেখা চাই' তার আগে দেখেছিলেন বাগালদের গর্ভবতী স্বর্ণগোধিকাকে পিটিয়ে মারার দৃশ্য। যেভাবে চাষি হাতলাঠি দিয়ে গরু মারত সেই লাঠি দিয়ে বউকেও পেটাত, কখনও মারতে মারতে মেরেই ফেলত। তিনি দেখেছিলেন—

> প্রত্যেক সন দু'একটি বউ পাটের বিষ তেল খেয়ে মরত। ফলিডল খেয়ে বউ মরেছে, যুবতী বউ, কোলের বাচ্চা মরা মায়ের বুক হাতরে চলেছে দুধ খাবে বলে। যুবতী মৃত বউ জানলই না, তার ছেলে কাঁদছে, তার বুকের দুধও বিষ হয়ে গেছে।[২৩]

আবুল বাশারের এই মরমী দৃষ্টি তাঁকে নারী নিয়ে আরও ভাবিত করে তুলেছে, বাগালের হাতে নির্যাতিত স্বর্ণগোধিকার মতো নারীদের ভবিষ্যৎ, নারীকে দেখার ক্ষেত্রে পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছিল তাঁর মনে। নারীকে পুরুষের থেকে অনেক উন্নত মনে হয়েছে তাঁর। 'পুরুষ তার কামশক্তি দিয়ে নারীকে বুঝতে চেয়ে ভুল করেছে' এমন মনে করতেন আবুল বাশার। মুসলিম ধর্মগুরুরা সাধারণ মুসলিমদের বাহাত্তর হুরের টোপ দিয়ে, বেহেস্তার কথা শুনিয়ে বক্তৃতার ফি আদায় করে নিত, যারা এই বক্তৃতা দিত তারা একাধিক স্ত্রী ও অধিক সন্তানের অধকারী ছিল। এই ব্যাপারগুলো আবুল বাশারকে সন্দিগ্ধ করে তুলেছে। অন্যদিকে গৌতম বুদ্ধের 'অহিংসা পরম ধর্ম, সর্ব জীবে সম দয়া' এখানে বধু, সন্তান, সিংহাসন, হুর কোনোকিছুর দরকার হয়নি। এসবের পাশাপাশি মুসলমানদের অভাব, ফতোয়া, মৌলবির বাড়বাড়ন্ত, ধর্মের প্রবল তেজ অথচ এত দারিদ্র্য, যে সমাজে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়র বিজ্ঞানী নেই। শিশুরা অক্ষর চেনে না, আল্লা চেনে, সংস্কৃতি চর্চা থেকে দূরে থাকা বাংলার এই বিচিত্র মুসলমান সমাজ তাঁকে ভাবিয়েছিল। *ফুলবউ* (১৯৮৮) উপন্যাসে মুর্শিদাবাদের মুসলিম নারীদের অবহেলিত জীবন বর্ণনা করেছেন। অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের মূল কেন্দ্রে থাকে নারী এই নারীরা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে উঠে আসে, আবুল বাশার একটি বিশেষ অঞ্চলের বিশেষ সম্প্রদায়ের নারীর কথা বলেছেন। তবে নারীকে বিভিন্ন দিক দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন আবুল বাশার। তিনি বলেছেন—

> আমার সাহিত্য নারীকে নানান দিক থেকে দেখা ও উপলব্ধি করা। তার কাছে পৌঁছানো। আমি বরাবরই লালনপন্থী মানুষ, নারীকে বাদ দিয়ে জীবন অবান্তর, অপ্রাসঙ্গিক, অসহ্য।[২৪]

খোদাকে বুঝতে গেলে নারীকে বুঝতে হবে একথাও বলেছেন তিনি। মুসলমান সমাজের ধর্মীয় মোহে সমস্ত অবৈজ্ঞানিক অসংস্কৃত ব্যাপার এবং সামান্য ব্যাপারে তালাক দিয়ে নতুন বউ নিয়ে ইফতার করা, ভাইকে হত্যা করে নামাজ পড়ছে হত্যাকারী ভাই ইত্যাদি। গান গাওয়া নিষেধ অথচ প্রতিষ্ঠিত মুসলমান শিল্পীর গান গাওয়া বন্ধ করতে পারে না। অমুসলিম বিবাহে অমুসলিম ব্যক্তিকে আগে ধর্মান্তরিত করা এসব নিয়মের বেড়াজালে গরীব মানুষকে জড়িয়ে ফেলা গেছে সহজে, সমাজ নামক অলীক ক্ষমতার সাহায্যে। এসব থেকে পালাতে চেয়েছিলেন আবুল বাশার আর এই পালানো লেখার মধ্য দিয়েই। তাঁর লেখাতেও এসব উঠে এসেছে। তিনি বলেছেন 'আমার লেখা, আমারই জীবনী।' গোঁড়ামির বিরুদ্ধে লেখা দিয়েই প্রতিবাদ করেছেন তিনি। সিনেমা সংস্কৃতি জগতের তাবর শিল্পীরা যে পাপ করে চলেছে তার প্রায়শ্চিত্য করতে হয় বাংলার তথা ভারতীয় গরিব মুসলমানদের। পালিয়ে যেতে পারেননি তিনি, তাই পালাবার চেষ্টাটা করেছেন সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়ে। সমাজের জালে জড়িয়ে যত ছটফট করেছেন পালিয়ে যেতে, তত জড়িয়ে পড়েছেন সামাজিক দায়বদ্ধতায়।

আবুল বাশার সত্তর দশকের রাজনীতির মধ্যেও সক্রিয়ভাবে প্রবেশ করেছিলেন তবে সেই রাজনীতিতে আদর্শের সঙ্গে লোভের দ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন *ভোরের প্রসূতি,* অগ্নিবলাকা (১৯৯৩) এমনকি *সঙ্গীদা বাঈ* (১৯৮৯) উপন্যাসে। সত্তরের অস্থির রাজনীতিকে উপেক্ষা করতে পারেননি তিনিও। আবুল বাশার ধর্ম ও রাজনীতি এই দুটি বিষয়কে সাবলীলভাবে তাঁর উপন্যাসে এনেছেন, *ধর্মের গ্রহণ* উপন্যাস লিখেছেন, ধর্ম সম্পর্কে তার বোধ ছিল অভিজিৎ সেনের মতোই যুক্তিবাদী। ধর্মকে তিনি মনস্তত্ত্ব রূপেই দেখেছিলেন, ধর্ম আসলে বিশ্বাসীর জন্য, যেমন গঙ্গার জলের পবিত্রতার বিশ্বাস মানুষের মনে। অভিজিৎ সেন ধর্মকে তার অনেক উপন্যাসেই এনেছেন, ধর্ম কীভাবে মানুষের জীবনে স্থিতি আনে, আশ্রয় হয় আবার কীভাবে সমাজকে ও মানুষকে সংকটের মধ্যে এনে ফেলে তাও অভিজিৎ সেন দেখিয়েছেন। আবুল বাশার একটু অন্যভাবে দেখিয়েছেন, ধর্ম কীভাবে মানুষের জীবনকে নরক করে তোলে। নারীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া ধর্মীয় বিধান কীভাবে নারীকে সমাজে ভোগ্য পণ্য করে তুলেছে, অজাচারে লিপ্ত করেছে *ফুলবউ* উপন্যাসে তা দেখিয়েছেন তিনি। সমাজের পুরুষ ও ধর্ম নারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে যেন। মুসলিম সমাজে নারীর অবস্থান, ধর্মীয় সংস্কারকে কীভাবে বাধ্য হয়ে মেনে নিয়ে একটা সস্তা জীবনযাপনে বাধ্য

হতে হচ্ছে তাও আবুল বাশার নির্দ্ধিধায় বলেছেন। ভিন্ন এক উপলব্ধির কথা বলেছিলেন যেখানে মানুষ সংস্কারের বাধা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না তা নয়, বেরোতে চায় না *মাধব সুন্দরী* উপন্যাসে তাই দেখিয়েছেন। অভিজিৎ সেনের মতো মিথ কল্পনা ও ইতিহাস নিয়ে *রাজাবলি* (১৯৯৬), *মরুস্বর্গ* (১৯৯১) উপন্যাস লিখেছেন আবুল বাশার। প্রেমের বাস্তবচিত্র নির্মাণে আবুল বাশার অভিজিৎ সেনের মতোই সাহসী। গল্প নির্মাণে মানুষের আদিম প্রবৃত্তি, নদী, নারী, যৌনতা, প্রতিবাদী চেতনা, কুসংস্কার, দাঙ্গা, ধর্ম, রাজনীতি, সাম্প্রদায়িক সমস্যা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিচরণ করেছিলেন। মানবতার ধারক আবুল বাশার উপন্যাসে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ধর্ম, নারীর জন্য প্রতিবাদ ও সমাজের সুস্থতার জন্য লিখেছেন বেশি।

১৯৭০ সালে প্রথম উপন্যাস *অগ্নিদগ্ধ* (১৯৬৮) লিখেছিলেন সাধন চট্টোপাধ্যায়। পথভ্রষ্ট ব্যক্তি খাদ্য আন্দোলনে যুক্ত হয়ে নিজেকে শুধরে নিয়ে অগ্নিশুদ্ধ হয়েছে এই উপন্যাসে। সাধন চট্টোপাধ্যায় নিজেও কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী ছিলেন এবং এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সত্তর দশকে 'বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ' এর সঙ্গে তিনি পরিচিত। কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজন, খাদ্য আন্দোলন, নকশাল আন্দোলন এবং রাজনৈতিক পালাবদলের নানা দৃশ্য দেখেছিলেন তিনি, সাহিত্যেও এসব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। সুন্দরবন গোসাবা অঞ্চলে মাছমারাদের কার্যপ্রণালী খুব কাছ থেকে নিবিড়ভাবে দেখে লিখেছিলেন *গহীন গাঙ* (১৯৭৯) উপন্যাস। নদীর উপর নির্ভরশীল জল ও জঙ্গলের মানুষগুলোর কথা নিপুনতার সঙ্গে তুলে এনেছেন। গ্রামজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, গ্রামের উত্থান-পতন, জমির মালিক ও ভাগচাষির সম্পর্ক, রাজনৈতিক দলের ভাঙন, নেতাদের ক্ষমতা প্রদর্শন, গ্রামের আদিবাসী মানুষের সংস্কার বিশ্বাস নিয়ে *উদ্যোগ পর্ব* (১৯৮৯) লিখেছিলেন। নকশাল আন্দোলনের কম বেশি প্রভাবও দেখা যায় এখানে। দেশভাগের পর অনেক মানুষ প্রাচীন কলকাতার জলাজঙ্গল সরিয়ে বাসস্থান গড়ে তুলেছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এইসব অঞ্চল বদলে যেতে যেতে পুঁজি ও ক্ষমতার জোরে ক্রমে পস্ অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। ফলে নিম্নমধ্যবিত্ত আদর্শবান মানুষগুলো খাপ খাইয়ে নিতে না পেরে সরে পড়েছিল অন্য ঠিকানায়। কিন্তু উন্নয়নের জোয়ারে তাদের সেই অন্য ঠিকানাতেও তারা স্থায়ী হবে কিনা জানত না, এসব নিয়ে লিখেছিলেন *দুই ঠিকানা* উপন্যাস। ভূমিহীন ছিন্নমূল মানুষদের নিয়ে *পিতৃভূমি* (১৯৮৪) উপন্যাস লিখেছিলেন। যেখানে নিজস্ব দেশ

গাঁয়ের পাওয়া খাস জমিও রাজনৈতিক নেতাদের ও জোতদারের ভূমিকায় খোয়াতে হয়েছে তাদের, পিতৃভূমি বলে কিছুই থাকছে না। অপারেশন বর্গার পরবর্তী সময়েও জমি মালিকের ক্ষমতা প্রদর্শনের ছবি দেখিয়েছেন *পক্ষ বিপক্ষ* (১৯৮৮) উপন্যাসে। ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে গ্রামবাংলায় যেভাবে নতুন শক্তি গড়ে উঠেছে, তাতে বোঝা গিয়েছিল শোষক শ্রেণি সমাজ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়নি নতুন রূপে এসেছে। বাঁকুড়ার একটি গ্রামের সত্তর পরবর্তী পরিবর্তিত চিত্র উঠে এসেছে এই উপন্যাসে। যেভাবে অভিজিৎ সেন তাঁর অনেকগুলি উপন্যাসে ও গল্পে গ্রামের জমিকেন্দ্রিক সংঘাতকে ধরেছিলেন।

জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ে সাধন চট্টোপাধ্যায় শুধু বুঝতে চাইলেন না, বিষয়টা নিয়ে দুটি লক্ষ্যভেদ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—

> অনেক দিন ভেবেছি, বাংলা সাহিত্যের বিষয়ে বৈচিত্র্য আনা প্রয়োজন। আধুনিক সব কিছু ভাবনা ও বিজ্ঞান শাখার নানা বৈচিত্র্য আখ্যানে ঢোকা দরকার।[২৫]

তিনি ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র আর কথাসাহিত্যিক। ফলে বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে সাহিত্যিক বোধকে মিলিয়ে লিখেছেন *জলতিমির* (১৯৯৮) এবং পরবর্তীকালে *বিন্দু থেকে বৃত্তে* এই দুটি উপন্যাস। ধর্ম, জীবনধারণ, শিক্ষা, উন্নতি বিষয়ে গ্রামবাংলার নারীদের মধ্যে যে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল তা *মাটির অ্যান্টেনা* (২০০০) উপন্যাসে তুলে এনেছিলেন। সাধন চট্টোপাধ্যায় গুজরাটের দাঙ্গা নিয়ে একটি প্রতীকী উপন্যাস *কী বলে মৃত্যু মুহুর্তে* লিখেছিলেন। যদিও এই উপন্যাসে তিনি যে বিশেষ সাড়া পাননি তা স্বীকার করেছিলেন। অভিজিৎ সেন রাম মন্দির, বাবরি মসজিদ নিয়ে টানাপোড়েন ও দাঙ্গা নিয়ে *আঁধার মহিষ* লিখে যথেষ্ট সাড়া পেয়েছিলেন। সাধন চট্টোপাধ্যায় আধুনিক সময়ে বিদ্যালয় জগতের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ নিয়ে লিখেছেন *ধরিত্রী* (২০০৭) ও *তেঁতুলপাতার ঝোল* (২০০৮) উপন্যাস দুটি। এই দুটি উপন্যাসের কেন্দ্রে আছে শিক্ষক সমাজ, রাজনৈতিক প্রভাব, পরিচালন ব্যবস্থা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে উপস্থিত দ্বন্দ্ব, এসব নিয়ে বেশ গুরুত্বপূর্ণ এই দুটি উপন্যাস। অভিজিৎ সেন বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির উপর রাজনৈতিক প্রভাব ও তা থেকে নিন্দনীয় প্রাণঘাতী সংঘাত নিয়ে লিখেছিলেন *নাগকেশর অক্ষবাট* উপন্যাসটি। অভিজিৎ সেনের মতো সাধন চট্টোপাধ্যায় মনোরঞ্জনের ধারায় লেখালেখি করেননি, অন্য ধারায় বিচরণ করেছেন যে ধারায় সত্তরের লেখকরা জেগে উঠেছিলেন। সাধন চট্টোপাধ্যায় সত্তরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি

হোক গ্রামবাংলার চিত্র হোক নিখুঁতভাবে ধরেছেন,তাঁর বেশিরভাগ উপন্যাসের ক্ষেত্রে আছে বাস্তব অভিজ্ঞতা।

সুবর্ণরেখার তীরবর্তী বাছুর খোয়াড় গ্রাম নলিনী বেরাকে বারে বারে মায়ার টানে বেঁধে ফেলেছে। ভৌগোলিক পরিধি নলিনী বেরার কথাসাহিত্যের বিশেষ উপাদান। জনজাতির জীবনবেদ রচনা করা দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ কাজ, অভিজিৎ সেন *রহু চণ্ডালের হাড়* উপন্যাসে বাজিকর গোষ্ঠীর জীবনচিত্র নির্মাণ করতে গিয়ে যেমন তাদের জীবনযাপন রীতি, সংস্কৃতি, ভাষা, বিশ্বাসকে বুঝেছিলেন, *শবর চরিত* (২০০৫) উপন্যাস নির্মাণ করতে গিয়ে নলিনী বেরাও সেই কাজ করেছেন। শবর ও লোধা এই দুই জনজাতির শিকার, চুরি, ভাষা, মিথ, পুরাণের প্রতি বিশ্বাস সমস্তই তুলে এনেছেন তাঁর গবেষণাধর্মী মহাকাব্যিক উপন্যাসে। সোহারাব হোসেন বলেছিলেন—

> শুধু গল্প শুধু আখ্যান রচনা, শুধু অভিজ্ঞতার বর্ণনা তো উপন্যাস নয়, অভিধান। সমাজের কিংবা জীবনের অভিধান। সমাজ ও জীবন নির্ভর এইসব অভিধান যখন ছোট সময়ের বৃত্তে বড়ো-সময়কে প্রতিফলিত করায়, চেনা জীবন ও মানুষের মধ্যে অচেনা সত্তাকে আবিষ্কার করায়, খণ্ড বোধ থেকে অখণ্ড দার্শনিকতায় উড়ান দেয়, তখন সেটি উপন্যাস হয়।[২৬]

নলিনী বেরার উপন্যাসে এমন দাবির যথেষ্ট উপাদান আছে। তাঁর উপন্যাসের ভূগোল একই হলেও প্রতিটি উপন্যাসে নতুন নতুন করে এসেছে। উড়িষ্যার সীমান্তবর্তী সুবর্ণরেখা নদীর তীরে নয়াগ্রাম ও গোপীবল্লভপুরের মানুষ, ভূগোল, প্রকৃতি, ইতিহাস, রাজনীতি তাঁর উপন্যাসে বারে বারে উঠে এসেছে। তিনি জন্মভূমির মধ্যে দিয়েই দেশকে দেখতে চেয়েছিলেন। এই দেখার মধ্যে অন্য সব কিছুর সঙ্গে সমসাময়িক অবস্থাও উঠে এসেছে নয়াগ্রাম ও গোপীবল্লভপুরের প্রেক্ষিতে। নলিনী বেরার বেশিরভাগ উপন্যাসের চরিত্ররা তাঁরই প্রতিবেশি, আত্মীয় পরিজন। এমনকি *শবর চরিত* শুধু লোধা শবরদের নিয়ে নয়, 'সমস্ত অন্ত্যজ 'জঙলি' মানুষদেরই চরিতমালা'। একেবারে হালে লেখা *সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা* (২০১৮) উপন্যাসে জীবনের অন্বেষণে ঘুরতে ঘুরতে মানুষ যে কোথায় পৌঁছে যায় তা সে নিজেও জানে না, তবুও শেকড়ের খোঁজে সে ফিরতে চায়। সুবর্ণরেখা নদীর তীর জুড়ে কত জনপদ কত পরিবার, এমনই এক পরিবারের আখ্যান শুনিয়েছেন নদীকেন্দ্রিক এই উপন্যাসে। মনস্তাত্ত্বিক ভাবনা প্রবাহ, রাজনীতি, বৈধ-অবৈধ প্রেম, দ্বন্দ্ব, অন্ত্যজ মানুষের নানান ওঠা-

পড়া, কিন্নর সমাজের অবদমন এমন বিষয়গুলো নলিনী বেরা ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে উপস্থাপন করেছেন তাঁর *ভাসান* (১৯৮১), *শবর চরিত, অপৌরষেয়* (২০০৭), *ইরিনা ও সুধন্যরা* (১৯৯৪), *ঈশ্বর কবে আসবে* (১৯৯৬) ইত্যাদি উপন্যাসে। ভগীরথ মিশ্রের মতো দেশীয় ঐতিহ্য অনুসরণে আগ্রহী ছিলেন তিনি। *রামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ* থেকে প্রত্ন প্রাচুর্য সংগ্রহ করেছিলেন নলিনী বেরা। উপকথা, লোককথার আঞ্চলিকতা, আঞ্চলিক ভাষার সম্ভার গড়ে তুলেছেন তিনি। উপস্থাপনের রীতিতে সত্তর দশকের অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের থেকে অনেকটাই আলাদা নলিনী বেরা।

যুগ পরিবর্তন করতে না পারার যন্ত্রণায় অবশ হয়েও যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করেছিলেন, স্বপ্ন ভেঙে যাওয়া যে মানুষগুলো আবার উঠে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখেছেন, জীবনের অন্য ধারায় এসে আবার অন্যান্যদের মতো বেঁচেছেন, কিন্নর রায় তাদেরই একজন। জীবনের রুক্ষ বাস্তবতায় সাহিত্য সাধনা তাঁর কল্পনার অতীত ছিল তবুও সত্তা বদলে তিনি কলম ধরেছিলেন, লিখেছেন অসাধারণ কিছু। কিন্নর রায় জেল জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখেছেন প্রথম উপন্যাস *কাছেই নরক*। বিচিত্র সেই অভিজ্ঞতা, জেলের করুণ, ভয়ংকর পরিবেশ, নিয়ম কানুন, ফাঁকি, খাবার, নিত্যদিনের রুটিন, অবিচার, ঘুষ, বিভিন্ন ধরনের অপরাধীর বৈশিষ্ট্য, জেল সংঘর্ষের নামে হত্যা, অপরাধ জগতের ভাষা, কোড শব্দ, এসবই আছে এই উপন্যাসে। কিন্নর রায়ের পরিচয় *প্রকৃতি পাঠ* (১৯৯০) উপন্যাস দিয়ে শুরু। পরিবেশ রক্ষা, দূষণের বিরুদ্ধে কথা এবং পরিবেশকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা নিয়ে লিখেছিলেন এই উপন্যাস। লেখক হিসাবে একটা সংশয় ছিল কিন্নর রায়ের—

> এই যে বড় পুঁজি শাসিত খবরের কাগজ ও তার ডাল-পালার অন্য অন্য পত্রিকায় গিয়ে মাথা মুড়োলাম না ভালো লেখাটি লিখবো বলে, এই যে প্রায় শুধুই লিটল ম্যাগাজিন আশ্রয় করে বাঁচলাম এত এত বছর, তাতে কি কিছু হল?[২৭]

এই সংশয় শুধু তাঁর নয়, সত্তর ও সত্তর পরবর্তী অনেক প্রথাগত ধারার বাইরের লেখকদেরও ছিল। যাঁদের মাথায় বড় পত্রিকার হাত নেই, যাঁরা একটা বৃহৎ পাঠকের ভালো লাগাকে আমল দেননি। এসবের মধ্যেই কিন্নর রায় লিখে চলেছিলেন, বিচিত্র বিষয়, নানান প্রশ্নের উপস্থাপন, প্রতিবেদনের ধরন নিয়ে। তিনি নানান ভূমিকায় উপন্যাস রচনা করেছেন, যেমন সূত্রধর, ভাষ্যকার, সাংবাদিক ইত্যাদি। কিন্নর রায় বন্য হাতির লোকালয়ে প্রবেশ

করাকে কেন্দ্র করে হাতির বিবর্তনের তথ্য দিয়েছেন এবং হাতির সংকট ও হাতিকে নিয়ে নানান লোকবিশ্বাস এসব দিয়ে *মেঘপাতাল* (১৯৯৫) উপন্যাস রচনা করেছেন। যাতে কিন্নর রায় বিষয়ের অভিনবত্ব এনেছেন সত্তর দশকের উপন্যাসে। তিনি লিখেছিলেন নকশাল আন্দোলন নিয়ে, আবার ছড়া, লোককথা, রূপকথা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ভাষা, পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করেও লিখেছেন। নকশাল আন্দোলনের উলটোদিকে সমাজের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে সুবিধাভোগী বামপন্থীদের চিত্র এঁকেছিলেন *সংঘর্ষ* উপন্যাসে। অভিজিৎ সেন নকশাল আন্দোলনের ব্যর্থতার পর স্মৃতিচারণ করিয়েছেন তাঁর এই জাতীয় উপন্যাসের চরিত্রকে, আসলে তিনি বুঝেছিলেন এই আন্দোলনের ভ্রান্তিগুলোকে, এই পথে বিপ্লব হয় না এটা বোধগম্য হয়েছিল তাঁর। তাই হারিয়ে যাওয়া সময় আর সম্ভাবনার ভাবনা মাথায় নিয়ে হাজার প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছিলেন ব্যক্তিজীবনে, যেমন তাঁর উপন্যাসের চরিত্ররা খুঁজেছেন। ১৯৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে দরিদ্র মুসলমানদের জীবনযাপনকে ধরেছেন *সংখ্যালঘু* উপন্যাসে। অভিজিৎ সেনের মতো কিন্নর রায় বৈচিত্র্যের ভিন্ন রঙ ছড়িয়েছেন তাঁর কথাসাহিত্যে।

'উপন্যাস লেখার চেয়ে গল্প লেখা অনেক কঠিন কাজ', উপন্যাস লেখার ক্ষেত্রে নিজের অনীহা ও অক্ষমতার কথা বললেও স্বপ্নময় চক্রবর্তী বিজ্ঞাপণ বিনোদনের যুগে নিজের মতো করে উপন্যাস লিখে চলেছেন। সত্তরের অন্য লেখকদের মতো স্বপ্নময় চক্রবর্তী লিটিল ম্যাগাজিনেই লেখা প্রকাশ করতে থাকেন। তিনি মনে করেছেন নিজের মতো লিখতে পারা যায়, ম্যাগাজিনের উৎসাহ বন্ধুত্ব ও আড্ডার সুবাদে। রমাপদ চৌধুরীর (১৯২২-২০১৮) পরামর্শে প্রথম উপন্যাস লিখেছেন। তবে গবেষণা ও ক্ষেত্রসমীক্ষা ছাড়া তিনি উপন্যাস লিখতেন না তিনি। *নবম পর্ব* (১৯৯৭) লেখার আগে উড়িষ্যার ভাষা, জনজাতি, সমস্যা, বাঙালি ও ওড়িয়াদের সম্পর্ক, আদিবাসী এলাকায় রেললাইনের কাজ, জমি অধিগ্রহণ, এসব লেখক সেখানে থেকে দেখে বুঝে বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। স্বপ্নময় চক্রবর্তী তাঁর পূর্ববর্তী সাহিত্যিকদের সাফল্য প্রতিষ্ঠা এবং পরবর্তীদের সম্ভাবনার কথা বললেও তার নিজস্ব সফলতাও কম ছিল না। সংস্কৃতি, পুরাণ, মিথ মিশিয়ে *চতুষ্পাঠী* (১৯৯৫), *নবম পর্ব অবন্তীনগর* (২০০১)—এর মতো উল্লেখযোগ্য উপন্যাস লিখেছিলেন। কলকাতার সুবর্ণবনিক সম্প্রদায়ের ইতিহাস নিয়ে লিখেছেন *অবন্তীনগর*। উড়িষ্যার ঐতিহ্য, কিংবদন্তি, সাধারণ মানুষের ছোটো ছোটো স্বপ্ন, কষ্ট, যন্ত্রণা, ওড়িয়া ও বাংলা সাহিত্য বিষয়ে

দুই জায়গার মানুষের ধারণা এসব নিয়েই *নবম পর্ব* লিখেছেন স্বপ্নময় চক্রবর্তী। *চতুষ্পাঠী* একজন মানুষের ঐতিহ্য বোধের সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির লড়াই। নানান সমস্যা উপেক্ষা করে অস্তিত্ব রক্ষা করতে চাওয়া মানুষটি প্রাণপন চেষ্টা করে গেছে। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর উপন্যাসের কুশীলবরা যুদ্ধ দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছিল সর্বক্ষণ। কেউ নদী পাহাড়কে বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রাম করেছে কেউ আবার অবন্তীনগরগামী নৌকার গতিশীলতায় বিশ্বাস করেছে। বাস্তবের যন্ত্রণাময়তার মধ্যে ঐতিহ্যে আশ্রয় নিতে চেয়েছে তাঁর উপন্যাসের চরিত্ররা। মানুষের বার বার আশ্রয়হীন হওয়া নিয়ে লিখেছিলেন *বাস্তুকথা*। এই উপন্যাসে তিনি মনের দিক থেকেও মানুষ কীভাবে আশ্রয়হীন হয়ে যায় তা বুঝিয়েছেন। অত্যন্ত আধুনিক বিষয় নিয়ে লেখা *কম্পিউটার গেমস্* উপন্যাস, তখন সবে মধ্যবিত্ত জীবনে কম্পিউটার আসতে শুরু করেছে, বিভিন্ন কোম্পানিগুলো ভারতে বসেছে এই সময়টাই উপন্যাসে এসেছে। কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে কম্পিউটার নিয়ে যে পাগলামি শুরু হয়েছিল তা থেকেই দুটি পরিবারে ট্র্যাজেডি নেমে এসেছে। এছাড়াও স্বপ্নময় চক্রবর্তী আরও কয়েকটি উপন্যাস লিখেছিলেন *যে জীবন ফড়িং এর, মন্দ মেয়ে মন্দিরা, কিছু তুচ্ছ ঘটনা, বাপ হওয়া কি মুখের কথা* ইত্যাদি।

বাস্তবিকভাবে নিম্নবর্গীয় মানুষের দুঃখ দুর্দশার প্রধান প্রতিকূলতা অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা এবং সমাজে বর্গ নির্ণয়ের মাপকাঠিও তাই। অনিল ঘড়াইয়ের উপন্যাসের মূল আধার নির্মিত হয়েছিল এইসব নিম্নবর্গীয় মানুষ ও জনজাতির দিনযাপনের চিত্র নিয়ে। অনিল ঘড়াই নিজেও যে পরিবারে বেড়ে উঠেছিলেন সেটাও তাঁর কাছে প্রথম অভিজ্ঞতা এসব নিয়ে লেখার ক্ষেত্রে। প্রথম প্রকাশিত নয়, প্রথম লেখা *মুকুলের গন্ধ* (১৯৯৩) উপন্যাসে নিজেকে নিয়েই অনেক কথা বলেছিলেন। প্রথমদিকের *মুকুলের গন্ধ* ও পরবর্তীকালের *জন্মদাগ* (১৯৯৯) উপন্যাসে নিজের কৈশোর জীবনের খন্ডিত ঘটনা চিত্রিত করেছেন। জীবিকার সন্ধানে বাবা মেদিনীপুর থেকে নদীয়ায় চলে আসেন, সংসারের অভাব, মায়ের চোখে মুখে কষ্টের ছাপ, প্রতিবেশী মানুষের জীবনযাপন এসবই উপন্যাসের চরিত্রগুলোর মধ্যে বিধৃত হয়েছে। *নুনবাড়ি* (১৯৮৯) উপন্যাসে সমুদ্রভূমি মেদিনীপুরের কাদামাটির মধ্যে নুন ধারণের কথা, যা নাকি মাটির ধর্ম, মানবতা যেমন মানুষের ধর্ম তেমনি। মানবতার সঙ্গে লবন-মাটির নুন ও নারীর সাযুজ্য খুঁজেছেন এখানে। নুনমারা অসহায় অবহেলিত নারীর জীবন উঠে এসেছে। সিংভূমের পটভূমিকায় লিখেছেন *বনবাসী*

(১৯০০) উপন্যাস। ঝাড়খন্ডের এই অঞ্চলে চাকরিসূত্রে অনিল ঘড়াই ছিলেন, ওখানকার মানুষদের আত্মীয়ের মতো ভেবে, আদিবাসী জনজাতির অভাব সংস্কার ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। বন কেটে সাফ হয়ে যাচ্ছে, আধুকিকতার বিষবাষ্পে মানুষ নিঃশ্বাস নিচ্ছে, সিংভূমের বাতাসেও তাই। নারীর স্বাধীনতা বিপন্ন, গুণিনের আধিপত্য, গ্রামের কুষ্ঠ রোগীদের গ্রাম থেকে দূরে শহরের ঝুপড়িতে আশ্রয় নিতে হচ্ছে, এরাই বনবাসী। মেদিনীপুরের প্রেক্ষাপটে *বিপরীত যুদ্ধের মহড়া* (২০০১) লিখেছিলেন, এখানেও যেন তাঁর পারিবারিক অভাবেরই চিত্রন, ভাঙনের ছবি। গ্রাম ছেড়ে খাদ্যের সন্ধানে মানুষ শহরে পালিয়ে গেছে, এই ভাঙন রোধ করা খুব কঠিন, মানুষ শহরের পথে পথে খাদ্যের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছিল। সম্প্রদায়গত ভাবে অনিল ঘড়াই বেছে নিয়েছিলেন নিম্নবর্গের মানুষকে। হাড়ি সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি লোকাচার, দুঃখ দুর্দশার মধ্যে তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যকে ধরতে চেয়েছিলেন *মেঘ জীবনের তৃষ্ণা* (১৯৯৬) উপন্যাসে। একইভাবে বিহারের আদিবাসী জনজাতির ভিন্ন এক জীবন-জীবিকা লড়াই নিয়ে লেখা *দৌড়বোগাড়ার উপাখ্যান* (১৯৯৭) উপন্যাস। কাকমারা সম্প্রদারের কঠোর দারিদ্র্যতা, ভিক্ষা, জীবিকা, জীবনযাপন নিয়ে অনিল ঘড়াই লিখেছিলেন *নীল দুঃখের ছবি* (২০০১) উপন্যাসটি। পর্ণমোচী বৃক্ষের মতো মানুষের জীবন কোনো কোনো সময় নিঃস্ব হয়ে যায় এই কল্পনায় লিখেছিলেন*পাতা ওড়ার দিন* (২০০২) উপন্যাস। গ্রামজীবন পুরোপুরি ধরতে চেয়েছিলেন তিনি, অভাবী মানুষের জীবনবেদ রচনা করতেও চেয়েছিলেন, আঞ্চলিক ভাষার সাবলীল ব্যবহারেও দক্ষ ছিলেন তিনি। সত্তর দশকের অনেকটা পরে নতুন ধারাকে সামনে দেখে লিখতে বসে অনিল ঘড়াই মধ্যবিত্ত মানুষের বিচিত্র জীবনের দিকে গেলেন না, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ঘুরে ব্রাত্য মানুষদের কষ্টকে সহজে বুঝতে পেরেছিলেন যা নিজের জীবন দিয়েও বুঝেছিলেন। গ্রামের অসংখ্য দরিদ্র মানুষের অসংখ্য জীবিকা, হাসি-কান্না, সম্পর্ক দিয়েই অনিল ঘড়াই তাঁর সাহিত্যের ইমারত তৈরি করেছেন। দীঘার সমুদ্রকে অবলম্বন করে কিছু মানুষ জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করে, এই মানুষদের অনিল ঘড়াই খুব ভালো করেই চিনতেন, দীঘা নিয়ে তাঁর উপন্যাস লেখার সাধ পূরণ করেছেন *সামনে সাগর* (২০০৩) উপন্যাস লিখে। নোনা জলের নোনা মাছ, নোনা হাওয়া, সবই তার চেনা ছিল তবুও বাংলার বাইরে বিহার, উড়িষ্যাতেও তাঁর সাহিত্যের ভূগোলকে বিস্তৃত করতে চেয়ে তিনি বলেছেন—

যে কোনো লেখায় আমার ইচ্ছা থাকে বাংলা সাহিত্যের ভূগোলটাকে পয়েন্ট ওয়ান মিলিমিটার হলেও বাড়িয়ে দেওয়া। এ ভীষণ কঠিন কাজ। তবু চেষ্টা করে দেখতে তো ক্ষতি নেই।[২৮]

ভাবাবেগ কল্পনার মিশ্রণে, বিষয় বৈচিত্র্যের সঙ্গে পটভূমিও বদলে বদলে এসেছে অনিল ঘড়াইয়ের উপন্যাসে। বাংলা সাহিত্যের ভূগোলকে বিস্তৃতি দিয়েছেন তিনি।

অভিজিৎ সেন তাঁর গল্প উপন্যাসে মুসলিম চরিত্র, জীবনাচার, ধর্মবোধ, শিক্ষিত মুসলিম সমাজের সমাজ ভাবনা সম্পর্কে কোথাও কোথাও বলেছেন। মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়াতে আবুল বাশার ও আফসার আমেদ মুসলিম সম্প্রদায়ের খুঁটিনাটি নিয়ে উপন্যাস লিখেছিলেন। আফসার আমেদ, আবুল বাশারের মতো মুসলমান সমাজ-জীবন নিয়ে তাঁর কিস্‌সা সিরিজের লেখা দিয়েই আধুনিক কথাসাহিত্যে জায়গা করে নিয়েছেন। মুসলমান সমাজের নারীদের অসহায় দিক বেশি বেশি করে এসেছে তাঁর লেখায়, এক্ষেত্রে যদি তাঁকে 'ঘোরতর নারীবাদী' কেউ বলে থাকেন, তাতে তাঁর সোজা উত্তর ছিল—

ধর্ম সমাজ তো পুরুষতান্ত্রিক, সেখানে অর্ধেক আকাশের কথা যদি বা বেশি করেই এল। তারাও তো আমার জননী-জায়া-কন্যা। ইতিহাস জুড়ে বর্বরতা তো কম হয়নি।[২৯]

বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা (১৯৯৫), *কালো বোরখার বিবি ও কুসুমের গন্ধ এবং চল্লিশজন লোক* (১৯৯৬), *এক আশ্চর্য বশীকরণ কিস্‌সা* (১৯৯৮), *মেটিয়াবুরুজে কিস্‌সা* (২০০৩), *হিরে ও ভিখারিনী সুন্দরী রমণীর কিস্‌সা* লোককাহিনির ধরনে উদ্ভট চরিত্র, কৌতুক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, ও বাস্তবতার আশ্রয়ে তিনি নির্মাণ করেছিলেন তাঁর এই 'কিস্‌সা' সিরিজ। এক্ষেত্রে তিনি 'কিস্‌সা' শব্দের লঘুতর অর্থ বদলে দিয়েছেন, আর সিরিজ লেখার ক্ষেত্রে তিনটি দিয়ে শেষ করার ধারাবাহিক রীতির ধার ধারেননি। আবার এই লেখা তাঁর অনায়াস দক্ষতায় এসেছিল 'কলম চিবিয়ে লিখতে হয়নি।' চলতি লেখার ধরন থেকে বেরিয়ে এসে প্রবহমান জীবনের ভিতর থেকে কাহিনি তুলে এনে রক্ষণশীলতার বাইরে গিয়ে নিরপেক্ষভাবে লিখেছিলেন আফসার আমেদ। মুসলমান সমাজের মধ্যে থেকে স্বাধীন মানুষের সন্ধান করেছেন তিনি, পরাধীনতা নিয়ে কথা বলেছেন, রক্ষণশীলতা থেকে দূরে গিয়ে সমাজের লেখক পরিচয়েই থাকতে চেয়েছিলেন। *বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা* ও *মেটিয়াবুরুজে কিস্‌সা* তাঁর নিজস্ব অনুসন্ধানের ফসল। মানুষের বিশ্বাস-অবিশ্বাসে যে 'কিস্‌সা' মিশে থাকে এবং তা যে

'কিস্‌সা' নির্ভর হয় তা আফসার আমেদ দেখিয়েছেন। ধর্মের ধ্বজাধারী সমাজের পরিচালক সেজে যারা বসে আছে তাদের অন্তরে স্বার্থপর লোভী কামুক সত্তাকে উন্মুক্ত করেছেন আফসার আমেদ। *মেটিয়াবুরুজে কিস্‌সা* শুধু এই অঞ্চলের নয়, বিশ্বের যে কোনো মুসলমান সমাজের কাহিনি হতে পারে। এবং কিস্‌সার যে নির্দিষ্ট ভূগোল থাকে না তাও আফসার আমেদ দেখিয়েছেন। কামনার বশবর্তী হয়ে ধর্মতাড়নার দোহাই দিয়ে বিয়ে করতে চাওয়া, মুসলমান সমাজে বিয়ের ক্ষেত্রে নারীর পরাধীনতা উঠে এসেছে। মেটিয়াবুরুজের কাহিনিতে এমন এক নারীর স্বামী হারানোর কষ্ট ও পরক্ষণেই দ্বিতীয় বিয়ের প্রস্তাব প্রাপ্তির অসহায়তা মিশে গিয়েছিল চোখের জলে। সেই জল সম্মতির লক্ষ্মণ বলে ধরে নেয় পুরুষেরা। ধর্মীয় অনুশাসনের নামে সুযোগ নেওয়া, ধর্মকে স্বার্থে ব্যবহার করা মৌলবির পরিচয়, আফসার আমেদ তাঁর কিস্‌সাতে লিপিবদ্ধ করেছেন। পুরুষের আয়াস-আরাম, ভোগ-অধিকার এসবের কথা অকপটে দেখিয়েছেন তিনি। অতি ধার্মিক লোক কামনায় জর্জরিত হয়ে সাধারণ হতে চেয়েছে, তার কামনাকে আশ্রয় দিতে কোরানের সমর্থন খুঁজেছে। নারীর ব্যথার জগৎকে উন্মোচিত করেছেন আফসার আমেদ, পুরুষের ভয়ংকর রূপকেও। *ঘর গেরস্তি, সানু আলির নিজের জমি* (১৯৮৯)', *ধানজ্যোৎস্না* (১৯৯৩) প্রভৃতি উপন্যাসে আফসার আমেদের দক্ষতা বোঝা গিয়েছে। তবে একজন আফসার আমেদ, একজন নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) আর একজন আবুল বাশার সমাজের এই গাঢ় অন্ধকার দূর করতে পারবে কিনা সন্দেহ কিন্তু এই অন্ধকারে আলো ফেলে সবাইকে দেখাতে পেরেছেন অন্ধকারের গভীরতা।

নিম্নগতির নদী উপন্যাসে অভিজিৎ সেন গঙ্গার নিম্নগতি অংশে মালদা জেলার বন্যা দেখিয়েছিলেন। যেহেতু মালদা জেলাকে হাতের তালুর মতো জানতেন তিনি তাই অন্যান্য নদীর সঙ্গে গঙ্গার সংযোগ, গঙ্গা কেন, কীভাবে মালদা জেলায় ভয়াবহ বন্যা সৃষ্টি করেছিল এসব বৃত্তান্ত তুলে ধরেছেন। অভিজিৎ সেনের মতো শচীন দাশ হারিয়ে যাওয়া আদিগঙ্গার বৃত্তান্ত ও তার তীরের জীবনযাপন নিয়ে লিখেছিলেন *অন্ধনদীর উপাখ্যান* (২০০৪) উপন্যাস। দুশো বছর আগের দক্ষিণবঙ্গের আদি গঙ্গার যে ধারায় এক সময় ডাচ, পোর্তুগিজরা বন্দর তৈরি করেছিল, যে তীর ধরে চৈতন্যদেব নীলাচলে গিয়েছিলেন এবং ইংরেজরা যে ধারাপ্রবাহ থেকে খাল কেটে বিদ্যাধরীর সঙ্গে যুক্ত করেছিল। কীভাবে এই আদি গঙ্গার প্রবাহ হারিয়ে গেল এসব দিয়ে শচীন সভ্যতার সঙ্গে আদি গঙ্গার ইতিহাস তুলে এনেছেন।

এছাড়াও শচীন দাশের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস *অরণ্যপর্ব*, *উদ্বাস্তু নগরীর চাঁদ* (২০০৮-১৪) ইত্যাদি।

বিশ শতকের সত্তর দশকে এবং কিছু আগে পরে বাংলা কথাসাহিত্যে অনেক প্রতিভাই এসেছিল, যারা সময় থেকে মুখ ফিরিয়ে থেকেছিলেন আর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জন্য হা-হুতাশ করেছেনে এই ধরনের লেখকদের জন্য মহাশ্বেতা দেবী বলেছিলেন—

> পেশাদারি লেখককেও তাঁর অবস্থানকে ন্যায্য মর্যাদা দিতে হলে এমন-এক সময়কে দলিলে ধরে রাখতে হয়। বরঞ্চ আমি বলব, রাজনীতিক গল্প উপন্যাস সে-সময়ের সেইগুলি, যাতে সময়ের কোনো ছাপ নেই, স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া নেই। আছে সত্তর দশকের অভিজ্ঞতা থেকে মুখফেরানো সুপরিকল্পিত এক সাহিত্য-সৃজন। এটি রাজনীতিক।[৩০]

আবার কেউ সময়ের আঁচ উপলব্ধি করে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারেননি। সাধ্যমতো প্রতিরোধ গড়ে তুলছিলেন। আবার কথাসাহিত্যের গতানুগতিকতা থেকে বেরিয়ে অনেকেই স্বতন্ত্রতার সঙ্গে লিখে চলেছেন আজও। ফলে বাংলা কথাসাহিত্য বিষয় ও আঙ্গিকে বিরাট পরিধি পেয়েছে। উল্লেখিত সব ঔপন্যাসিক সত্তরের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে আপন আপন ক্ষেত্রে নিজস্ব জগৎ গড়ে তুলেছেন বিষয় ও আঙ্গিকে বৈচিত্র্য এনে। মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গে অভিজিৎ সেনের তুলনা বাদ রেখে বলা যায়, অন্যান্যদের সঙ্গে অভিজিৎ সেনের সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য কিছু আছে। সত্তর দশকে অনেকটাই স্বতন্ত্র ভগীরথ মিশ্র, অমর মিত্র, কিন্নর রায়, সাধন চট্টোপাধ্যায়, নলিনী বেরা, অনিল ঘড়াই, আফসার আমেদ, এমনকি অভিজিৎ সেনও।

উল্লেখপঞ্জি

১। দেবী, মহাশ্বেতা, 'সত্তর দশক ও তারপরে', অনিল আচার্য (সম্পাদিত), *সত্তর দশক* (খণ্ড এক), অনুষ্টুপ, কলকাতা, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত অনুষ্টুপ সংস্করণ ২০১৪, পৃষ্ঠা- ৪৮

২। আচার্য, অনিল, 'সত্তর দশকের ছোটগল্প', অনিল আচার্য (সম্পাদিত), *সত্তর দশক* (খণ্ড দুই), অনুষ্টুপ, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ ২০১৪, পৃষ্ঠা- ২৭৮

৩। আচার্য, অনিল, 'সত্তর দশক' (ভূমিকা), অনিল আচার্য (সম্পাদিত), *সত্তর দশক* (খন্ড এক), অনুষ্টুপ, কলকাতা, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত অনুষ্টুপ সংস্করণ ২০১৪, পৃষ্ঠা- ২২

৪। চক্রবর্তী, শচীন্দু, 'তেভাগা আন্দোলনের আলোচনা', ধনঞ্জয় রায় (সম্পাদিত), *তেভাগা আন্দোলন,* কে পি বাগচি এন্ড কোং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০০০, পৃষ্ঠা- ৭৫

৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৭৫

৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৮৫

৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ, *ইতিহাসের দিকে ফিরে ছেচল্লিশের দাঙ্গা,* র‍্যাডিক্যাল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০০, পৃষ্ঠা- ২৩

৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৯

৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৮

১০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫০

১১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৮১

১২। ঘোষ, নির্মল, *নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০১৬, পৃষ্ঠা- ৪৯

১৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিমল, *ভূমি ও ভূমিসংস্কার সেকাল একাল,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ মার্চ ২০১৭, পৃষ্ঠা- ১২৬

১৪। আচার্য, অনিল, 'সত্তর দশকের ছোটগল্প', অনিল আচার্য (সম্পাদিত), *সত্তর দশক* (খণ্ড দুই), অনুষ্টুপ, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ ২০১৪, পৃষ্ঠা- ২৭৪-২৭৫

১৫। পূর্বোক্ত,পৃষ্ঠা- ২৭৯

১৬। মিশ্র, ভগীরথ, 'আমার সৃষ্টির নেপথ্য কথা', তাপস ভৌমিক (সম্পাদক), *কোরক সাহিত্য পত্রিকা* (প্রাক্ শারদ সংখ্যা), কলকাতা, ১৪১৫, পৃষ্ঠা- ৮০

১৭। চক্রবর্তী, সুদেষ্ণা, 'বিগত তিন-চার দশকে বাংলা উপন্যাসের কয়েকটি ধারা', তাপস ভৌমিক সম্পাদিত, *কোরক সাহিত্য পত্রিকা* (প্রাক্ শারদ সংখ্যা), কলকাতা, ১৪১৫, পৃষ্ঠা- ৩৫

১৮। ভগীরথ মিশ্রের সাক্ষাৎকার, সমীরণ মজুমদার (সম্পাদক), *অমৃতলোক*, মেদিনীপুর, ৩১ বছর দ্বিতীয় সংখ্যা জানুয়ারি ২০০৬, পৃষ্ঠা- ৩৩৪

১৯। বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ জানুয়ারি ২০১২, পৃষ্ঠা- ৩৩৮

২০। মিশ্র, ভগীরথ, 'আমার সৃষ্টির নেপথ্য কথা', তাপস ভৌমিক (সম্পাদক), *কোরক সাহিত্য পত্রিকা* (প্রাক্ শারদ সংখ্যা), কলকাতা, ১৪১৫, পৃষ্ঠা- ৮৫

২১। দাশ, শচীন, 'লাট অঞ্চলের মানুষজন ও ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস', তাপস ভৌমিক (সম্পাদক), *কোরক সাহিত্য পত্রিকা* (প্রাক্ শারদ সংখ্যা), কলকাতা, ১৪১৫, পৃষ্ঠা- ১৭৯

২২। মণ্ডল, শুভময়, 'অমর মিত্রের গদ্য ও গদ্যের দায়', তাপস ভৌমিক (সম্পাদক), *কোরক সাহিত্য পত্রিকা* (প্রাক্ শারদ সংখ্যা), কলকাতা, ১৪১৫, পৃষ্ঠা- ২৮৯

২৩। বাশার, আবুল, 'কেন এই লিখিলেখা', তাপস ভৌমিক (সম্পাদক), *কোরক সাহিত্য পত্রিকা* (প্রাক্ শারদ সংখ্যা), কলকাতা, ১৪১৫, পৃষ্ঠা- ৪৬

২৪। পূর্বোক্ত,পৃষ্ঠা- ৪৯

২৫। চট্টোপাধ্যায়, সাধন, 'কেন উপন্যাস লিখি', তাপস ভৌমিক (সম্পাদক), *কোরক সাহিত্য পত্রিকা* (প্রাক্ শারদ সংখ্যা), কলকাতা, ১৪১৫, পৃষ্ঠা- ১৪৬

২৬। হোসেন, সোহারাব, 'দেশজ-লোকজ ঘরানার কথাকার নলিনী বেরা', তাপস ভৌমিক (সম্পাদক), *কোরক সাহিত্য পত্রিকা* (প্রাক্ শারদ সংখ্যা), কলকাতা, ১৪১৫, পৃষ্ঠা- ২৫৬

২৭। রায়, কিন্নর, 'বাওয়া' ডিমের বাইরে', তাপস ভৌমিক (সম্পাদক), *কোরক সাহিত্য পত্রিকা* (প্রাক্ শারদ সংখ্যা), কলকাতা, ১৪১৫, পৃষ্ঠা- ১৫৬

২৮। ঘড়াই, অনিল, 'আঁতুড় কথা', তাপস ভৌমিক (সম্পাদক), *কোরক সাহিত্য পত্রিকা* (প্রাক্ শারদ সংখ্যা), কলকাতা, ১৪১৫, পৃষ্ঠা- ১৬৪

২৯। আমেদ, আফসার, 'কিস্‌সা: অন্তরালের কথা', তাপস ভৌমিক (সম্পাদক) *কোরক সাহিত্য পত্রিকা* (প্রাক্ শারদ সংখ্যা), কলকাতা, ১৪১৫, পৃষ্ঠা- ১৬৮

৩০। দেবী, মহাশ্বেতা, 'সত্তর দশক ও তারপরে', অনিল আচার্য (সম্পাদিত), *সত্তর দশক* (খণ্ড এক), অনুষ্টুপ, কলকাতা, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত অনুষ্টুপ সংস্করণ ২০১৪, পৃষ্ঠা- ৪৭

তৃতীয় অধ্যায়

অভিজিৎ সেনের উপন্যাস: আখ্যান নির্মাণ

অভিজিৎ সেনের (জন্ম- ১৯৪৫) উপন্যাসের আখ্যান একমুখী নয়, বহুমুখী। তাঁর প্রকাশিত আঠাশটি উপন্যাসের বিষয়ে অনেক বৈচিত্র্য এসেছে। সত্তর দশকের সমাজ রাজনীতি পঞ্চাশ ষাটের থেকে অনেকটাই বদলে গিয়েছিল, আর এই পরিবর্তমান কালের আবহে সাহিত্যেও অনেকটাই বদল এসেছে, সাহিত্যের ধারা নতুন পথে ধাবিত হয়েছিল। নিম্নবিত্ত মানুষের লড়াই, সংস্কৃতিসহ সমগ্র জীবন এবং ভূমিসংস্কার, দাঙ্গা, দেশভাগ, নকশাল আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের মতো একাধিক বিষয় উঠে এসেছে কথাসাহিত্যে। প্রথাগত বা প্রাতিষ্ঠানিকতা থেকে বেরিয়ে এসে একদল সাহিত্যিক তাঁদের লেখায় মহানগর ছাড়িয়ে গ্রামগঞ্জকে তুলে ধরেছেন, মার্জিতভাবে নয়, অবিকৃতভাবে। ফলে সাহিত্যের পাঠক নতুন স্বাদ পেয়েছিল। মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬), সতীনাথ ভাদুড়ির (১৯০৬-১৯৬৫) উপন্যাসের নায়ককে শিক্ষিত, মার্জিত, সুদর্শন হতে হয়নি, চুয়াড় যুবকও মহাকবি হতে চেয়েছিল। সাহিত্য মাটি সংলগ্ন হয়ে উঠেছিল। এই সময়ে অভিজিৎ সেনও তাঁর উপন্যাসের আখ্যান একটি ধারায় রচনা করেননি। যাযাবর গোষ্ঠীর কথা এসেছে, নারীকে স্বাধীনচেতারূপে উপস্থিত করেছেন, মানুষের জমির অধিকারের লড়াইকে নীতিগতভাবে উপস্থাপন করেছেন। ইতিহাসের পুনরুদ্ধার করে বাস্তবোচিত ভাবনায় জারিত করেছেন, নকশাল আন্দোলনের আদর্শ ও আদর্শচ্যুতির কথা যুক্তি দিয়ে বলেছেন, নারী পাচারের মতো সমস্যা সমাজের গোড়ায় কীভাবে গুপ্ত সমর্থন পেয়েছে তাও দেখিয়েছেন। সাম্প্রদায়িক বিষে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ, আদর্শবান মানুষের রাজনৈতিক ও সামাজিক শোষণ, রাজনৈতিক ব্যভিচার, প্রেম, যৌনতা একাধিক বিষয় নিয়ে অভিজিৎ সেন তাঁর আঠাশটি উপন্যাসের আখ্যান নির্মাণ করেছেন। তাঁর উপন্যাসের আখ্যান নির্মাণ কৌশল যেমন স্বতন্ত্র তেমন আখ্যানেও বৈচিত্র্য এসেছে। এই বৈচিত্র্যের দিক থেকে অভিজিৎ সেনের উপন্যাসগুলিকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে। এপ্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন, উপন্যাসগুলির পর্ব বিভাগের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মূল বিষয়ের উপর নির্ভর করা হয়েছে। ভূমিকেন্দ্রিক উপন্যাসেও রাজনীতি আছে আবার মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা উপন্যাসগুলিও রাজনৈতিক দলিল। অভিজিৎ সেনের উপন্যাসে

লম্বা চওড়া আখ্যানের থেকে টুকরো টুকরো অনেকগুলি কাহিনি একসঙ্গে প্রাধান্য পেয়েছে তাই একটি নির্দিষ্ট সীমায় উপন্যাসগুলিকে পাকাপাকিভাবে বেঁধে ফেলা যথার্থ হবে না। তবুও আলোচনার সুবিধার্থে মূল কাহিনিকে প্রাধান্য দিয়ে পর্বগুলি ভাগ করা হয়েছে।

১। ইতিহাস আশ্রিত

অভিজিৎ সেন কথাসাহিত্যিক, তার আগে তিনি একজন ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন। এই দুই পরিচয় তাঁর ইতিহাস নিয়ে লেখা উপন্যাসে দিয়েছেন। ইতিহাসের সঙ্গে সমাজের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন, ঐতিহাসিক কাহিনি ও চরিত্রের সঙ্গে লৌকিক চরিত্রের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। ইতিহাসের তথ্য দিয়ে ভারাক্রান্ত করেননি উপন্যাসের কাহিনিকে। সময় থেকে পিছিয়ে গিয়ে চতুর্দশ-পঞ্চদশ, ষোড়শ-অষ্টাদশ শতকের ইতিহাস নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন অভিজিৎ সেন। কিছু লেখায় ইতিহাস প্রসঙ্গক্রমে এলেও একেবারে ইতিহাসের কাহিনি ও চরিত্র নিয়ে তাঁর তিনটি উপন্যাস ও কয়েকটি গল্প আছে। এই জাতীয় লেখায় তিনি ইতিহাসের কাহিনির পুনরাবৃত্তি করেননি, নতুন করে ইতিহাসের পুরোনো গল্প শোনাননি, ইতিহাসের চরিত্রের সঙ্গে লৌকিক চরিত্রের পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়ে রসালো গল্প বলেননি। সমাজকে, সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রকে বোঝার চেষ্টা করেছেন, একাধিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চেয়েছেন।

ক। *মৌসুমি সমুদ্রের উপকূল*

সোনার বাংলাকে বারে বারে লুঠ করেছে দেশি-বিদেশি দস্যুরা। মধ্যযুগের সাহিত্যেও দেখা গিয়েছিল বাংলা লুঠের প্রসঙ্গ, মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর (জন্ম- আনুমানিক ষোড়শ শতকের প্রথমদিকে) *চন্ডীমঙ্গল* (আনুমানিক ১৫৪৪), সৈয়দ আলাওলের (১৬০৭-১৬৭৩) *পদ্মাবতী* (১৬৪৮) কাব্যে এছাড়াও পূর্ববঙ্গ গীতিকায়। পরবর্তীকালে কথাসাহিত্যেও মহাশ্বেতা দেবীর পরে অভিজিৎ সেন একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের কলেবরে ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকে মগ-পোর্তুগিজ-ওলন্দাজদের অত্যাচারের কাহিনি দেখিয়েছেন। তিনশো বছর ধরে কীভাবে এই দস্যুরা বাংলার উপকূল অঞ্চলে লুণ্ঠন ও নির্যাতন চালিয়েছিল, কিশোর, নারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে নির্বিচারে তাদের অত্যাচারের শিকার করেছিল। মানুষকে পশুর মতো দাসবাজারে বিক্রি থেকে ধর্ষণ, লুণ্ঠন, হত্যাযজ্ঞ কিছুই বাদ দেয়নি দস্যুরা। তবে অভিজিৎ সেন এসবের মধ্যে সমাজের অবস্থানও তুলে ধরেছেন। মগ স্পর্শিত মানুষকে নিম্নবর্গের মানুষ যদিও গ্রহণ করত কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় গ্রহণ করত না। করলেও তাকে প্রায়শ্চিত্যের যে রীতি পালন

করাত তাতে মানুষটা বেঁচে থাকবে কিনা সেটাই নিশ্চিত ছিল না। ফলে সমাজ এবং মগ এই দুই কূলের মাঝে পড়ে অনেকে আত্মহত্যাও করেছিল। এই অবস্থায় সবথেকে বেশি বিপাকে পড়েছিল নারীরা। দস্যুদের লালসার শিকার হবার পর সমাজ, সংসার, পরিবার পরিজন ছাড়া নারীর বাঁচা দুর্বিষহ হয়ে পড়েছিল। তবে খ্রিস্টান, ইসলাম এই দুই ধর্ম সেই সময় এমন অনেক মগ স্পর্শিত মানুষকে আশ্রয় দিয়েছিল। অভিজিৎ সেন তাঁর ইতিহাসবোধ ও যুক্তিবোধে ইতিহাসের এই কালপর্বের কাহিনি এবং সমাজে তার প্রভাব নিয়ে গড়ে তুলেছেন *মৌসুমি সমুদ্রের উপকূল* (২০০৭) উপন্যাসের আখ্যান।

উপন্যাসের কথামুখ অংশে লেখক আরাকান, পেগু, পগা, শ্যামরাজ প্রভৃতি রাজবংশের উল্লেখ করেছেন, তাদের বংশমর্যাদা কিসে উচ্চ হয় আর কিসে খর্ব হয় তা নিয়ে ভাবিত রাজারা শ্বেত গজের অধিকারী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করতেন। এবং আরাকান রাজাদের আমলে কীভাবে পোর্তুগিজরা গির্জা বানানো ও খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের অনুমতি পেয়েছিল এমন অনেক ইতিহাসের তথ্য দিয়েছেন লেখক। এইসব বলতে গিয়ে অভিজিৎ সেন তাঁর এই উপন্যাসের অভিপ্রায়, লেখকের স্বাধীনতা এবং উপন্যাসে কী বলতে চেয়েছেন তাও স্পষ্ট করেছেন—

> আধুনিক উপন্যাসের কোনো নির্দিষ্ট শৃঙ্খলা নেই। বস্তুত, উপন্যাসের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ এবং বিষয়বস্তুর ধরাবাঁধা শৃঙ্খলা কখোনই উপন্যাসের একমাত্র বিবেচ্য হতে পারে না। প্রকৃত জীবনের অনুরূপ বা অনুকৃতি যা কাল্পনিক কাহিনিকে সম্বল করে গড়ে ওঠে, তাই উপন্যাস পদবাচ্য হতে পারে। প্রকৃত, অতিপ্রাকৃত, ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, ধর্ম, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি যাবতীয় পার্থিব বিশেষ করে মানবিক বিষয়ের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে আধুনিক উপন্যাস যে কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে এবং করেও। বর্তমান লেখকের প্রয়াসও তদনুরূপ।[১]

ইতিহাস রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, ধর্মকে আশ্রয় করে লেখক মানবিক স্বরূপ দেখিয়েছেন একথা সত্য। আরাকানি ও মগেরা হঠাৎ সাধারণ জীবনযাপন ছেড়ে দুর্বৃত্ত জীবনে প্রবেশ করেছিল, রক্তের নেশায় মেতে উঠে নির্বিচারে শুধুমাত্র খুন করার অভিপ্রায়ে মানুষ খুন করেছিল। পোর্তুগিজরা আরাকানের রাজার সঙ্গে সু-সম্পর্ক স্থাপন করে দেয়াং বন্দরকে ঘাঁটি বানিয়ে, সন্দ্বীপ দখল করে রাজত্ব কায়েম করে নিয়েছিল। পাশাপাশি উপকূলগুলোর উপর আধিপত্য কায়েম করে রেখেছিল। আরাকানের বৌদ্ধদের সঙ্গে ঘনিষ্টতা রেখে, গোয়া, বম্বে

থেকে অপরাধীদের এনে অস্ত্র ও নৌবিদ্যা শিখিয়ে দুর্ধর্ষ করে তুলেছিল, এরাই হার্মাদ, বোম্বেটে, মগ নামে পরিচিত ছিল।

মগদের সঙ্গে পোর্তুগিজ দস্যুদের বেচা-কেনার একটা সম্পর্ক ছিল, উপকূল অঞ্চল থেকে মগরা মানুষ লুঠ করে পোর্তুগিজদের কাছে বিক্রি করত। বাংলার দাসদের বাজারমূল্য ভালো ছিল কারণ এরা আফ্রিকার দাস-দাসীদের মতো ক্রোধী নয়, শান্ত স্বভাবের। মানুষ যে সবথেকে ভয়ংকর ও হিংস্র, বাংলার উপকূল অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে পোর্তুগিজ জলদস্যুদের ব্যবহারে তা প্রমাণ হয়েছিল। অন্যদিকে সমাজের শুদ্ধিরক্ষার জন্য ধ্বজাধারী ব্রাহ্মণরা মগ স্পর্শিত মানুষকে সমাজরক্ষার দোহাই দিয়ে সমাজ থেকে বর্জন করেছিল, অভিজিৎ সেন লিখেছিলেন—

> মগ হার্মাদের দৌরাত্ম্যকে আশ্রয় করে এই সময়ে বাংলার উপকূলে আরও বিচিত্র কান্ড ঘটতে শুরু করে। ব্রাহ্মণ্য আত্মনিগ্রহ জাতপাতকে আশ্রয় করে সমাজকে রক্ষা করার নামে, নিষ্কলুষ রাখার ছলনায় সমাজ দেহকেই ধ্বংস করতে শুরু করে। পৃথিবীতে এমন দেশ বিরল যেখানে হতভাগ্য নিগৃহীতদেরই সমাজ দণ্ড দেয়, এমন দণ্ড যা বংশানুক্রমে চলতে থাকে।[২]

বংশানুক্রমে দণ্ড বহন করার ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট, বাঘে বা কুমীরে কোনো মানুষকে নিয়ে গেলে তার বংশ ব্যাঘ্রদোষ বা কুমীর দোষে দুষ্ট হয়ে বংশানুক্রমে সমাজ থেকে বিবাহের মতো শুভ ক্ষেত্রে নিগ্রহ সহ্য করত। মগে নিয়ে গেলে সে 'মউগ্যা' বা মগের উচ্ছিষ্ট হয়, এ ধরনের অমানবিকতা থেকে রেহাই পেতে মানুষ যে কোনো সিদ্ধান্ত নিত, মানুষ ধর্ম সম্পর্কে নিজস্ব বোধ তৈরি করেছিল, ধর্ম বদলে অন্য ধর্মে আশ্রয় নিত। তাই মগে নিয়ে যাওয়া আউলাকেশি দেছেলবা বলেছে—

> মানুষের বাইচ্যা থাকাটা মানুষের বড় ধর্ম। সেই মহাধর্ম পালন করতে গিয়ে তুমি হিন্দু থাকো, না খ্রীস্টান হও, না মুসলমান হও, সব পরের বিবেচনা।[৩]

আউলাকেশি দেছেলবা সেই নারী যে মগের উচ্ছিষ্ট, নিজের সমাজ তাকে মানেনি তাই সে অন্য ধর্মে আশ্রয় নিয়েছিল। ইংরেজদের অনেক আগেই ওলন্দাজ পোর্তুগিজরা ভারতে এসে ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল। উপকূল অঞ্চলে অত্যাচারের জন্য বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তিগুলো অনেকাংশে দায়ী। আঞ্চলিক শক্তিগুলো নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বহিরাগত নাবিকদের প্রশ্রয় দিয়েছিল তার ফলেই মগরা এত ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল।

বাংলার স্বাদ বিদেশি বণিকদের অচেনা ছিল না, একথাও সত্য সব বণিকরাই যে বাংলাকে লুঠ করতে এসেছিল তা নয়। এই উপন্যাসে ওলন্দাজ বণিক ইয়েকব এমন এক ব্যক্তি যে এদেশে এসেছিল শুধু ভারতকে জানতে, তারপর ব্যাবসায় জড়িয়ে পড়েছিল। সে ওলন্দাজ বণিকের কথা স্মরণ করে বলেছে 'বাংলায় ঢোকার রাস্তা একশোটা কিন্তু বেরোবার রাস্তা একটাও নেই' বাংলার সম্পদ ছাড়াও বাংলার ঐতিহ্য বিদেশিদের আকর্ষণের কারণ ছিল। ইয়েকব জানত পোর্তুগিজ হার্মাদ আর আরাকানের মগেরা মিলে নিম্নবঙ্গের অঞ্চলগুলো ধ্বংস করছে। ইয়েকবের কাছে এমন তথ্যও ছিল, পোর্তুগিজরা গর্ব করে বলেছে ধর্মযাজকরা যত হিন্দুকে খ্রিস্টান করেছিল তার দশগুণ হার্মাদরা করেছে। অর্থাৎ হার্মাদের অত্যাচারের ফলে হিন্দু ধর্ম থেকে বহিষ্কৃত মানুষ ইসলাম ও খ্রিস্টান গ্রহণ করত। ইয়েকব স্বীকার করেছে ইউরোপীয় জাতিগুলি বাংলায় যেভাবে দৌরাত্ম করেছিল তাতে পোর্তুগিজদের পরেই ওলন্দাজদের স্থান। এবং ইউরোপীয় জাতিগুলো বাণিজ্য করতেই এসেছিল। এই জাতিগুলি পরস্পরের প্রতি নৃশংস ছিল। খুন, ধর্ষণ ও পাশবিকতা এদের রক্তেই ছিল।

সাত সমুদ্র তের নদী জুড়ে পোর্তুগাল যখন শাসন করছিল, খাদ্য, অস্ত্র, দাসদাসী লিসবনে আসছিল তখন অন্যদিকে প্লেগের ভয়ে আর না খেতে পেয়ে পোর্তুগালের অন্য প্রান্তের মানুষ শহরের দিকে আসতে শুরু করেছিল। এমন সময়েতেই ফারনান্দেজ তার বন্ধু অ্যাবরেনানসিয়াসকে বলেছিল—

> ভারতবর্ষের সন্দ্বীপ নামে একটি দ্বীপ আছে। সেন্ট অ্যান্টনি গ্রামের সিবাস্টিয়ান গনজালেস সেখানকার রাজা হয়ে বসেছে। প্রাচুর্যের সেই দেশে গেলে ধনী তুমি হবেই, কপাল ভালো থাকলে রাজা-মহারাজাও হওয়া সম্ভব।[৪]

ক্ষমতা দেখানোর সুযোগ পেলে যে কেউ রাজা হতে পারে এমন ধারণা ফারনান্দেজের ছিল তাই সে জাহাজের খালাসি হয়ে ভারত সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল। অ্যাবরেনেনসিয়াসও বসে থাকল না, গোয়ার উদ্দেশ্যে ভেসে পড়েছিল। দাস ব্যাবসার নৃশংসতা সম্পর্কে তার ধারণা হল, দাসদের বাজারে তোলা হলেও তাদের আগে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা হয়েছে অর্থাৎ তাদের নরকের আগুন থেকে উদ্ধার করে স্বর্গের পথে এগিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সে নরক দেখেছিল স্বচক্ষে যখন জাহাজ ঘাটায় জাহাজ থেকে দাসদের নামিয়ে নির্মমভাবে

চাবুক মারতে মারতে স্বামী-স্ত্রীকে, পিতা-মাতা-পুত্রকে আলাদা করে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় পাঠানো হয়েছিল। মর্মান্তিক আর্তনাদ আর কোলাহলের সেই দৃশ্য। অ্যাবরেনানশিয়াসের কাছে যা নরকের আগুন ছাড়া কিছুই নয়। সেবাস্তিয়ানের মতো যারা খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে এসেছিল তারা ব্যাবসায়ীদের মতো অত্যাচারী হয়ে ওঠেনি ঠিকই কিন্তু এসব পরিস্থিতি সত্ত্বেও তাদের ধর্ম প্রচার ও প্রসারের কাজ চালিয়ে গিয়েছিল সার্থকভাবে। দস্যুদের বিরুদ্ধে কোনো ধারাবাহিক প্রতিরোধ গড়ে ওঠেনি অনেকটা সময়। দিল্লির সম্রাটদের তোয়াক্কা না করে সমুদ্রতীরে দাপিয়ে বেরিয়েছে দস্যুরা। অভিজিৎ সেন লিখেছেন—

> আকবর বাদশার রাজত্বকালের শেষদিকে নিম্নবঙ্গের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে সমুদ্র দস্যুদের অত্যাচারে অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়। হোসেনশাহি আমল পর্যন্ত স্থানীয় ভূস্বামীরা এই ধরণের অরাজকতা ও দস্যুবৃত্তির বিরুদ্ধে একটা প্রতিরোধের ব্যবস্থা রাখত। আবার একে অপরের বিরুদ্ধতা করার সময় অকাতরে দস্যুদের সহায়তা গ্রহণ করত। কিন্তু ভুঁইয়ারা দিল্লির বাদশার কাছে পরাজিত এবং নিহত হলে নিম্নবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে মগ, ফিরিঙ্গি ও অন্য নানাবিধ উৎপাত মাত্রা ছাড়িয়ে গেল।[৫]

যুদ্ধক্ষেত্রে মগদের প্রয়োজনীয়তা ছিল অর্থাৎ পরোক্ষভাবে মগদের প্রতি মদত ছিল শাসকের। দিল্লির সম্রাটরা মগদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে আঞ্চলিক শক্তিগুলোর সঙ্গে এক হতে পারেনি। একে অপরের সঙ্গে লড়াই করার ফলে দস্যুরা সুযোগ পেয়েছিল।

চট্টগ্রামের দাসবাজার থেকে দাস সংগ্রহ করে ওলন্দাজরা তাদের কুঠি ও কারখানায় কাজে লাগিয়েছে। মগেরা দাসের জোগানদার, বাজারে দাসের জোগান মগেরাই দিত। তবে এসব ব্যাবসায় দেশীয় দালাদের সক্রিয় উপস্থিতি ছিল। উপন্যাসে শিস মহম্মদের মতো দালালকে দেখা গেছে। কুঠি গুদাম ছাড়াও লবনের তাফালের মতো অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দাসদের কাজে লাগানো হত। তাফালে বেশিরভাগ কাজ ছেলেদের, কিন্তু তবুও কিছু মেয়ে রাখতে হত, এইসব ছেলেরা যাতে না পালিয়ে যায়। দাস কেনাবেচার অমানবিক দৃশ্য মানুষ ও পশুকে এক করে ফেলেছিল। স্বাস্থ্যবান ও সুন্দর দাসের গায়ে চিমটি কেটে গায়ের রঙ আসল কিনা দেখে নিত, আবার খুঁটিয়ে দেখার জন্য মেয়েদের শাড়ি খুলেও দেখত ক্রেতারা। চট্টগ্রাম যখন মগের মুলুক হয়ে পড়েছিল তখন দালালেরা আরাকানের রাজার ক্ষমতা যেমন বুঝেছিল তেমন মগ প্রশাসকের ক্ষমতাও বুঝেছিল। মগদের মতো বিশ্বাসঘাতক ও নৃশংস

আর কেউ ছিল না তাই দালালরা কোনো পক্ষকেই না চটিয়ে ব্যাবসাটা ভালো করে চালিয়ে গিয়েছিল। দাসরা ছিল পশুর মতোই—

> গোঘাটায় কসাইয়ের কাছে বেচতে নিয়ে যাওয়া গোরুকেও গা ধুইয়ে, শিঙে তেল মেখে নিয়ে যায় বিক্রেতা। দাসদাসীর হাটে নিয়ে আসার আগে লুণ্ঠিত স্ত্রী-পুরুষ এবং বালক-বালিকাদের একটা শ্রীবৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালানো হয় সেই সুবাদে আউলাকেশির অঙ্গে একখাবলা তেল পড়েছে আজ।[৬]

বোঝাই যাচ্ছে মানুষ ও পশু এখানে আলাদা কিছু নয়। লুণ্ঠিত বালিকা থেকে যুবতী, বৃদ্ধা একাধিবার ধর্ষিত হয়েছে, দাসীদের ধর্ষণের ব্যাপারটা মামুলি ছিল। দাস বাজারেই দেখা যায় প্রকাণ্ড ষণ্ড প্রকৃতির মানুষ বুক অনাবৃত দাসীকে দেখে চরম উত্তেজিত হয়ে প্রকাশ্যে ধর্ষণ করেছিল। এভাবেই ধর্ষিত নারীদের গর্ভবতী অবস্থায় বিক্রি করার সময় বলতে শোনা যায় 'পেটেরটা খসলে তো ফাউ পেয়ে যাবে আর একটা। সেটার দাম তো ধরিনি।' বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের জীবনে এই চরম অভিশাপ তাদের আর মানুষ করে রাখেনি, পশুতে পরিণত করেছিল। 'মগেরা আসছে! সুন্দরবনের বাঘের থেকে হিংস্র, নদীনালার কুমির কামটের থেকেও ভয়ংকর মগ আসছে।' মগের গ্রামে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে একটা সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যেত, মানুষ শঙ্খ আর উলুধ্বনি দিয়ে জানান দিত মগের আগমণ, এই ধ্বনি তখন মঙ্গলধ্বনি ছিল না, বিপদের সংকেত। গ্রামের স্ত্রী, পুরুষ, বৃদ্ধ, শিশুরা দিক্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে বাঁচার আশায় ছুটত, কেউ কেউ জলা জায়গা খুঁজে নিত, তারপর—

> শুধু নাকটুকু কচুরিপানার আড়ালে উঁচু করে রেখে সর্বাঙ্গে, মাথার বাকি অংশটা পচা পাঁকের তলায় ডুবিয়ে এক প্রহর অতিক্রম করতে পারবে প্রাণভয়ে কাতর মানুষ। যারা এমন করবে তারা ভুলে যাবে যে পচা পাঁকের অভ্যন্তরে ভয়ংকর কুমিরেরা আছে... আছে ভয়ানক বিষধর কেউটে, গোক্ষুর এবং শিয়রচাঁদার মতো জাত সাপেরা; যারা জঙ্গলের বড়ো বড়ো গাছের ডালে দোল খেয়ে এক গাছ থেকে পনেরো হাত দূরের অন্য গাছে অবলীলায় যেতে পারে।[৭]

সাপ, কুমির, গাছের উঁচু ডালের থেকেও মগ বড়ো ত্রাস। গ্রামের ধনীদের ঘর থেকে মাল লুঠ করে স্ত্রী-দের প্রকাশ্যে বিবস্ত্র করে লাঞ্ছিত করে, বয়স্ক রোগীকে হা করিয়ে মুখে থুতু দিয়ে, দাহ্যযোগ্য বাড়ি পেলে তাতে আগুন লাগিয়ে উল্লাস করত দস্যুরা। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মতো অনিবার্যভাবে মগের অত্যাচার উপস্থিত হলে মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। মগের মানুষ লুঠের দৃশ্যটা এমন—

জনা-পনেরো মগ আট-দশজন বালক ও যুবতি স্ত্রীলোককে একটা মাত্র দড়ির সাহায্যে বেঁধে রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে নদীর ঘাটের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক বন্দির কোমরে দড়ির একটা করে প্যাঁচ এবং গিট। দড়ির দুই প্রান্ত এই দস্যুর হাতে। গোরু বিক্রির হাটে গোরু মোষকে যেভাবে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, সশস্ত্র মগেরা বন্দিদের সেভাবেই নিয়ে যাচ্ছিল।[৮]

কোনো বাধা নেই, কোনো প্রতিকারের সামনে পড়তে হত না মগদের। লুণ্ঠিত নারী পুরুষের হাতের তালু ফুটো করে বেত গলিয়ে গুচ্ছ করে রাখত। আউলাকেশি অবশ্য এমন পরিবেশকে মানিয়ে নিতে পেরেছিল কারণ এখানেই তার ঘর ও বর জুটেছিল। ধর্ম আর সতীত্ব বিসর্জন হয়ে যাবার পর সে এই সুখ পেয়েছিল তার সৌন্দর্যের কারণে। সুন্দর মুখের প্রতি মায়া আর যৌনতার মাদকে দুর্বলতা অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই আছে যেমনটা মাসকারহেনার ছিল তাই তো আউলাকেশিকে বাড়িতে ঠাঁই দিয়েছিল।

পোর্তুগিজরা মানুষকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষা দিয়ে, গির্জা বানিয়ে আরও শক্তিশালী হয়ে বাংলার উপকূলে ক্ষমতা বিস্তার করে রাজত্ব করার স্বপ্নও দেখেছিল। এরা ধর্ম বিস্তার, ব্যাবসা-বাণিজ্য ছাড়াও সুযোগ পেলে দস্যুবৃত্তি ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করত। পোর্তুগিজরা স্বপ্ন দেখত চট্টগ্রাম দখল করার। কিন্তু আরাকান রাজ মিনখা মৌং, হোসেন শাহ ও মোগলদেরও চট্টগ্রাম দখল করতে দেয়নি প্রবল ক্ষমতাবলে। কিন্তু একদিন চট্টগ্রামে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হয়েছিল। জাহাঙ্গীর ও শাহাজাহানের মধ্যে বিবাদের সুযোগ নিয়ে আরাকানরাজ সুধম্মা তিন দিন ধরে রাজধানী ঢাকায় লুটপাট, খুন ধর্ষণ চালিয়েছিল। চট্টগ্রামের বারোজন সামন্তরাজা মোগলের পরামর্শে আরাকানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল তার প্রতিশোধ নিতে সুধম্মা এই কাজ করেছে। আরাকানরাজ বাকলার রাজার সঙ্গে চুক্তি করে পোর্তুগিজদের বিনাশ করতে চেয়েছিল। প্রথমে পোর্তুগিজদের গির্জা বাণিজ্যকুঠি, ঘরবাড়ি ধ্বংস করে মানুষদের হত্যা করেছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে পালিয়ে আসা পোর্তুগিজরা দিয়াঙ্গা, চট্টগ্রাম, ওড়িষা উপকূল পর্যন্ত ডাকাতি ও লুঠ করেছে। সেবাস্তিয়ান গঞ্জালেশ যে খ্রিস্টধর্মের ধর্মগুরু ছিল, সে এখন বোম্বেটেদের সর্দার হয়ে উঠেছে। এভাবে যুদ্ধ বিশ্বাসঘাতকতা, হত্যা, ধর্ষণ, লুঠ সবসময় চলতেই থাকে। অভিজিৎ সেন লিখেছিলেন—

পোর্তুগিজদের সঙ্গে আরাকান রাজাদের ভাব-ভালোবাসা এবং হিংসাযুদ্ধ উভয়ই ছিল লাগাতার। আপাতশান্তির মধ্যে কখন যে হিংসা শানিয়ে উঠবে, আপাতযুদ্ধের মধ্যে কখন যে প্রেম প্রীতি

লতিয়ে উঠবে, কেউই হিসাব রাখতে পারত না। আসলে যুদ্ধটাই আসল। শান্তি শুধু পরবর্তী যুদ্ধের প্রস্তুতি।[৯]

যুদ্ধ নিত্যদিনের জীবনযাপনের মতো চলেছিল। সন্দ্বীপে পোর্তুগিজদের শেষ হয়ে যাবার পর মোগল আরাকানি, ত্রিপুরিদের মধ্যে আবার যুদ্ধ শুরু হয়েছিল।

সাধারণ মানুষের দুর্দশার কারণ বহিরাগত দস্যুরা একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। দেশীয় দালালরা এদের সঙ্গ দিয়েছে। আর সকলেই জানত ফিরিঙ্গিরা দাস ব্যাবসায়ী ও জলদস্যু। এরাই মগদের হিংস্র তৈরি করেছিল। মগের হিংসার শিকার হওয়া নারীর অভিশাপ দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না—

সর্বনাশ হবে তোদের! বজ্রপাত হবে তোদের মাথায়! তোদের দেশ জ্বলে-পুড়ে যাবে! শকুনে ঠুকরে খাবে তোদের ছেলেমেয়ের চোখ! ওরে মগ, ওরে সর্বনাশা মগ, নিরপরাধ মানুষের ঘরবাড়ি লুটে, খেয়ে সাধ মেটে না তোদের, তোরা সেই অসহায় মানুষগুলোকে ধর্ষণ করে, বিক্রি করে মানুষের সমস্ত শুভবুদ্ধি, মানুষেরত যত মঙ্গল, মানুষের যত পবিত্রতা, সব তোরা ধ্বংস করিস! ঈশ্বর না থাকলেও ভূমিকম্প আছে! আছে ঝড়ঝঞ্ঝা, মহামারী! তোদের রেহাই নাই মগ, তোদের পরিনতি হবে এইসব মানুষের থেকেও ভয়ংকর![১০]

এই কথাগুলি মগদের উদ্দেশ্যে একজন মায়ের অভিশাপ, সত্যভামা নামের যে মা দুই সন্তানসহ মগ লুণ্ঠিত, অত্যাচারিত ও ধর্ষিত হয়েছিল। যখন তার কনিষ্ঠ বালিকা কন্যাকে ধর্ষণ করে অজ্ঞান অবস্থায় সত্যভামার কাছে ফেলে দেওয়া হয়েছিল তখন সে এসব কথা বলেছে। কিন্তু এইসব অভিশাপে মগের কর্ণপাত করার সময় ছিল না। এই অভিশাপের মর্ম বুঝতে না পেরে অথবা অত্যন্ত বিরক্ত হয়েই সত্যভামার মুখের আড়াআড়ি সজোরে আঘাত করে রক্তাক্ত করেছিল। মায়ের এই অভিশাপ বাংলার উপকূলের সমস্ত মায়ের অভিশাপ ছিল। মগের দালাল মগদের মতো সরাসরি অত্যাচার লুণ্ঠনে অংশ না নিলেও মগদের শোষণের সমস্ত পথ তৈরি করে দিত। বিষ্ণুপ্রিয় ভট্টাচার্যের পুরো পরিবার, স্ত্রী সত্যভামা ও দুই কন্যা শর্মিষ্ঠা, মঞ্জরী মগের কবলে গিয়েছিল তাদের পাশের গ্রামের দালাল যুগল সাধুর জন্য। যুগল সাধুদের মতো লোভী বিকৃতকাম মানুষের জন্য অনেক পরিবার ছারখার হয়েছিল। একদিন মানুষ লুঠ করে হরিণ্ডহাটা নদী সংলগ্ন সুন্দরবনের অস্থায়ী গোপন ঘাঁটিতে আশ্রয় নিয়েছিল মগেরা। যুগল সাধু লুটের সময় ছিল না কিন্তু এখন মগের সঙ্গে আছে। গলায় তুলসীমালা পরিহিত যুগল বৈষ্ণব, উপকূল অঞ্চলের বণিক সে, মগের সঙ্গে

চুক্তিতে কাজ করত। সে নিজে এবং তার চরেরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে খবর নিত, কোন গ্রামে অনুষ্ঠান আছে, কার বাড়িতে সুন্দর মেয়ে আছে, এভাবে সে নতুন উপার্জনের পথ বের করে নিয়েছিল। সঙ্গে মগ ফিরিঙ্গিদের মতো বন্দি স্ত্রীলোকদের সঙ্গে যৌন মিলনের আকাঙ্ক্ষাও ছিল তার। ফলে সে যৌন রোগে আক্রান্ত হয়েছিল, যে রোগ ফিরিঙ্গিরা এদেশে আমদানি করেছে। এই রোগ থেকে মুক্তির উপায় হিসাবে সে কোনো অক্ষতযোনি বালিকার সঙ্গে যৌন মিলন করে, সেই বালিকার দেহে এই রোগ দিয়ে নিজে মুক্তি পেতে চেয়েছিল যুগল। এই উদ্দেশ্যে পূর্বেই দেখা বিষ্ণুপ্রিয়র ছোটো মেয়ে মঞ্জরীকে নির্বাচন করেছিল। বিষ্ণুপ্রিয়র পরিবারকে মগদের হাতে তুলে দিয়ে তার উদ্দেশ্যে সফল করেছে, বিকৃতকাম যুগল বালিকা মঞ্জরীকে ভোগ করে রোগমুক্তি সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়েছিল। তার বিকৃত কামনার জন্য পুরো গ্রামের কপালে দুর্ভোগ জুটেছিল।

মগের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া এত সহজ নয়, একমাত্র মরলে তবেই মুক্তি। মগেরা খোয়ারে মানুষ রেখে তার চারিদিকে খেজুর, বাবলা, বেল কাঁটার জঙ্গল করে রাখত। মগরা মনে করত সমস্ত বাংলাদেশ তাদের জাইগির, এই ভূভাগের সম্পদ, হাঁস মুরগি, গরু, ছাগল এমনকি মানুষ সবই তাদের। কালিকট, গোয়া, বোম্বে কিংবা পশ্চিম সমুদ্র পাড়ের দেশে নিয়ে গিয়ে মানুষ বিক্রি করার অধিকার ছিল। মোগলেরা বলত—

> চারজন মগের একখানা নৌকা পথে পড়লে একশোজন দেশি মানুষের বজরা প্রথম চেষ্টা করবে পালাতে। এবং শেষেও চেষ্টা করবে পালাতে।[১১]

এই একশোজন মানুষ প্রতিরোধ না করে নৌকা থেকে জলে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বাঁচাতে চেয়ে ডুবে মরবে, মগেদের কোনো পক্ষ থেকে কোনোভাবে প্রতিরোধের সামনে পড়তে হত না। যেদিন বিষ্ণুপ্রিয়র পরিবার লুঠ হয়েছিল সেদিন সমস্ত অত্যাচারিতের প্রতিনিধি হয়ে বোবা নামের এক যুবক মগদের বিরুদ্ধে একাই লড়েছিল—

> মগ গ্রামে ঢুকে কখনও বাধা পায় না। মগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কোনো ঘটনার কথা শোনা যায় না, প্রতি-আক্রমণ তো তাদের দুঃস্বপ্নেরও অতীত। বোবা সেই কাজটা করল।[১২]

লম্বা হাঁসুয়া নিয়ে ফিরিঙ্গিদের দলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সে, ফিরিঙ্গি কোষ থেকে তলোয়ার বের করে বোবার প্রথম কোপ আটকালেও পরের কোপে ফিরিঙ্গির মাথা ধর থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। এরপর পাঁচ-ছ জন সশস্ত্র দস্যু বোবাকে ঘিরে ফেলেছিল;

বেশিক্ষণের লড়াই ছিল না। বোবা তার বোবা আর্তনাদে আর আঘাত করার প্রচেষ্টায় একাকী লড়াই করেছিল এদের বিরুদ্ধে কারণ এরা মানুষকে পশুর অধম জীবন দিয়েছিল। অভিজিৎ সেন লিখেছেন—

> কিছুক্ষণ আগে গোটাতিনেক ডাব্বায় মগেরা জল ঢেলে গিয়েছিল। আর কাচা চাল মুঠো-মুঠো করে ছড়িয়ে দিয়েছিল ঘেরার মধ্যে। বন্দিরা সেই চাল এখনও খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। সত্যভামা ডাব্বার জল হাতে তুলে মঞ্জরীর নিম্নাঙ্গের ক্ষত ধুইয়ে দিতে দিতে এতক্ষণে করুণ বিলাপ শুরু করল।[১৩]

মগে নিয়ে যাওয়া মানুষের বিলাপের অন্ত নেই। মগের খপ্পরে একবার গেলেই আমৃত্যু বিলাপ করে কাটাতে হত। যদি কোনোক্রমে বেরিয়ে আসতে পারত তবে সে আর আগের মানুষ থাকত না। আউলাকেশির মতো কজন পারত নতুন সমাজ, নতুন ঘর নতুন ধর্ম নতুন আপনজনদের মানিয়ে নিতে।

আধারমাণিক, ধাত্রীনগর ইত্যাদি গ্রামগুলো লুঠ হয়েছিল। মগের হানা ও লুঠপাটে যারা লুকানো সম্পদ বের করে দেয়নি এমন তিনজন খুন হয়েছিল। আর যাদের শুধুমাত্র সম্পদ গেছে কিন্তু কোনো মানুষকে ধরে নিয়ে যায়নি তারা ভাগ্যবান। আবার নাগভূষণ বসু, ক্ষেমংকর সেন, দয়ালহরি চক্রবর্তীরা জঙ্গলে যায়নি আবার মগের হাতেও ধরা পড়েনি। এরা ধাত্রীনগরের স্বচ্ছল পরিবার। কিন্তু প্রতিরোধ কেউ করেনি বোবা ছাড়া। মগ যাদের স্পর্শ করেছিল, নিয়ে যায়নি তাদের অবস্থাও খুব একটা ভালো ছিল না। মগ লুণ্ঠিত বালক বালিকার পরিবারের লোকেরা এইসব ব্যাপারকে কালের নিয়ম বা প্রকৃতির নিয়ম বলেই মেনে নিয়েছিল। ক্ষেমংকর জানে মগে ধরা মানুষকে ফিরিয়ে আনা খুব কষ্টের আর আনলেও অনেক বিপত্তি আছে। তাই বিষ্ণুপ্রিয়র পরিবারের খবর নিতে গিয়েও তাকে একবার হোঁচট খেতে হয়েছে। উপন্যাসের একটি অংশে ক্ষেমংকর ও দয়ালহরির কথোপকথনে ইতিহাসের কিছু তথ্য উঠে এসেছে। দয়ালহরি বলেছিল—

> ভেবেছিলাম দিল্লির বাদশার রাজত্ব সুস্থিত হলে দুরাত্মা মগরা দমিত হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে তা হয়নি। বরং কীর্তিনারায়ণ, অনন্তমাণিক্যর রাজত্বে এদেশের মানুষ যে পরিমাণ সুখে শান্তিতে কাটাত, দিল্লির বাদশাহের আমলে তার ছিটেফোঁটাও আর অবশিষ্ট নেই। দুরাত্মা মগ ও ফিরিঙ্গিরা আমাদের দেশের ধনসম্পদ, এমনকি মানুষ পর্যন্ত লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছে, অথচ দিল্লির বাদশা সে ব্যাপারে যে আদৌ ভাবিত এমন মনে হচ্ছে না।[১৪]

ক্ষেমংকর এই কথার মৃদু প্রতিবাদ করে যুক্তি দেখিয়েছিল। দয়ালহরির কথা সম্পূর্ণ সত্যি নয়। কীর্তিনারায়ণ ও অনন্তমাণিক্যের সময় মগ ফিরিঙ্গিরা গ্রাম লুঠ করেছিল আর এই দুই রাজা একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মগের সাহায্য নিয়েছে। মগদের দৌরাত্ম এদেশে শুরু হয়েছে গৌড়ের রাজা হোসেন শাহের আমল থেকে। একথা সত্যি সুবা রাজারা একে অপরকে প্রতিহত করতে গিয়েই মগদের সাহায্য নিয়ে মগদের আরও শক্তিশালী করেছিল। সার্বিকভাবে কেউ ভাবেনি সমস্যাটাকে, নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়েই বিপত্তি ঘটিয়েছে। ক্ষেমংকর মগদের উৎপত্তি ও প্রতিপত্তি সম্পর্কে বলেছিল—

> যদি কাউকে নির্দিষ্টভাবে দোষী করতেই হয়, তবে বলব যে বঙ্গোপসাগরে পশ্চিম থেকে আসা ফিরিঙ্গিদের একাংশই এ ব্যাপারে সবথেকে অধিক এবং প্রাথমিকভাবে দোষী। এইসব মানুষের মধ্যে দুর্বৃত্ত স্বভাবের মানুষ এবং দেশ-দেশান্তর থেকে তাড়া খাওয়া, বিতাড়িত অপরাধীরা প্রথমে আমাদের সমুদ্রে উপস্থিত হয়ে এই দৌরাত্ম শুরু করেছে। পড়ে মগদের প্রশিক্ষণ দিয়ে এই ঘৃণ্য কাজে তাদের নিযুক্ত করেছে। দিল্লির বাদশা এবং মগদের রাজার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সন্দেহ বেড়ে যাওয়ার ফলে এই দৌরাত্ম্য বিভিন্ন রাজকীয় কর্তৃত্বের কাছ থেকে উৎসাহও পাচ্ছে।[১৫]

উপন্যাসে ক্ষেমংকর একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক এবং সৎ আদর্শবান নিরপেক্ষ ব্যক্তি। তার এই যুক্তি ও ইতিহাসবোধ সমাজ ও ইতিহাস থেকেই পেয়েছিল। অভিজিৎ সেন তাঁর অনেক উপন্যাসে এমন একজন চরিত্র রূপায়ণ করেছেন তবে তাদের সাধ্য সামাজিক ও রাজনৈতিক সীমায় বাঁধা ছিল। আদর্শবান হয়ে অসাধ্য সাধন করেনি। সবলতা দুর্বলতা নিয়ে একনিষ্ট কর্মীর মতো কাজ করে গেছে। যেমন *ছায়ার পাখি* (১৯৯৩) উপন্যাসের গোপাল এই উপন্যাসের ক্ষেমংকর তেমনই।

পোর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ডাচ প্রভৃতি বিদেশি জাতিগুলো ব্যাবসার ক্ষেত্রে দেশীয় রাজনীতিতে অংশ নেওয়ার জন্য একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করত। তাই মগ রাজা ও পোর্তুগিজদের সঙ্গে বিরোধে মোগলরা ডাচদের সাহায্য পেয়েছিল। মোগলদের সঙ্গে মগরা পরাজিত হলে প্রায় কুড়ি হাজার দাস আরাকান থেকে পালিয়ে আসার সুযোগ পেয়েছিল। এই ঘাটতি পূরণ করতে মগরা পাগলের মতো আক্রমণ করতে থাকে। যেভাবে হোক পিপলি বন্দরে দাসের যোগান দিতে হবে। আর মুক্তিপণ হিসাবে অনেক অর্থ পেতে হবে। সুবর্ণরেখা নদীর মুখে পিপলি বন্দর, পোর্তুগিজরাই এই বন্দরের পত্তন করেছিল দাস ব্যাবসার জন্য। হুগলিতেও পোর্তুগিজরা দাস ব্যাবসার কেন্দ্র করেছিল। মগ ও পোর্তুগিজরা

প্রকাশ্যেই এই ব্যাবসা গড়ে তুলেছিল। সম্রাট সাজাহান এভাবে পশুর মতো মানুষের বেচা-কেনাকে মেনে নেয়নি। ১৬৩২ সালে মোগল পোর্তুগিজদের ব্যান্ডেলের দাসবাজারে কামান দেগেছিল। কিন্তু ব্যান্ডেল ছাড়াও পোর্তুগিজদের দাস বাজার ছিল, দস্যুরা সুবর্ণরেখার মুখে এসে নোঙর করে, ক্রেতাদের দূতের মাধ্যমে পিপলিতে উপস্থিত হতে বলেছিল। গনজালেসের পতনের পর দিলাল খাঁ সন্দ্বীপের দখল নিয়েছিল, মোগল নওয়ারা একেও বিতারিত করেছিল। মোগল নওয়ারা কর্ণফুলিতে মগের একশো পঁয়ত্রিশটা রণতরী আটক করেছিল। প্রচুর মগ মারা গেল বাকিরা প্রাণের দায়ে পালিয়ে বাঁচল। সুবেদার নবাব শায়েস্তা খানের পুত্র উমেদ খানের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম থেকে মগদের বিতাড়িত করা হয়েছিল। বহুকাল পর চট্টগ্রাম আবার বাংলার শাসকের অধিকারে এসেছিল। এরপর দু-একটা বিচ্ছিন্ন আক্রমণে বাংলার উপকূল আরও কিছুদিন ভীত থাকল কিন্তু তারপর মৌসুমি বায়ুর প্রবাহে সমুদ্রের উপকূল অঞ্চলের মগদের বড়ো বড়ো অভিযান বন্ধ হয়ে গেল।

'মানুষের ধর্ম মানুষ থাকা আর সব বাইরের' আউলাকেশি দেছেলবা তাই মানুষ থাকতে চেয়েছিল। সে একজন মগস্পর্শিত নারী, সে 'মউগ্যা'। এক খ্রিস্টান আউলাকেশিকে কেনে এবং তার সুন্দর মুখের কারণে আর স্ত্রীকে খুশি করার জন্য আউলাকেশিকে বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিল। সেখানেই আউলাকেশি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল। তারপর সম্পূর্ণ নতুন জীবন পেয়েছিল। অর্থাৎ সে মানুষ থাকতে পেরেছে। পুনরায় হিন্দু সমাজে ফিরে আসতে তাকে মৃত্যুসম প্রায়শ্চিত্য করতে হয়নি। মগ স্পর্শিত হিন্দু নারীরা নিজ ধর্মে থাকতে চেয়েছে কিন্তু হিন্দু সমাজ তাদের গ্রহণ করেনি। ষোড়শ সপ্তদশ শতকে হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় খাদ্য, শুচি-অশুচি ব্যাপারগুলো ভীষণভাবে ছিল। অভিজিৎ সেন *মৌসুমি সমুদ্রের উপকূল* উপন্যাসে ষোড়শ-অষ্টাদশ শতকের ইতিহাসের সেই বিশেষ পর্ব, বাংলার উপকূলে মগ দস্যু ও পোর্তুগিজদের দৌরাত্বের কথা বলতে বসেছিলেন, সেই সুবাদে তৎকালীন সমাজের ইতিহাস যেভাবে উঠে এসেছে তা আলাদা ইতিবৃত্ত রচনা করেছে।

অভিজিৎ সেন উপন্যাসে সেই সমাজের কথা বলেছেন যে সমাজের বৈষ্ণব মাংসাশী নয় ঠিকই কিন্তু আনন্দ করে মাছ খেত। শক্তির দেবী কালীর পুজো করতে পারে না শাস্ত্র নিষিদ্ধ করেছে বলে কিন্তু কালীর খুঞ্চা দিত। যে সমাজে আইন তৈরি করত উচ্চবর্ণরা।

সমস্ত শৃঙ্খলা বিধি-বিধান উচ্চবর্ণের হাতে আর ধর্মের ধ্বজাধারীরা খুব কড়া হাতে সামলেছে, পান থেকে চুন খসলে গেল গেল রব তুলত। আসলে—

> শতাধিক বছর আগে রঘুনন্দর নতুন করে কিছু বিধান হিন্দুসমাজের উপর চাপিয়েছে বটে কিন্তু সে সব যত না মর্মান্তিক হয়েছে, তার থেকে কুলপঞ্জিকাকারগণের প্রতিষ্ঠিত নিত্য নতুন নিয়ম, প্রথা, অহংকারের, মিথ্যা কুলরীতি সমাজকে ক্রমশ সংকুচিত করে ফেলেছে।[১৬]

কঠোর নিয়ম আর ছুৎমার্গিতার কারণে ধর্ম যে সংকটের মুখে সে খেয়াল সমাজপতিদের ছিল না। নিম্নবিত্ত সমাজ থেকে অনেক মানুষ সেদিন অন্যধর্মে আশ্রয় খুঁজেছিল। কৌলীন্য প্রথাকে আশ্রয় করে কুলীনরা ব্যাবসা শুরু করেই দিয়েছিল একপ্রকার। শোনা যায় একজন কুলীন শতাধিক বিয়ে করে কূল রক্ষা করত। আবার বারো বছরের কুলীন পাত্র পনেরোটি কুলীন কন্যার কূল রক্ষা করেছিল যাদের মধ্যে দু-তিন জন তার মায়ের বয়সী। এসবের সঙ্গে মিলিয়ে আরও মজার গল্প লোকের মুখে ফিরত।

সতীদাহের আগুনে অসংখ্য বাল-বিধবার ভবিষ্যৎকেই ছাই করে দেওয়ার মতো কুৎসিত ব্যাপারকে সমাজপতিরা লালন করে রেখেছিল। বৃদ্ধ স্বামীর মরদেহর সঙ্গে জীবন্ত কিশোরী স্ত্রীর দাহ দ্বারা স্ত্রীর সতী তকমা লাভ এবং সতীর আত্মীয় পরিজন বাবা-মা চোখের সামনে জ্বলতে দেখত নিজেদের কন্যাকে। এমন বীভৎস ঘটনাকে মানুষের আবেগ আর ধর্মের প্রলেপে মহৎ ঘোষণা করা হত। বিয়ের ঘটক ত্রিপুরা, যে হুগলি, তমলুক, পিপলির দাসবাজারে মগ, পোর্তুগিজদের থেকে মেয়েদের কিনে তারপর বিয়ের বাজারে বেচে দিত। এই ত্রিপুরার বন্ধু প্রমথ এখন তার কৌলীন্য হারিয়েছে একসময় সে কুলীনের বংশ ছিল। তার ছয় মা, সাতাশজন বোন ও এগারো পিসির পরিণতি সে দেখেছিল। ত্রিপুরার বন্ধু প্রমথনাথের মনে পড়ে বন্ধু ত্রিপুরার দুই দিদি, দুই পিসির কথা, ব্রাহ্মণের মন্ত্রোচারণের সঙ্গে উলুধ্বনি, শঙ্খঘন্টা, ধান-দুর্বা এসবের মাঝে তাদের চিতা দাউ দাউ করে জ্বলেছিল। সে যেন নরকের আগুন—

> সেই নরকের আগুনে এক জরাজীর্ণ মৃতদেহের সঙ্গে জীবন্ত দগ্ধ হবে আরও ছ-জন স্ত্রীলোক। এই ছ-জনের মধ্যে তিনজনই যুবতি! তারপর সেই আগুনে ওষুধ প্রয়োগে নেশাগ্রস্ত স্ত্রীলকদের ঠেসে ধরে পোড়ানো, পলায়নপর দেহকে বাঁশ দিয়ে বাড়ি মেরে ফের আগুনে ফেলা এবং ঠেসে ধরে রাখা যতক্ষণ না পর্যন্ত তার শরীরের আক্ষেপ স্তিমিত হয়।[১৭]

সতীদাহের মতো ভয়ানক প্রথা যেমন সমাজপতিরা লালন করে রেখেছিল আবার একান্ত বিপর্যয় যেমন বাঘে ধরা বা কুমিরে নিয়ে যাওয়া পরিবারকে ব্যাঘ্রদোষ বা কুমিরদোষে সারাজীবন বংশপরম্পরায় সমাজের গ্লানি ভোগ করে যেতে হত। ফলে এই পরিবারে সম্পর্ক করতে চাইত না অনেকেই। বিবাহের মতো শুভ কাজে এই দুষ্ট পরিবারকে হয়রানি হতে হত। উপন্যাসের সবথেকে ট্র্যাজিক চরিত্র বিষ্ণুপ্রিয়র পরিবার ছিল কুমীরদোষে দুষ্ট, চারপুরুষ ধরে তাই শুনে এসেছে বিষ্ণুপ্রিয়। তাই তার মেয়ের বিয়ে দিতে অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। হিন্দু রক্ষণশীলতাকে ব্রাহ্মণ যক্ষের মতো আগলে রাখতে চেয়েছে। একদিকে মগ, পোর্তুগিজরা যেমন তুলে নিয়ে গিয়ে হিন্দুর জাত মেরেছে আবার ব্রাহ্মণরা রক্ষণশীলতা দিয়ে পরোক্ষে হিন্দুর জাত মেরেছে। যবনের খাবারের গন্ধে হিন্দুত্ব নষ্ট হয়ে যেত, একঘরে নিদেন, দুষ্ট অপবাদ, প্রায়শ্চিত্যের কঠিনতা এসবে মানুষ বিতশ্রদ্ধ হয়ে অন্য ধর্মের আশ্রয় নিয়েছিল। আউলাকেশির সেই কথাটা মূল মন্ত্রের মতো, বেঁচে থাকাটাই মানুষের ধর্ম। দয়াল চক্রবর্তীর মতো ব্রাহ্মণ কুলীন একাধিক পত্নীর অধিকারী ছিল, কূলের অধিপতি এরা, সমাজ তৈরি করেছিল এরাই, এদের অঙ্গুলিহেলনে মানুষ বাঁচে-মরে। তাই তো অভিজিৎ সেন লিখেছিলেন—

> ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজ রাজশক্তির থেকে অধিক শক্তিশালী। দিল্লির বাদশার ক্ষমতা নেই হিন্দুর, বিশেষ করে ব্রাহ্মণের সামাজিক কতৃত্বকে শাসন কিংবা অস্বীকার করে।[১৮]

অ্যাবরেনানশিয়াসের মতো খ্রিস্টিয় যাজকরা মনে করত ভারতকে যত তাড়াতাড়ি খ্রিস্টিয় আওতায় আনা যায় ততই মঙ্গল এই দেশটার। একদল মানুষকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করতে গিয়ে পাদরি হিন্দু-মুসলমান আলাদা হয়ে দাঁড়াতে বললে দেখা গিয়েছিল তিনভাগের দু-ভাগ হিন্দু। এর মধ্যে এক ব্রাহ্মণ তরুণ যে যবনস্পর্শ খাদ্য খেয়ে জাত খুইয়েছিল, সে জানে জাত গেলে হিন্দুর আর কিছুই থাকে না, তাই নতুন ধর্মে আশ্রয় নিতে এসেছিল। প্রায়শ্চিত্য করে স্বধর্মে ফিরে যেতে চায়নি। কারণ সে এটাও জানত—

> হিন্দু প্রায়শ্চিত্যের বিধান বড়ো ভয়ংকর। বহুক্ষেত্রে প্রাণ পর্যন্ত চলে যায়। প্রায়শ্চিত্য ধর্ম মানলেও সমাজ মানবে না। চিহ্নিত করে রাখবে বংশপরম্পরায়। জাত সমাজের সম্পত্তি, ধর্মের নয়।[১৯]

অন্য ধর্মের প্রতি প্রবল ঘৃণার ফলে নিজের ধর্মকেই ক্রমশ ক্ষয়ক্ষতির দিকে এগিয়ে দিয়েছিল সমাজপতিরা। ধর্ম পাকা ফল নয় যে পচে নষ্ট হবে কিন্তু অতি রক্ষণশীলতার

কারণে মানুষ নিজের ধর্মেই ঠাঁই পাচ্ছিল না। জোরপূর্বক ধর্মান্তর তো ছিলই, নিজের ইচ্ছায় ধর্ম পরিবর্তন কম হত না।

স্থবির ধর্ষকাম সমাজের বিরুদ্ধে ক্ষেমংকর অন্তত কিছুটা লড়াই করতে পেরেছিল। উপন্যাসে যুক্তিবাদী, সচেতন ডাক্তার ছিল ক্ষেমংকর। সে লড়াই করেছে ঠিকই তবে তাকে অনেক দাম দিতে হয়েছিল। মগের নিয়ে যাওয়া মানুষগুলিকে মুক্তিপণ দিয়ে পাবার আশায় ক্ষেমংকর পদক্ষেপ নিয়েছিল, তাতে বাধাও আসে, রত্নেশ্বর বলেছে—

> ধর্ম নষ্ট হয়ে জাত নষ্ট হয়ে আমাদের পুরো পরিবারটাই শেষ পর্যন্ত মগুয়া-ব্রাহ্মণ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে বংশ পরম্পরায় অভিশাপ বহন করবে? না ক্ষেমংকর, আমরা এমন অনাচার হতে দিতে পারি না।[২০]

বিষ্ণুপ্রিয়র পরিবার থেকে এমন যুক্তি এসেছিল, সমাজের ভয়ে মানুষ নিজের মনকে মানিয়ে নিয়েছিল, স্নেহ, প্রেম, ভালোবসাকে বিসর্জন দিয়ে, হৃদয়কে পাথর করেছিল। বিষ্ণুপ্রিয় তার স্ত্রী ও দুই কন্যাকে হারিয়ে স্থবির হয়ে গেছে সেও দৃঢ়ভাবে বলতে পারে না, সে তার পরিবারকে ফিরিয়ে নেবে। এই পরিস্থিতিতে ইসলাম যে গ্রহণ করতে জানে এটা প্রমাণ হয়েছিল। সাদাত আলি এগিয়ে এসেছিল আশ্রয় দিতে, সে জানে হিন্দু সমাজ এই মেয়েদের আশ্রয় দেবে না। সাদাত নিজেও হিন্দু ছিল, এখন সে মনে করেছে মুসলমান হয়ে তার জীবন অনেক সহজ হয়ে গেছে, এখানে ধর্মীয় কারণ নয় সাদাত মানবিক কারণে আশ্রয় দিতে চেয়েছিল। বিষ্ণুপ্রিয়র মেয়ের সঙ্গে তার ছেলের বিয়ে দিতে চেয়েছিল, অনেক ছোটো থেকেই বিষ্ণুপ্রিয়র মেয়েদের স্নেহ করত সে। ক্ষেমংকর সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদটা করেই ফেলেছিল, কোনো তোয়াক্কা না করেই নিজের সিদ্ধান্তে অটল থেকেছে। কিন্তু জিতু ও দয়াল চক্রবর্তীর মতো সমাজের প্রহরীরা 'সনাতন ধর্মের আদর্শে সমাজকে রক্ষা করা সমাজপতিদের কর্তব্য' বলে বিবেচনা করেছিল। ক্ষেমংকর, দয়াল ও জিতুকে মানবিকভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেছে, মগস্পর্শিতরা আমাদের স্বজন হলে আমরা বর্জন করতে পারতাম না, তারা যাবে কোথায় ইত্যাদি। এসব কিছুই সমাজপতিদের কানে প্রবেশ করেনি, স্পষ্ট বলে দিয়েছিল তাদেরকে নির্মমভাবে ত্যাগ করতে হবে। হিন্দু ধর্মের রক্ষণশীলতা জাতকে অনেক ঠুনকো করে দিয়েছিল, তাই তো শুনতে হয়েছে—

> হিন্দুর মতো এমন জাতখেপা কেউ আর কোথাও দেখেনি। ওরা নিজেরাই কখনো-কখনো খেপে গিয়ে দলবেঁধে মুসলমান হয়।[২১]

একথা একেবারেই সত্য, দলবেঁধে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে দয়ালের মতো সমাজপতিদের অত্যাচারে। পৃথিবীতে নিঃশ্বাসের বাতাস যদি হিন্দু-মুসলমানের জন্য আলাদা করা যেত এরা তাই করত। ক্ষেমংকর তার ব্যাখ্যায় বলেছিল সমাজপতিদের জন্য হিন্দু ধর্ম ভাঙনের মুখে, মুসলমান বেড়ে কীভাবে হিন্দু-মুসলমানের অনুপাত সমান হচ্ছিল ক্রমশ। বল প্রয়োগ নয়, কট্টর হিন্দুর অবজ্ঞা যে পরবর্তীতে এই অনুপাত সমান করবে তা বুঝিয়েছে। মানুষ বাধ্য হয়ে নিজের ধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্মকে সহজেই মেনে নিয়েছিল, 'কাষ্ঠহিন্দু' ও গোঁড়া মোল্লার কারণে। ব্রাহ্মণের সঙ্গে ক্ষেমংকরের বিরোধ চরমে উঠেছিল, শাস্ত্র ন্যায় নীতি মানবিকতা কিছুই টলাতে পারেনি ব্রাহ্মণের আজন্মলালিত ব্রাহ্মণত্বকে। যে ব্রাহ্মণত্ব সদাশিবের মাকে তপ্ত ঘি পানের প্রায়শ্চিত্য বিধান দিয়েছিল, অথবা সদাশিবকে মাতৃত্যাগ করতে বলেছিল। কারণ ঘোর বিপদে মুসলমান তাদের আশ্রয় দিয়েছিল। সদাশিব এসব কিছুই করেনি মাকে নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ব্যক্তি, পরিবার, শাস্ত্র নয় 'ব্রাহ্মণ্য অহংকার শুধু নিজেকেই স্ফীত; শুধু নিজেকেই তৃপ্ত দেখতে চায়'। তাই প্রায়শ্চিত্য বিধানে প্রতিশোধ স্পৃহা বা অর্থের বিনিময় ব্যাপারগুলো এসেছিল। যেভাবে সদাশিবের ক্ষেত্রে প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল কারণ সদাশিব শাস্ত্রজ্ঞ তাই যুক্তি বুদ্ধি দেখিয়েছিল। ব্রাহ্মণ দয়াল সদাশিবের ভাইয়ের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিতে চেয়ে পারেনি। ক্ষেমংকরের বিরুদ্ধেও এসেছে তার সবথেকে দুর্বল জায়গায় আঘাত। ক্ষেমংকরের পিতা-মাতা প্রমথ-মাধবীলতা ব্রাহ্মণের প্রায়শ্চিত্যের মধ্য দিয়েই সমাজে ঠাঁই করে নিয়েছিল। ক্ষেমংকর বুঝতে পেরেছিল—

> বিগত পাঁচশো বছর ধরে হিন্দু সমাজ যেন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। একই স্মৃতি, একই অনুশাসনের অধীন। সেই অনুশাসন যে কখন সমগ্র সমাজকে কঠিন নিগড়ে বেঁধে ফেলেছে, সে ব্যাপারে কারো কোনো যেন ভ্রূক্ষেপ নেই।[২২]

ক্ষেমংকর সমাজপতিদের সঙ্গে লড়াই করেই এসেছিল, তাকে কেউ চেষ্টা করেও বাধা দিয়ে ধরে রাখতে পারেনি। কারণ সে সমাজের গোড়ার অসুখটা আবিষ্কার করে ফেলেছিল। এরপর তার দ্বিতীয় লড়াই ছিল বিষ্ণুপ্রিয়র পরিবারকে নিয়ে, তাদের জীবন্ত পেয়েছিল সে। ইতিমধ্যে গ্রামে ঘোষণা হয়ে গিয়েছিল উদ্ধার হওয়া ও উদ্ধার করতে যাওয়া সকলেই হিন্দু ধর্ম থেকে বহিষ্কৃত। অনেকেই মসজিদে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ক্ষেমংকর বিষ্ণুপ্রিয়র

স্ত্রী সত্যভামা, কন্যা শর্মিষ্ঠা, মঞ্জরীর শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা করতে শুরু করেছিল, কিন্তু সত্যভামা নিজেকে সন্তানসম্ভবা বুঝতে পেরে আত্মহত্যা করে নিষ্কৃতি পেয়েছে। 'সমাজ, পরিবার এবং নিজের হাত থেকে রেহাই হল তার'। ক্ষেমংকরের দুটি মানসিক পরিবর্তন হয়েছিল, বন্ধুকন্যা শর্মিষ্ঠাকে বিয়ে করেছিল, মহম্মদ নাসির হয়ে, শর্মিষ্ঠা হল সায়েমা বিবি। অবশেষে সমাজের আগল টপকে বিষ্ণুপ্রিয় এসেছিল তার মেয়েদের সঙ্গে দেখা করতে, তার মেয়েরা বাবা সম্বোধনে কথাও বলেছিল। সে দেখেছিল হিন্দু তার স্ত্রী-কন্যাকে কষ্ট যন্ত্রণা দিয়েছে আর ক্ষেমংকর তার মানবধর্ম দিয়ে সুখ দিয়েছে। মহম্মদ নাসিরের কাছে এই জিজ্ঞাসার সমাধান আসে না, ভাবতে থাকে কে বেশি কাকে ঘৃণা করে নাসির ক্ষেমংকরকে নাকি ক্ষেমংকর নাসিরকে।

খ। *রাজপাট ধর্মপাট*

আজ ছশো বছর পরেও শ্রীচৈতন্যদেবের দিব্যচরিত্রের আলো কিছুমাত্র কমেনি, হয়তো জগৎ সংসারের অন্তিমকাল পর্যন্ত তা থাকবে। তবে তাঁকে দেখার আলোর রঙ পরিবর্তিত হয়েছিল বার বার। কৃষ্ণচরণে নিবেদিত প্রাণ গৌরাঙ্গ ধর্ম-জাতি-বর্ণের ঊর্ধ্বে প্রেমধর্ম আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন, কৃষ্ণনামের মধ্য দিয়ে পাপী তাপী আচণ্ডালে কোল দিতে চেয়েছিলেন। রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তি শ্রীচৈতন্যদেবের নবধর্মের ডাকে সাড়া দিয়ে হাজার হাজার মানুষ সেদিন শান্তির পথ খুঁজেছিল, সেই চৈতন্যদেবকে চিরকাল মানুষ জেনে এসেছে প্রেমের ঠাকুর হিসাবে। জীবনীসাহিত্যে চৈতন্যদেবের আধ্যাত্মিক পরিচয় বিধৃত হয়েছিল কিন্তু একালের সাহিত্যিকেরা চৈতন্যদেবকে রাজনৈতিক, পারিবারিক প্রেক্ষিতে নতুন পরিচয়ে তুলে এনেছেন। সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮), শৈবাল মিত্র, সাধন চট্টোপাধ্যায় (১৯৪৪), রূপক সাহার (১৯৪৯) মতো অভিজিৎ সেন চৈতন্যদেবকে একটি সম্পূর্ণ অপরিচিত প্রেক্ষাপটে এনে হাজির করেছেন। একদিকে তিনি যেমন প্রেমধর্মের বিস্তার করছিলেন অন্যদিকে তাঁকে কেন্দ্র করেই একসময় বাংলার রাজধানী গৌড়ে তিনশো বছরের মুসলিম শাসনের ইতিহাসে ব্রাহ্মণ রাজার স্বপ্ন ও চক্রান্ত রচনা হয়েছিল। তাঁকে কেন্দ্র করেই রাজনৈতিক, ধর্মীয় চাপান-উতর, রাজার সিংহাসন হারাবার দুশ্চিন্তা আন্দোলিত হয়েছিল। এসব যে চৈতন্যদেবের অগোচর ছিল তা নয়, রাজনৈতিকভাবে সচেতন গৌরাঙ্গ প্রজ্ঞা, বিচারবোধ, জিজ্ঞাসা দিয়ে সবই গোচরে এনেছিলেন। গৌড়ে গৌরাঙ্গের সাত দিনের অবস্থানে যেভাবে ধর্মীয় রাজনৈতিক পরিবেশ পরিস্থিতি ঘুরপাক খেয়েছিল। অভিজিৎ সেন

তাঁর *রাজপাট ধর্মপাট* (২০০৮) উপন্যাসে চৈতন্যদেবকে নিয়ে এমনই এক আখ্যান নির্মাণ করেছিলেন। এই উপন্যাসে মধ্যযুগের ইতিহাস ও ধর্মনায়ককে কেন্দ্র করে নতুনপাঠ রচনা করেছেন লেখক। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আধুনিক বিচারবোধ ও বিশ্লেষণ দিয়ে সাহিত্যে গৌড় ও গৌরাঙ্গের প্রায় অনালোকিত ক্ষেত্রে আলোকপাত করেছেন অভিজিৎ সেন।

১৫১০ সালে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন এবং ১৫১৫ সালে গৌড়ে গিয়েছিলেন চৈতন্যদেব। সমাজে তখন ব্রাহ্মণতন্ত্র বেশ জাঁকিয়ে বসেছিল। মজ্জাগত সংস্কারী, ঘুষখোর ব্রাহ্মণের বিধানই সমাজের নীতি নির্ধারণ করত। বেদ নির্ধারিত বর্ণভেদ সমাজে একটি ধর্মের মধ্যে বিভেদ তৈরি করেছিল। হিন্দুধর্ম যা চেয়েছিল চৈতন্যদেব প্রচারিত নতুন ধর্ম অর্থাৎ প্রেমধর্ম তা চায়নি। তাই এই চতুর্বর্ণের ভেদ চৈতন্যদেব মেনে নিতে পারেননি। তাঁর প্রেমধর্মে এইসব ভেদ নেই, চণ্ডাল, পাপী, তাপী, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, নারী, পুরুষ সবার স্থান ছিল। তিনি কৃষ্ণনামের মালায় সকলকে গ্রন্থিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি এইসব ধ্বজাধারী ব্রাহ্মণদের মানতেন না শুধু তাই নয়, বেদেও বিশ্বাসী ছিলেন না—

> আমি সেই কারণেই বেদবিরোধী এই নব্যপন্থার সন্ধান করেছি। ধর্ম ও সমাজকে আচারসর্বস্বতার পথ পরিবর্তন করে ভক্তি ও প্রেমের, শুধু ভক্তি ও প্রেমের সম্পর্ককেই গুরুত্ব দিতে হবে। জাতপাতের ক্ষুদ্র গণ্ডিকে অতিক্রম করে যেতে হবে আমাদের। ...ব্রাহ্মণতন্ত্রের কদাচার থেকে সমাজকে রক্ষা করতেই হবে। আপনারা আমার সহায় হলে আমরা সমগ্র দেশ জুড়ে একটা প্রবল আন্দোলন তৈরি করতে পারব, যা অবশেষে ধর্ম এবং সমাজ উভয়কেই বাঁচাবে।[২৩]

এক্ষেত্রে চৈতন্যদেবকে গোঁড়ারা নাস্তিক বলতেন কারণ হিন্দু ধর্মে হিন্দু আচার বিচারে নয়, বেদে অবিশ্বাসী নাস্তিক। এইজন্য নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ সমাজে চৈতন্যদেব ও চৈতন্যপন্থীদের 'পাষণ্ডী' বলা হত।

চৈতন্যদেব গৌড় আগমনকালে গৌড়ের সিংহাসনে ছিলেন রাজা হোসেন শাহ। এই সময় বাংলায় ধর্ম বলতে সনাতন হিন্দুধর্ম, নব্য প্রসারিত ইসলাম ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম। উপন্যাসেও এই তিন ধর্মের কথা আছে। হিন্দুধর্মে ব্রাহ্মণ নির্দেশিত মার্গের পাপ-পুণ্যের গোলক ধাঁধা। গৌড়ের তিনশো বছরের ইতিহাসে একমাত্র হিন্দু রাজা গণেশের পুত্র যদুকে গণেশ নিজেই ইসলামে দীক্ষিত করেছিল ইব্রাহিম শর্কীর হাত থেকে বাঁচতে ও নিজের ক্ষমতা ধরে রাখতে। ধর্ম পরিবর্তনের ফলে যদু হয়ে উঠেছিল জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহ। তারপর গণেশ তার হাত থেকে ক্ষমতা ফিরিয়ে নিয়ে ষোলোটি স্বর্ণগাভীর মুখগহ্বর দিয়ে

জালালুদ্দিনকে ঢুকিয়ে পায়ুগহ্বর দিয়ে যদুকে বের করেছিল। তবুও যদু ব্রাহ্মণ্য মতে পূর্বের যদু হয়ে উঠতে পারেনি, জালালুদ্দিন হয়েই ছিল। একসময় ভাই মহেন্দ্রকে সরিয়ে নিজে রাজা হয়ে গণেশের সুযোগ্য পুত্র হিসাবে মুসলমান সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল যদু। ধর্মও যুগের দাবি মেনে নিয়েছিল, ধর্মেরও বিবর্তন হয়েছিল, একথা বোধহয় ব্রাহ্মণতন্ত্রের শিরোমনি চূড়ামণিরা মানতে পারেনি।

চৈতন্যদেবের জন্মের পূর্বে ব্রাহ্মণ ও মুসলমানের মধ্যে বিবাদ তৈরি হয়েছিল, গুজব রটেছিল এক শক্তিমান পুরুষের আবির্ভাব হবে যিনি যবন অবসান করে রাজা হয়ে গৌড়ের সিংহাসনে বসবেন। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে ভক্তরা আশা করেছিল সমাজের উচ্চস্তরের ছুতমার্গীতা দূর হয়ে যাবে আর স্বার্থান্বেষীরা চেয়েছিল চৈতন্যদেবকে অবতার না করতে পারলে গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হবার স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে। কিন্তু সন্ন্যাসীর সিংহাসনের লোভ ও যশের মোহ ছিল না, ভক্তিতে মুক্তির পথ খুঁজেছিলেন চৈতন্যদেব। তাই গৌড়ের হিন্দু আমাত্যদের গোপন অভিলাষে সাড়া দেননি, সুগত, বিদ্যাবাচস্পতি, সার্বভৌমকে কোনো আশার আলো দেখাতে পারেননি চৈতন্যদেব। ব্রাহ্মণের জাত্যভিমান ছুৎমার্গীতার চোরা স্রোতকে ক্রমশ বেগবান করে তুলেছিল। গৌড় রাজসভার নগরাধিপতি সুবুদ্ধি রায় রাজসভা তথা সমগ্র গৌড়ে বিশেষ মর্যাদার দাবিদার ছিল। অর্থ প্রতিপত্তি ছিল তবুও ব্রাহ্মণ্য সংস্কারে অভিশপ্ত হয়েছিল তার জীবন। দুই কন্যার বিবাহ, এক কন্যার মুসলিম পাত্রে প্রেম, মুসলমানের সঙ্গে একত্রে পানাহারের ফলে তার পরবর্তী জীবন কাশীতে প্রায়শ্চিত্ত বিধানের পথ খুঁজেছিল। সারাজীবনের সম্পদ দিয়েও এই বিধান খুঁজে পায়নি সে। হিন্দুর এই রক্ষণশীলতা হোসেন শাহের কাছে উপহাসের সামগ্রী ছিল—

> যারা চোখে কম দেখে বা অন্ধ, হিন্দু তারাই থাকুক। চক্ষুষ্মানেরা হিন্দু থাকবে কোন্ দুঃখে।[২৪]

জাত-পাত, ধর্ম, মুক্তি, মোক্ষ, ইহকাল, পরকাল নিয়ে ধর্মের এই জাঁতাকলের কথা স্মরণ করে তা থেকে মুক্তির পথ বলেছিলেন চৈতন্যদেব। তাঁর কাছে বেদ, উপনিষদের মন্ত্র ছিল ‘হরেকৃষ্ণ’, প্রেমভক্তি সব ধর্মের সার কথা হোক এটাই তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল।

উড়িষ্যা ও ত্রিপুরা ছিল স্বাধীন হিন্দুরাজ্য, শুধু গৌড়ের হিন্দুরা যবনদের মাঝে জাত মান হারাতে হচ্ছিল, তাই বাচস্পতিসহ হিন্দুরা চেয়েছিল চৈতন্যদেবের হাত ধরে সনাতন হিন্দুধর্ম মাথা তুলে দাঁড়াক। কিন্তু চৈতন্যদেব শুধু প্রেম ও ভক্তির আশ্রয়ে ব্যক্তিবিশেষ ও

সম্প্রদায়গত ভেদ না রেখেই তাঁর নতুন ধর্ম নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন। চৈতন্যদেব জানতেন অবতার হলে রেহাই নেই কারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষা সীমাতীত। আকাঙ্ক্ষা পূরণ না হলে মানুষ ঈশ্বরকেও গালাগাল দিতে ছাড়ে না, এমনই ছিল তাঁর বিচারবোধ। মানুষ তাঁর প্রেমধর্মের আশ্রয়ে আসুক কিন্তু অবতার হতে তাঁর অস্বস্তি ছিল। তিনি মনে করেছিলেন—

> মুমূর্ষু ব্রাহ্মণ্য আচারসর্বস্ব, ক্রমশ স্থবির হওয়া সমাজের প্রগতি একেবারে চোরাবালিতে এনে ঠেকিয়েছে, সেখানে নতুন কিছু ভাবতে হবে। এই নতুন কিছু সমন্বয় ছাড়া আর কিছু হতে পারে না... [২৫]

গৌড়বঙ্গে ধর্মান্তরিত ও বহিরাগত মুসলমান বেড়েই চলেছিল। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে জোর করে ধর্মান্তরিত করার ব্যাপারটা একেবারেই মিথ্যা না হলেও সবসময় যে এমনটাই হয়েছিল তা নয়, কিছু মানুষ স্বেচ্ছায় ও স্বার্থে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। গণেশের রাজসভায় দরবেশ যেমন বলেছিল—

> লক্ষ লক্ষ গৌড়ীয় ইসলাম আলিঙ্গন করেছে এবং প্রতিদিনই করছে, সে ব্যাপারটা অস্ত্রের সাহায্যে হচ্ছে না![২৬]

দরবেশের এই কথার পূর্ণ প্রতিবাদ সম্রাট হয়েও করতে পারেনি গণেশ, কারণ ব্রাহ্মণ্যবাদ গণেশের অগোচর ছিল না। ব্রাহ্মণ নিজের জাতের মানুষকেই গোঁড়ামি দিয়ে পরোক্ষে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য করছিল। অন্যদিকে হোসেন শাহ দাবি করেছিল কেশবের কাছে—

> তোমাদের হিন্দুদের ওপর আমি কোনোরকম ধর্মীয় বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে কোন অন্যায় অত্যাচার করেছি?[২৭]

হোসেন শাহের এই কথা পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য ছিল না তবে সময়ের এই কালখন্ডে সমাজ সচেতন চৈতন্যদেব শুধু রামকেলিতে বসে ব্রাহ্মণ্য গোঁড়ামির কথা ভাবেননি এই বোধ ছিল তাঁর আজন্ম। 'ব্রাহ্মণ্য হচ্ছে সেই সাপ যে অনবরত নিজেকেই নিজে ছোবল মারে' বৈদিক মতে চতুর্বর্ণের মধ্যে নিম্নবর্গীয়দের প্রতিনিয়তই এই বিষাক্ত ছোবল খেতে হয়েছিল।

সুবুদ্ধি রায়ের ধর্মান্তরিত কন্যা মালতীর কাছে ধর্মীয় উপলব্ধি, বিচারবোধ, আদর্শ প্রকাশ করেছিলেন চৈতন্যদেব। ধর্মাচারণ শুধু উপাসনা ও সাধনার জন্য নয়, সৎচিন্তা,

সৎকর্ম, সদালোচনার মধ্য দিয়েই ঈশ্বরে ভক্তি জন্মায়, প্রেম জন্মায় এসবের মধ্যে দিয়েই ভক্ত হয়ে ওঠা যায় ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে যাওয়া যায়। মালতীর প্রশ্নের উত্তরে চৈতন্যদেবের বেদ ও ব্রাহ্মণের গোঁড়ামির বিরোধিতা ছিল স্পষ্ট—

> বেদে চতুর্বর্ণের ব্যবস্থা আছে। বৈদিক সমাজ চতুর্বর্ণাশ্রিতই ছিল। কয়েক হাজার বছর পরেও এই প্রথা আমাদের সমাজে এখনও বর্তমান। আমরা এই বর্ণবিভাগের বিরোধী। ব্রাহ্মণ্য কর্তৃত্বেরও বিরোধী আমরা। হরিভক্তিপরায়ন চণ্ডালও শ্রদ্ধেয়।[২৮]

পরলোক নয়, ইহলোকে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। কর্মফল তিনি মানতেন তবে সেটা ইহলৌকিক। সাত দিনের গৌড়বাস চৈতন্যদেবের জীবনে এবং গৌড়বাসীর জীবনে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় ছিল। প্রেমধর্মের রূপকার চৈতন্যদেবের আহ্বানে গৌড়প্রেমের প্লাবনে সেদিন ঘর ছেড়েছিল অনেকেই। আপামরে কোল দিতে তাঁর কার্পন্য ছিল না, সকলকেই এক ছত্রছায়ায় এনে গড়ে তুলেছিলেন একটি আনন্দ নিকেতন। তবে সেই সময়ের ধর্মীয় অনুশাসন এতটাই দুর্বল ছিল না, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি এত সহজে ছেড়ে দেয়নি নিমাইকে, আন্দোলনের মধ্য দিয়েই পথ চলতে হয়েছিল তাঁকে। এই আন্দোলনের ভীত দৃঢ় ছিল তাইতো নিমাইয়ের প্রেমের ডাকে রূপ, সনাতন গৌড়ের প্রাসাদ ছেড়ে, রাজরোষ উপেক্ষা করে, বন্দি দশা কাটিয়ে মহাপ্রভুর অনুসরণ নিয়েছিল, নবধর্ম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে।

চৈতন্যদেব বাঙালি তথা বাংলার এক ধর্মনেতা এটা ভাবলে একটু কম ভাবা হবে। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা তাঁর কোনো অংশে কম ছিল না। প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ব্যক্তি না হয়েও তাঁর সময়ের রাজনীতি সম্পর্কে তিনি সার্বিকভাবে জ্ঞাত ছিলেন। গৌড়ের রাজনৈতিক পালাবদলের ইতিহাস চিরকালই অস্থির, রাজার রক্তের দাগ মুছতে না মুছতেই সশস্ত্র নতুন রাজার অভিষেক হত সিংহাসনে। প্রাসাদরক্ষী থেকে মন্ত্রী লোভ আর ক্ষমতা দিয়ে যে কেউ রাজা হতে পারত। গৌড়ের সুলতানের ক্রমতালিকাটা একটু দেখে নেওয়া যাক—

> ফতেহ শাহকে খুন করে বারবাক, বারবাককে খুন করে মালিক আন্দিল, মালিক আন্দিলকে খুন করে তাঁর পুত্র কুৎবুদ্দিন মামুদ শাহ, কুতবুদ্দিন মামুদ শাহকে খুন করে শাহসুদ্দিন মুজাফফর শাহ এবং শাহসুদ্দিন মুজাফফর শাহকে খুন করে রাজা হলেন সৈয়দ হোসেন।[২৯]

গৌড়ে রাজকার্যের থেকেও সচেতন থাকা বেশি জরুরি কারণ গুপ্ত ঘাতক চারিদিকেই ছিল। গৌড় রাজসভার কাউকেই বিশ্বাস করা যেত না, রাজা হোসেন শাহ মৃত্যুভয়ে রাতে

প্রাসাদেও থাকত না। এমন পরিস্থিতিতে হঠাৎ করে আসা সন্ন্যাসী, লক্ষ লক্ষ হিন্দু যাঁর শরণাগত, আবার এদিকে প্রবাদ ছড়িয়েছিল 'গৌড়ে ব্রাক্ষণ রাজা হব হেন আছে/নিশ্চিন্তে না থাকিও প্রমাদ হব পাছে।' সবমিলিয়ে সুদক্ষ শাসক হোসেন শাহ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্র চৈতন্যদেবের পৃষ্টপোষক হলে হোসেন শাহের কপালে ভাঁজ পড়েছিল। গৌড় ও উড়িষ্যার শত্রুতার মাঝে চৈতন্যদেব গৌড়েশ্বরের কাছে আর এক সঙ্কট হয়ে গিয়েছিল। অবাক হয় হোসেন শাহ, যখন তার দুই মন্ত্রী দবির খাস ও সগির মালিকের আপ্যায়নে চৈতন্যদেব রামকেলিতে হাজার শিষ্য নিয়ে হরিনাম করছিলেন। আসলে পীর, সুফি দরবেশ এরাই সিংহাসন নিয়ন্ত্রণ করত তাই হোসেন শাহের আশঙ্কা বৃদ্ধি পেয়েছিল তবে 'হিন্দু সন্ন্যাসী বা সাধুপুরুষদের রাজ্যের শাসন পরিবর্তনে অংশগ্রহণ বা চক্রান্ত করার কথা শোনা যায়নি' এটাই আশার কথা। তবুও হোসেন শাহ চিন্তায় ডুবেছিল। গৌড়ের রাজনীতিতে চৈতন্যেদেবের প্রবেশ অজ্ঞাতে হলেও ক্রমে চৈতন্যদেব বুঝতে পেরেছিলেন তিনি গৌড়ের রাজনীতির মধ্যে প্রবেশ করেছেন।

গৌড় দরবারের হিন্দু আমাত্যদের মধ্যে যে পরিকল্পনা পূর্বে হয়েছিল চৈতন্যদেব তার অংশ ছিল। চৈতন্যদেব শুধু কি নিজের অজান্তে রাজনৈতিক আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন নাকি রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে চেয়েছিলেন। সারাদেশ জুড়ে প্রেমধর্মের প্রচার যদি তাঁর একান্ত উদ্দেশ্য তবে সনাতনকে কেন বলেছিলেন 'গৌড় রাজত্বের পূর্ব ইতিহাস এবং রাজনীতি আমি আর একটু বিস্তারিত বুঝতে চাই।' অর্থাৎ এমন নয় তিনি গৌড়ের রাজসভায় যুক্ত হবেন, তবে আঁচ বুঝতে চেয়েছিলেন। তাঁর গৌড়ে আসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিজেই বলেছিলেন—

> আমি রামকেলিতে তোমাদের দুজনের সঙ্গে মেলবার জন্যই এসেছি।[৩০]

কাতারে কাতারে লোক কৃষ্ণনামে মেতে উঠেছিল, রাজপথে কোলাহল, হোসেন শাহের উদ্বেগ বাড়িয়েছিল তাই সে জানতে চেয়েছে 'তোমাদের চৈতন্যের কাছে কী কারণে এত মানুষ ছুটে যাচ্ছে' গরীব পীর বা সন্ন্যাসীর কাছে মানুষ আলৌকিক শক্তির ফল পেতেই যায় কিন্তু চৈতন্যদেবের মধ্যে অলৌকিকতা কিছুই ছিল না তবে কী ব্রাহ্মণ রাজা গুজবে হোসেন শাহ বেশি ভাবিত হয়েছিল। কেশব ঠিকই ভেবেছিল—

দুজন অসম স্থানাধিকারীর মধ্যে, তা তারা বিদ্যায় হোক, বুদ্ধিতে হোক কিংবা ক্ষমতায় হোক, সত্যিকারের বোঝাপড়া কখনও হয় না।[৩১]

হোসেন শাহ জানত সন্ন্যাসী আলৌকিক শক্তি নিয়ে জনসংযোগ বাড়ালে কোনো চিন্তা নেই কিন্তু চৈতন্যদেব সাধারণ মানুষ নন এটাই তার কাছে চিন্তার ও সন্দেহের ছিল। গৌড়ের সেনাবল, রসদ, অস্ত্র বিষয়ে এবং হিন্দু পরিকল্পনা বিষয়ে চৈতন্যদেব বিস্তারিত জেনেছিলেন। সন্ন্যাসীর এসব জেনে কী দরকার এমনটা আপাতভাবে মনে হতে পারে। বিস্মিত হতে হয় 'কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদ সন্ন্যাসীর রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে বাস্তববোধ অভিজ্ঞতার পরিচয়' পেয়ে। গৌড়েশ্বর, চৈতন্যদেব ও তাঁর ভক্তমণ্ডলী, ব্রাহ্মণের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও গুজব নিয়ে যথেষ্ট ভাবিত ছিল। প্রথমাবস্থায় রূপ, সনাতনের বৈষ্ণবসংঘে যোগদান যে সমীচিন হবে না তা চৈতন্যদেবের মতো রাজনীতি সচেতন মানুষ জানতেন, তাই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সনাতনকে জানিয়েছিলেন 'এখনই চাকরি ছেড়ে গৌড় ছেড়ে আপনার যাওয়ার সময় হয়নি' আবার রূপকে বলেছিলেন 'অপেক্ষা করুন সময় হলেই আমি ডেকে নেব আপনাদের' গৌড়ের প্রধান দুই মন্ত্রীর বিয়োগ হোসেন শাহকে শুধু ভাবিত রাখবে নাকি পদক্ষেপ গ্রহণে আগ্রহী করবে তাও চৈতন্যদেব বুঝেছিলেন।

গৌড়ে ব্রাহ্মণের উচ্চাশা সম্পর্কে চৈতন্যদেবের বাস্তবতাবোধ বলেছে—

যারা এইসব চিন্তাভাবনা করছে কিংবা এ বিষয়ে অগ্রণী হয়ে গৌড় কিংবা নবদ্বীপের বিদগ্ধ হিন্দুদের সংগঠিত করার চেষ্টা করছে, তাদের সামনে কোনো স্থির লক্ষ্য নেই।[৩২]

তিনি তো ইসলামের উদারতা ও ভ্রাতৃত্ববোধকে আয়ত্ত করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন। আদর্শ বাঁচিয়ে উদারতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন 'অপর বিশ্বাসের ঈশ্বর বা শাস্ত্রের নিন্দা করবে না তেমনি বৈষ্ণবের নিন্দা কীর্তন শুনবে না'। অভিজিৎ সেন লিখেছিলেন—

পয়লা আষাঢ় গৌড়ের আকাশে বর্ষার মেঘ জমতে শুরু করল শেষ রাত থেকে। রাত পোহাতে আকাশে মেঘের ঘনত্ব বাড়তে শুরু করল।[৩৩]

দবির খাস, সগির মালিক রাজসভায় অনিয়মিত, হোসেন শাহের মনে প্রশ্ন 'কবে যাবেন সন্ন্যাসী?' রাজ্যের অপ্রীতিকর ঘটনাগুলি পরপর ব্যাখ্যার পর কেশবকে সরাসরি এসব অপ্রীতিকর ঘটনায় জবাবদিহি করতে বলেছিল। 'রাজা মহারাজা যে তাঁর পায়ের উপর শুয়ে থাকে' একথা জানত না হোসেন শাহ, জানার পর গৌড়ের রাজার মনের আকাশে মেঘ

পুঞ্জীভূত হয়েছে। চৈতন্যদেবের গৌড়ে আসার উদ্দেশ্য কী? রামকেলিতে কতদিন থাকবেন? দাবির খাস ও সগির মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ কতদিনের ইত্যাদি প্রশ্ন জেগেছে। চৈতন্যদেবের গরিমা ও খ্যাতির কাছে হোসেন শাহর ক্ষুরধার রাজনৈতিক বুদ্ধি কোথায় যেন পরাজিত হয়েছিল। একে একে রাজমন্ত্রীদের গোপনে চৈতন্য সাক্ষাৎ, হোসেন শাহের কৌতূহল, মানুষের মধ্যে স্বপ্নপূরণের উন্মাদনা সব মিলিয়ে গৌড়ে এবং রাজার মনের যে পরিস্থিতি হয়েছিল তা থেকে কেশবের সিদ্ধান্ত—

> ভগবানের আর রামকেলিতে থাকা সমীচিন নয়। জানিয়েছেন যে রাজা তাঁকে সম্মান করেন এবং যথার্থ মহাপুরুষ হিসাবে স্বীকারও করে নিয়েছেন কিন্তু রাজধানীর এত নিকটে এমন জনসংঘট্ট তাঁর সন্দেহের না হলেও, সুরক্ষার সমস্যা হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া সিংহাসনের চারপাশে চক্রান্ত তো সব সময়ই সক্রিয়। সবকিছু স্বাভাবিক থাকতে থাকতে প্রভুর এখন রামকেলি থেকে সরে যাওয়াই ভালো।[৩৪]

কিন্তু চৈতন্যদেব গৌড়ে ব্রাহ্মণদের জাগাতে আসেননি, নবদ্বীপের মতো গৌড়ের ব্রাহ্মণদের উচ্চাশাকে 'অবান্তর আকাঙ্ক্ষা' বলে মনে করছিলেন। গৌড়ের রাজা কে হবে তা নিয়ে কোনো চিন্তা ছিল না চৈতন্যদেবের—

> রাজ্য দখল বা রাজত্ব আমাদের কাজ নয় নিত্যানন্দ।... আমি অন্যভাবে এদেশের মানুষকে জাগাতে চাই। প্রেম ভক্তির সাধনায় যাবতীয় ভেদবুদ্ধি এবং বিদ্বেষকে নির্মূল করতে পারে।'[৩৫]

প্রেমভক্তির সাধনা শ্রেষ্ঠ সাধনা, এটাই চৈতন্যদেবের উদ্দেশ্য গৌড় আগমনের তাই নবধর্মের প্রচার করতে গিয়ে সামাজিক পরিস্থিতিকে বুঝে নেওয়ার দরকার ছিল।

ধর্ম যে একপ্রকার মাদক, রাজনীতিও তাতে আসক্ত প্রত্যক্ষ সামিল না হয়েও তা বুঝতে হয়েছিল চৈতন্যদেবকে। ইসলামের ভ্রাতৃভাব সনাতন হিন্দু ব্রাহ্মণ স্বীকার করেনা, ভেদ-বিভেদের ধর্মীয় রাজনীতি গায়ে না মেখেও কৃষ্ণনামের মধ্য দিয়ে উদ্দেশ্য সাধন করতে পেরেছিলেন চৈতন্যদেব। তিনি রাজনৈতিক সচেতন ছিলেন বলেই বন্দি সনাতনের পরিণতির কথা ভেবে অন্তর কেঁদে উঠেছিল, সনাতন তাঁর জন্যই কী বিপদগ্রস্ত এ ভাবনায় আত্মগ্লানিতে পড়েন তিনি। অন্যদিকে তিনি চাননি কৃষ্ণদাসী তমসা, যাকে কৃষ্ণভক্তি প্রচারের দায়িত্ব অর্পণ করবেন সে সুগত রায়ের সান্নিধ্যে থাকুক। শুধু সুগতর বিপজ্জনক কাজ নয়, চৈতন্যদেব জেনেছিলেন—

> কাঞ্চীদেশ জয় করার পর প্রতাপরুদ্রের আগ্রাসী মনোভাব বেড়েছে। প্রতাপরুদ্র গৌড় অধিকার করতে পারলে গৌড়ের সিংহাসনে সুগত করদভূপতি হিসাবে বসবে এমন পরিকল্পনাও হয়ে থাকতে পারে। সম্ভবত এই পরিকল্পনায় গৌড়ের বেশ কয়েকজন হিন্দু ও মুসলমান আমিরের সমর্থন আছে।[৩৬]

যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে চৈতন্যদেব গৌড় থেকে প্রস্থান করেছিলেন, সীমান্তপাড়ে পথ অতিক্রম হতে তাঁকে সাহায্য নিতে হয়েছিল। হোসেন শাহের যুদ্ধস্পৃহা ভয়ংকর, উড়িষ্যার সঙ্গে বিবাদ তার সিংহাসনে বসা থেকেই, এবার যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন হবে, তারই প্রস্তুতি ছিল চারিদিকে। চৈতন্যদেবের প্রথম নীলাচল ভ্রমণ উড়িষ্যা ও গৌড়ের যুদ্ধকালীন অবস্থায়। গৌড়ের সীমান্তরক্ষী তাঁকে গোপনে পার করে দিয়েছিল উড়িষ্যায়। উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রকে একসময় গৌড় আক্রমণে নিবৃত্ত করেছিলেন চৈতন্যদেব কারণ তিনি মনে করেছিলেন, যে কোনো যুদ্ধই আসলে ধ্বংস, মৃত্যুকে ডেকে আনে। তবে যে কোনো সময় হোসেন শাহ উড়িষ্যা আক্রমণ করতে পারে প্রতাপরুদ্রকে এমন সতর্কবার্তা দিয়েছিলেন চৈতন্যদেব। অন্যদিকে গৌড়ের হিন্দু আমাত্য, সুগত, বাচস্পতি চৈতন্যদেবকে স্বপ্ন পূরণের সহায়ক মনে করলেও চৈতন্যদেব এ বিষয়ে মন দেননি। বরং গৌড়ে হিন্দু শাসন বিষয়ে তাদের বুঝিয়েছিলেন—

> রাষ্ট্র ও সমাজ ঘোরতর ভেদবুদ্ধি দ্বারা আচ্ছন্ন, হিন্দু সমাজে কী উচ্চ, কী নিম্ন স্তর, সর্বত্রই যৌনাতিশয্য এবং ভোগলালসা, পঙ্গু ভঙ্গুর এক সামাজিক অবস্থা। দুর্বল, দৈন্যপীড়িত জাতি। চিন্তাভাবনা ধ্যান ধারণায় প্রাচীনপন্থী অদৃষ্টবাদী জ্যোতিষনির্ভর সমাজের সর্বস্তর।[৩৭]

রাজা, রাজ্য, ভোগ, সুখ এসব দিয়ে সন্ন্যাসীর লাভ নেই ঠিকই কিন্তু রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রতিটা মুহূর্তের ধারণা এবং বিশ্লেষণ সন্ন্যাসীর কাছে পাওয়া গিয়েছিল। প্রতাপরুদ্র ও বাংলার হিন্দু সমাজ চৈতন্যদেবের ব্যাপক প্রভাব কাজে লাগাতে চেয়েছিল, আধ্যাত্মিক ও রাষ্ট্রনৈতিক কোনো দিক থেকেই তাঁর এই নিঃস্পৃহ ভাব মেনে নিতে পারেনি এরা। অবশেষে চৈতন্যদেব ধরা দিয়েছিলেন প্রতাপরুদ্রের কাছে বাসুদেব সার্বভৌমর মাধ্যমে। একথা হোসেন শাহ জানত চৈতন্যদেবের রামকেলি আসার পূর্বে। চৈতন্যদেবকে নিয়ে তার উদ্বেগের এটাও যে কারণ ছিল না তা নয়। হোসেন শাহর সঙ্গে একবারও আলাপ বা বাক্যালাপ না হলেও হোসেন শাহ যেমন চৈতন্যদেবের প্রতি পদক্ষেপের হিসাব রাখত অন্যদিকে চৈতন্যদেব যে গৌড়ের রাজা, রাজসভা ও অন্যান্য বিষয়ে খোঁজ খবর নিতেন না

তা নয়। এমনকি গৌড় প্রস্থানের পর হোসেন শাহ যে তার পিছনে পিছনে উড়িষ্যা আক্রমণ করতে আসবে একথাও অবিদিত ছিল না তাঁর। তাই এমন পরিস্থিতিতে চৈতন্যদেব উড়িষ্যা থাকাও ঠিক মনে করেননি। বৃন্দাবন যাত্রার উদ্দেশ্য ত্যাগ করলেও উত্তর ভারতের তীর্থ দর্শনের পরিকল্পনা বজায় রেখে, উড়িষ্যার আকাশে যখন যুদ্ধের ভয়াবহতা তখনই উপযুক্ত সময় মনে করে বেরিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। নতুন করে বৃন্দাবন যাত্রার পরিকল্পনায় গৌড় থেকে মন উঠে গিয়েছিল এমন নয়, বিকর্ণর কাছে গৌড় সম্পর্কে উদাসীন থাকলেও গৌড়ের খবর যে তাঁর বেশি রাখা প্রয়োজন একথা নিজেও জানতেন। বিকর্ণর মুখে রূপ, সনাতনের অস্থিরতার খবর চৈতন্যদেবকে বিচলিত করেছিল। যদিও গৌড়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁর অজানা ছিল না। তাই সনাতনের বন্দিত্ব, রূপের গোপনে গৌড়ত্যাগ কোনোটাই অপ্রত্যাশিত ছিল না। রূপ ও সনাতনকে আহ্বান করে তাদের মধ্য দিয়ে দৃঢ় সংগঠন তৈরি করতে চেয়েছিলেন। গৌড়ের বিদ্রোহীরা বিকর্ণর মতোই উড়িষ্যার বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিতে চেয়েছিল, চৈতন্যদেবের রামকেলি যাওয়া, থাকা এবং ফিরে যাওয়া, অগনিত ভক্তের সাক্ষাৎ সব মিলিয়ে একটা ধর্মীয় রাজনৈতিক নাটকের পাঁচ পর্বের আকার ধারণ করেছে এই উপন্যাস। যদিও এসব থেকে চৈতন্যদেব বাইরে থাকতে চেয়েছিলেন কিন্তু কোথাও যেন জড়িয়েও গিয়েছিলেন।

গৌড়ে চৈতন্যদেবের উপস্থিতি এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি দুটো দিককে পরিচালিত করেছিল, একদিকে যেমন হোসেন শাহর কৌতুহল, উদ্বেগ দানা বেঁধেছিল অন্যদিকে সুগতর মতো অনেক হিন্দু সেদিন আশায় বুক বেঁধেছিল। মুসলমান শাসক উচ্ছেদ করতে দলবদ্ধ হয়েছিল, গৌড়ের প্রসাশনের হিন্দু আমাত্যদের মতো সুগতও চেয়েছিল হিন্দু রাজা হবে। কিন্তু সুগতর আশা, বিদ্যা বাচস্পতির পরিকল্পনা কোনোটাই আমল না দিয়ে সবার আকাঙ্ক্ষিত গৌড়ের সিংহাসন দখল ব্যাপারটা গৌণ করে ধর্মকেই মূখ্য করে তুলেছিলেন চৈতন্যদেব। অধ্যাপক সত্যবতী গিরি যথার্থ বলেছিলেন—

> ঔপন্যাসিক যে চৈতন্যকে আমাদের সামনে তুলে ধরলেন তিনি আমাদেরই শ্রীচৈতন্য। আজকের একবিংশ শতকের পটভূমিতে আমরা তাঁকে বাদ দিতে পারি না। বলা বাহুল্য রাজপাট নয়, ধর্মপাটই জয়ী হয়েছে এই উপন্যাসে।[৩৮]

পার্থিব উদ্দেশ্য যাঁর কিছুই ছিল না, পান্ডিত্যকে জলে ফেলে, নাম-যশ, খ্যাতির তোয়াক্কা না করে, স্ত্রী জননী ছেড়ে বৃন্দাবনের পথযাত্রী হয়েছিলেন চৈতন্যদেব। কৃষ্ণনামেই যাঁর অবিরাম অশ্রু ঝরেছে, ভাবে উন্মাদ এই সুকুমার দেহ বিশিষ্ট সন্ন্যাসীর কোনো দোষ বা কোনো গুণ নয়, গৌড়ের অধীশ্বর সংবেদনশীল, সুবিবেচক, দক্ষ রাজনীতিবিদ রাজা আলা-উদ্-দুনিয়া ওয়াদ-দীন আবুল-মুজাফফর হোসেন শাহ আসলে চৈতন্যদেবের রাজনৈতিক সত্তাকে উপলব্ধি করেছিল সন্দেহের বশে। চন্দনচর্চিত অপরূপ সন্ন্যাসী ধর্মপ্রাণ মুসলমান শাসক ও গৌড়ের রাজসভার ছন্নছাড়া ভাব বুঝতে চেয়েছিলেন শুধুমাত্র কৌতুহলে এমনটাও যে নয়, তা একটু ভাবলেই বোঝা যায়। হোসেন শাহ যে পদ্ধতিতে সিংহাসনে বসেছিল অর্থাৎ গৌড়ের সিংহাসন দখলের রক্তাক্ত ইতিহাসে চৈতন্যদেব 'রক্তাক্ত চন্দ্রহাস' হাতে সিংহাসনে বসতে পারেন এমন সম্ভাবনা ছিল না, রাজসভায় কোনো চক্রান্তের সরাসরি অংশীদার নন তিনি। সাত দিনে একবারও মুখোমুখি হতে হয়নি, কোনো কারণও ছিল না। অলক্ষে থেকে চৈতন্যদেব হোসেন শাহ ও গৌড়ের রাজসভাকে বিচলিত করেছিলেন কোন শক্তিতে অলৌকিক না রাজনৈতিক? বস্তুত বাঙালির কাছে পরিচিত যে হস্ত উত্তোলিত সুদর্শন সৌম্য মুর্তি কৃষ্ণপ্রেমের জোয়ার এনেছিলেন, তিনিই যে সাতদিনেই গৌড়ে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জোয়ার এনেছিলেন একথা ভাবতে অবাক হতে হয়। তবে তিনি মানবতাতেই জোর দিয়েছিলেন, বাহুশক্তিতে নয়। *রাজপাট ধর্মপাট* এই দুই পাটের প্রেক্ষিতে চৈতন্যদেবের নবরূপকার অভিজিৎ সেন এই উপন্যাসে ভিন্ন স্বাদ এনেছেন।

গ। *ধর্মায়ুধ*

অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে, ক্ষমতায় আসীন থাকতে ধর্ম আয়ুধ হতে পারে এবং এই আয়ুধ দিয়ে লক্ষপূরণ করাও যায়। পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয় দশকে গৌড়ের সিংহাসনে পাল ও সেন যুগের পরে একমাত্র হিন্দু রাজা গণেশদেব ইব্রাহিম শর্কির আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে শাসনভার টিকিয়ে রাখতে ধর্মায়ুধ প্রয়োগ করেছিল। অভিজিৎ সেন এই ইতিবৃত্তান্ত তুলে এনেছেন *ধর্মায়ুধ* (২০২০) উপন্যাসে। রাজা দনুজমর্দনদেব বা গণেশ ইব্রাহিম শর্কির মতো ক্ষমতাবান ছিল না কিন্তু বিচক্ষণ ছিল, তাই জৌনপুরের সুলতান শর্কির সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেছিল। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী রাজভান্ডার উজার করে শর্কিকে প্রচুর সম্পদ দিয়ে আর নিজে সিংহাসন ত্যাগ করেছিল। পুত্র যদুসেনকে ইসলামে ধর্মান্তর করে জালালুদ্দিন মুহাম্মদ শাহ নাম দিয়ে গৌড়ের সিংহাসনে বসিয়েছিল। গণেশের মধ্যে ধর্মীয় উদারতা ছিল না

এমনকি ধর্ম তার কাছে সামান্য ব্যাপার ছিল তাও নয়, থাকার কথাও নয়। সময়টা পঞ্চদশ শতক, হিন্দুদের মধ্যে জাত ধর্মের প্রচণ্ড রক্ষণশীলতা ছিল, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বা রাজকার্যে ধর্মকে আয়ুধ করলেও রাজা গণেশ সুযোগ বুঝে মাত্র দু-বছর পর নিজ পুত্রকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে আবার রাজা হয়ে বসেছিল। এই দু-বছরে পুত্র যদুর মধ্যে যে ইসলামীয় আচার আচরণ স্থায়ী হয়েছিল সেগুলো গণেশ একেবারে মুছে ফেলতে ছেয়েছিল। রাজকোষের সমস্ত স্বর্ণ দিয়ে ষোড়শ গাভী তৈরি করে তা দিয়ে প্রবেশের মাধ্যমে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে যদুকে পুনরায় হিন্দু ধর্মের মধ্যে আনার ব্যবস্থা করেছিল। যদু পুত্র হলেও সে এখন মুসলমান এই কারণেই খুব বেশি সময় যদু বা জালালুদ্দিনের হাতে রাজ্যভার দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারেনি গণেশ। হিন্দু থেকে মুসলমান, মুসলমান থেকে পুনরায় হিন্দু এই পরিবর্তন প্রত্যাবর্তনের ফলে যদুর অন্তরের দোলাচলতা, জিজ্ঞাসা কোনো কিছুকে সেভাবে আমল দেয়নি গণেশ। যদুও তার ব্যক্তিত্বকে সরিয়ে পিতার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ভালোবাসা ও দ্বিধার সঙ্গে সবকিছু স্বীকার করেই নিয়েছিল। কিন্তু ইসলামে থাকা দু-বছরে যদুর ধর্মীয় বোধের সঙ্গে রাজনৈতিক বোধের বিকাশ হয়েছিল। রাজা গণেশের মতো বিচক্ষণ সেও, তাই রাজ্যভার নেবার একমাত্র আয়ুধ হিসাবে ধর্মকে কাজে লাগিয়ে পুনরায় যদু থেকে জালালুদ্দিন হয়ে গেল। এমন নাটকীয় কাহিনি সংঘাতের মধ্যে এগিয়েছে অভিজিৎ সেনের *ধর্মায়ুধ* উপন্যাসের আখ্যান।

২০১৪ সালের *আজকাল* শারদ সংখ্যায় *ধর্ম ও সিংহাসন* নামে প্রকাশিত উপন্যাসের পরিবর্ধিত রূপ *ধর্মায়ুধ* উপন্যাস। নাট্যকার কুন্তল মুখোপাধ্যায় *ধর্ম ও সিংহাসন* উপন্যাসের নাট্যরূপ *ধর্মায়ুধ* করেছিলেন, এই উপন্যাসের গ্রন্থাকারে প্রকাশে এই নামটি অপরিবর্তিত থেকে গেছে। অভিজিৎ সেন আবিদ আলি খানের লেখা *মেময়ার্স অফ্ গৌড় অ্যান্ড পাণ্ডুয়া* বই পড়ে উৎসাহিত হয়েছিলেন প্রথমে চৈতন্যদেবের গৌড় আগমন নিয়ে *রাজপাট ধর্মপাট* উপন্যাস লিখেছিলেন তারপর গৌড়ের হিন্দুরাজা গনেশের কাহিনি নিয়ে *ধর্ম ও সিংহাসন* লিখেছেন। রাজা গণেশের চরিত্র ও নাটকীয় কাহিনিতে অভিজিৎ সেন আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি রাজা গণেশ সম্পর্কে মনে করেছিলেন—

> দুর্দান্ত সাহসী, বীর এবং অতীব মেধাবী এই নায়কের জীবন কাহিনী যেমন চিত্তাকর্ষক, তেমনই নাটকীয়।[৩৯]

রাজা গণেশ দ্বিতীয়বার সিংহাসনে বসেছিল পুত্র জালালুদ্দিন মুহাম্মদ শাহকে সরিয়ে এবং রাজা দনুজমর্দনদেব উপাধি নিয়ে। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মে দীক্ষিত হবার বিধান আছে কিন্তু হিন্দু শুধুমাত্র জন্মের ফলেই হওয়া যায়। তবে গণেশ তার পুত্র যদুকে ইসলাম থেকে হিন্দুতে ধর্মান্তর করার ক্ষেত্রে এই নিয়ম ভেঙেছিল। আসলে এক যুগের তৈরি নিয়ম অন্য যুগ বইতে পারে না, যুগের কারণে যারা নিয়ম তৈরি করে তারাই ভাঙে। বিচক্ষণ গণেশ ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি নাড়িয়ালের যুগল পরিকল্পনায় দীর্ঘদিনের মুসলমান শাসন সরিয়ে গণেশ একজন জমিদার থেকে রাজা হয়েছিল। গৌড়ের সিংহাসন দখলের ইতিহাস রক্তাক্ত, গনেশের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয়নি। অভিজিৎ সেন লিখেছিলেন—

> গৌড়ের রাজত্ব অধিকার করতে গণেশদেবকেও অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। তারপর গৌড় সিংহাসনের রক্তপিপাসু রীতি অনুযায়ী সুযোগ উপস্থিত হতে চক্রান্ত এবং রক্তপাত সংঘটিত করে গণেশদেব সিংহাসনে বসেন।[৪০]

এই সুযোগ পেতে কুড়ি বছরের বেশি গণেশ ও নাড়িয়াল অপেক্ষা করেছিল। ইসলামের বিজয় রথ থামিয়ে আড়াইশো বছরের তুরস্ক শাসনের গতি রুদ্ধ করে সুনিপুন কৌশলে গণেশ সিংহাসনে বসেছিল। অর্ধেক পৃথিবীতে যখন ইসলামের বিজয় পতাকা উড়ছে, এদিকে গৌড়েও ইলিয়াস শাহ সিকান্দার শাহ দিল্লিকে উপেক্ষা করে দক্ষতার সঙ্গে রাজকার্য পরিচালনা করছিল স্বাধীনভাবে, গনেশের অপেক্ষা তখন থেকেই। সিকান্দারের পুত্র গিয়াসউদ্দিন সিংহাসনের জন্য বেশিদিন অপেক্ষা করতে পারেনি, পিতাকে পরাজিত ও নিহত করে গৌড়ের সিংহাসনে বসেছিল। যুদ্ধবাজ গণেশের ভাতুড়িয়ার জমিদার থাকাকালীন গৌড়ের সঙ্গে পরোক্ষ সম্পর্কের ফলে সিংহাসনের আকাঙ্ক্ষা জন্মেছিল। ইতিপূর্বেই সিকান্দার শাহের পারিবারিক কলহ তার পত্নীদের মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে বিরোধ গণেশের আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করেছিল।

সিকান্দার শাহের প্রথমা পত্নীর সতেরজন পুত্রের মধ্যে কেউ সিংহাসনে বসার যোগ্য ছিল না, দ্বিতীয়া পত্নীর একমাত্র পুত্র গিয়াসউদ্দিন তার সতেরজন ভাইয়ের থেকে বিচক্ষণ ছিল, সে সিংহাসন দখল করতে চাইলে তার ভাইদের আটকাবার মতো ক্ষমতা ছিল না। রাজা সিকান্দার শাহ বাবা ইলিয়াস শাহের গরিমাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে তার সুযোগ্য পুত্র গিয়াসউদ্দিনকেই সিংহাসনে আসীন দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু সন্তান স্বার্থে বড়ো রাণীর

নিজের সন্তানের জন্য সিংহাসন দাবি করাটা অনুচিত ছিল না, এসব ব্যাপারে যখন ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেয়েছিল গিয়াসউদ্দিন তখন সতর্ক হয়ে গেল। কারণ—

> গৌড়-পাণ্ডুয়ার রাজসভায় এবং শাসক ও অমাত্যদের অন্দরমহলে অহরহ চক্রান্ত ও গুপ্ত বা প্রকাশ্য হত্যার জাল বোনা চলতে থাকে।[৪১]

তাই হয়তো সিকান্দার শাহ অবাক হবে না যদি তার পুত্র গিয়াসউদ্দিন তাকে হত্যা করে সিংহাসনে বসে। রাজ্যের সম্পূর্ণ শাসনভার গিয়াসউদ্দিনের হাতে ছেড়ে দিলেও গিয়াসউদ্দিন তার ভাই ও বিমাতার থেকে সচেতন থাকতে সোজা গিয়ে হাজির হয়েছিল সিকান্দার শাহের তরুণ আমির গণেশের জমিদারিতে। গণেশের ও তার শক্তিশালী বাহিনীর উপর সিকান্দার নির্ভরশীল ছিল। গিয়াসউদ্দিন যখন ভাতুড়িয়ায় এসেছে গণেশ তখন পাণ্ডুয়ায় বাস করছিল, ফলে নাড়িয়ালের সঙ্গেই কথা হয়েছে। গণেশের পিতৃবিয়োগের পর নাড়িয়াল ভাতুড়িয়ার জমিদারি দেখাশোনা করছিল। গিয়াসউদ্দিন নাড়িয়ালের কাছ থেকে জানতে চেয়েছিল গৌড়ের পূর্ববর্তী রাজাদের বীরত্বের কাহিনি, কাহিনি শুনে গিয়াস তার মনের কথা ব্যক্ত করেছিল—

> গৌড়ের সিংহাসন যদি সুরক্ষিত রাখতে কেউ চায়, তবে এই মুহুর্তে আমার বিকল্প সম্ভবত আর কেউ নেই। একথা আমার বাবাও জানেন। আপনাদের, মানে ভাতুড়িয়ার সমর্থনও আমার পক্ষে যাবে বলেই আমার বিশ্বাস।[৪২]

এই সমর্থন আদায়ের আশাতেই অত্যন্ত গোপনে গিয়াসউদ্দিনের ভাতুড়িয়ায় আসা সেকথা সুচতুর নাড়িয়ালের বুঝতে অসুবিধা হয়নি। বিমাতা ও ভাইদের চক্রান্ত গিয়াসউদ্দিনের রাজদ্বারে আটকাবার শক্তি ছিল, আসলে তার সিংহাসনের জন্য ধৈর্য চরম সীমায় পৌঁছেছিল। ঠাকুরদা ইলিয়াস শাহের মতো বীর ও খ্যাতিমান হবার স্বপ্ন গিয়াসউদ্দিনের মধ্যে জমেছিল যা নাড়িয়ালের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। রাজনৈতিক দক্ষ নাড়িয়াল অন্য সম্ভাবনাও দেখতে পেয়েছে—

> দীর্ঘদিন ধরে যে বাসনা তিনি মনের ভেতরে লালন করেছেন, যে বাসনা তৃপ্তির লক্ষ্যে সুদূর সুরমা উপত্যকার শ্রীভূমি থেকে নিজের গ্রাম, নিজের পরিচিত ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতি এবং নিজের পরিবার-পরিজন ছেড়ে এতদূরে পড়ে আছেন, এতদিনে কি তারই একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে? খুবই ক্ষীণ সম্ভাবনা, নাড়িয়াল তাতেই যেন প্রবল উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।[৪৩]

গণেশের সুহৃদ, শুভাকাঙ্ক্ষী, বন্ধু, পরামর্শদাতা, গুরু নাড়িয়াল, ফলে গণেশ গৌড়ের রাজা হলে নাড়িয়ালেরও রাজসভায় একটা জায়গা পাকা থাকবে, আর সিকান্দার শাহের পরিবারের অন্তরকলহ, গিয়াসউদ্দিনের আকাঙ্ক্ষাও ভাতুড়িয়ার উপর নির্ভরের মধ্যে সেই সম্ভাবনাই দেখতে পেয়েছিল নাড়িয়াল। দিল্লিবাহিনীর বাংলা আক্রমণ তাতে গণেশের পিতা রঘুপতির বাংলার হয়ে যুদ্ধে প্রাণ দেওয়া, এবং বর্তমানে গণেশের বাহিনী ও আধুনিক অস্ত্রের জোগান দেখিয়ে নাড়িয়াল ক্ষমতা দর্শাতে চেয়েছিল। নাড়িয়ালের পরামর্শ গিয়াসউদ্দিনের পছন্দ হয়েছিল কারণ গোপনীয়তার সঙ্গে দুই স্বার্থ এক জায়গায় মিলেছিল।

নাড়িয়ালের ব্যবস্থা মতোই গিয়াসউদ্দিন পাণ্ডুয়ায় ফিরে আসেনি, বিশাল নৌবহর নিয়ে দক্ষিণ পূর্ব দিকে ভেসে চলেছিল। এই খবর সিকান্দার শাহের কাছে যাবার আগেই সোনারগাঁওয়ে গিয়াসউদ্দিন আধিপত্য বিস্তার করে বসেছিল। মুয়াজ্জামাবাদ ও সাতগাঁও টাঁকশাল থেকে নিজের নামে মুদ্রা তৈরি করেছিল, 'এ কাজ প্রকৃতপক্ষে রাজা সিকান্দারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহই।' দক্ষিণ পশ্চিম ও পূর্ব বঙ্গে স্বাধীন রাজা হয়ে শাসন করতে লাগল। পিতাকে উপেক্ষা করে স্বাধীন রাজার মতোই আচরণ ও বিশ্বের অন্য দেশের সুলতানদের সঙ্গে লেনদেনে মন দিয়েছিল, অন্যদিকে প্রবীন রাজা সিকান্দার শাহ একপ্রকার মেনেই নিয়েছিল তার প্রিয়তম পুত্র গিয়াসউদ্দিন যা করেছে তা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। বৃদ্ধ রাজার অবস্থা রামায়ণের দশরথের মতো, একদিকে পুত্রস্নেহ অন্যদিকে রানীর ভালোবাসার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও দায়িত্ববোধ এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে অস্থির ছিল সে। ইলিয়াস শাহী বংশের মান মর্যাদা রক্ষাকারী হিসাবে সে তার পুত্র গিয়াসউদ্দিনকেই বিবেচনা করে এসেছিল, গোপনে গিয়াসউদ্দিনকে পত্র পাঠায় তাতেও লেখা ছিল—

> ইলিয়াস শাহী বংশের সম্মান এবং ধারাবাহিকতা রক্ষার দায়িত্ব আমি তোমার উপর অর্পণ করছি। এই লক্ষ্যে তুমি যে কোনো পন্থা স্বাধীনভাবে গ্রহণ করতে পার এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মহান ইলিয়াস শাহী বংশের মুখ তুমিই উজ্জ্বল রাখতে পারবে।[৪৪]

বৃদ্ধ রাজার করুণ আকুতি দেখে পত্রবাহক চন্দ্রশেখর দায়িত্ব নিয়ে এই পত্র গিয়াসউদ্দিনের হাতে তুলে দিতে গিয়ে পত্রসহ নাড়িয়ালের হাতে পড়েছিল। ইতিমধ্যে গণেশ ও নাড়িয়ালের পরামর্শ মতো গোপনে গিয়াসউদ্দিন সসৈনে রাজধানীর দিকে এগিয়েছিল। তাই এই চিঠি গিয়াসউদ্দিনের হাতে যাওয়া ঠিক নয় কারণ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে এমনটাই বুঝিয়ে দিয়েছিল

চন্দ্রশেখরকে। কোনো বিভ্রান্তি হতে দেয়নি নাড়িয়াল ও গণেশ। সবকিছু পরিকল্পনা মতোই হয়েছিল। নাড়িয়ালের মনে হয়েছিল এই পত্র কোনো বড়ো সুযোগের দুয়ার খুলে দিতে পারে। 'গোয়ালপাড়ার মাঠে পিতা সিকান্দার শাহের বাহিনীর সঙ্গে পুত্র গিয়াসুদ্দিনের বাহিনীর তুমুল যুদ্ধ হলো।' যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনে রাজা সিকান্দার বিপক্ষের মারণ আঘাত পেয়েছিল, শেষ মুহূর্তে পুত্রের কোলে মাথা রেখে প্রাণত্যাগ করেছিল সিকান্দার শাহ, 'পিতা-পুত্রের যুদ্ধে যেই জয়ী হোক, উভয়ের কাছেই পরিণতিটা হয় বিয়োগান্তক।' পিতার মৃতদেহ নিয়ে বসে থাকা অবস্থায় চন্দ্রশেখর চিঠিখানা গিয়াসুদ্দিনের হাতে দিলে সেটা পড়ে হাহাকার করে উঠেছিল সে। পাণ্ডুয়ায় এসে পিতার অন্ত্যেষ্টির পর এক এক করে সতের জন ভাইকে হত্যা করে মহা সমারোহের সঙ্গে গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ নামে সিংহাসনে বসেছিল। গণেশ তার প্রধান সহকারী থেকে প্রধান অবলম্বন হিসাবে গৌড়ের রাজসভায় উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করেছিল।

কুড়ি-বাইশ বছর সমগ্র বাংলাদেশ শাসন করে গিয়াসউদ্দিনের মৃত্যু হলে তার পুত্র সৈফুদ্দিন হামজা শাহ রাজা হয়েছিল, এর তিন বছরের মাথায় ক্রীতদাস শিহাবুদ্দিন, সৈফুদ্দিনকে হত্যা করে রাজা হয়েছিল, 'এই হত্যার পেছনে যে গণেশদেবের হাত ছিল না, এ কথা রাজসভার কেউই বিশ্বাস করেনি।' গণেশের ক্ষমতা ক্রমশ বিস্তার হতে থাকে। শিহাবুদ্দিনের সময়েই রাজ্য ও রাজস্ব বিষয়ে গণেশই শেষ কথা বলত। শিহাবুদ্দিন তার বিরুদ্ধে গেলে গণেশ তাকে হত্যা করে তার বালক পুত্র ফিরোজকে সিংহাসনে বসিয়েছিল কিন্তু গনেশকে বাধা দেবার মতো সাহস গৌড়-পাণ্ডুয়ায় কারো ছিল না এটা বুঝেই নাড়িয়ালের কথামতো 'ক্রীতদাসের বাচ্ছা'কেও খতম করে গণেশ নিজেই সিংহাসনে বসেছিল। রাজা গণেশের সিংহাসন লাভের এই কাহিনিতে ছিল চক্রান্ত, দীর্ঘ প্রতীক্ষা, আর অজস্র হত্যা। গৌড় সিংহাসনের জন্য এসব ব্যাপার কিছু নতুন ছিল না। গণেশদেব সিংহাসনে বসার আগেই সমস্ত প্রতিরোধের সম্ভাবনাকে বিনাশ করেছিল কিন্তু তৎকালীন বাংলার গ্রাম-গঞ্জের পির, ফকির, দরবেশ, কলন্দর প্রভৃতি মুসলমান গোষ্ঠীর থেকে প্রতিরোধ আসতে শুরু করেছিল—

> দুশো বছরের ইসলামের আসন শক্ত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়া রাজ্যের উপর একজন কাফেরের প্রভুত্ব কায়েম হবে, এই বিষয় তারা মানতে কিছুতেই রাজি ছিল না। ফলে গণেশদেবের রাজসভাতে প্রথম থেকেই দরবেশরা রাজাকে প্রকাশ্যে অপমান, অবজ্ঞা এবং গালাগালি দিতে শুরু করল।[৪৫]

সারা পৃথিবীতে যখন ইসলামের একটা আধিপত্য চলছিল একমাত্র হিন্দু রাজা হিসাবে গণেশের কাছে ইসলামীয় প্রতিরোধ থামানোটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। গণেশ এত সহজে এসব যে মেনে নিয়েছে তা নয়, আদিনা মসজিদে গণেশ নামাজ বন্ধ করে দিয়ে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের দপ্তর বানিয়েছিল। দরবেশরা প্রকাশ্য রাজসভায় এর প্রতিবাদ ও রাজা গণেশকে অপমান করেছিল এবং তারা কোনো বিধর্মীকে সম্মান দেখানো অনুচিত মনে করেছিল, ফলে সরাসরি বিবাদ সংঘটিত হয়। গণেশ বদমেজাজি দরবেশের উপর তার ক্ষোভ সংবরণ করতে পারেনি—

> যে পবিত্র মসজিদ নিয়ে আজ কথা বলতে এসেছেন, সেই পবিত্র মসজিদ তৈরী করতে কতগুলো হিন্দু মন্দির ভাঙতে হয়েছিল? হিন্দু দেব-দেবীর পাথর নির্মিত মূর্তি তো এখানে ওখানে এখনও অবিকৃত অবস্থায় মসজিদের গায়ে গাঁথা আছে। এমনকি মসজিদের ভিতরে যে কিব্‌লা বা প্রার্থনার কুলুঙ্গি, তা যে আসলে হিন্দু মন্দির ভাঙা খিলান, তো এখনও স্পষ্ট বোঝা যায়। এই কাফেরদের দেবদেবীর মূর্তি মসজিদের গায়ে শোভা পেলে, সেখানে আল্লার আরাধনা কি সম্ভব, দরবেশ?[৪৬]

গণেশের এই অভিযোগ ব্যক্তিগত স্বার্থপূরণ ও কোনো অভিসন্ধি ছিল না। একজন হিন্দু রাজার এই ক্ষোভ শুধু নয়, প্রতিটি ধর্মপ্রাণ মানুষের এই অভিযোগ, সেদিনেও, বর্তমানেও। একথা বলেও গণেশ দরবেশকে দমাতে পারেনি। দরবেশরা রাজা গণেশের উদ্দেশ্যে বলেছিল 'অশিক্ষিত এবং অবিশ্বাসী মানুষ সিংহাসন দখল করলে এরকম অবস্থাই হয়।' জোর করে রাজসভায় প্রবেশের পর দরবেশরা তাদের অহংকার বজায় রেখেই প্রতিক্রিয়া দেখায় ফলে তাদের বন্দি হতে হয়েছিল, এর পরেও কয়েকজন দরবেশ বিদ্রোহী হলে গণেশ তাদের একত্রে জলে ডুবিয়ে হত্যা করেছিল। এই ঘটনার পর থেকেই রাজা গণেশের রাজনৈতিক ধর্মীয় ও পারিবারিক প্রেক্ষাপট বদলে গিয়েছিল। ত্রিহুতের রাজপুত্র শিবসিংহের মতো গণেশ নৃশংস ও কঠোরতা দিয়ে দরবেশদের শায়েস্তা করতে চাইলেও দরবেশদের প্রতিপত্তি বাংলায় শাসক শুধু নয়, উত্তর ভারতের বিভিন্ন মুসলমান রাজ্যে এমনকি ভারতের বাইরেও ছিল। গণেশের দরবেশ হত্যার কথা জানিয়ে অন্য এক দরবেশ নুর কুতুব আলম জৌনপুরের রাজা ইব্রাহিম শর্কিকে চিঠি লিখেছিল। ইসলামের জানমাল বাঁচাবার আবেদন ছিল সেই চিঠিতে। ইব্রাহিম শর্কির কাছে জৌনপুরের আরও এক দরবেশের চিঠি গিয়েছিল তাতে রাজা গণেশসহ কাফেরদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও ইব্রাহিম শর্কিকে উত্তেজিত করার মতো

যথেষ্ট উপাদান ছিল। দরবেশদের মূল লক্ষ্য কাফের শাসন থেকে মুক্তি, বাংলার গ্রাম গ্রামান্তরে ইসলামের আদর্শ ছড়িয়ে দেওয়া।

দরবেশদের চিঠি পেয়ে ইব্রাহিম শর্কি যখন বাংলার পথে এগিয়ে এসেছিল তখন রাজা গণেশ বুঝতে পেরেছিল এই শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মতো শক্তিসঞ্চয় তার এখনো হয়নি। তাই দরবেশ নুরকুতুব আলমের মধ্যস্থতায় ইব্রাহিম শর্কির সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেছিল গণেশ। দরবেশের মতে বাংলার মসনদে যেই বসুক তাকে মুসলমান হতে হবে। অর্থাৎ গণেশকে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে। দরবেশ মনে করেছিল গণেশের মতো শক্তিশালী প্রতিভাশালী মানুষ নব্য মুসলমানে বিকশিত হবে এবং মানুষকে আকৃষ্ট করবে। এভাবেই দরবেশরা অসংখ্য হিন্দুকে ইসলাম ধর্মে এনেছিল। ইব্রাহিম শর্কি এবং দরবেশরাও বিচক্ষণ কৌশলী গনেশদেবকে বুঝতে পারেনি, এবার গণেশ মোক্ষম চাল চেলেছিল—

> হজরত, আমি বৃদ্ধ মানুষ। একথা ঠিক যে অচিরেই আমার জীবনান্ত হবে, তেমন বয়স আমার হয়নি। কিন্তু আমি ইসলাম কবুল করলেই আমার বংশে সবাই মুসলমান হয়ে যাবে এমন নয়। তাছাড়া, আমি মুসলমান হলে আমার পরিবারে নানা রকম জটিল সমস্যা বাড়বে। তার থেকে আমার প্রস্তাব, আমার পুত্র যদুকে ধর্মান্তরিত করে সিংহাসনে বসালে সব দিক রক্ষা। সে শিক্ষিত, বুদ্ধিমান এবং বীর। ইসলামি ভাষাও সে ভালো ভাবেই শিক্ষা করেছে। আপনি অনুগ্রহ করে এই বিকল্প প্রস্তাবটি গ্রহণ করুন। যদুকে সিংহাসনে বসিয়ে আমি পুনরায় আমার নিজস্ব ভূমি ভাতুড়িয়াতে ফিরে যাব। সুলতান বোধ হয় আমার এ প্রস্তাব অনুমোদন করবেন।[৪৭]

এই প্রস্তাবের পরে ইব্রাহিম শর্কি প্রচুর সম্পদ নিয়ে জৌনপুর ফিরে গেলে গণেশের পুত্র ধর্মান্তরিত হয়ে যদুসেন থেকে জালালুদ্দিন মুহাম্মদ শাহ্ নামে সিংহাসনে বসেছিল। গণেশ ভাতুড়িয়ায় ফিরে গিয়েছিল। পুত্রের ধর্ম পরিবর্তন হলেও ক্ষমতা পরিবারের মধ্যেই থেকে গিয়েছিল, গণেশ নিজেও ক্ষমতার কাছাকাছি ছিল। এর দু-বছর পর সুযোগ বুঝে আবার গণেশ নিজে সিংহাসনে বসে পুত্র যদুকে পুনরায় হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করেছিল।

জালালুদ্দিনকে পুনরায় হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা স্থির হয়েছিল কিন্তু দু-বছর ইসলামে থাকা যদুর মানসিক পরিবর্তন হয়েছে এই ব্যাপারটা গণেশ আমল দিতেই চায়নি। যদু নাড়িয়ালের তত্ত্বাবধানে গণেশের মতো বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান হয়েছিল, ইতিমধ্যে বিদেশি শাসক রাজদূতদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে জেনেছে ইসলামের আদর্শ, জ্ঞান, শক্তি

পরাক্রমের কথা। পিতার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা থাকলেও পিতার সঙ্গে সব বিষয়ে সহমত পোষণ করেনি। যদু জেনেছিল, তার বাবা বীর বটে কিন্তু উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ইসলামের পদতলে। এই যুগে ইসলাম সব দিক দিয়ে অগ্রসর, যুদ্ধবিদ্যায় তাদের জয় করা অসম্ভব। যদু সময়টা বুঝে ইসলাম থাকাই শ্রেয় মনে করেছিল। তাই প্রায়শ্চিত্য বিধানের কাজে বিরক্ত সে, পিতার উদ্দেশ্যে স্বগতোক্তি 'আপনি আমাকে নিয়ে আর কত যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন!' যদুর উপরে রাজার আদেশ হয়েছিল মুসলমানি আচার আচরণ বন্ধ রাখতে হবে, কিন্তু যদু ফকিরের নামাজ দেখে উতলা হয়ে উঠেছিল—

> উতলা এই কারণে নয় যে তিনি ধর্মান্তরিত হয়ে খুব আনন্দিত হয়েছিলেন এবং মন প্রাণ দিয়ে ইসলামকে বরণ করেছেন। বরং উল্টো তার অসম্ভব বিরক্তি জন্মেছিল বাবা যখন এরকম একটা প্রস্তাব তাঁর সামনে এনে হাজির করেছিলেন। শুধু বিরক্তি নয়, বিরক্তি থেকে ঘৃণা এবং ঘৃণা থেকে প্রবল ক্রোধ জন্মেছিল তার।[৪৮]

যুবক যদুর কাছে ধর্ম বিরাট কোনো ব্যাপার তা নয়, কিন্তু যুগের প্রয়োজনে সে হিন্দু অপেক্ষা ইসলামে বেশি অনুরক্ত হয়েছিল একথা বোঝাই যায়। গণেশের শক্তি বৃদ্ধি নাড়িয়ালের পরামর্শে, গণেশ ও নাড়িয়াল দুজনেই সাহসী, উচ্চাভিলাষী, দৃঢ়চেতা। নাড়িয়াল গণেশকে বলেছিল—

> তাড়াহুড়ো কোরো না গণেশ, একেবারে অধৈর্য হবে না। হিন্দুস্থানে আবার হিন্দুর রাজত্ব হবে। আবার হিন্দুর বিজয়পতাকা আকাশে উড়বে... আর্য ধর্মের নতুন সূর্যোদয় হবে। আমি তোমাকে ঠিক সময়ে সংকেত দেব।[৪৯]

নাড়িয়ালের সংকেতেই তো রাজা গণেশ সিংহাসন পেয়েছিল, নাড়িয়ালের মন্ত্রণাতেই গণেশ নির্ভরশীল। গণেশ পুত্র যদুর শিক্ষাভার নাড়িয়ালের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিল। নিজের মধ্যে যে উচ্চাভিলাষ ছিল তা দিয়ে পুত্রকে অনুপ্রাণিত করত গণেশ। অনুগ্রহ মিশ্র, গণেশ, নাড়িয়াল, স্বর্ণধেনু নির্মাণকারী শ্রেষ্ঠী লক্ষিপতি সকলেই জানত যদুর প্রায়শ্চিত্য বিধান শুধুমাত্র লোকদেখানো যাঁকযমকপূর্ণ একটা পদ্ধতি ছিল। যা অনেক সহজ করে নেওয়া হয়েছিল, নাহলে প্রায়শ্চিত্য বিধানের যে রীতি হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল তাতে প্রায়শ্চিত্তকারীর প্রাণ যাওয়াও আশ্চর্যের কিছু নয়। কিন্তু যদুর ক্ষেত্রে অনেক ফাঁকি রাখা হয়েছিল, পন্ডিত অনুগ্রহ মিশ্রের আদেশে। তৎকালীন হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রতি একটা ভীতি থাকত। অনুগ্রহ মিশ্রকেও পাণ্ডুয়ার হিন্দুরা ভয় করত।

দু-বছর আগে অপেক্ষাকৃত কম অভিজ্ঞ যদু ইসলাম ধর্মে যাওয়ার পর তার পত্নী তিস্তা তাকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। পিতা ও গুরুদেবের প্রতি অগাধ ভক্তি ও জটিল রাজনৈতিক আবর্তে সেদিন দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল যদু। যন্ত্রের মতো আদেশ মেনে নেওয়া ছাড়া কিছুই করার ছিল না। আসলে নাড়িয়াল এমন এক ব্যক্তিত্ব তাকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা ছিল না যদুর। শ্রেষ্ঠী লক্ষ্মীপতির কথায়—

> উরিব্বাপ! তাঁকে দেখলে সম্ভ্রমের থেকে আতঙ্ক বেশি হয়। একেবারে কাঁচাখেগো দেবতা! আর কিছু না বলাই ভালো। তবে কী যেন একটা আছে ওঁর মধ্যে! ভারী রহস্যময়।[৫০]

নাড়িয়ালের মধ্যে যে রহস্য আছে তা কি বুঝতে পেরেছিল যদু, স্ত্রী তিস্তার সঙ্গে তর্কে কোনো শক্ত যুক্তি দেখাতে পারেনি, তার ধর্মান্তর, হিন্দু-মুসলমান রীতি, তাদের সম্পর্ক, তাদের সন্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। ধর্মান্তরণের ফলে সন্তানবতী স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদে ব্যথিত হয়েছিল যদু। ইব্রাহিম শর্কির কাছে পণ বন্দির অবমাননা, স্বামীর ধর্মান্তর অস্থির করে তুলেছিল তিস্তাকে কিন্তু যদুর কাছে ধর্ম এত গুরুত্বপূর্ণ কিছু না। শিক্ষিত দম্পতির তর্কে উঠে এসেছে যবন তুরস্ক, হূণ, হিন্দু, ইসলাম, বৌদ্ধ ধর্মের গোড়ার কথা। কীভাবে মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ তৈরি হয়েছিল, বৌদ্ধদের উপর ব্রাহ্মণদের অত্যাচার, এসব তর্কের পরে সমাধান সূত্র বেরোয়নি বরং আপাত বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল।

শুদ্ধি অনুষ্ঠানকে উপহাস ও আপাত অবজ্ঞায় রাজকুমার যদু তার মুসলমান সত্তাকে এগিয়ে এনেছিল, নাড়িয়াল এসব বেশি গুরুত্ব না দিয়ে পরামর্শ দিয়েছিল চিত্ত শুদ্ধি করতে। 'সব নিষেধাজ্ঞার কিছু সামাজিক এবং রাজনৈতিক কারণ থাকে' আসলে ক্ষমতাই ধর্মীয় নীতি তৈরি করে। নাড়িয়ালের সঙ্গে তর্কে যদু হিন্দু ধর্মে ব্রাহ্মণ্যকে নিষ্ঠুর এবং বিভেদকারী বলেছিল, কিন্তু ইসলামেও যে বিভেদ আছে নাড়িয়াল তা দেখিয়ে আরব জাতিগুলির দ্বারা ভারতীয় মুসলমানদের দ্বিতীয় শ্রেণির মুসলমান মনে করার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিল। ষোড়শ স্বর্ণধেনুর মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে শুদ্ধ হবার সিদ্ধান্তে যদুর দোলাচলতার অবসান ঘটিয়েছিল রাজা গণেশের মধুমেহ রোগের খবর। নাড়িয়াল সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল যদুকে—

> তোমার বীর পিতা এবং আমরা যে সংকল্প করেছি, সেসব শুধু তোমার ভবিষ্যতের কথা ভেবেই নয়, এই পবিত্র ভারতভূমির এবং অনিবার্যভাবে তোমার রাজ্য এই বাংলার কথা মনে রেখেই।[৫১]

এসবের আগে পিতার অসুস্থতা তাকে পীড়া দিয়েছিল, পিতা-পুত্রের মধ্যে অনেক দুরত্ব সত্ত্বেও, পিতার অশ্রুভারাক্রান্ত চোখ তাকে মনে মনে বিচলিত করেছিল, যদু মনে করত ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত হয়ে থাকাই ভালো, সমস্ত যুক্তি বুদ্ধি ফেলে সে রাজি হয়েছিল শুদ্ধ হতে। এরপর জালালুদ্দিন আবার যদুতে রূপান্তরিত হয়ে গেল, যা রাজকুমারের আদৌ সম্মানজনক মনে হয়নি তা রাজসভার সকলেই বুঝতে পেরেছিল।

যদুর শুদ্ধি অনুষ্ঠানের পর দনুজমর্দনদেব ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। সস্ত্রীক রাজা নাড়িয়ালসহ গোপনে ভাতুড়িয়ার চলে যাবার পর দেহত্যাগ করেছিল। এবং অভাবিতভাবে তার অন্য পুত্র মহেন্দ্রদেবকে সমগ্র বাংলার রাজা ঘোষণা করে গেল। সঙ্গে গণেশের অনুরূপ মহেন্দ্রদেবের নামে মুদ্রা প্রচলন করে তাতেও লেখা হয়েছিল 'চণ্ডীচরনপরায়নস্য'। আসলে—

> ইতিহাসপুরুষ পরবর্তী প্রজন্মকে এইভাবে জানিয়ে রাখার ব্যবস্থা করলেন যে মহারাজা দনুজমর্দনদেবের প্রয়াণ হয়েছে এবং জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহ নয়, রাজা হয়েছেন প্রয়াত রাজার দ্বিতীয় পুত্র মহেন্দ্রদেব।[৫২]

মহেন্দ্রদেবের রাজা হবার পর যদু আত্মগোপন করে ফিরোজাবাদে ছাউনি ফেলেছিল, যদু বুঝেছিল, মানুষ রাজাকে কেবল জাগতিক বিষয়ে অনুসরণ করে, ধর্মে না, রাজধর্মে বিশ্বাস করে। বাংলার গ্রাম গ্রামান্তরে তুরস্কদের ধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল, মুসলমান সংস্পর্শেও শিক্ষা, সাহিত্য, আইনের ধন-মান-সংস্কৃতির শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল। অনেক মুসলমান রাজার দরবারে হিন্দু উচ্চপদে আসীন, রাজা গণেশও তো এর বড়ো দৃষ্টান্ত। চারিদিকে মুসলমানের শাসনের মাঝে যদু ইসলামে থেকেই নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে পারবে, এই ভাবনায় যদু রাজ্যের মন্ত্রী, আমির, পন্ডিত, ধর্মীয় নেতাদের ডেকে বলেছিল—

> ইসলাম ধর্মের সত্য আমার কাছে পরিষ্কার। তাকে গ্রহণ করা ভিন্ন আমার অন্য উপায় নেই। আপনারা যদি আমাকে মানেন এবং আমার সার্বভৌমতা অস্বীকার না করেন, তাহলেই আমি এই পবিত্র সিংহাসনে বসব। না হলে, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহেন্দ্রদেব রাজা থাকুন, আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন।[৫৩]

যদু নয়, জালালুদ্দিনের এই প্রস্তাব মান্যতা পেয়েছিল, ১৩৪০ শকাব্দের শেষ ভাগে পাণ্ডুয়া ও চাঁটগায়ের টাঁকশাল থেকে রাজা জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহ নামে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন হয়েছিল। এবং আগের মুদ্রার 'শ্রীচণ্ডীচরণপরায়নস্য'র জায়গায় 'জালালুদ্দুনিয়া ওয়াদ্দিন আবুল

মুজাফফর মুহম্মদ শাহ আস-সুলতান' মুদ্রিত হয়েছে। রাজা গণেশ ধর্মকে আয়ুধ করেই সিংহাসনে আসীন থাকতে চেয়েছিল, যদুও দু-বছরে বুঝেছিল ক্ষমতা ধরে রাখতে গেলে ধর্মই একমাত্র আয়ুধ। তাই যদু-জালালুদ্দিন-যদু-জালালুদ্দিন এই রূপান্তরের শেষটিকে শাসনকার্য ধরে রাখার উপযুক্ত মনে করেছিল। অভিজিৎ সেন ইতিহাসের নাটকীয় কাহিনির মধ্যেও মানবিক সম্পর্কের উপস্থাপন করে প্রাচীন থেকে বর্তমানের দিকে যাত্রা করেছেন মাঝে মাঝেই। স্বপ্নময় চক্রবর্তী যথার্থই বলেছিলেন—

> এই 'ধর্মায়ুধ' নামক উপন্যাসটিকে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বর্গের ভিতরে সমালোচকরা রাখতে চাইলে আপত্তি করার কিছু নেই, যদিও এটা শেষ পর্যন্ত মানবিক সম্পর্কের এক কোমল বিভা দান করেছে,... [৫৪]

২। চাষের ও বাসের ভূমি: অধিকারের লড়াই

মানুষের জীবনে ভূমির প্রয়োজন অনন্তকাল ধরেই। প্রথমত এক টুকরো বসবাসের জমি তারপর আর একটু চাষের জমি। চাষের না হলেও বাসের জন্য অবশ্যই জমি দরকার। মানুষের এই প্রয়োজনটুকু কতটা জরুরি তা সবথেকে ভালো বোঝা গিয়েছিল দেশভাগ ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর যে উদ্বাস্তু স্রোত ভারতের দিকে ধেয়ে এসেছিল তা দেখে। সেইসব মানুষেরা তাদের অতীত স্মৃতি নিয়ে এখনো বেঁচে আছে এদেশে, তাদের স্মরণে আছে সম্পূর্ণ নতুন দেশে এসে তাদের প্রধান ও প্রাথমিক চাহিদাটুকুর কথা। সেটা যে অবশ্যই মাথা গোঁজার একটা জায়গা এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এছাড়াও আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান তাই দেশের অর্থনীতি অনেকটাই কৃষিনির্ভর। দেশের অর্থনীতির বিকাশ ঘটাতে কৃষির উন্নতি আবশ্যিক ছিল। এই উদ্দেশ্যেই পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৫ সালে ভূমিসংস্কার আইন প্রণীত হয়েছিল। এই আইনের প্রধান লক্ষ্য ছিল দেশের কৃষিব্যবস্থার উন্নতি, সামন্ততন্ত্রকে শেষ করা, রায়তের জমি রাখার ঊর্ধ্বসীমা নির্দেশ করে অতিরিক্ত জমিকে সরকারের হস্তগত করে সেগুলো ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করা, বর্গাদার নথিভুক্ত করে তাদের চাষে নিশ্চয়তা দেওয়া। কিন্তু আইন প্রণয়নের পর এই কঠিন কাজগুলিকে বাস্তবায়িত করতে সরকারের যে পদক্ষেপ নেওয়ার দরকার ছিল তা নেয়নি। এই কাজ করতে গিয়ে ভূস্বামীদের সঙ্গে বিবাদে যেতে চায়নি সরকার পক্ষ। ফলে ভূমিসংস্কারের কাজে মূল প্রতিকূলতা সরকারের অনিচ্ছা। ভূমিসংস্কারকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল জোতদারের, জমিদারের ক্ষমতা। আসলে শুধুমাত্র আইন করে চাষির বা কৃষির উন্নতি করা সম্ভব ছিল না, কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করা জরুরি ছিল। 'আইনের সংখ্যা যত বাড়ে, ফ্যাকরা তত বাড়ে' ফলে আইনের ফাঁকফোকর খুঁজে নিয়ে স্বার্থান্বেষীদের পয়সা রোজগার করতে অসুবিধা হয়নি। ভূমিসংস্কার আইন প্রণয়নের অনেক বছর পরে ১৯৬৭ সালে রাজনৈতিক পালাবদল হয়েছিল, এই সময়ের যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভূমিসংস্কার মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ কোঙার মহাশয়ের পরিচালনায় পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কারের শুরু হয়েছিল। ১৯৭২ জাতীয় কংগ্রেসের সময় এই কাজে কিছুটা ভাটা পড়ে, ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট আবার ক্ষমতায় এলে এই কাজ গতি পেয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমিসংস্কার দপ্তরের দক্ষ কর্মী পরিমল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *ভূমি ও ভূমিসংস্কার সেকাল একাল* গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছিলেন—

ভারতীয় সংবিধানে ভূমি বিষয়টি রাজ্য-তালিকায় থাকায় পরিকল্পনা কমিশন রাজ্যগুলিকে ভূমিসংস্কার রূপায়ণে উপযুক্ত পরামর্শ দেয়। রাজ্যগুলিও মোটামুটি স্বল্পকালের মধ্যে আইন প্রণয়ন করে। পশ্চিমবঙ্গে প্রণীত হয় পশ্চিমবঙ্গ জমিদারি অধিগ্রহণ আইন ১৯৫৩ এবং পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইন ১৯৫৫। দেশে তোড়জোড়ের অভাব ছিল না কিন্তু অভাব ছিল সরকারের রাজনৈতিক ইচ্ছা এবং ভূমিসংস্কারের মতো দুঃসাহসিক কাজের জন্য সাহসী মানসিকতা ও পরিকাঠামো।... ভারতের শাসনব্যবস্থায় ভূস্বামীদের অবিসংবাদিত প্রভাব থাকায় এবং ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল তাদেরই স্বার্থবাহী হওয়ায় ভূমিসংস্কার সম্ভব হল না। সরষের মধ্যেই ছিল ভূত, ফলে, সেই সরষে সমাজ-অর্থনীতির ভূত ঝাড়ানোর কাজে লাগতে পারে না।[৫৫]

ভূমিসংস্কার আইনের ৩ নং অধ্যায় পুরোটা বর্গাদারদের জন্য, অপারেশন বর্গাআইন অনেক প্রতিকূলতা ডিঙিয়ে বাংলার কৃষকদের জমির অধিকার দিয়েছিল। আবার জোতদারের কৌশল ও স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক ব্যক্তির হস্তক্ষেপ অনেক চাষিকে বঞ্চিত করেছিল। সৎ আধিয়ারদের কেউ কেউ মনে করেছিল বর্গা রেকর্ড আইন হলেও তা আসলে মালিকের সঙ্গে বেইমানি করা, আধিয়ারের এই সরলতার ফলে জোতদারকে জমির শাসন ও শোষণের ক্ষেত্রে বেগ পেতে হয়নি। চাষি অল্পতেই খুশি থেকেছে, কিন্তু সময় দেখিয়ে দিয়েছে এই চাষিদের কাউকে জমির জন্য প্রাণ দিতে হয়েছে, কাউকে সর্বশ্রান্ত হতে হয়েছে, আবার নারীর সম্মান খোয়াতে হয়েছিল।

১৯৫৫ সালে সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় কংগ্রেস সরকার ভূমিসংস্কারের নতুন বিল পেশ করেছিল। এই বিল প্রসঙ্গে বদরুদ্দিন উমর 'সত্তরের কৃষক আন্দোলন' প্রবন্ধে বলেছিলেন—

এই বিলে জমির ঊর্ধ্বতম সীমা নির্ধারণ, রাজস্ব, বর্গাদার ও রায়তদের অধিকার, সমবায় ইত্যাদি বিষয়ে আইন প্রণয়নের কথা থাকলেও তার মধ্যে ভূমি মালিকদের পক্ষে ফাঁকির সুযোগ এত বেশি রাখা হয়েছিল যে তার দ্বারাও বর্গাদারসহ খোদ কৃষকদের কোনো উপকার হয়নি, গ্রামাঞ্চলে কাজের সংস্থান বাড়েনি এবং বেআইনি আদায় ও নানা অত্যাচারের নিরসন ঘটেনি।[৫৬]

অর্থাৎ সরকারের সৎ উদ্দেশ্য রক্ষিত হয়নি। আইনকে আর আইনের রক্ষককে হাতে নিয়ে শোষণ চালিয়ে যেতে কোনো অসুবিধা হয়নি জোতদারের। জমি যেই চাষ করুক না কেন, সন্তানের মতো আগলে রাখুক না কেন, অধিকার সেই মালিকের। নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) 'ফরিয়াদ' কবিতা অবলম্বনে বলা যায়—

জনগণে যারা জোঁক-সম শোষে তারে মহাজন কয়,

সন্তান-সম পালে যারা জমি তারা জমি-দার নয়।

মাটিতে যাঁদের ঠেকেনা চরণ,

মাটির মালিক তাঁহারাই হন![৫৭]

অর্থাৎ জমিদার ও জোতদার মাটি স্পর্শ না করলেও মাটির মালিক তারাই। এই মাটির সঙ্গে যার নাড়ির যোগ সেই কৃষক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। এইসব আইনের বাইরেও বর্গাচাষের জটিল পদ্ধতিতেই ভাগচাষিরা জব্দ হয়ে থাকত। অভিজিৎ সেন ব্যাংক কর্মী হওয়ার সুবাদে বর্গাআইন ও ভূমিসংস্কার সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, যা তাঁকে এই জাতীয় গল্প উপন্যাস রচনার বহু উপাদান জুগিয়েছে, তবে লেখক মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন কাহিনি নির্মাণে। যেখানে ব্যক্তি নয়, ব্যক্তির আড়ালে গোষ্ঠীকে প্রাধান্য দিয়ে শ্রেণিসংগ্রামকে দেখিয়েছেন। 'গল্প বিষয়ে ভাবনা' প্রবন্ধে লেখক জানিয়েছেন শ্রেণিসংগ্রাম তাঁকে কিভাবে আকর্ষণ করেছিল। চাষির কাছে জমির মূল্য কতটা, জমির সঙ্গে চাষির সম্পর্ক কেমন ছিল তা অন্তরে উপলব্ধি করেছিলেন অভিজিৎ সেন। তিনি বলেছেন—

> আকাঙ্ক্ষিত শ্রেণী-বিরোধের মূল বিষয়গুলি সম্পর্কে আমি যে কথাগুলো বলতে চাই সেই কথাগুলো অনেক বেশি রক্তমাংস নিয়ে, অনেক প্রাণবন্ত হয়ে আমার লেখায় ধরা দিতে শুরু করেছে।[৫৮]

আসলে ভূমিসংস্কার অপারেশন বর্গা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে সত্তরের সমাজ রাজনীতি থেকে শুরু করে কৃষক পরিবারগুলির মধ্যে অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল। তা নিয়ে যে সংগ্রামের ক্ষেত্র তৈরি হয় তা ব্যক্তি থেকে গোষ্ঠীকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছিল। অভিজিৎ সেন তারই নিখুঁত চিত্র এঁকেছেন তাঁর বেশ কিছু গল্প উপন্যাসে।

ভূমিসংস্কারের অধীন বর্গা আইনে কৃষকের অধিকার আইনত সুনির্দিষ্ট হল ঠিকই কিন্তু জোতদার অলিখিতি প্রতি আইন তৈরি করে ফেলেছিল। অর্থাৎ আধি উচ্ছেদ, জবরদখল, জমি বিক্রি এসবের মধ্য দিয়ে আধিয়ারদের ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছিল। আধিসহ জমি তারাই কিনতে চাইল যারা ক্ষমতার জোরে কৃষকের ফসল নষ্ট করে, গুণ্ডা দিয়ে ভয় দেখিয়ে আধি উচ্ছেদ করতে পারবে। অর্থাৎ সরকারি আইনের ফলে সুষ্টভাবে আধিয়ার জমির অধিকার পেয়েছিল তা নয়, একটা লড়াইয়ের সূচনা হয়েছিল। অভিজিৎ এই সময়ে শুধু জমি কেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব নয়, জমিকে কেন্দ্র করে রাজনীতিও দেখিয়েছেন। 'দেবাংশী', 'আইন-

শৃঙ্খলা’, ‘বিষ’, ‘ঈশানীমেঘ’ ‘ব্যবচ্ছেদ’ এমন আরও বেশ কিছু গল্পে ভূমিসংস্কারের ফলে জমিকে কেন্দ্র করে বর্গাদার-জোতদার সম্পর্ক দেখিয়েছেন। সরকারের ভূমিসংস্কারের ফলে কৃষি উন্নতির প্রকল্প জমির প্রতি জোতদারের নজরকে বদলে দিয়েছিল, রাতারাতি তাদের কাছে জমির কদর বেড়েছিল। ভাগচাষি উচ্ছেদ করে জমি নিজেদের হাতে আনতে চাইলে ব্যাপক সংঘাত বেঁধেছিল। *বর্গক্ষেত্র* (১৯৮১), *ক্রান্তিবলয়* (১৯৮৫) উপন্যাসেও বর্গাদার-ভাগচাষির জীবন জমিকে কেন্দ্র করে কীভাবে আবর্তিত হয়েছে এবং প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক অস্বচ্ছতার পরিচয় আছে। সরকারের ভূমিসংস্কারের জন্য প্রণীত বর্গাআইন কৃষকের এই লড়াইকে আরও উজ্জীবিত করেছিল।

ক। *বর্গক্ষেত্র*

বর্গক্ষেত্র উপন্যাসে আছে, শচীকান্ত দশ একর জমির মালিক যাতে আধি করত আস্তিক মাল, তার ছেলে পরশুরাম মাল ও ভাই বিম্ব মাল। এদের বিশাল চেহারার জন্য কাশিয়ানির দৈত্য বংশ বলে পরিচিত ছিল। খেটে খাওয়া গ্রামীণ মানুষের মধ্যেও যারা বিভিন্ন কারণে পাশাপাশি অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করে তেমনই এই পরিবারটি। সরকারের বর্গা আইনকে আস্তিক ও বিম্বর ‘বেইমানি’ বলে মনে হয়েছিল। সরকারি অফিসারদের সামনে নিজেদের শচীকান্তের আধিয়ার বলে পরিচয় দিতে অস্বীকার করে বলেছিল ‘হামরা বাবুর চাকর লাগি।’ চার পুরুষ ধরে চাকর থাকার পরিচয় একমাত্র অগ্রাহ্য করেছিল আস্তিকের ছেলে পরশুরাম। সে সোচ্চারে ঘোষণা করেছিল—

> হামরা চার পুরুষ ইনার জমি আধি চষি। আধা উনাক্ দিই, আধা হামরা খাই। ই সন হামারদের নাম রেকর্ড করবা আজ্ঞা হয়।[৫৯]

পরশুরামের এমন দাবির জন্য পিতা তাকে শাসন করেছিল। শচীকান্ত দীর্ঘদিনের আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে বাহ্যিক আইন কানুনে শত বৎসরের সম্পর্ক নষ্ট না করার বাণী শুনিয়ে আশ্বস্ত করেছিল। ফলে শচীকান্তের নামে জমি বহাল থাকে, জমির দাগ নম্বরের পাশে ‘আধি দং আস্তিক মাল গং’ এই বয়ান লেখা হয় না। বিশ্বাসের ফলে আস্তিক মাল নিজের চারপুরুষের অধিকার বুঝে নেয়নি, তার অটুট বিশ্বাস মালিকপক্ষ ভেঙে দিয়েছিল। শচীকান্ত রাখাল সরকারকে জমি বিক্রি করে আধিয়ার ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছিল। অভিজিৎ সেন কর্মজীবনে এসব নিয়ে অনেক কাজ করেছিলেন, তাই সাংবাদিকের মতো তথ্য দিয়েই বিশ্লেষণ করেছেন। রাখালের মতো দাঙ্গাবাজ লোকেরা সস্তায় আধিজমি কিনে নিয়েছিল।

এবার বিরোধটা রাখাল ও পরশুরামের মধ্যে দানা বাঁধে। শচীকান্তের জমি বিক্রির খবর তার ছেলে চিঠি দিয়ে জানালে সেই চিঠির পাঠ শুনতে শুনতে আস্তিকের পরিবারের বারোজন সদস্যের সামনে আস্তিকের দেহ থেকে প্রাণ বেরিয়ে যায়। বাবার মৃত্যু পরশুরামকে আরও একরোখা করে তুলেছিল, শচীকান্তের বেইমানি ও পিতৃহারার যন্ত্রণা নিয়েও 'বাপের বিরাট ব্যক্তিত্বের উত্তরাধিকার' নিয়েছিল।

ভূমিসংস্কারের সময় আধিয়ার দাবি জানালে আধিয়ায়ের নামে জমি রেকর্ড হত, দাবি না জানালে হত না। আবার বর্গা রেকর্ড হওয়া না হওয়ার অনেক কারণ ছিল, যেমন অসৎ সরকারি কর্মচারী, অসৎ রাজনৈতিক ব্যক্তি এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তির প্রভাব। অভিজিৎ সেন লক্ষ করেছিলেন—

> ভূমিসংস্কার, ভূমি অধিগ্রহণ এবং সেটেলমেন্ট, এই বিভাগগুলিতে যারা কাজ করে তাদের মধ্যে এক দল খুব খুশি। এইসব বিভাগের আইনে যত ধারা, তার বহুগুণ উপধারা। আইনের সংখ্যা যত বাড়ে, ফ্যাকড়া তত বাড়ে। ফ্যাকড়া যত বাড়ে পয়সা আসার অলিগলি ততই বেশি করে গজিয়ে ওঠে।[৬০]

এসব সত্ত্বেও সার্কেল ইন্সপেক্টর ও জে.এল.আর-এর রিপোর্ট পরশুরাম ও বিশ্বর সপক্ষে রাখালের বিপক্ষে গেলে রাখাল অন্যভাবে জটিলতা তৈরি করেছিল। থানার অফিসারকে বড়ো মাছের লোভ দেখিয়েছিল, কিন্তু অফিসার মাছ তো খাবেই তার সঙ্গে বিশ্বর মেয়ে সারির ডাগর শরীর দেখে লালায়িত হয়েছিল। পদাধিকারীদের ইচ্ছেমতো খাবার সুযোগ এসেছে। অবস্থাপন্ন জোতদার রাখাল, টাকা দিয়ে জমি কিনেছিল সে, তার কাছে মা বোনের থেকে টাকার মূল্য অনেক। পরশুরামকে টাকা দিয়ে জমির অধিকার ছেড়ে দিতে বলে কারণ সে জানত সরকারের ভূমিসংস্কার কাজে মাঠে ডিপ টিউবওয়েল বসলে জমির দাম ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাবে। এই কারণে যেভাবেই হোক জমি হস্তগত করতেই হবে। কিন্তু পরশুরাম জমির অধিকার ধরে রাখতে চেয়েছিল অন্য কারণে—

> ঘরৎ হামার খানেআলা বারোঝনা। জমি বেহাত হলে অ্যামকাই মরব, জমি রাখবা ঝদি মরবা হয়, বহুৎ আচ্ছা।[৬১]

পরশুরাম টাকায় যখন ভোলেনি তখন জমি শাসনের সাবেক পদ্ধতিগুলো রপ্ত করতে শুরু করেছিল রাখাল। সময়টা খুব গোলমেলে ছিল, সবাই চারিদিক থেকে ফন্দিফিকির করত।

নীচুস্তরের রাজনৈতিক নেতারা উপরে কৃষকের শুভাকাঙ্ক্ষী হবার নাটক করেছিল রাজনীতির স্বার্থে, দল বাড়াতে। কংগ্রেসের আমলে যখন ভাঙ্গি মৌজায় সাহাবুদ্দিন দাইয়ের একশো একরের বেশি জমি ভেস্ট হলে সেই জমি বিলি করতে গিয়ে ব্যাপক হারে স্বজন-পোষণ হয়েছিল। এক একটা পাট্টার দাম পঞ্চাশ থেকে পাঁচশো টাকা পর্যন্ত উঠেছিল। কিন্তু সময় বদলেছে কৃষক সচেতন হয়েছে, সরকারি পাট্টা বিলির তোয়াক্কা না করেই রাতারাতি তারা দখল নেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। নিজের লড়াই নিজেরাই লড়তে চেয়েছিল। সরকারি আইন আরও সচেতন করে তুলেছিল, এখন পরশুরাম পাট্টা বিলি সম্পর্কেও জেনে গেছে 'বিলি করিচ্ছে সব নেতাগুলার নিজেদের লোকগুলাক্ বা টাকা খেয়্যে'। এছাড়াও এর আগে সবথেকে খারাপ, নীচু আর দূরের জমি আদিবাসী পোলিয়াদের মধ্যে বিলি করা হয়েছিল। লেখক নিজে রাজনীতির লোক ছিলেন, তাই তিনি জানতেন, রাজনীতিতে শাসক যখন সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠে তখন আদর্শ ও অনাদর্শের মধ্যে দলীয় কোন্দল, দলবদলের রাজনীতি, কৃষকের স্বার্থের নামে রাজনীতি করার সুযোগ নেওয়া, স্বজন-পোষণ এসব চলতে থাকবে, এসব আজকের রাজনীতিরও অঙ্গ যা আশির দশকে অভিজিৎ সেন প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ব্যাংক কর্মী হওয়ার সুবাদে বর্গা রেকর্ডের বিষয়টাও তাঁর অজানা ছিল না। পরশুরাম তাঁর দেখা মানুষ ছিল, অভিজিৎ সেন বলেছিলেন—

> বিদেশী মাহাত নামে এক ব্যক্তির কথা মনে পড়ে। ১৯৮০-১৯৮১ সালে বামফ্রন্ট সরকারের অপারেশন বর্গা কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত হয়েছিলাম। বিদেশী স্থানীয় একজন জোতদারের সাত-আট বিঘা জমি বর্গা বা আধিসত্ত্বে চাষ করত...। বিদেশী সম্ভবত তাঁর ছেলের পীড়নে ব্যাংকে আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলেন। প্রথমেই জিজ্ঞেস করলাম, 'আধির পড়চা করিয়েছেন?' খুব বিস্মিত বিদেশী বললেন, 'জোতদারের সঙ্গে বেইমানি করমো?' বিদেশী বলেছিল বর্গা রেকর্ড আইন হলেও আসলে বেইমানি...। কিন্তু বিদেশী আধি রেকর্ড করাননি। তাঁর জোতদারকেও আমি চিনতাম। মাঝারি মাপের জোতদার তিনি। অধিকন্তু সামাজিক অবস্থানের কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার চাকরি করতেন তিনি।[৬২]

লেখকের এই বিদেশী মাহাতোই এই উপন্যাসের আস্তিক মাল। তার জোতদারকেও গোকুল মাস্টার বা শচীকান্ত দুজনের চরিত্রে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়। 'দেবাংশী' গল্পের দেবাংশী চরিত্র নির্মাণে ভবানী বর্মন নামে এক ব্যক্তির আদল আছে এমন কথা অভিজিৎ সেন বলেছিলেন। তাঁর চরিত্ররা বেশিরভাগ মাটি থেকেই উঠে এসেছিল।

শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি থেকে শুরু হত কৃষকের চরম দুর্দশা। মাঠের কাজ তখন শেষ সীমায়, ফসলের দিকে অপলক তাকিয়ে দু-মুঠো ভাতের অপেক্ষা করত চাষিরা। শরীরে বস্ত্র অপ্রতুল যুবতী, শিশু, রমনীরা নয়ানজুলিতে উবু হয়ে কিংবা পাট পচা জলে একাগ্র ভাবে তাদের ভাগ্যকে হাতরাতে থাকত, কেউ আবার একটা মুরগির থেকেও কম মূল্যে নিজের যৌবন বিক্রি করত, গরিব কৃষকের জীবন মূল্যহীন ছিল। রাখাল এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে দেদার ধান দাদন দিয়েছিল, দেড়া দুনা শর্তে ফিরে পাবার কথা না ভেবে, কারণ সে পরশুরামের জমি দখলের জন্য এভাবে লোক কিনেছিল। গোকুল মাস্টার ওপাড় বাংলা থেকে একাত্তরে এসে একটি চাকরি ও বিশ একর জমি খুব কম সময়ে সংগ্রহ করেছিল। দুই বাংলা মিলিয়ে একটি গোপন দল নিয়ে তার ব্যাবসাও বেশ রমরমিয়ে চলছিল। এমন একটি সঙ্গী পেয়ে রাখাল যথেষ্ট শক্তিশালী মনে করেছিল নিজেকে। পরশুরামের লড়াইটা অনেক কঠিন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরশুরাম দৈত্য বংশের সেই উত্তরাধিকার যে জমির জন্য জান দিতে ও নিতে পারত। এরই মধ্যে কৃষকদের যে একটা শ্রেণিচেতনা জেগে উঠেছিল, সংঘবদ্ধ কৃষক যে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে অধিকার বুঝে নিতে চাইছিল তা বোঝা গেল যখন বিম্বর মেয়ে সারির স্বামী বৈশাখ মালকে গোরু চুরির দায়ে পুলিশ ধরতে এসেছিল। ওসি, সারিকে লালসার শিকার করতে পারেনি এবার তার প্রতিশোধের সুযোগ এসেছে। পুলিশের সঙ্গে বৈশাখের ধস্তাধস্তি বাকবিতণ্ডার মধ্য দিয়ে পুরো একটা যুদ্ধক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল। সারি দা হাতে রণমূর্তি ধারণ করেছে, ওসি রিভলবার তাক করেছিল—

> অন্তত শতখানেক মানুষ খোলা রাস্তায়, ঘরের সামনে, মাঠের কাদার মধ্যে কী যেন এক ইঙ্গিতের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। অনেকের হাতেই দা, শাবল, বল্লম, লাঠি প্রভৃতি নিতান্ত নিত্যব্যবহার্য অস্ত্র। সে রিভলবার আবার হোলস্টারে ভরে এবং তার মনের পর্দায় চল্লিশ বছর আগের মৈনুল খাঁ নামক এক দারোগার তৈরি আস্তিক মালের ডোসিয়ারের বিবর্ণ পাতা পুনর্মুদ্রিত হয়। সে আবার ঘুরে সারির দিকে তাকায়, ততক্ষণে সারির পাশে আরও তিন-চারটি সমবয়স্ক মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে...। ও সি তার চার কনস্টেবলের দিকে তাকায়। দুজনের পায়ে টায়ারের চপ্পল, শীর্ণ শরীর, ভালো করে রাইফেল তুলবারও শক্তি নেই।[৬৩]

এভাবেই অভিজিৎ সেন শ্রেণিচেতনাকে ব্যাখ্যা করেছেন, কৃষকেরা জোটবদ্ধ হয়েছে, এখানে এক একটি নারী পুরুষ আলাদা আলাদা নয় একটি সংগ্রামের সৈনিক তারা। সামন্ততন্ত্র ও ভ্রষ্ট ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার যথাযথ সময় ছিল এটা। আস্তিক মাল, পরশুরাম কেউ

একক চরিত্র নয়, শ্রেণি প্রতিনিধি। কনস্টেবলের শীর্ণ শরীরে রাইফেল তুলবার ক্ষমতা ছিল না, অর্থাৎ বিক্রিত প্রশাসনের অত্যাচারের শক্তি ফুরিয়ে এসেছিল মানুষের জাগরণে।

এই উপন্যাসে আছে আইনে স্বত্বদখল, অনুমতি দখল, বর্গাদখল, ও জবর দখল এই চাররকম দখলের মধ্যে সবথেকে দুর্বল বর্গাদখল। রাখাল ও গোকুল জবর দখলের ছক তৈরি করে স্থানীয় লোক না পেয়ে ট্রাকে করে গুণ্ডা ভাড়া করে এনেছিল। প্রথমেই পরশুরামের রোওয়া ধান নষ্ট করেছে কিন্তু রাখাল ও গোকুল ভাবতে পারেনি যা তাই হয়েছিল, 'প্রতিপক্ষের সাংগঠনিক শক্তিকে বিন্দুমাত্র ধারণা করতে পারেনি' কৃষকদের প্রত্যাঘাতে গুণ্ডারা পালিয়ে বেঁচেছিল। রাখাল পুলিশের কাছে ধরা দিয়েছিল। পরশুরাম সমস্ত সহযোদ্ধাদের শান্ত করে সর্বসমক্ষে তার পূর্ব পুরুষের বিশ্বস্ততার কথা এবং তাদের মতো গরিব কৃষকের জীবনে জমির মূল্য সম্পর্কে সোচ্চারে বলতে থাকে। আধি জমির এই একটি লড়াই সংক্রমণের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল কাশিয়ানির পার্শ্ববর্তী এলাকায়। পরশুরামের সফল প্রতিরোধের ফল দেখা গিয়েছেল, আরও কয়েকটি ছোটো ছোটো প্রতিরোধের মাধ্যমে। পরশুরাম, বৈশাখ, বিম্ব আইনের জালে জড়িয়ে গেলেও কিন্তু নিজেদের ধান মান নারীর আব্রু রক্ষায় কোনো আপসে যেতে রাজি হয়নি। পরশুরামের মধ্যে আন্দোলনের প্রবাহ ছুটছিল, আগের মানুষ ছিল না সে, সমস্ত আধিয়ারের অভিভাবক এখন সে, এ লড়াই তার একার নয়, এই লড়াইয়ের ফল সে একা ভোগ করতেও চায়নি, সমস্ত আধিয়ারের মধ্যে ভাগ করতে চেয়েছিল। তাইতো এস.ডি.ও দেখেছিল—

> একটি বেদীর ওপরে পরশুরাম মালের মূর্তির মতো চেহারা দু-হাত তোলা অবস্থায় সে এখান থেকেও দেখতে পায়। তাঁর হাত যেন আকাশে ঠেকছে। এত লোক জমা হয়েছিল! আশ্চর্য! বাইরে মানুষের কোলাহল, গর্জন। পরশুরাম তেমনই আকাশ ছুঁয়ে থাকে। কোলাহল স্তব্ধ হয়। পরশুরাম আকাশ ছেড়ে মাটিকে স্পর্শ করে। জলভরা মেঘ-গর্জনের মতো এখন তার কণ্ঠস্বর, ই মাটি হামার মাও, হামার কপাল পোড়া, তাই হামার খোরৎ আধি থাকে। ই সন আধা ভাগ নাই, মাওয়ের তিনভাগ খালাস কইরলাম। —প্রবল সমর্থন। —জোতদার সিকি ভাগ পামেন —প্রবলতর গর্জন। —হামলা হলে এক ছটাক ধানও দিমো না। —ছেদহীন গর্জন।[৬৪]

অভিজিৎ সেনের 'আইন-শৃঙ্খলা' গল্পে কৃষক টুইলা বর্মনকে খুন করা হয়েছিল, সে ছিল লড়াকু ও সফল চাষি। তার মৃত্যুর পর তার নবজাত শিশুর উদ্দাম চিৎকারে কাঁচের জানালা দরজা ঝন্‌ঝন্ করে উঠেছিল। এই চিৎকার আসলে টুইলার সংগ্রামকে জিইয়ে রাখার

সংকেত ছিল। এখানেও পরশুরাম সেই সংগ্রামকে ছড়িয়ে দিয়েছিল গোষ্ঠীর মধ্যে। পরশুরামদের এই লড়াই শুধু রাখাল ও গোকুলের বিরুদ্ধে ছিল না, সম্পূর্ণ মালিক শ্রেণির বিরুদ্ধে ছিল।

খ। *ক্রান্তিবলয়*

ক্রান্তিবলয় উপন্যাসটি **১৯৮১** সালে আংশিক এবং **১৯৮৫** সালে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পেয়েছিল। এই উপন্যাসেও বর্গাচাষিদের প্রতি জোতদারের শোষণ ও অত্যাচার, কৃষকের প্রতিরোধ, আন্দোলন আর এসবের মধ্যে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এসব বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও ব্যাপকভাবে তেভাগা আন্দোলনের কথা এসেছে। *বর্গক্ষেত্র* উপন্যাসের কাহিনিতে বর্গাদারের যে অবস্থার কথা বলা আছে *ক্রান্তিবলয়* তে তার পূর্বের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। তেভাগা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কৃষক সংগঠিত হয়েছিল, তেভাগার শহীদ এদের অনুপ্রেরণা। দুটি উপন্যাসের প্রেক্ষাপট দক্ষিণ দিনাজপুর, কাহিনিগত সংস্থান অনেকটাই এক। প্রশাসনের সঙ্গে জোতদারের সম্পর্ক ভালো থাকার ফলে জোতদার প্রশাসনকে দিয়ে ভাগচাষিদের শায়েস্তা করত, মামলা দিয়ে অথবা সরাসরি অত্যাচার করে। *ক্রান্তিবলয়* উপন্যাসে আছে জোতদার চাষিদের উদ্দেশ্য নিয়ে ক্ষেপিয়ে তুলত তারপর পুলিশকে লেলিয়ে দিত। *বর্গক্ষেত্র* উপন্যাসেও দেখি কৃষকের উপর কীভাবে নানা ধারায় মামলা, অপবাদ দিয়ে সরাসরি প্রহার করা হত। জোতদারের সঙ্গে রাজনৈতিক নেতার সম্পর্ক এখানেও আছে, প্রভাবশালী হারা সম্পর্কে মহীপদ তাই বলেছিল 'এরা থাকলে আমরা আছি। আমরা না থাকলে এদের খুব অসুবিধা নাও হতে পারে।' *বর্গক্ষেত্র* উপন্যাসেও ও.সির সঙ্গে জোতদার রাখালের লেনদেনের সম্পর্ক, অসৎ রাজনৈতিক কর্মীরা নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে অসৎ কাজে ঢুকে পড়েও সহজেই নিস্তার পেয়ে যেত, *ক্রান্তিবলয়*-এ পার্টির ক্যাডারকে জুয়ার বোর্ড থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করত আবার নেতারা ছাড়িয়ে নিয়ে যেত অন্যদিকে *বর্গক্ষেত্র* উপন্যাসেও দেখি যেসব গরু চুরি হয়ে বাংলাদেশে পাচার হয়ে যেত তাতে যখন পার্টির নেতা যুক্ত থাকলে তাকে গ্রেপ্তার করা করা হলেও পার্টি তার জামিন ও মামলার দেখাশোনা করেছে। আধিয়াররা বর্গাদারদের তেভাগার লড়াইকে নতুন করে জাগাতে চেয়েছিল, উপন্যাসে অভিজ্ঞ বৃদ্ধ রেংটার চোখে সেই আগুন আবার জ্বলে উঠেছিল তারপর কৃষকদের মধ্যে তা সঞ্চারিত হয়েছে। জোতদাররা হাটে হাটে ঘুরে অন্যায় তোলা সংগ্রহ করত, দুফরুর মাত্র দুটি লাউ বিক্রির টাকাও জোর করে কেড়ে নিয়েছিল জমিদারের লোক।

অন্যদিকে রাজনৈতিক সব দল টাকার এপিঠ আর ওপিঠ। যথেচ্ছ টাকা খরচ করলেও চাষির কথা কেউ ভাবত না। শোষণ আর বঞ্চনার বিরুদ্ধে চাষিরা নিজেদের লড়াই নিজেরাই লড়তে চেয়েছে। গোলা লুঠ, খদ্যশস্যর গাড়ি আটক, জোর করে জমি দখল এসব পন্থা অবলম্বন করেছিল। চাষিদের বলিদান দিতে হয়েছে অনেক কিছু। কৃষকের জমি হারানোর যন্ত্রণা, তেভাগার দুঃসাহসিকতার স্মৃতি, তাদের তিনভাগ নয়, পুরো চারভাগের লড়াইয়ে আহ্বান করেছিল। ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করার সময় সুযোগ নেই তাদের, পাশে দাঁড়ানোর মতো কোনো মেরুদণ্ড দেখতে পায়নি তারা, এ লড়াই চাষির একান্ত লড়াই, বউ বেটি, ধান আর মানের লড়াই। *ক্রান্তিবলয়* উপন্যাসে সংগ্রামের শুরুয়াত দেখিয়েছিলেন, প্রবল সঞ্চার *বর্গক্ষেত্র*-তে দেখালেন অভিজিৎ সেন। সর্বোপরি দুটি উপন্যাসের প্রাণকেন্দ্রে ছিল ভূমির জন্য জীবন বাজি রাখা সংগ্রাম, যে ভূমি যে মাটি চাষির মা, মেয়ে, সবকিছু।

পশ্চিমবঙ্গের বিরাট ভূমিসংস্কারের সঙ্গে অভিজিৎ সেন যুক্ত হয়েছিলেন যাকে তিনি বলেছেন 'সেতুবন্ধে কাঠবিড়ালির' ভূমিকা। গ্রামীণ ব্যাংকে কাজ করার সুবাদে গ্রামের বর্গা চাষিদের সঙ্গে সম্পর্ক, ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ দেবার প্রক্রিয়া এবং বর্গা আইনকে ভালোভাবে বোঝা এসবই লেখককে এই পর্যায়ের উপন্যাসের রসদ জুগিয়েছিল। বর্গাচাষির জীবনের সঙ্গে জোতদারের ভোগবিলাসপূর্ণ জীবন ও চেহারাকেও তুলে এনেছেন তিনি। হারা চৌধুরীর চেহারা, বয়স, মেজাজ, চরিত্র, হাবভাব তাকে যে তেজারতির শিরোমণি ও জোতদারের তকমা দিতে পারে তা লেখক প্রথমেই দেখিয়ে দিয়েছিলেন। 'হারা মূলত জোতদার' তেজারতি তার কাঁচা পয়সার জোগান দিলেও জোতদারি তার আসল শক্তির উৎস। যা দিয়ে সে ভারত, বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা ব্লকের এক নম্বর ব্যক্তি হয়ে উঠেছিল। বেনামে জমি দখল রাখা, যুদ্ধ-রাজনীতি প্রভৃতির উত্তাপে লক্ষ লক্ষ টাকা কামিয়ে নিত সে। হারা জানত জীবনে জমির মূল্য 'জমি থাকে মানুষের রক্তের মধ্যে, অস্থিতে মজ্জায়। জমি হল ক্ষমতা।' বাবা নগেনের মতো সে এটাও জানত জমি কীভাবে ধরে রাখতে হয়। নগেন মনে করত আইন না মানলেও চলবে কিন্তু নিয়ম মানতে হবে—

> আধি উচ্ছেদ করা, খুন করা, চুরি করা, ধর্ষণ করা, বাস্তুজমি থেকে উচ্ছেদ করা, ঘরে আগুন লাগানো, এইসব কাজ আইনের আওতায় এসে পড়ে। নগেনের মতে এগুলো না মানলেও চলে। কিন্তু থানা পুলিশকে তাঁবে রাখা, সরকারি লোককে প্রাপ্য সম্মানী, বি এস এফ কে খাসি খাওয়ানো ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো নিয়ম, এগুলো মানতেই হবে।[৬৫]

আসলে পুলিশ প্রশাসনের অসৎ সঙ্গ পেয়ে খলতার চরম পর্যায়ে বিচরণ করত নগেন ও হারার মতো জোতদার। সবাই মিলে একটা অসৎ দুনিয়া গড়ে তুলেছিল, গরিব মানুষকে দুঃখ কষ্ট দিয়ে এরা আনন্দ পেয়েছে নিজেদের বিকশিত করেছে ধনে-মানে।

উখনা নামক একটি গোটা ওঁরাওপ্রধান গ্রামের প্রায় পুরোটাই হারা চৌধুরীর আধিয়ার ছিল। এদের বিরুদ্ধে হারা দু-হাজার বিঘা আধি জমির মামলায় কোর্টে হেরে গিয়েছিল। এই খবর যথেষ্ট উত্তেজনার ছিল। এই উত্তেজনা শুধু হারার আদিয়ারদের মধ্যে নয়, উখনা গ্রামের স্কুল মাস্টার অনিলের কাছেও। উখনা গোলাঘাট, চিকরাশি, জলা, মানিকপুর প্রভৃতি গ্রামের 'নেংটা গরীব' বর্গাদারেরা জমির মালিক হবে একি চাট্টিখানি কথা। সেই তেভাগা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে আধিয়াররা জমির লড়াই চালিয়ে এসেছিল তারা আজ জমির মালিক হবে। হারা চৌধুরীর মামলা হারার খবর কৌশল্যাকে অস্বাভাবিক করে তুলেছে, যার স্বামী বিরসা তেভাগার লড়াইয়ে শহিদ হয়েছিল। কৌশল্যা 'তেভাগার বিটি' তার স্বামীর লড়াইয়ের ফল পাবে সে ও অনেকে, তাই তার উপলব্ধি অনেক উঁচুতে। কৌশল্যার জন্মই হয়েছিল তেভাগার সময়, পুলিশের গুলিতে যখন চিয়ার সাই, হপন, যশোদার মতো একে একে শহিদ হয়েছিল। খাঁপুরে পুলিশের অভিযান আটকাতে যে খানা খুঁড়েছিল তেভাগার কৃষকরা, তা দিয়ে অনেক রক্ত গড়িয়ে গেছে। এসব সময়ের এক রাতে খাঁপুর থেকে উখনা যাওয়ার পথে খাটিয়ার ডুলিতে রাতিনী কৌশল্যাকে জন্ম দিয়েছিল। 'তেভাগা বিটি' কৌশল্যার নাড়ি কাটার জন্য বাঁশের চটা নয় ব্যবহৃত হয়েছিল তালগাছা কাটা এবং জোতদারের মাথা নামানো যায় এমন 'হেস্যা'। 'তেভাগার বিটি'র নাড়ি পোঁতা হয়েছিল জোতদারের জমিতে—

> জোতদারের জমিৎ রাখলাম তেভাগার বিটির নাড়। আগলা সনে ধান হোবে কেমন দেখো। আর ই মাঠে ঝান্ডা বসাবো পরথমে। তেভাগার পয়লা লড়াই হোবে ইখানে, আর সি লড়াইতে হামরা জিতম।[৬৬]

তারপর আধিয়ার বর্গাদার দিনমজুরের লড়াই চলেছিল, তেভাগার আইন হয়েছিল কিন্তু কাগজেই সে আইন থেকে গেছে। আধিয়ার বর্গাদারের খামারে ফসল ওঠেনি, জমি ও ফসলের অধিকারীও হয়নি এরা। অনিল মাস্টার হারা চৌধুরীর হেরে যাবার খবর দিয়ে কৌশল্যার মধ্যেকার সুপ্ত উদ্বেগকে জাগিয়ে দিয়েছিল। তেভাগার সঙ্গে যুক্ত কাকার কথা

মনে করে অনিলেরও উত্তেজনা হয়েছিল। হারা চৌধুরীর মামলার বিষয়টা বিস্তারিত জানতে চেয়েছে বিমলের কাছে। বিমল অবাক হয়ে বলেছিল 'তাতে তোমার কী দরকার?' সেই অর্থে অনিলের দরকার ছিল না তবে তামাম বর্গাদারের দরকারেই সে তৃপ্ত হবে। সারাজীবন খড়কুটোর মতো ভেসে যাওয়া একাকী জীবনে, কংগ্রেসি হওয়ার সুবাদে বয়স ভাড়িয়ে একটা মাস্টারির চাকরি জোগাড় করেছিল সে, তার চিন্তা চেতনায় অনেক ভাবনা এবার বাসা বেঁধেছে। উখনার সামাজিক জীবন তার মধ্যেও পরিবর্তন এনেছিল। তেভাগার সৈনিক বৃদ্ধ রেংটার মুখে বিপ্লবের কথা শুনতে শুনতে সেই দৃশ্য অনিলের চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল—

> ই দেখো তিরিশ সাল আগে হামরা তেভাগা লড়লাম। কোত্তো মানুষ জাহান দিল, কোত্তো মানুষ জেহেল গেল, কোত্তো মানুষের ঘরবাড়ি জ্বলে গেল, তবু হামরা এককাট্টা রইলাম। জান দিব তবু ধান দিব না। হিন্দু মুসলমান, সাঁতাল, ওরাং, পোলিয়া, রাজবংশী কেমন একসাথ লড়াই করলাম।[৬৭]

বৃদ্ধ রেংটা আরও বলেছিল 'লাঙ্গল যার জমি তার' একথা ঠিক নয়, জোতদারের কুড়ি বাইশ জোড়া হাল তাহলে তো জমি তার, তেভাগার যোদ্ধারা তাই বলতে শুরু করেছিল 'লাঙ্গল ঠেলে যি, জমির মালিক সি।' এসব কথা শুনতে শুনতে অনিল বিহ্বল হয়ে আরও শুনেছিল তখনকার রাজনীতির কথা নেতার কথা, নেতাদের মধ্যে যে জমির মালিক সেও আধা নেয়, আধার পুরোটাই 'কট, বন্দক, চেকফর্ক, রেহান, খাই-খালাসি বেগার, পারাবি, আবয়াব, তোলাগণ্ডি হিসাবে দিতে হয়।' বুড়ো বয়সে রেংটার শরীরেও জোতদারের জমি দখল ও গোলা লুঠের মাতন লেগেছিল। লুটের টাকা দিয়ে ফ্রন্টের পার্টি জিপ কিনে গ্রাম ঘুরে প্রচার ও বক্তৃতা করেছে। নেতাদের দালান বাড়ি হয়েছে তাদের বউ, শালা, শালি, ভাই, বোনের চাকরি হয়েছে, আসলে এসব গরিব কৃষকদের উসকিয়ে নেতারা লুটে নিয়েছিল। অভিজ্ঞতায় বৃদ্ধ রেংটা অনিল মাস্টারকে সমাজ রাজনীতি ভালো-মন্দের পাঠ পড়িয়ে দিয়েছিল। যা অনিলের বোধ বুদ্ধিতে সত্য বলে মনে হয়েছিল তাই সে রেংটার কোনো কথার বিরোধ করেনি। বরং তার নিজের যন্ত্রণাদায়ক অতীত চোখের সামনে উঠে আসতে থাকে একে একে। বাবা মায়ের মৃত্যু, দেশত্যাগ, চাকরির জন্য পার্টিতে উমেদারি করা, পার্টির লোকের নীচতা, স্বার্থপরতা, লুঠ ও টাকা ভাগ নিয়ে পার্টির মধ্যে মারামারি আরও অনেক কিছু। একাকী জীবনের সঙ্গে, ভাগচাষির দুর্ভাগ্য আরও বিষন্ন করেছিল অনিলকে।

দুফরু নামের রাজবংশী মধ্যবয়সী লোকটি তাড়ি পান করতে করতে হাহাকার করে কেঁদে উঠেছিল কারণ তার গাভীন হওয়ার বয়সী ছাগল বেচে সে বউ-মেয়ের শাড়ি কিনবে বলেই হাটে এনেছিল কিন্তু সেটা তোলাবটি হয়েছে। হাটের মালিক জমিদার, তোলাবটি তার হক, ফলে তার স্বেচ্ছাচার সবাইকে মেনে নিতে হত। দুফরু আগের হাটে মাত্র দুটো লাউ এনেছিল তাই বিশেষ কিছু তোলা দিতে পারেনি, পরের হাটে পুষিয়ে দেবে বলেছিল, কিন্তু 'জমিদারের লোক পুষিয়ে নিয়েছে।' দিনাজপুরের মেলা ও হাটগুলো জমিদার জোতদারদের কাছে শস্যখেতের থেকে মূল্যবান কারণ এখান থেকে হাটতোলা ও পারানি অর্থাৎ জবরদস্তি পয়সা আদায় হত। কাজেই সবাই বুঝতেই পেরেছিল দুফরুর হাহাকারের রহস্য। মানুষের মধ্যে ক্রোধের সঞ্চার হয়েছিল 'তোলাবটি বন্ধ করবা হোবে' এই অভিপ্রায়ে ইজারাদারদের ঘর ভেঙে আগুনে পুড়িয়েছিল উত্তেজিত দুফরু ও তার সাথীরা। জলপাইগুড়িতে এই আন্দোলন শুরু হলেও দিনাজপুর থেকে ব্যাপক আকার পেয়েছিল। কৃষকের জমির আন্দোলনের অনুসঙ্গে এসব অত্যাচারের বিরুদ্ধেও সংঘটিত হয়েছিল কৃষকরা। এসব ঘটনা ১৯৩৯ এর, এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, তারপর দুর্ভিক্ষ কৃষকদের জীবনে চরম সংকট নেমে এসেছে। বিহার, উত্তরপ্রদেশ যখন দাঙ্গা কবলিত, কংগ্রেস ও লীগের নেতারা দিল্লিতে মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে ব্যস্ত। কৃষকের চাষের কোনো সামগ্রী নেই, এই দুর্দিনেই তেভাগার লড়াই হয়েছিল—

> বাংলাদেশের কৃষক অভূতপূর্ব সংহতিতে তেভাগার আশ্চর্য লড়াইটি দেখাল। দেখাল অগণিত আত্মদানের দৃষ্টান্ত। দেখাল সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত সহমর্মিতার উজ্জ্বল চিত্র, দেখাল কম্যুনিস্ট পার্টি এবং কৃষকসভার দুর্বলতা।[৬৮]

সম্প্রদায় নির্বিশেষে এই লড়াই নেতৃত্বের চোখে আঙুল দিয়ে কৃষকের একতাকে দেখিয়ে দিয়েছিল। আসলে যন্ত্রণা, বেদনায় হিন্দু-মুসলমান কৃষকরা একই সারিতে ছিল। তারা সবাই বর্গাদার ভূমিহীন খেতমজুর। তবুও কৃষক সভার নেতৃত্ব সাহাবুদ্দিন ও চিয়ার সাইয়ের বলিদানকে গুরুত্ব দেয়নি। ভূমিদাস ও ভূমিহীন খেতমজুরদের অগ্রণী ভূমিকা ছিল তেভাগায় কিন্তু তাদের দাবির কথা গুরুত্ব পায়নি তেভাগার স্লোগানে।

হারা চৌধুরীর মামলা হেরে যাওয়ার একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে এটা স্বাভাবিক। জলাতে স্মাগলিং বেড়ে যায়, চারদিক থেকে হারার অর্থ আসতে থাকে। হারা চৌধুরী সাফল্য

আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিরসা যেভাবে খুন হয়েছিল তারপর হাজার দশেক কৃষকের সভা থেকে বৃদ্ধ রেংটা হারা চৌধুরীর গুষ্টিশুদ্ধ জ্বালিয়ে দেবার ডাক দেয় এই ডাক দীর্ঘায়ত হয়ে কোরাস হয়েছিল। বিরসা যখন খুন হয়েছিল তখন স্লোগান উঠেছিল 'কৃষক হত্যাকারী জোতদারের রক্ত চাই।' আবার 'জোতদার জমিচোরকে কুপিয়ে মার!' ইত্যাদি। কৌশল্যাও জোতদারের ধান কাটার সুখ পেয়েছিল, মৃত বিরসাও যেন কিছু নির্দেশ দিয়েছে এদের, যে নির্দেশে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ দশদিক ছারখার করে দিতে পারত। রেংটাও সেই নির্দেশ দিয়েছিল, সেই রেংটা এখন অনেক বৃদ্ধ হয়েছে, সময় অনেক গড়িয়েছে কিন্তু তেভাগার বত্রিশ বছর পরেও হারা তার আধিয়ারদের থেকে আধা ধান ঠিক মাপে পেয়ে যেত। সরকারি দপ্তরে আইনের খাতার পরিবর্তন হয়েছে শুধু অন্য কোথাও কিছু পরিবর্তন হয়নি, তেভাগার ঝটিকাকেন্দ্র দিনাজপুরেও জোতদার আধা ভাগ পাচ্ছিল, এ নিয়ে কারো বিশেষ প্রতিক্রিয়া ছিল না। পার্টির অনেকেই বা তাদের পরিবারের কেউ কেউ বেশ কিছু জমির মালিক ফলে তারাও এসব নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাত না। হারা চৌধুরী এত সহজে দমে যায়নি, দু-হাজার বিঘা দেবোত্তর জমি ভেস্ট হলে কংগ্রেসি নেতার কাছে নালিশ জানিয়েছিল, কারণ ভোটে দশ হাজার টাকা চাঁদা দিত সে। কিন্তু যুব নেতা শিবুর কাছে অপদস্ত হয়ে ফিরে আসতে হয়েছিল। শিবুর বাবার তিনশো বিঘা জমি ভেস্ট হয়েছিল, তা থেকে অর্ধেকের বেশি বিক্রিও হয়েছিল। সরকার কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারেনি। অভিজ্ঞ মহীপদ হারার বন্ধুস্থানীয় তাই এসব কথা শিবুকে মনে করিয়ে দিয়েছিল। তারপর শিবুকে আসল কথাটা বলেছিল—

> একটু হুঁশ রেখে কথা বোল বাপু। একটা কথা মনে রেখো, ...এরা থাকলে আমরা আছি। আমরা না থাকলে এদের খুব অসুবিধা নাও হতে পারে।[৬৯]

মহীপদর মতো অনেক নেতাই নিজের অবস্থানের সুযোগ নিতে ছাড়ে না, কৃষকদের চাহিদা কম তাদের ভোটের সময় একবার দরকার হয় শুধু কিন্তু জোতদারকে বার বার দরকার হয়। বর্গা আইনের নিয়ম অনুযায়ী অতিরিক্ত জমি সরকারে ন্যস্ত হবে, যদি বর্গা থাকে সাড়ে সাত বিঘার পাট্টা পাবে, বাড়তি জমি সরকারের খাতায় যাবে। হারার ভেস্ট জমি নিয়ে তার আবাল্য সাথী লোচন ব্যাবসা শুরু করেছিল। ভেস্ট জমি বর্গাদারদের মধ্যে বন্টন হবে তাই বর্গাচাষি জোতদারের রসিদ দেখিয়ে বর্গা রেকর্ডের আবেদন করতে পারত। ইস্তিফান নামের বর্গাচাষি রসিদ আনতে গিয়েছিল হারার কাছে কিন্তু লোচনের টোপ খেয়ে পরেরবার টাকা

নিয়ে হাজির হয়েছে জমি কিনতে। সুচতুর লোচন জানত এই ঘটনার ভবিষ্যৎ। কিছুদিনের মধ্যে বেশ ভালোই টাকা আসতে থাকে, সরকারি অফিসারের মতো হারা শুধু সই দিচ্ছিল রসিদে। ভেস্ট জমির এভাবেই রসিদ দিতে থেকেছে হারা ও লোচন। হারা লোচনের বুদ্ধির প্রশংসা করেছিল। হারা কিছুটা ভয় পেলেও লোচন তাকে অভয় দিয়েছিল—

—থাম হারা, ডরাস না। খুনখারাবি ইবার দ্যাখ্ নেংটাগুলো নিজেরা করবি, তুই হামি দেখমো।[৭০]

লোচন একই দাগের জমির রসিদ অনেককে দিয়ে একটা দাঙ্গা বাঁধাতে চেয়েছিল। কারণ জমি তেমনই জিনিস যার জন্য খুন হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। ফলে রাজনৈতিক মহলেও একটা কর্মব্যস্ততা শুরু হয়েছিল, পাইয়ে দেবার কৌশলে নেতাদের টাকা আসতে থাকে। অন্যদিকে গরিব বর্গাদার থেকে দিনমজুর সবাই টাকা জোগাড় করতে ব্যস্ত হয়, মাতব্বরকে টাকা খাইয়ে এক টুকরো ভেস্ট জমির কাগজ যাতে পাওয়া যায়। সবমিলিয়ে হারার পরাজয়ের আঘাতে কিছুটা উপশম হয়েছিল এভাবে।

অনিল মাস্টার দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছিল, সামাজিক নানান ওঠা পড়া মানুষের দুর্দশা দেখতে দেখতে নিজেকে বড়ো একাকী দেখেছিল সে। কিন্তু প্রফুল্লের মতো মাস্টার স্কুল না এসেও মাইনে নেয়, লোন নিয়ে শহরে ব্যাবসা করেছিল বেনামে, গ্রামে দাদন দিত জোতজমি বাড়িয়েছিল আর এসবই সম্ভব রাজনৈতিক ক্ষমতায় আর লোভে। অনিল ও শচীনের মতো মাস্টার অনেক চেষ্টা করেও গ্রামের আদিবাসী সাঁওতালদের শিক্ষিত করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি কারণ শয়ে শয়ে প্রফুল্ল এসে বাধা দিয়েছে। অনিল গ্রামের দরিদ্র মানুষের কষ্ট ও জোতদারের ফুলেফেঁপে ওঠা দেখে বলেছিল নকশালরা প্রাণ দিয়েছে কিন্তু আমার মতো এত দরিদ্র মানুষকে তারা দেখেনি। কৌশল্যা রেংটা তাকে ভিতরে ভিতরে তাড়া করেছিল। অনৈতিকতা অসততার পরিবেশ অনিলের মানসিক পরিবর্তন এনে দিইয়েছিল ক্রমে। এই পরিবর্তন বোঝা গিয়েছিল হাটখোলায় কালী পুজো উপলক্ষে ছেলে ছোকড়াদের চাঁদা আদায়ের পদ্ধতিতে, যখন টাকা দিতে অপারগ বয়স্ক লোকেদের হেনস্থা করা হয়েছিল। এক বৃদ্ধর কাতর আর্তি যা অন্য লোকেদের কানে গেলেও আমল দেয়নি অল্পবয়স্করা কিন্তু অনিল আমল দিয়েছিল। তার মনে পড়েছে রেংটার মুখে চেক, ফর্ক, রেহান, বন্দকি প্রভৃতির কথা। অনিল অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ছোকড়াদের সঙ্গে মারপিটে জড়িয়ে হারার ছেলে কেশবের ব্লেডের গুরুতর আঘাতে হাসপাতালে শয্যাশায়ী

হয়েছিল। এসবে অনিলের স্বার্থ ছিল না কিছুই, তার কোনো পরিজন নেই, কোনো পিছুটান নেই, সে কারো বর্গাচাষিও নয় তবু গ্রামের সমস্ত বর্গাচাষি গরিব দিনমজুরের উপর অবিচারের প্রতিবাদে সামিল হয়ে নিজের দুর্দশা ডেকে এনেছিল। অনিলের পরিবর্তন সমাজে প্রভাব ফেলেছে, হাটে চাঁদা তোলা ও পাইকারের জুলুম বন্ধ হয়েছে, পুলিশ তাদের রাক্ষস প্রবৃত্তি বজায় রেখেও কিছুটা সক্রিয় হয়েছিল। অনিল অনেকগুলি সংঘঠিত মানুষের প্রতিবাদী সত্তাকে জাগিয়ে তুলেছিল একটা প্রতিবাদে। মানুষের মধ্যে অনেকদিন থেকেই প্রতিরোধের বারুদ সঞ্চিত ছিল শুধু একজন মর্যাদাবান মানুষের অগ্নি সংযোগের অপেক্ষায় ছিল। অনিল সেই অগ্নি সংযোগকারীর ভূমিকা নিয়েছে। অভিজিৎ সেন বারে বারে শ্রেণির এই জাগরণকে দেখিয়েছিলেন, শ্রেণিচেতনা ও জাগরণে নিজেই বিশ্বাসী ছিলেন, সামন্ততান্ত্রিক শোষণের লড়াইয়ে তিনি একক নয়, গোষ্ঠীবদ্ধ প্রতিবাদকে প্রাধ্যান্য দিয়েছিলেন। রেংটা বাস্‌কে ও বিখনা এই লড়াই নিয়ে আলোচনা করেছিল, অনিলের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেছে তারপর ভেস্ট জমির পাট্টা নিয়ে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ কীভাবে হচ্ছে সেটা নিয়েও আলোচনা করেছে। পার্টির ক্ষমতা অনুযায়ী ভেস্ট জমির পাট্টা প্রদানে স্বজন-পোষণ, টাকার লেনদেন এমন প্রচুর অনিয়ম চলতে থাকে। জোতদার, পার্টির লোক, পুলিশ সব মিলিয়ে বিরাট চক্রান্ত বর্গাচাষির বিপক্ষে। এইসব চক্রান্তের বিরুদ্ধে অনিল যে কবে থেকে তৈরি হতে শুরু করেছিল তা সে নিজেই জানত না। মুখে প্রচুর সেলাইয়ের পর শুধু তার মুখমণ্ডলের চেহারা বদলে যায়নি, উপলব্ধিরও বদলেছিল। ভারত, বাংলাদেশের কৃষক সংগ্রামের ইতিহাস, আদিবাসীদের বিদ্রোহের ইতিহাস তাকে নতুন করে জাগিয়ে তুলেছিল, কৃষক আন্দোলনের একসময়ের শরিক কাকা বসন্ত ও রেংটা তার পথপ্রদর্শক। কাকার বাড়ি থেকে কমিউনিস্ট সাহিত্য পত্র-পত্রিকা কার্লস মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩), ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস (১৮২০-১৮৯৫), ভ্লাদিমির লেনিনের (১৮৭০-১৯২৪) বই নিয়ে এসেছিল, অনিল উপলব্ধি করেছিল নির্ঝঞ্ঝাট জীবনে সুখ নেই, এবার মুক্ত আকাশ অপর্যাপ্ত জীবন, অগণিত মানুষ দেখে মনে করেছিল সে বেঁচে আছে।

হারা চৌধুরী রসিদ লিখে প্রচুর টাকা রোজগার করেছিল, সি.পি.এমের লোক ঝামেলা করেও হারাকে কায়দা করতে পারেনি কারণ বর্গা রেকর্ডের ক্ষেত্রে জোতদারের রসিদ লাগত এটাই আইন ফলে হারা আইনের বিধান দেখিয়ে জোর পেয়েছিল। জমির পাট্টাপ্রার্থী মানুষগুলো আর নেতারা একে অপরকে ধরাধরি করতে লেগেছিল—

কিষক সোমস্যা কি সোমস্যা রে বাবা! বাপের ছান্ধে এতোদিক নজর কোরবা লাগে না। ধ্যাত্তেরি তোর ইয়া করিছে ওপ্‌রেশনবর্গার। আজ শালো পাছু পাছু ঘুরবা লাগিছে, এক বিঘা, দ্যাড় বিঘা জমি পাওয়াই দ্যাও ন্যাতা। হঁ হঁ, খরচাপাতি ঠিকই দিমো, তোমার লেগ্যে সব করমো। তুমি বুললে ইনকিলাব জিন্দাবাদ করমো, বন্দেমাতরম করমো, যুগ যুগ জিও করমো, বায়ে বুললে বায়ে যামো, ডাইনে বুললে ডাইনে যামো... [৭১]

কিন্তু বামফ্রন্টের পার্টির এত বিভাজন ও জোট চাষা মানুষগুলির বোধে আসেনি। এসবের মাঝে অনিল নায়ক হয়ে উঠেছিল, সে এখন যে কোনো হামলার শক্ত হাতে প্রতিকারের কথা ভাবে। হারার সাথী লোচন, ধান্দাবাজ স্বার্থপর মহিপদ, প্রফুল্ল অনিলকে একপ্রকার হুমকি দিতে এসেছিল, হারার জমির ব্যাপার ও বর্গাদারদের নেতৃত্ব থেকে সরে আসতে বললে অনিল রাতের বেলা তিনজন স্বার্থান্ধ লোককে অপমান করে বের করার সাহস করেছিল। এমনকি মহিপদর দেওয়া চাকরির তোয়াক্কা করেনি সে। অন্যদিকে হারা ঘোষের ভেস্ট জমির দখল নিয়ে আরও নাটক চলেছিল, একই জমিতে দুই পার্টির প্ররোচনায় দুই দল দুবার বিছন লাগিয়েছে ফলে দাঙ্গার পরিস্থিতি তৈরি হলে বৃদ্ধ রেংটা মাঝখানে এসে সেই দাঙ্গা থামিয়েছিল। কিছু জমিতে অনিলের চেষ্টায় বিরোধ দানা বাঁধেনি।

বৃদ্ধ রেংটা হা-হুতাশ করেছিল তেভাগার লড়াই শেষ হয়নি বলে। তার জীবনের শেষ দিকে অনিলকে বলেছিল মালিক আধাই ভাগ পায় চাষের কোনো খরচ না দিয়ে, সরকারের আইন মোতাবেক চার ভাগের একভাগ মালিকের, তিনভাগ চাষির, এই হিসাব কেউ মানছে না। রেংটা আধা ও তিনভাগ চায়নি, পুরোটাই চেয়েছিল। অনিলকে সেই লড়াইয়ের দায়িত্ব দিয়ে যায় রেংটা। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আদিবাসী সাঁওতাল ছেলে-মেয়েদের স্বপ্ন দেখানো, লেফট রাইট ও জাতীয় সঙ্গীত শেখানোর মতো সহজ হবে না রেংটার দেওয়া দায়িত্ব তা জানত অনিল। তবুও যুগ যুগ ধরে ক্ষমতাবান সামন্ত প্রভু, প্রশাসন, স্বার্থপর রাজনৈতিক নেতা এরা সবাই রোদে পোড়া অর্ধনগ্ন মানুষের কষ্ট দেখে আনন্দ পেয়ে এসেছিল। অনিলের মাথায় ‘ক্যাড়া’ ঢুকেছে এইসব রোদে পোড়া মানুষের মুক্তি চাই, অধিকার চাই সেই অভিপ্রায়েই কঠিন পথে ঝুঁকি নিতে চেয়েছে। পরশুরাম মালের মতো অনিলের জমির সঙ্গে নাড়ির যোগ না থাকলেও সেও হতে পারে মুক্তিপথের কাণ্ডারি।

গ। *হলুদ রঙের সূর্য*

জমির অধিকার লড়াই এসব থাকলে প্রতিপক্ষ নিশ্চই থাকবে। অভিজিৎ সেনের *বর্গক্ষেত্র* ও *ক্রান্তিবলয়* উপন্যাসে কৃষকদের জমি অধিকারের লড়াইয়ে মূল প্রতিপক্ষ ছিল জমিদার ও জোতদার। চাষিদের প্রাপ্য জমির অধিকার দিতে নারাজ জোতদারের সঙ্গে চাষির সরাসরি সংঘাত বেঁধেছিল। *হলুদ রঙের সূর্য* (১৯৯৬) উপন্যাসেও প্রেক্ষাপটও এমন। সত্তর দশকের গ্রামবাংলার যেসব পরিবর্তন হয়েছিল তার মধ্যে কৃষিব্যবস্থাও পড়ে। ভাগচাষিদের কষ্ট দূর করার সদিচ্ছা এসেছিল সরকারের, তাতে যে কৃষি ব্যবস্থার উন্নতিসাধন হয়েছিল একথা অস্বীকার করা যায় না কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই ভাগচাষিদের দুঃখ নিবারণ করা দুঃসাধ্য হয়ে গিয়েছিল। জোতদারের আধি উচ্ছেদ, জবরদখলের শক্তিপরীক্ষার সামনে নিরুপায় ছিল বর্গাচাষিরা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় প্রচুর মানুষ পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিল। একেবারে নিঃস্ব সহায়সম্বলহীন মানুষগুলো শিকড় উপড়ে এদেশে এসে প্রথমেই একটা বাসস্থানের খোঁজ করেছে। অভিজিৎ সেনের কথাসাহিত্যে এমন শেকড়ছেঁড়া অনেক মানুষকে দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমদিকের লেখা 'শেয়াল' নামের একটি গল্পে বাংলাদেশ থেকে আসা সহদেব বিশ্বাস সরকারি পাট্টায় জলা জংলা জমি চাষযোগ্য ও বাসযোগ্য করার চেষ্টা করেছিল। সেই জমিতে ঘাসের জঙ্গলে একপাল শেয়ালের সঙ্গে সহদেবকে মরনপণ যুদ্ধ করে জমির দখল নিতে হয়েছিল। শেয়াল ও সহদেব কেউ সেই জমির অধিকার ছাড়তে চায়নি। উভয়ে উভয়ের অনধিকার প্রবেশ মেনে নিতে পারেনি, শেষে সহদেব জয়ী হয়েও নিজেকে অনধিকারী মনে করে বিষণ্ণ হয়েছিল। এই উপন্যাসেও বাংলাদেশ থেকে এই দেশে চলে আসা আর এক সহদেব বিশ্বাসকে দেখা গিয়েছিল। গল্পের সহদেবকে যেভাবে হিংস্র পশুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে, উপন্যাসের সহদেবের বড়ো প্রতিদ্বন্দ্বী জোতদার। জোতদার এত লোভী যে সহদেবের কেনা জমিও কৌশলে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল। এসবই এই উপন্যাসের মূল প্রেক্ষাপট।

বাংলাদেশ থেকে যে সব হতভাগ্য মানুষ এদেশে এসে উদ্বাস্তু হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছিল যাদের প্রধান প্রয়োজন ছিল একটু বাসস্থান অভিজিৎ সেনের *হলুদ রঙের সূর্য* উপন্যাসে সহদেব বিশ্বাস তাদের দলপতি। বার বার নিগৃহীত হয়েও সে জমির সন্ধান করেছিল। অনেকগুলো মানুষ তার উপর নির্ভরশীল, একটা বসবাসের ভূমি তাকে পেতেই হবে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে খান সেনাদের সঙ্গে লড়াই করা সহদেব বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও আর

ফিরে যায়নি, এদেশেই কিছু একটা বন্দোবস্ত করে নিতে চেয়েছিল। এমন অনেকেই সেদিন দীর্ঘ অত্যাচারিত হওয়ার পর একটু শান্তির আশ্রয় পেতে চেয়ে এই দেশে থেকে গিয়েছিল। সহদেব দয়া ঘোষের পতিত ভূমি কিনে গোষ্ঠী নিয়ে বাস করতে শুরু করেছিল। চারিদিকে জলের মাঝে সামান্য জেগে থাকা বা আগাছার জঙ্গল ভরা দ্বীপ সহদেবের গোষ্ঠী বাসযোগ্য করে নিয়েছিল। এই জঙ্গলাকীর্ণ দ্বীপগুলি দয়া ঘোষের বা বনমালী ঘোষের পৈত্রিক সম্পত্তি ছিল না, আইনকে কাজে লাগিয়ে কৌশলে দখল করেছিল। মানুষের ব্যক্তিগত যুদ্ধে মানুষ বুঝতে পারে জীবনটাকে। সহদেব এক সাঁওতাল চাষির কাছ থেকে জানতে পেরেছিল যাদের প্রচুর জমি আছে দয়া ঘোষ ও বনমালী ঘোষের মতো লোকেরা তারা নাকি চাষ করে না সেভাবে। কিন্তু সহদেব বুঝেছিল একথা সত্যি নয়, কারণ এখন চাষে লাভের মুখ দেখছে চাষিরা, পশ্চিমবঙ্গে সরকার কৃষির উন্নতিকল্পে নানান প্রকল্প নিয়ে এসেছে। তবুও সহদেব দয়া ঘোষের উপর নির্ভর করে, শুধুমাত্র তার উপর নির্ভরশীল পঞ্চাশ ষাট ঘর মানুষের কথা ভেবে। পতিত দ্বীপ যা বেণীর গিঁট নামে পরিচিত, দয়া ঘোষের দখলীকৃত এই গিঁট বিক্রি করতে চাওয়ার অন্য কারণ অবশ্য ছিল। সে জানত—

> ১৯৬৭-এর ভেস্টের হাওয়া আবার নতুন করে উঠতে পারে যে-কোনো সময়ে। সরকার তখন রায়তদের উদ্‌বৃত্ত জমি সব খুঁজে খুঁজে ভেস্ট করছিল। তেমন যদি আবার হয়, যার সম্ভাবনা ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে, তা হলে বামনীর গিঁটগুলো সে আটকাবে কেমন করে। সাতষট্টি-আটষট্টিতে জমির অভাব ছিল না, কাজেই পতিত জমির দিকে মানুষের নজর পড়েনি। একাত্তরের পর জমির অভাব দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ হু হু করে আসছে। বামনীর গিঁট হস্তান্তরের এই হচ্ছে উপযুক্ত সময়।[৭২]

রায়তদের অনামী বেনামী জমি যা তারা দখল করে রেখেছিল ক্ষমতাবলে, সরকারের হস্তক্ষেপে সেগুলো ভেস্ট করে জমিহীনদের মধ্যে বন্টন করার একটা প্রক্রিয়া চলেছিল। তাই দয়া ঘোষ নিজের স্বার্থে বেণীর গিঁট বিক্রি করেছে। সহদেব ও তার গোষ্ঠীর এই জমি দরকার ছিল, দুই স্বার্থ মিলে গিয়ে কার্যসিদ্ধি হয়েছিল। এক জায়গায় অনেকটা জমি পেলে সহদেবের দল ঘর বাঁধতে পারবে চাষের জমিও পাবে তাই বেণীর গিঁট উপযুক্ত মনে হয়েছিল সহদেবের। আসলে একাত্তরের পর গ্রামে একটা কর্মযজ্ঞের শুরু হয়েছিল, একটু পয়সাওয়ালাদের কাছে যা আলোড়ন তুলেছিল। হাসকিং গমকল, বাসের লাইসেন্স ঠিকাদারিতে প্রচুর পয়সা আসছিল, রিফিউজি ক্যাম্পে কাঠ সরবরাহ করেই কেউ কেউ

লাখপতি হয়েছে। দয়া ঘোষ এই সুযোগে ব্যাবসায় তার ছেলের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল দেখতে পেয়েছিল। তাই জমি বিক্রির নগদ টাকা তার কাছে বিশেষ কাজে আসবে। এরপর একদিন সে বাড়ির ছাদ থেকে দেখেছিল—

> সরলা-বাক্ষণীর দুটি গিঁটে অনেকগুলো মানুষকে কোদাল, কুড়াল, দা, শাবল, খন্তা নিয়ে অমানুষিক লড়াই করতে দেখল। কতগুলো অসমসাহসী মানুষ যেন ময়দানবের কারখানা বসিয়েছে ওই দ্বীপ দুটিতে।[৭৩]

এভাবেই একদল ভূমিহীন মানুষের নির্দিষ্ট ভূমি, অন্ন ও বাসস্থানের সংস্থান হয়েছিল। তবুও মানুষের সংগ্রাম শেষ হয়নি, জীবনযুদ্ধের ধারা থেমে যায় না। এই ধারা অব্যাহত থাকে। সহদেব ও তার গোষ্ঠীর মানুষের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল।

জমিতে যেমন স্থায়ী সুখ আছে দুঃখও কম নেই, অনেক দুঃখের রাস্তা পেড়িয়ে সুখের সন্ধান করেছিল কৃষকেরা। সহা কিস্কুর জোতদার মিথ্যে মামলায় সহাকে ফাঁসিয়ে এক রাতে নয় বিঘা জমির ধান কেটে নিয়ে গিয়েছিল। এমন কষ্টকে নেশার মধ্যেও ভুলে থাকতে পারে না বর্গাচাষিরা। ধিক্কারে, ঘৃণায় প্রতীকি লাথি মারতে থাকে সহা ‘লাথি আধিতে, লাথি ধানে, লাথি আইন-কানুন-দারোগা-হাজত-সব কিছুতে,...’ সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে কানুর মতো সাঁওতাল সন্তান স্কুলের মাস্টার হয়েছিল, গ্রাম উন্নয়নের সংগঠনের তরফে সুদেবের মতো যুবক দরিদ্র ভাগ চাষিদের উঠোনে গিয়ে তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়েছে তবু এই মানুষগুলোর দুর্দশা যায়নি, সুবিচার পায়নি। ফসলের হিসাব না বুঝলেও সুফলা জমির জন্ম সাঁওতালের হাতে। জমিতে নির্ভর করে যে মানুষগুলো বেঁচেবর্তে থাকে, জমি দিয়েই তাদের শোষণ করা হয়েছিল—

> সাঁওতালের কপালে শুধু অফলা জমি। সাঁওতাল শুধু অফলা জমিকে ফলবতী করবে। রক্ত দিয়ে শুকনো ভাঙা জমিকে সজল করবে। আর সমস্ত সুফলা জমিগুলোতে বেড়া উঠবে। সেই বেড়া চারপাশ থেকে আমাকে চেপে ধরে আমার দম বন্ধ করে দেবে।[৭৪]

এই নিয়তিকে মেনে নিয়েই সাঁওতালরা জমি নিয়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছিল। জেলের কালো কুঠুরি থেকে ফিরে এসে সহা তার ভাইয়ের কাছে সর্বনাশের হিসাব নিয়েছিল। সর্বনাশের দীর্ঘ তালিকা, সহার আধপাকা ধান জোতদার কেটে নিয়ে গেছে, সহাকে ভাগচাষি হিসাবে মানতে নারাজ, জমি ছাড়িয়ে নিতে চায় অর্থাৎ আধি উচ্ছেদ। বর্গা রেকর্ডের সরকারি

ব্যবস্থায় যে সব ভাগচাষিরা মালিকের সঙ্গে বেইমানি করা হবে ভেবে বর্গা রেকর্ড করায়নি তাদের সততার ফল সহা কিস্কুর মতো হয়েছিল। সহা বলেছে—

> যতবার রেকর্ড করাবার কথা ভেবেছি, ততবার আমার সাঁওতাল আত্মা ছোটো হয়ে গেছে, মানুষটার সাথে বেইমানি করব?[৭৫]

ভাগচাষির এমন ভাবনার দৃষ্টান্ত দেখা গেছে অভিজিৎ সেনের গল্প উপন্যাসে, তবে লেখকের বানানো নয় বাস্তবতাও আছে এর মধ্যে। কয়েক পুরুষ ধরে জমিকে কেন্দ্র করে ভাগচাষি-জোতদার সম্পর্কের মধ্যে ভাগচাষি বিশ্বাস রোগে আক্রান্ত হয়ে আইনকে না মেনে আত্মীয়তা বজায় রাখতে চেয়েছিল কিন্তু মালিক পক্ষ থেকে বার বার বেইমানি হয়েছে, বিশ্বাসভঙ্গের বার্তা এসেছে।

সহদেব বিশ্বাস তার নতুন পত্তনির নাম দিয়েছিল বেণী। জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনায় তারা জমি চেয়েছিল তাই জমি পেয়েই 'জীবনমুখী কর্মকাণ্ড' শুরু করেছিল। পয়সাওয়ালারা যেমন সুযোগ বুঝে গুছিয়ে নিতে চেয়েছে এই সময়ে, বেণীর মানুষরাও তাদের শ্রম দিয়ে গুছিয়ে নিতে চেয়েছিল। বাস্তু ভিটা তৈরি, আল বাঁধা, বেড়া দেওয়া, ঢেঁকি বসানো, উনুনে ধান শেদ্ধ, চিড়া খই, মুড়ি তৈরি, মাছ ধরা গ্রামে ঘুরে মুরগির ডিম, পালক সংগ্রহ এমনকি তরিতরকারি কিনে হাটে বসত তারা। তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করা এসবের মধ্য দিয়ে সহদেব ও তার গোষ্ঠী স্থিতিবান হচ্ছিল ক্রমশ। সরকারি উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্প নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করেছিল ফলে বেণীর বন্ধ্যা জমিকে কম সময়ে এরা দু-ফসলি করে তুলেছে। এরপর ছলনাটা এসেছিল একটি অপ্রত্যাশিত জায়গা থেকে, দয়া ঘোষের বংশধর ভবেশ ঘোষ সমবায় সমিতির চেয়ারম্যান, বেণীর সদস্যদের সমিতির থেকে নেওয়া পঁচিশ-তিরিশ হাজার টাকা দাদনের পরিশোধের পরিমান দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল। সহদেব ভেবেছিল কোনো ভুল হয়েছে হিসাবে কিন্তু ভুল নয় এটা প্রতারণা ছিল—

> যে টাকা সমবায় সমিতি থেকে তারা পেত, তার দ্বিগুণ টাকা তাদের নামে অনুমোদন করানো হত। সইসাবুদ সব আগে থেকেই করানো হত বলে ঝামেলা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। টাকা দাদনের সময় সমবায় পরিদর্শকও উপস্থিত থাকত। দাদন হত পুরো টাকা, হাতে পাওয়া যেত আধা। বাকি আধা টাকা সেক্রেটারি, চেয়ারম্যান, মান্যেজার ইত্যাদির মধ্যে ক্ষমতা অনুযায়ী ভাগ হত।[৭৬]

সমবায় ব্যাংকের ঋণের সুবিধা নিয়ে গরিব কৃষক কৃতার্থ হত ঠিকই তার সঙ্গে ভবেশ ঘোষের মতো ব্যাবসাদার আরও বেশি কৃতার্থ হত। ভবেশদের ঋণ শোধ করার বিশেষ দায় থাকত না। কিন্তু বেণির লোকের দায় আছে ঋণ শোধ করে আবার ঋণ না নিলে চাষের খরচের জন্য ভবেশ ঘোষেদের মতো বাবুর কাছে হাত পাততে হত, যদিও সহদেব এখনো সেই ফাঁদে পা দেয়নি। বরং সুদেব ও শচীন রায়ের সাহায্যে তার বেণীকে উন্নয়ন সমিতির আওতায় আনতে চেয়েছিল। সহদেবরা নিতান্ত আশ্রয়ের তাগিদে বেণীর গিঁটের কাজগপত্র ঠিক না থাকলে কিনে নিয়েছিল, তাদের ভরসা ছিল এতগুলো মানুষকে সরকার তুলতে পারবে না বা চাইবে না। কিন্তু বিপদ আসার আশঙ্কা ছিল ঘোষেদের পক্ষ থেকেই। আসলে দয়া ঘোষের সময়ে পঁয়তাল্লিশ একরের একটা জমি সাতষট্টি সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসে দখল করে লাল ঝান্ডা পুঁতে দিয়েছিল। তারপর বামফ্রন্ট ক্ষমতা থেকে সরে গেলে ঘোষেরা সেই জমি কোর্টের সাহায্যে আবার দখল নিয়ে ফসল ঘরে তুলেছিল। আবার সাতাত্তর সালে বামফ্রন্টের সময়ে মামলা জেগে উঠলে জমি ঘোষেদের হাতছাড়া হয়েছিল। সেই সুযোগে ভূমিহীনদের মধ্যে জমি বিলি হয়েছে। পয়তাল্লিশ একর জমির ঘা শুকিয়ে যাওয়া এত সহজ ছিল না, তার সঙ্গে বেণীর গিঁটের যে রূপান্তর তা চোখে পড়ার মতো। জমির প্রতি মানুষের আকাঙ্ক্ষা চিরকালের কিন্তু আধিয়ারের শ্রমে যে জমি রত্নগর্ভা হত সেই জমির প্রতি লোভ জোতদারের রক্তপিপাসু সত্তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল। তেমনভাবেই বেণীর গিঁটগুলোর প্রতি ঘোষেদের নজর পড়েছিল, কীভাবে সেগুলো পুনরুদ্ধার করা যাবে সেই চেষ্টা করেছিল—

> সহদেবের ধারণা শুধু ভবেশ এবং তার দু-ভাই-ই নয়, ঘোষপাড়ার অনেকেই এখন গোপন চক্রান্ত করছে এই দুটো গিঁট পুনরুদ্ধার করা যায় কীভাবে। ঘোষপাড়ার যেসব মানুষের অবস্থা খারাপ, তারাও এ ব্যাপারে বড়োদের সহায়তা করছে। কারণ, গিঁট দুটো যদি পুনরুদ্ধার হয়, তাহলে তাদেরও হয়তো কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে।[৭৭]

বাকি জঙ্গলাকীর্ণ দুর্গম দ্বীপগুলোতে কারো নজর ছিল না, আসলে সাঁওতাল বৃদ্ধ মরাং ঠিকই বলেছিল, তৈরি জমিতে জোতদারের নজর আগে পড়ে। সহদেবের যেমন চিন্তা ছিল তাদের বাসভূমি নিয়ে অন্যদিকে সাঁওতাল আধিয়ার সহা ও বাহা কিস্কুর চিন্তা কম ছিল না, জমি নিয়ে মালিকের সঙ্গে মামলা, যে আধিয়ার নির্দিষ্ট সময় চাষের খরচ জোগাতে পারে না, সন্তান প্রাপ্তির পর মানত রক্ষা করতে পারে না টাকার অভাবে তারা মামলার খরচ জোগাবে কীভাবে। জোতদার বনমালী ঘোষ ডেকে পাঠিয়েছিল আধিয়ার সহাকে। সহার সঙ্গে

সাঁওতাল কানু মাস্টারকে দেখে বনমালী চটে গিয়েছিল, জোতদার কোনোদিন চায় না আধিয়ারের সঙ্গে চুক্তিতে কোনো শিক্ষিত সচেতন মানুষ হস্তক্ষেপ করুক, এতে তাদের শোষণকার্যে ব্যাঘাত হবে। গ্রামগঞ্জে পাকা রাস্তা, যানবাহন, চাষের উন্নত বীজের ফলন, সেচের ব্যবস্থা সার্বিক পরিবর্তনের সঙ্গে ভাগচাষির যুক্তি বুদ্ধি জ্ঞানের বিকাশ হতেও শুরু করেছিল। সহা কিস্কু একজন সচেতন অভিজ্ঞ মানুষের মতো জোতদার বনমালী ঘোষের সঙ্গে কথা বলতে থাকে। 'গেরস্থ আর আধিয়ারের সম্পর্ক তোমার সঙ্গে আমারতো আর নেই।' অতএব কানুকে সাক্ষী রেখে কথা বলতে চেয়েছিল সহা। বনমালী তাচ্ছিল্য করে বলেছিল 'ভালো, আইন বোঝা ভালো। আইন না বুঝলে আইন ভাঙা কঠিন হয়।' সহা হাজত বাস করে অনেক কিছু জেনে এসেছে, তাই মুখের উপর জবাব দিতে পেরেছিল—

> খুব ঠিক কথা মালিক? আবার দেখো আইন বুঝলে আইন না মানাও সহজ। আমি কি জানতাম যে আধিয়ার-জোতদারে আইনের ভাগ বারো আনা চার আনা। কিংবা আধি ধানের রসিদ রাখা লাগে? আবার দ্যাখো, তুমি বুঝদার মানুষ, সেই ফাঁকে আমাকে উচ্ছেদ করলে?[৭৮]

বর্গা রেকর্ডের সময় যেসব আধিয়ার শুধুমাত্র মালিকের সঙ্গে বেইমানি করা হবে একথা ভেবে জমি রেকর্ড করেনি এই ভাবনাটা যে পরবর্তীতে প্রতিপক্ষের আইনি শক্তি হবে তা ভাবতেই পারেনি। সহাকে সেই অস্ত্র প্রয়োগ করেছে বনমালী, সহাও বাবার আমল থেকে ভাগচাষি, বর্গা রেকর্ড করায়নি ঠিকই কিন্তু সংশোধনের আইন আছে একথা কানু জানিয়েছিল। বনমালী ঘোষের প্রস্তাব আঠারোশো টাকায় ন-বিঘা জমির আধিস্বত্ব ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাবে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল সহা, কানু মামলা করবে ভাবে, কিন্তু মিথ্যা ডাকাতির মামলা লড়ছে সহা আবার বনমালী ঘোষের বিরুদ্ধে মামলা করলে এত খরচ পাবে কোথায়। সহা এই ভাবনার নিষ্পত্তি খুঁজতে চেয়েছিল নেশার মধ্যে।

ভূমিসংস্কার কাজের সুবাদে ব্যাংক নতুন করে কৃষকের কথা ভাবতে শুরু করেছিল। পঁচাত্তর ছিয়াত্তর সাল থেকে জোতদার, জমিদারের উদ্‌বৃত্ত জমির পাট্টা দেওয়া শুরু হয়েছিল ভূমিহীনদের মধ্যে এবার ব্যাংক সেইসব কৃষকদের ঋণ দেবার ব্যবস্থা করেছিল। বেণীর চাষিরাও ঋণ পেতে ব্যাংকের দারস্থ হয়েছিল। কিন্তু ভবেশ ও বনমালীর চক্রান্তে কাজগের কলমে সহদেবরা ঋণমুক্ত হতে পারেনি টাকা ফেরত দিয়েও। মাতব্বর ভবেশ ও বনমালীর কাছে অনুরোধ করে বেণীর মানুষকে আসল সার্টিফিকেট পাইয়ে দিক সমিতি থেকে নয়তো

তাদের নেওয়া টাকা সমিতিকে ফেরত দিয়ে সহদেবদের ঋণমুক্ত করুক। ভবেশ কোনো কিছুতেই রাজি হয়নি। বনমালী বলেছিল—

> বল, শরম কী রে? শরম কী? তোর মতো রিফুজির বাচ্ছারে, ফের শরম কী? মুখ সামলে কথা কবি, সহদেব বিশ্বাস। বড়ো ভাই দয়া কইরে জায়গা দিইছে তাই।, নালে লঙ্গরখানার রিলিফের পচা গম খায়ে তো মরতি। আজ যদি লাথি মারি, তো কাইল আর দাঁড়াবার জায়গা থাকবে না! তার আবার বড়ো বড়ো কথা![৭৯]

রিফুজি সহদেবের ভবিষ্যৎ কি হতে পারে বা কি করে দিতে পারে তা বলেছিল বনমালী ও ভবেশ। কিন্তু যারা রিফুজি নয়, সেই সহা ও বাহা কিস্কুর মতো সাঁওতাল ভাগচাষিরা যারা একটা জমির কয়েক পুরুষের চাষি, তাদেরও তো সহদেবের মতোই অবস্থান বনমালীদের কাছে। 'মূর্খ সাঁওতালের মৃত্যু পর্যন্ত একটার পর একটা শিক্ষা হতে থাকলেও, কাণ্ডজ্ঞান বাড়ে নি। সে শুধু অবাক হতেই শেখে।' সহা এমনভাবেই অবাক হয়েছিল যখন বনমালী ঘোষের সঙ্গে আধির মামলা হেরে 'জোয়ারের নদীতে ভেসে যাওয়া একটা ডিঙিনৌকার মতো তার ন-বিঘা জমির আধিস্বত্ব ক্রমশ দূরে, তার নাগালের বাইরে চলে গেল।' বিচার ব্যবস্থা আইনের থেকেও রাজনৈতিক দলকে প্রাধান্য দিত বেশি, বিচারের উপর রাজনীতি প্রভাব ফেলত, ফণী উকিল সেটাই বোঝায় সহদেব ও কানুকে। এবং জমির দখল ধরে রাখা জরুরি তারপর দীর্ঘমেয়াদী বিচার ব্যবস্থা তার নিয়মে চলতেই থাকবে। কানু নতুন রাজনৈতিক কর্মী উচ্চাকাঙ্ক্ষা তার আছে তাই হুজ্জুতিতে যেতে চায়নি। নাহলে কয়েক হাজার সশস্ত্র সাঁওতাল দিয়ে দখল নিতেই পারত, তাতে কয়েকটা মানুষ মারা যেত, জমি দখলের এমনই নিয়ম। সহা ক্রমে হতাশায় নেশাকেই আশ্রয় করে নিয়েছিল। এই হার তার আইনি হার নয় বরং অস্তিত্ব মুছে যাবার সামিল। পরিবারের সঙ্গে বিশেষ শৃঙ্খল রইল না, সহদেব, কানু নিজেদের ব্যস্ততায় সময় দিতে পারেনি। সহা পাগলের মতো হয়ে গেল, নিজস্ব চার বিঘা জমি পুলিশে আর উকিলে খেয়ে নিয়েছিল। 'বনমালী ঘোষের এক প্যাঁচে এক্কিবারে ফিনিস্' হয়ে গিয়েছিল সহা তার কিছুই করার ছিল তবুও সে একদিন এক কান্ড করে বসেছিল—

> একদিন সাপ্তাহিক হাটে বনমালীর ছেলে জীবনের মোষের গাড়ি আটকে দিল। হুংকার দিয়ে গাড়ির সামনে লাফিয়ে পড়ে সে বলল, এই শাল্লা, শাল্লার বেটা শাল্লা, দেখ তুমরা হামার জমিনের ধান খাইয়ে গতর কেংকা মোটা হইছে ই ঘোষের বেটার, দেখো...[৮০]

তারপর সহা মোষের গাড়ির সামনে শুয়ে পড়েছিল। আধি জমির নিষ্পত্তি চেয়েছিল সে। জীবন গাড়ি থেকে নেমে সহাকে চাবুক দিয়ে কয়েক ঘা মেরে উপস্থিত সকলকে শাঁসিয়েছিল 'বনমালী ঘোষের সাথ তালকঁষা বাইর করমো সবার।' সহাকে বাঁচাতে আসা সহদেবকেও শাঁসিয়ে বলেছিল 'আর ই জয়বাংলা পার্টি সহদেব বিশ্বাসের আসপদ্দা দেখিছেন,' ইত্যাদি। এরপর সহা কিস্কু জমি হারিয়ে পাগলপ্রায় হয়ে গিয়েছিল, যে সহা জেল থেকে আসার পর বনমালী ঘোষের সঙ্গে যুক্তি দিয়ে আইনি আলোচনা করেছিল, সেই সহা আর স্বাভাবিক ছিল না। শরীরে মনে নানান বিকার নিয়ে সহদেবের বেণীতে কিছুদিন থেকেছিল কারণ তার অস্বাভাবিক অবস্থা দেখে তার ভাই গোচের স্ত্রী এবং সাঁওতাল গ্রাম তাকে ডাইন ভাবতে শুরু করেছিল। গোচের সন্তানকে সহা খেয়ে ফেলেছে বলে মনে করেছিল গোচের স্ত্রী। আর সেই বিশ্বাসের আগুনে ঘি ঢেলে দিল নয়ন গুণমানের গণনা, যাতে সহাকে ডাইন রূপেই দেখানো হয়েছিল। গোচ এসব বিশ্বাস করত না কিন্তু কুসংস্কার মানুষের মনকে এমন অন্ধকারে নিয়ে যায় তাতে বিচার যুক্তি বুদ্ধিকে খুঁজে পাওয়া যায় না, গোচের তাই হয়েছিল। বেণী থেকে বেরিয়ে ঝড়বাদলের রাতে জল কাদায় কাঁটা খোঁচায় রক্তাক্ত, পোশাক স্থলিত, কষে রক্ত অবস্থায় সহা তার ভাই গোচের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল, যে ভাইকে সে কোলে পিঠে মানুষ করেছিল, 'ভাই-গোচ্?' বলে ডাকতে থাকে কিন্তু তার এই ভয়ার্ত শারীরিক অবস্থা হয়তো গোচের ডান অবিশ্বাসকে বিশ্বাসে পরিণত করে উৎসাহিত করেছিল। দাদা সহার শরীরে হেঁসো চালিয়েছিল যতক্ষণ না সহা মাটিতে পড়ে যায়। সহা গোচের এই পরিণতির জন্য অন্ধবিশ্বাস তো ছিলই আর ছিল জমির অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া, জোতদার বনমালীর প্রতারণা, শোষণ।

উন্নয়ন সমিতির সাহায্যে সুদেব ও সহদেবের চেষ্টা সফল হয়েছিল, বেণীতে শ্যালো টিউবওয়েল বসেছে, বেণীর একটি মেয়ে সেলাইয়ের কাজ শিখেছে সমিতির সাহায্যে, একজন তাঁত পেয়েছে ধারে, প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র হয়েছে। এসব উন্নয়নের সঙ্গে সহদেবের আইনি বোধ অনেকটাই বেড়েছিল। সে সমবায়ের পরিচালন সমিতির বিরুদ্ধে কালেক্টরের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছিল দাদন বন্টন ও আদায়ের জালিয়াতি নিয়ে। ফলে শঙ্কিত ভবেশ ও বনমালী নিজেদের বাঁচাতে আইনের অসৎ ব্যবহারে সরল ম্যানেজারকে ফাঁসানোর পরিকল্পনা করেছিল। জালিয়াতির তথ্য, প্রমাণ লোপাট করে থানায় চুরির ডায়েরি করা, এই ঝামেলাকে কোনোরকমে আদালতে নিয়ে যাবার চক্রান্ত করেছিল কারণ 'চোখের সামনে যা

স্পষ্ট দেখা যায়, আইনের চোখে তা সবসময়ই অস্পষ্ট।' রেহাই পাওয়া যাবে সহজেই। সহদেবকে জব্দ করতে আর এক জোতদার কন্দর্প ভবেশকে পরামর্শ দিয়েছিল—

> ক্ষেতি করি দেও? এমন ঠেক্‌না দেও যে ফের মাথা তুলবা না পারে। ...গেরামে বাস করা কঠিন হয়ে উঠেছে, তা বাদে যদি ইসব রিফুজি-নিখুজি, সাঁতাল, ওরাংকে সেলাম দিয়ে চলতে হয়, তো কাম সারা। কাজেই সময় থাকতে বুঝিয়ে দেও। মাজা ভাঙার পরেও যদি ফোঁস করে, তবে মাথা ভাইঙ্গে দেও।[৮১]

পরামর্শদাতা কন্দর্পের বুদ্ধি এই পর্যন্ত ছিল না, সে জানত সরকার যে সব সুবিধা কৃষকদের দিয়েছে তাতে তার এবং ভবেশ ও বনমালীর মতো রাজনৈতিক পদে আসীন ব্যক্তির রোজগারের নতুন রাস্তা বেরোবে। কৃষকের লাভ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার নির্ধারনে অনেকটা ভূমিকা নিয়েছিল। তাই সরকারি প্রকল্পের সাহায্যে কৃষির উন্নতি ভবেশ বনমালীর মতো ব্যাবসাদারের প্রচুর মুনাফা এনে দিয়েছিল। এবং এরা দুদিক থেকেই লাভ করতে থাকে, টাকা এদের শুধু বিলাসিতা বাড়িয়ে দেয়নি প্রবল অত্যাচারীও করেছিল।

বেণীতে উন্নয়নের সঙ্গে রাজনীতিও প্রবেশ করেছিল। বন্দুক লুঠ ও জোতদার খুন করে নকশালরা কৃষকের সমর্থন আদায় করার চেষ্টা করেছিল। বেণীকেও বিপ্লবের দুর্গ হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছে, তাই সহদেবের সমর্থন আদায় করার চেষ্টা করেছিল। অন্যদিকে ঘোষেরা সহদেব সহ বেণীর মানুষকে জব্দ করতে উঠে পড়ে লেগেছিল। গরু মোষ দিয়ে রোজ বেণীর ফসল নষ্ট করেছে, সহদেব থানায় অভিযোগ করতে গেলে ঘোষেদের লোকের আক্রমণে পড়েছিল, তা থেকে বিরাট দাঙ্গার সৃষ্টি হয়েছে। সেই দাঙ্গায় লাঠি, তীর, বন্দুক, সড়কি, হাঁসুয়া, বল্লম পাথর সবই ব্যবহার করা হয়েছিল। সহদেব গুলিবিদ্ধ হয়ে সুস্থ হতেই বেণীর মানুষ আর একটি গিঁট দখল করে নিল। সাঁওতালরা সারাজীবন ধরে অত্যাচারিত হতে হতে যেভাবে অবাক হয় বেণীর মানুষ সেভাবে অবাক হয়েছে আবার অবাক করেছিল জোতদারকে। দাঙ্গার পর পুলিশ দু-পক্ষের কয়েকজন মানুষকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়েছিল, তারপর আইন যেভাবে চলে সেই পথেই চলেছে। নকশাল বিপ্লবীদের সঙ্গে সহদেব একমত হতে পারেনি, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে লড়াই করা মানুষ সে, যুদ্ধের ভয়াবহতা রক্তক্ষয় সে জানত, হিংসার পথে ক্ষতির দিকে যেতে চায়নি সহদেব। এমনকি নকশালদের জোতদার খুনের সমস্যা সমাধানের পদ্ধতিতেও সে বিশ্বাসী ছিল না। সে শুধু জানতে চেয়েছিল আধিয়ার জমির মালিক হবে কিনা, বাজারের

মালপত্র সার, বীজ, ওষুধ চাষা সস্তায় পাবে কিনা, চাষাঘরের ছেলেমেয়ে বাবুঘরের ছেলেমেয়ের মতো লিখাপড়া শিখতে পারবে কিনা। সহদেব মনে করত নকশালীদের কার্যপ্রণালী আসলে শাস্তি দেওয়া, যুদ্ধ নয়। সহদেব শুধু একজন রিফুইজি নয়, এখন সে একজন দলপতি একটা গোষ্ঠীর প্রধান ছিল। নিজের ভালোমন্দর সঙ্গে অনেকগুলো মানুষের ভবিষ্যৎ জড়িয়ে আছে এটাও সে জানত। এদেশের সমাজ, রাজনীতি, কৃষি, অর্থনীতি, আইন-কানুন বুঝতে শিখেছিল তাই সে মনে করেছিল নকশালদের আবেগে কয়েকটা খুন হবে, হুজ্জুতি হবে তারপর বিপ্লবীরা সরে পড়লে তার গ্রামের ছেলেরা পুলিশ আর জোতদারের হাতে মরবে। সহদেবের এই আশঙ্কার মধ্যে অনেকটাই সত্যতা ছিল। এরপরেও নকশাল যুবকেরা হাল ছাড়েনি, ঘোষেদের সঙ্গে বেণীর লড়াইকে শ্রেণিসংগ্রামের ব্যাপকতর রূপ দিতে চেয়েছিল তারা। কিন্তু কানু ও সুদেব নকশালপন্থী শংকরের সঙ্গে আদর্শগত দিকে সহমত হতে পারেনি। সুদেব এ পথের পুরোনো যাত্রী, এই পথে ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে অনেক আগেই। সহদেব তার গোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ ছাড়া কিছুই ভাবতে পারেনি। তবুও জোতদারের একটা পরিকল্পিত ডাকাতির ঘটনা এবং কুখ্যাত ডাকাত সিংরাই সহদেবের হাতে মারা গিয়েছিল। বেণীর অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। এসব ঘটনার তদন্তে নকশাল, বেণীর সঙ্গে নকশালদের যোগাযোগ, সুদেব, সহা, সহদেব ও তার সঙ্গে জোতদারের বিরোধ, বর্গা জোতদার সব মিলিয়ে পুলিশের কাছে একটা বড়ো ব্যাপার দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। নকশালপ্রবণ এলাকায় পুলিশের সন্দেহের তালিকায় সুদেব সহদেবসহ বেণী যুক্ত হয়েছিল। সুদেব বেণীর সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে ছিল ফলে সহদেব ও সুদেবের নামে অনেকগুলি ধারায় মামলা হয়েছিল। সুদেব নকশালদের হাতে খুন হয়েছে। সহদেব জামিন পেলেও এরপর মামলা চলবে আইনের রাস্তায়, রক্তপাতের লড়াইকে আইনি খাতে এনে ফেলা, এসব ভবেশ বনমালী কন্দর্পর স্বাভাবিক বুদ্ধির পরিচয়। তাদের ব্যাবসা ও দৈনন্দিন কাজ আটকায়নি, প্রতিশোধ স্পৃহা জাগিয়ে রাখা ‘সামন্ততান্ত্রিক ঈর্ষা ও বিদ্বেষের এই রূপটি অত্যন্ত সাধারণ।’

ঘ। *রহু চণ্ডালের হাড়*

যাযাবরদের বোহেমিয়ান জীবনে স্থায়ী হবার আকাঙ্ক্ষা চিরকালের। তাদের পাঁচ পুরুষের জীবনের বহমানতার ইতিহাস নিয়ে লেখা *রহু চণ্ডালের হাড়* (১৯৮৫) উপন্যাস। জমির প্রতি অধিকার টিকিয়ে রাখার আগে জমি প্রাপ্তির জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছিল বাজিকর গোষ্ঠীকে। যাযাবর স্থায়ী গৃহস্থ হতে এক দেড়শো বছর লড়াই চালিয়েছিল। গৃহস্থ হতে গেলে স্থায়ী হতে গেলে আগে পায়ের নীচে নির্ভরযোগ্য জমি দরকার ছিল তারপর পরিচয়। অভিজিৎ সেনের কথায় 'জোত জমি বাড়ি-ঘর নিয়ে যে জীবনযাত্রা চালায়, সে হল 'গেরস্ত' তার স্ত্রী 'গেরস্থানি'।' বাজিকর এমন গৃহস্থ হতে চেয়েছিল। দলপতি পিতেম আদিবাসীদের সংস্পর্শে এসে জীবনে জমির মূল্য বুঝেছিল। তারপরের কয়েক পুরুষ ধরে স্থায়ী হতে জমির অন্বেষণ করেছিল এই ভবঘুরে যাযাবর গোষ্ঠী। অভিজিৎ সেনের গল্প উপন্যাসের জমি কেন্দ্রিক মানুষগুলো মালিকের অত্যাচার অবিচার থেকে জমির অধিকার টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম করেছিল। *রহু চণ্ডালের হাড়* উপন্যাসে বাজিকররা জমি প্রাপ্তির জন্য লড়াই করেছে।

পথের মানুষ বাজিকরদের সাঁওতাল লক্ষ্মণ সোরেন প্রথম বুঝিয়েছিল মানুষের 'জমিতেই স্থিতি, জমিতেই স্থায়িত্ব, জমিতেই সুখ।' চাষের জমিতে ফসল ফলালে পিতৃসুখ উপলব্ধি করা যায়। লক্ষণ সোরেনের প্রোথিত এই বীজ বাজিকরের পরবর্তী কয়েক পুরুষ জুড়ে পল্লবিত হয়েছে। কিন্তু বাজিকর জমিকে কেন্দ্র করে প্রথমেই রাজমহল পাহাড়ে ধাক্কা খায়, নকল পাট্টা কিনে জমি থেকে উচ্ছেদ হতে হয়েছিল। কিন্তু চাষের নেশা বাজিকরদের মধ্যে দেখা যায় তারা জমি তৈরির আসল কারিগর আদিবাসী সাঁওতালদের মতো পিছিয়ে আসেনি। বার বার তারা থিতু হতে চেষ্টা করেছিল গোরখপুর, রাজমহল, নমনকুড়ি, মালদা, রাজশাহি বার বার স্থানান্তরিত হতে হতে চাষ শিখেছিল। বাজিকর যেখানে কিছুদিনের জন্য স্থায়ী হয়েছে সেখানেই কিছু জমির প্রত্যাশা করেছিল। প্রয়োজনে জলা জংলা জমি খালাস করে আবাদযোগ্য করেছিল অমানুষিক পরিশ্রম করে। বাজিকর জানত তৈরি জমি কেউ দেবে না, তৈরি করে চাষ কর, যতদিন না কেড়ে নেয় ততদিন জমি নিজের, চাষ কর, ফসল খাও তারপর বেহাত হলে আবার জমি খালাস কর। এভাবেই চলেছে বাজিকরের আবাদের প্রক্রিয়া। ভবঘুরে বোহেমিয়ান জীবনে গৃহস্থ মানুষকে বার বার অনুসরণ করার চেষ্টা করেছিল বাজিকররা। কখনও কৃষিতে ঝুঁকেছে কখনো পশুপালনে। পরতাপ বাজিকরের মধ্যে চাষের নেশা অবাক করেছিল দলপতি পীতেমকে। পরতাপের উৎপাদিত

ফসলে হাত দিয়ে অন্য অনুভূতি পেতে থাকে পীতেম, রহুর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত হবার সম্ভাবনা দেখে।

জামির বাজিকর জমিতে স্থিতি পেয়ে অনেক বড় গৃহস্থ হবার স্বপ্ন দেখেছিল। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ফসল নষ্ট হলে পরিশ্রমী সাঁওতালরা হতাশ হয়েছিল কিন্তু জামির বাজিকর ইতিমধ্যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তাই সে চাষিদের বুঝিয়েছিল—

> আরে বাপু, ধরে নেও না কেন যে তিনটা চাষের একটা মারা যাবে। তাহলেও আর দুটো থাকে। আর সে দুটো তোমায় ভরে দেবে। চাষের তো এই নিয়ম।[৮২]

প্রতাপ ও জামিরের প্রচেষ্টা দেখে অনেক বাজিকর চাষে মন দিয়েছিল। বাজিকরের জীবনে কৃষিকাজের ধৈর্য নেই, অভিজ্ঞতা নেই তবুও জামিরকে দেখে তারা শিখেছিল। যেভাবে বাজিকররা জলের মধ্যেও ভিন্ন প্রজাতির ধান চাষ করে সফল হয়ে তামাম চাষির পথ প্রদর্শক হয়ে উঠেছিল তাতে জমির নেশা আরও বেড়ে যায় এই যাযাবর গোষ্ঠীর জীবনে। চাষের কাজের সফলতা ব্যর্থতার মধ্যেই ভিখ মাঙা, চুরি এসবকে ঘৃণা করতে শুরু করেছিল বাজিকর। প্রয়োজনে গৃহস্থ চাষির জমিতে কাজ শিখতে গিয়ে ফসলের ক্ষতি করে শাস্তি স্বরূপ মার খেয়েও শিখেছিল চাষের কাজ। অত্যন্ত কষ্টসাধ্য তরমুজের চাষে ব্যাপক সফল হয়েছিল জামির বাজিকর, কিন্তু দূর্বৃত্তদের অত্যাচারে সেই ফসল ভর্তি নৌকা জলে ডোবে। যাযাবরের সাময়িক আস্তানা যেখানে হয়েছে সেখানেই তারা চাষের ও বাসের জমি খুঁজেছিল। পেয়েছে আবার হারিয়েছে। যাযাবরের বিপদের শেষ নেই, কোথাও নির্বিঘ্নে স্থায়ী হতে না পারায় বার বার জমিহারাও হয়েছিল। জোতদার কয়েকদিনের সময় দিয়ে জমি খালি করতে বলত, বর্গাচাষিদের ক্ষেত্রে প্রতিবাদের জায়গা থাকে কিন্তু যাযাবরদের ক্ষেত্রে এসব ব্যাপার থাকত না, তাই কোনো সংগ্রাম করে সেই জমি ধরে রাখতে পারেনি। কৃষিজীবী মানুষের জমির প্রয়োজন অবশ্যই কিন্তু যাযাবরের তো স্থায়ী জমির প্রয়োজন সবথেকে বেশি। সেই জমির সংস্থান করতে গিয়ে তাদেরও দীর্ঘ লড়াই করতে হয়েছিল।

৩। নকশাল আন্দোলন— লেখকের ব্যক্তিসত্তার প্রতিফলন এবং সত্তর পরবর্তী রাজনীতি

মানুষ রাজনীতি বর্জিত নয়, মানুষের অরাজনৈতিক হওয়া খুব কঠিন। অভিজিৎ সেন নিজেও অরাজনৈতিক ছিলেন না, বামপন্থী ভাবধারায় বিশ্বাসী ছিলেন তারপর নকশাল বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। নকশাল আন্দোলন থেকে বেরিয়ে আসার পর লেখার মধ্যে রাজনৈতিক জীবনের স্মৃতিমন্থন করেছেন। যে বিপ্লবী আন্দোলনে সফলতার আলো দেখতে পাননি সেই আন্দোলন নিয়েই সফলভাবে সাহিত্য রচনা করেছেন। এই জাতীয় লেখায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে ব্যক্তিসত্তা উঠে এসেছিল। *স্বপ্ন এবং অন্যান্য নীলিমা* (২০০০), *লাশকাটা ঘরের সামনে অপেক্ষা* (২০১১), *মৃত মানুষের সঙ্গে বসবাস* (২০১৭) উপন্যাসে নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে নিজের বৈপ্লবিক সত্তাকে তুলে ধরেছেন। পক্ষপাত ও নিন্দা নয়, নকশাল আন্দোলনকে যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। ১৯৬৭ সালের নকশাল আন্দোলনের পক্ষে বিপক্ষে প্রচুর গল্প উপন্যাস লেখা হয়েছে। কোনো কোনো সাহিত্যিক এইসব শিক্ষিত তরুণদের আত্মত্যাগকে গভীর মমতায় লিপিবদ্ধ করেছিলেন, কেউ আবার দার্শনিকভাবে এই আন্দোলনকে ব্যাখ্যা করে শান্তিদূতের বেশ ধরে সশস্ত্র বিপ্লবকে রোমান্টিকতা, ঠাট্টা, তামাসা করে লিখে পুরস্কার লাভও করেছিলেন। নকশাল আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার যে কারণ ছিল তার মধ্যে মূলত খতম অভিযানকে নিয়ে দলীয় মতবিরোধ এবং নেতৃত্ব ও পরিকল্পনার অভাব। বিদেশি পদ্ধতি অনুকরণ করে বিপ্লবী কার্যপ্রণালী ঠিক করার আগে দেশীয় পরিস্থিতি বোঝা খুব জরুরি ছিল। মাও সে তুং (১৮৯৩-১৯৭৬) মনে করতেন বাস্তবসম্মতভাবে আগে দেশকে বুঝতে হবে তারপর আন্দোলনের রূপরেখা নির্মাণ করা উচিত। আমাদের দেশীয় নকশাল বিপ্লবীরা সেটা হয়তো মানতে পারেনি তাই অনুকরণ করতে গিয়ে বিপদ ডেকে এনেছিল। তাই খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি এই আন্দোলন। ১৯৭২ সালে শেষ হয়ে গেলেও 'নকশালবাড়ি মরেনি, নকশালবাড়ি কোন দিন মরবে না।'

নকশাল আন্দোলনকে বিষয় করে বাংলা সাহিত্য এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছিল। এই ভূমিকায় মহাশ্বেতা দেবী, শৈবাল মিত্র প্রমুখের নাম সর্বাগ্রে। অভিজিৎ সেন, মহাশ্বেতা দেবীর একনিষ্ঠ ভক্ত এবং উত্তরসূরীও বটে, অন্যক্ষেত্রে এক্ষেত্রেও। অভিজিৎ সেন কারও মতো সমাজের প্রবল তাপমাত্রা ও প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির গল্প শোনাননি, শুধু ব্যর্থতার কথাও

বলেননি, নকশাল আন্দোলনের গঠনমূলক চিন্তার কথাও বলেছিলেন, শুধু আবেগ অতিকথন নয়, একেবারে গোড়ায় গিয়ে আন্দোলনের সবটা উপলব্ধি করে তথ্যভিত্তিক আলোচনা করেছেন। শৈবাল মিত্রের মতো অভিজিৎ সেনও নকশাল আন্দোলনের প্রত্যক্ষ কর্মী ছিলেন। ফলে ওই পথের বাঁকচোর চড়াই-উৎড়াই ভালো বুঝতেন, তাঁর গল্প উপন্যাসে সেই বোধের বিকাশ ঘটেছিল। নিজে এই আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন বলে আন্দোলনকে আগাগোড়া সমর্থন করে লেখেননি আবার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২), শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (১৯৩৫), সমরেশ বসুর (১৯২৪-১৯৮৮) মতো শুধু শূন্যতা দেখিয়ে বিদ্রূপ করেননি। সমর্থন তো অভিজিৎ সেনও করেননি, তাই যোগদানের পর আদর্শগত দিকে হঠকারিতা দেখে ফিরে এসেছেন। আর এই আন্দোলনের ব্যর্থতা নিয়ে অকপটে বলেছেন লেখায়, কোনো পক্ষপাত নেই কোনো অজুহাত নেই, সমাজতাত্ত্বিকের মতো ব্যাখ্যা করেছেন। অভিজিৎ সেন শুধু আন্দোলনের উত্তাপকে নয়, বিপ্লবীদের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার আগে ও পরের মুহূর্ত তুলে ধরেছিলেন যাতে বোঝা যেত বিপ্লবীর আগের জীবন আর পরের ক্ষতবিক্ষত জীবনে সে কীভাবে সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেছে। নকশাল আন্দোলনের ছাইভস্ম যখন বাতাসে উড়ে নিঃশেষ হয়েছে তখন এই আন্দোলনের গুরুত্ব সমাজ ও সাহিত্যে বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল। নকশাল আন্দোলন সম্পর্কে উদাসীন লেখকগোষ্ঠী যাঁরা এতদিন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু এবার তাঁরাও বাজার ধরতে নকশাল আন্দোলন নিয়ে লিখতে থাকেন।

অভিজিৎ সেনের লেখা নকশাল আন্দোলনকে কেন্দ্রিক উপন্যাস *স্বপ্ন ও অন্যান্য নীলিমা*, *মৃত মানুষের সঙ্গে বসবাস*, *লাশকাটা ঘরের সামনে অপেক্ষা* এবং *হলুদ রঙের সূর্য* (১৯৯৬)। এছাড়াও প্রসঙ্গক্রমে *ছায়ার পাখি* (১৯৯৩), *নিম্নগতির নদী* (২০০৫), *মেঘের নদী* (২০০৫) প্রভৃতি উপন্যাসে নকশাল আন্দোলনের কথা এসেছে।

ক। *স্বপ্ন এবং অন্যান্য নীলিমা*

ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্থাৎ ১৯৪৭-১৯৭১ সাল, মাঝের এই দুই দশক ভারতবর্ষের সামাজিক রাজনৈতিক ইতিহাসে একাধিক ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রক্তক্ষয়ী পর্ব, দেশভাগের বেদনাময় হাহাকার, নকশাল আন্দোলনে শিক্ষিত যুবকদের বলিদানের দীর্ঘ তালিকা, পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার

লড়াই ইত্যাদি। অভিজিৎ সেন তাঁর *স্বপ্ন এবং অন্যান্য নীলিমা* উপন্যাসে এই দুই দশকের এসব ইতিহাস কাহিনির সাযুজ্যে ধরেছেন। এই উপন্যাস শুধু সুনির্দিষ্ট প্লটের বুননে উপন্যাস নয়, একাধারে অভিজিৎ সেনের আত্মজীবনী। অভিজিৎ সেন নকশাল আন্দোলনের হানাহানি বা রক্তক্ষরণের দৃশ্য বর্ণনা করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেননি বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছিলেন বিপ্লবীদের জীবনবোধ ও আন্দোলনে যোগদানের আগে পরের জীবন সম্পর্কে কথা বলতে।

সরোজ পূর্ব পাকিস্তান থেকে এদেশে চলে এসেছিল, দেশভাগের পর **১৯৫০-৫২** সাল নাগাদ। এখানে এসে অনেক লড়াই চালিয়েছিল জীবনযাপন করতে। দাঙ্গা ও দেশভাগ পরবর্তী সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না, এর মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তান থেকে সরোজের ছয় ভাই বোন ও মা-বাবা এসে হাজির হয়েছিল। অনেকবছর পর সরোজ তার মা ও ভাইবোনদের দেখেছে এটা যেমন আনন্দের তেমন কঠিন সংগ্রামের। কলকাতার বুকে এতবড় একটা সংসার চালানো বাবা-মার পক্ষে খুবই কঠিন ছিল তার সঙ্গে সংসারে সেই ভয়ের আবহ ছিল যা একজন নকশাল বিপ্লবীর পরিবারে থাকত। বাড়িতে পুলিশের হানা, জিজ্ঞাসাবাদ ও পরিবারের অন্য সদস্যদের হয়রানি। সরোজের নকশাল আন্দোলনে যোগ দেবার ফলে এসব তার পরিবারকেও সহ্য করতে হয়েছিল। কলকাতা ছেড়ে অনেক দূরে আত্মগোপন করে থেকে সরোজ একটা উদ্বাস্তু শিবিরের হয়ে কাজ করেছিল। আন্দোলনে পথে মানুষকে অত্যাচার থেকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব কিনা এমন দ্বিধা সরোজের মনে কাজ করতে শুরু করেছিল। কারণ সে দেখেছিল এই দলটির আদর্শ ও সংগ্রামকে বাস্তবায়িত করতে যেভাবে সংগঠনের দরকার ছিল তার অভাব আছে, শুধু মাত্র আবেগসর্বস্বতা দিয়ে, খতম অভিযান চালিয়ে আর মহাপুরুষের মূর্তি ভেঙে কোনো বিপ্লব সার্থক হতে পারে না। উপযুক্ত নেতৃত্ব ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না, যার ফলে দলের মধ্যে মতবিরোধ ছিল ফলে পুলিশি দমন প্রক্রিয়া সহজেই এই বিপ্লবের কোমর ভেঙে দিতে পেরেছিল। যাদের জন্য এই লড়াই সেই কৃষকের ব্যাপক অবস্থান ছিল না, তাদের কাছেও সুনির্দিষ্ট কোনো কর্মপরিকল্পনা পৌঁছে দিতে পারেনি এইসব নকশাল বিপ্লবীরা। পুলিশের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া তাদের হত্যা করা আর দেখে দেখে জোতদার খতম করার মধ্যে কৃষকেরাও মুক্তির পথ দেখতে পায়নি স্পষ্টভাবে। এর ফল যা হবার তাই হয়েছিল, সরকার জরুরি অবস্থায় নকশালদের মধ্যে গণহত্যা চালিয়ে স্তব্ধ করে করে দেয় উদীয়মান বিপ্লবের

ধারাকে। সরোজ এসব চোখে দেখে উপলব্ধিও করেছিল তাই দ্বিধা উত্তীর্ণ হয়ে এই পথ পরিত্যাগ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে। এই গল্প সরোজের কম অভিজিৎ সেনের জীবনের বেশি। দেশভাগের পর চলে আসা তারপর সপরিবারে কলকাতায় অবস্থান বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেওয়া আবার ছেড়ে চলে আসা, সর্বোপরি সরোজের উপলব্ধি এসব তো লেখকের জীবনেরই কাহিনি।

ইংরেজ আমল থেকে কৃষকদের বিদ্রোহ, তারপর তেলেঙ্গানা, কাকদ্বীপের কৃষক আন্দোলন এমন প্রেরণা থেকেই নকশাল আন্দোলনেও সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের স্বপ্ন ছিল। কিন্তু চারু মজুমদার মুক্তির দশকের যে ডাক দিয়েছিল সত্তর দশকে ও পরবর্তীকালেও যে সফল হবে এমন কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছিল না, তবুও কারও কারও বিশ্বাস ছিল হয়তো সম্ভব হবে। 'বিশ্বাসের রাজনৈতিক শক্তি কম নয়' সরোজ ঠান্ডা মাথায় ভেবেছিল—

> সাতের দশকের বিপ্লবীদের মধ্যে অনেকে এই বিশ্বাসরোগের শিকার হয়েছিল। ছয়ের দশক যাদের যাবতীয় বিশ্বাসকে ভেঙে দিয়েছিল, যাবতীয় স্বপ্নকে ছারখার করে দিয়েছিল, সাতের দশকে সেই বিশ্বাস ও স্বপ্নের আদলে এক অলীক ধারণা ও জগৎ তারা তৈরি করে নিয়েছিল। এইভাবে তারা অলীক মুক্তিফৌজ, অলীক মুক্তাঞ্চল, অলীক যুদ্ধ, অলীক রাষ্ট্রক্ষমতা দখল, এমনকি অলীক রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত সমান্তরাল এক জগৎ তৈরি করে নিয়েছিল।[৮৩]

সবকিছু অলীক আর শূন্য আরও বেশি করে মনে হয়েছিল তখন, যখন সামরিক বাহিনী নকশাল দমনে নেমেছিল। সরোজ বুঝতে পেড়েছিল এই গোটা পৃথিবীর কোথাও তার নিরাপদ আশ্রয় নেই। আন্দোলনের আবরণ ফেলে সে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল। তার মনে হয়েছে কেউ কোথাও ছিল না কোনোদিন। চরম অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তিকাতর হয়ে কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গের পথ ধরেছিল সরোজ। রাতের বাসের ভিতরে চারিদিকের অন্ধকার কোনো দিশা পায়নি সরোজ শুধু সামনে এগিয়ে যাবার জন্য বাসের দুটো হেডলাইটের আলো ছাড়া। এই ঘোর নিঃসঙ্গ বিপ্লবীর মনে শৈশবের স্মৃতির পাতাগুলো একটার পর একটা ওলটাতে থেকেছে। দেশভাগের পর কলকাতায় চলে আসার বেদনাদায়ক স্মৃতি যা তাকে প্রথমবার একা করেছিল আজ বিপ্লবের পথে দ্বিতীয়বার। সরোজ গা ঢাকা দিতে দিতে একটা উদ্বাস্তু শিবিরের দায়িত্ব নিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে চেয়েছিল। মাঝে মধ্যে স্থিমিত আন্দোলনের শেষ বিপ্লবীদের খবর নিজের স্মৃতিতে জেগে

উঠেছে। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, তর্ক-বিতর্কের মধ্যে হয়তো নিজের অবস্থানকে যথার্থ মনে করতে চেয়েছে। একটা সময় নিজের শানিত যুক্তি দিয়ে নিজের অবস্থানকে বোঝাতে পারত এখন তা ভোঁতা হয়ে গেছে। মৃত্যু ব্যাপারটা তাকে যেন বেশি পীড়া দিয়েছে, একদিকে যেমন নকশালদের জেলখানায় গুলি করে পিটিয়ে বেয়নেট চার্জ করে মারা হত আবার নকশাল দ্বারা জোতদারদের নির্বিচারে হত্যা করা কোনোটাই অর্থপূর্ণ মনে করতে পারেনি। কৃষ্ণপ্রিয়-অতসীর যে সন্তান মালদাতে পড়াশোনা করছিল সে জেলসংঘর্ষে মারা গেছে। তার মৃতদেহ আনতে গিয়ে সরোজ আরও একবার স্মৃতির অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছিল। মৃতদেহ সনাক্ত করা থেকে, নিয়ে আসার যে হেনস্থা তা সরোজের অজানা ছিল না, মর্গে পড়ে থাকা পচা গলা শবের মধ্যে চেনা যায় না কে কার পরিচিত, কে কার সন্তান, যে কোনো মৃতদেহকে যে কোনো পরিচয়ে চালিয়ে দেওয়া যেত। পুলিশ ভ্যানের মধ্যে বিখ্যাত নকশাল বিপ্লবী তিমিরবরণ ও নজরুল ইসলামের দেহ দেখেছিল সরোজ। সঙ্গে থাকা ত্রিদিবের মুখে 'ইউ আর অ্যাট ওয়ার উইথ দি ইন্ডিয়ান রিঅ্যাকশনারিস' শুনে সরোজের বিপ্লবী সত্তা যেন জেগে উঠেছিল। আন্দোলন থেকে সদ্য বেরিয়ে আসা সরোজের যুক্তি, যুদ্ধের একটা নিয়ম থাকে, যুদ্ধবন্দিদের এভাবে মারা সভ্য দেশের আদর্শবিরুদ্ধ। কিন্তু জোতদারের কাটামুণ্ডু তার স্ত্রী, ছেলে-মেয়েদের সামনে নিয়ে যাওয়া, এসব বিপ্লবের কোন পদ্ধতিতে আসে এ প্রশ্নের উত্তর সরোজের কাছে ছিল না। এমন অনেক প্রশ্ন ও তার উত্তর নিজেই খুঁজতে চেষ্টা করেছিল সরোজ।

নকশাল আন্দোলন ভারতে জাতীয় ক্ষেত্রে শক্তিশালী হতেই নকশাল দমনে একদিক থেকে সরকারের বাহিনী অন্যদিক দিক থেকে তাতে বামপন্থীদের মদত, এই সাঁড়াশি চাপের ব্যবস্থা হয়েছিল। চিনের অন্ধ অনুসরণ ভারতীয় নকশাল বিপ্লবীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি ছিল। নৃশংসতা বীরত্বকেও ছাপিয়ে যায় যে বিপ্লবে, সেই বিপ্লবের অন্তঃসারশূন্যতা সরোজ দেখতে পেয়েছিল, এই শূন্যতা অভিজিৎ সেনও দেখেছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধেও মুক্তিযোদ্ধারা কতকটা ভারতীয় নকশালদের পথ অবলম্বন করেছিল। হেনার বিপ্লবী জীবনের অস্বস্তি পরবর্তী জীবনের স্মৃতিচারণে বোঝা যায়—

> সেই মারের মুখে এগিয়ে গিয়ে নির্বোধের মতো মার খাওয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই। আর সেভাবেই ইতিমধ্যে মরে গেছে কয়েক হাজার। এই অলীক অথচ ভয়াবহ যুদ্ধে পশ্চাদপ্সরণ নেই,

> সন্ধি নেই, চুক্তি নেই, আধুনিক অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি নেই, পরিস্কারভাবে চিহ্নিত শত্রু নেই এবং কোনো নির্দিষ্ট রণনীতি কিংবা রণকৌশল নেই![৮৪]

শূন্যতার সঙ্গে একটা অনিশ্চয়তাও ছিল। মনে হয়েছিল কেউ কোথাও নেই যারা আছে তারা জেলখানায়। সরোজ তাই কলকাতা ছেড়ে উত্তরবঙ্গে বন্ধুর আশ্রয়ে চলে এসেছিল। মাথায় যখন শূন্যতা বিরাজ করেছে তার মধ্যেই অনুরূপ স্মৃতিও জেগে উঠেছে, দেশত্যাগের স্মৃতি। একটা পরিচিত বাড়িঘর, গ্রাম গাছপালা নদী পুকুর মাঠ পরিবার পরিজন ছেড়ে চলে যেতে হবে কলকাতা নামক একটি জায়গায় যেখানে নাকি 'একবেলা ভাত এবং একবেলা রুটি খেতে হয়।' শিশুমনের দুশ্চিন্তাগুলো মনে পড়ছিল সরোজের। তারপর চোদ্দ বছর মা বলে ডাকার মতো কাউকে কাছে পায়নি সে, সেই হতাশার সঙ্গে আজকের শূন্যতা শুধু বেদনার বিন্দুতে মিলে যাচ্ছে। বিপ্লবের ব্যর্থতা তাকে স্থবির করে দিয়েছিল। বাংলাদেশী মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং চলেছিল ভারতীয় বাহিনীর ক্যাম্পে তখনও সরোজ নিষ্ক্রিয় ছিল। মূলস্রোতের যে জীবনকে অনেক মেধাবী ছেলে মেয়েরা অবলীলায় উপেক্ষা করেছিল, আর যারা পারেনি তাদের কারও কারও একটা মৌন সমর্থন ছিল, তেমন একজন মানুষ ডেপুটি ত্রিদিবের চেষ্টায় সরোজের একটা চাকরি হয়েছিল শরণার্থী শিবিরের ইনচার্জ হিসাবে। লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণভয়ে চলে এসেছিল পূর্ব পাকিস্তান থেকে। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে মানুষের জীবনের মূল্য ছিল না। এত মানুষের গাদাগাদিতে ক্যাম্পগুলো নরক হয়ে উঠেছিল। যুদ্ধকালীন অবস্থায় বাজারে বিশৃঙ্খল অবস্থা, মানুষের নৈতিক অসততা দেখা যেত। তার সঙ্গে কলকাতার কয়েকটি অঞ্চলের জেলখানায় নকশাল নিধন চলেছিল। সরোজ থাকলে হয়তো তাকেও এই তালিকায় থাকতে হত। সীমান্ত অঞ্চলেও যুদ্ধের প্রভাব আর কলকাতার নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পাড়াগুলো বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টিগুলোর দখলে, নকশালও আছে এর মধ্যে—

> কে যে কার শত্রু আর কে যে কার মিত্র, কিছুই ঠিক নেই। প্রত্যেকটি পরিচিত এবং অপরিচিত মুখই সম্ভাব্য শত্রু। শ্রেণিশত্রু নির্ণয়ে এতবড়ো তাত্ত্বিক বিপর্যয় পৃথিবীর আর কোনো দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনে হয়েছে কি না সন্দেহ।[৮৫]

তবু একটা উদ্দামতা ছিল, ইংরেজ আমলের কৃষক বিদ্রোহ তার পরবর্তীকালে তেলেঙ্গানা ও কাকদ্বীপের লড়াই সাম্যবাদী বিপ্লবীদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। সমাজব্যাবস্থার পরিবর্তনের

সঙ্গে তাদের স্বপ্ন চেতনায় দৃঢ়তার সঙ্গে সৎ ও আত্মত্যাগের মতো চিত্ত তৈরি ছিল। কিন্তু সশস্ত্র সংগ্রামের নীল নকশা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে অনেকের মতো সরোজ দার্শনিকতার আবেগ ত্যাগ করে বাস্তবতার শক্ত মাটি থেকে দেখতে পেয়েছিল—

> সবাই জানত চারু মজুমদারের মুক্তির দশকের স্লোগান একটা কথার কথা। সাত কেন, আট, এমনকি নয়ের দশকেও ভারতবর্ষে বিপ্লব জয়যুক্ত হবে এমন বিশ্বাস কারও ছিল না। বিশ্বাস না-থাকলেও, ঘটনা বার বার বিপরীত প্রমাণ নিয়ে হাজির হলেও মানুষের ভিতর এক ধরণের অলীক আকাঙ্ক্ষা জন্মাতে পারে— সেও এক ধরণের বিশ্বাস। বিশ্বাসের রাজনৈতিক শক্তি কম নয়।[৮৬]

অভিজিৎ সেন এখানে দার্শনিকতা ত্যাগ করেছিলেন, তবে যে 'বিশ্বাস রোগের' কথা বলেছেন তাকে নির্দ্বিধায় মেনে নিতে একটু হোঁচট খেতে হয়েছিল। এতগুলো মেধাবী জীবন শুধু আবেগ আর বুকভরা বিশ্বাস পাথেয় করে বন্ধুর পথে নেমেছিল এমনটা তখন ভাবলেও আজ ভাবা যায় না। অনেকগুলো মারণ আঘাতে পুরো সমাজের ভীতসহ গোটা ইমারতটা কেঁপে উঠেছিল। সেটাও কম কথা কী?

আন্দোলনের প্রতিটা ক্ষেত্রে একটা গোপনীয়তা থাকে। আস্তানার ক্ষেত্রেও গোপন আস্তানা থেকে শ্রমিক শ্রেণির মানুষের কাছে শ্রেণিসংগ্রামকে বোঝাতে চেষ্টা করত নকশাল বিপ্লবীরা। কিন্তু সেই আলোচনা জোতদার খতমের অভিপ্রায়ে শেষ হত। কিন্তু জোতদার খতমযোগ্য কিনা সেটা বিচার করার অবকাশ ছিল না। খতমের তালিকা থেকে কোনো জোতদার বাদ গেলে একটা হতাশা জন্মাত। জোতদার খুঁজে বেড়ানো একটা কাজের মধ্যেই পড়ত। কোনো এক সময় জোতদারের কাটা মুণ্ডু শিয়ালদা স্টেশনের উঁচু গ্রিলের মাথায় আটকে দেবার কথা হয়েছিল। অভিজিৎ সেন সরোজের স্মৃতিচারণার মধ্যে নৃশংসতাকে দেখিয়েছেন যা বিপ্লবের পথ যে নির্দেশ করে না এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তিনি এসবের প্রতিবাদ ও ঘোর বিরোধিতা দেখিয়েছিলেন অন্যভাবে—

> রাত্রে কোনো কষ্টকর হাইড আউটে শুয়ে ঘুম আসত না তার। সে সময়ে সারা গায়ে চাম-উকুন হয়েছিল তার। কমরেডদের মধ্যে কেউ জেলখানা থেকে নিয়ে এসেছিল। কখনো কখনো মনে হত বিপ্লবের থেকে অনেক জরুরি উকুনের সমস্যার সমাধান। মনে হত ভয়ংকর জোতদার খতমের থেকে চাম-উকুন খতম করা অনেক বড়ো বিপ্লবী কাজ। নির্ঘুম ক্লান্ত রাতে আসল সমস্যা যৌনতা, উকুন, না বিপ্লব, এইসব নিয়ে সংশয় উপস্থিত হত।[৮৭]

আসলে বিপ্লবের পন্থা নিয়ে লেখকের প্রতিবাদ এটা। অন্যদিকে সমাজের যত সমস্যার মূলে নকশালদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগ আছে বলেই অনেকে মনে করত। হরিমোহন সায়ের মতো লোকেরা যুদ্ধের বাজারে মজুত দ্রব্যের দাম ইচ্ছেমতো বাড়াতে পারত। তার সমগোত্রীয়দের সঙ্গে তার রেষারেষিও ছিল এবং পারিবারিক বিবাদ নিয়ে মামলা চলেছিল এর মধ্যে হরিমোহন খুন হলে হরিমোহনের পক্ষের লোকেরা তার বিপক্ষ পরিবারের সঙ্গে নকশালদের যোগ আছে তাই এই খুনেও নকশালদের যোগ আছে বলেই মনে করেছিল। এমন কাহিনির অবতারণা করে লেখক নকশালদের পক্ষেই দাঁড়িয়েছেন। অভিজিৎ সেন নকশাল আন্দোলনে যোগ দিয়ে যে সময়টা কাটিয়েছেন সেটাকে বাস্তবিকভাবেই অপচয় বলেই মনে করেছেন। এছাড়া তাঁর পরিবারকে যে খেসারত দিতে হয়েছিল রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য এক্ষেত্রে লেখকের একটা অপরাধবোধ কাজ করেছে এটাও স্পষ্ট।

মাঝের বন্দর নামের ছোট শহরটায় নিজেকে কাজের মধ্যে রেখে সরোজ যে একেবারেই গা থেকে ঝেড়ে ফেলেছিল নকশাল আন্দোলনের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎকে তা নয়। নকশাল বিপ্লবীদের প্রতিটি মৃত্যু সরোজকে অতীতের সামনে এনেছে, আচ্ছন্ন হয়েছে মৃত্যুর খবরে। বহরমপুর জেলে নকশালদের হত্যার দু-মাস আগে মেদিনীপুরের জেলে হত্যা করা হয়েছিল নকশালদের। 'একেবারে নির্দিষ্ট পরিকল্পনার ছকে একটা প্রজন্মের প্রথম সারির যুবকদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলার ব্যবস্থা', দু-মাস অন্তর এমন হত্যাযজ্ঞ চলতেই থাকে। এসব ভাবনা সরোজকে অস্থির করেছিল। অস্থিরতা থেকে মুক্তি পেতে ভেবেছিল এমন জীবন না হলেই পারত। বরং সুস্থ স্বাভাবিকভাবে উপভোগ্য জীবনে ভেসে যেতে পারত। খবরের কাগজে কাশীপুর, বরাহনগরের নকশাল নিধনের খবর দেখে সরোজ বিচলিত হয়েছিল, ছেড়ে আসা আন্দোলন আজও মনকে আন্দোলিত করে। বারাসাতের ঘটনায় গোপনে খুন, লাশ পাচার, প্রকাশ্য রাজপথে খুন এসবের সঙ্গে খবরের কাগজে আরও লেখা ছিল—

> পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে ছাড়া আর কখনও একটি মহল্লার ভিতরে এই পরিমাণ রক্তপাত ও অন্য উপদ্রব হয়নি।[৮৮]

এসব খবরে সরোজ ভিতর থেকে উত্তেজিত, অস্থির, আতঙ্কগ্রস্থ হত, বিপ্লবের মধ্যে থাকাকালীন এভাবে আতঙ্কগ্রস্থ হয়নি সরোজ। খবরের কাজগও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে অনেক

খবর গোপন করে প্রশাসনকে গোপন করার চেষ্টা করছিল। সরোজ ঘুমের মধ্যেও শূন্যতাকে উপলব্ধি করেছে। আর স্বপ্নের মধ্যে অন্যান্য সম্ভব-অসম্ভব বিষয় উঠে এসেছিল, এসব স্বপ্নের মাঝে যৌনতা, বিপ্লবের অতীত-বর্তমান এসে উঁকি দিয়েছিল, বোমা, গুলির শব্দ স্বপ্নকে ভয়ার্ত করেছিল।

নকশাল আন্দোলনের এক প্রাক্তন কমরেডের সঙ্গে দেখা হলে, সরোজ দত্ত ও যামিনী গুপ্তের মতো নকশাল নেতাদের কথা মনে পড়লে এখনো আবেগে চোখে জল আসে সরোজের। বিপ্লবে যোগদানের পর তাদের বেঁচে থাকাটাই আশ্চর্যের, কারণ—

> আধুনিক অস্ত্র নয়, পশ্চাদপসরণ নয়, কোনোক্রমেই মারের মুখে গ্রাম ছেড়ে আসা নয়, ধরা পড়লে আইনের সাহায্য কৌশল হিসাবে নেওয়াও নয়, সন্ধি নয়, এরকম এক অশ্রুত, অনভিজ্ঞতা, অনর্থক যুদ্ধ তাদের লড়তে হয়েছিল।[৮৯]

ফলে বিপ্লবটা জনগণ অপেক্ষা নিজের জন্য বেশি জরুরি মনে হয়েছিল। আবার যারা এসব বিপ্লবীদের হত্যা করেছিল শুধু কর্তৃপক্ষের নির্দেশে নয়, তাদের মধ্যে আদর্শানুগত্য অবশ্যই জন্মেছিল। চারু মজুমদারকে একজন আদর্শ নেতা হিসাবে পেয়ে শুধু তার নির্দেশ পালনের কথাই বলেছিল যামিনী গুপ্ত। বিপ্লবের রণকৌশল ব্যাখ্যা করতে বসে ঐতিহ্যবিরোধিতা, মূর্তিভাঙা, স্কুল কলেজ পোড়ানো, রবীন্দ্র বিরোধিতা এসবের যুক্তিহীন ব্যাখ্যা দিত এমনটা মনে হয়েছিল সরোজের। অতীতে যামিনী গুপ্ত রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনতে ভালোবাসত, কমিউনিস্টদের যারা রবীন্দ্র বিরোধিতা করেছে তাদের বিরুদ্ধে যামিনী কলম ধরেছিল। যামিনী গুপ্তের বাষট্টির চিন যুদ্ধের সময়ে হাজতবাস তারপর জেল থেকে বেরিয়ে চারু মজুমদারের পার্টিতে যোগদানের কথা সরোজ জানত। বিপ্লবীদের সেন্টিমেন্টকে আশ্রয় দিতে চায়নি যামিনী কিন্তু সরোজের চোখের সামনে যে বিপ্লবীর সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়েছিল সেই মৃত্যু সরোজ ভুলতে পারছিল না। মৃতপ্রায় বিপ্লবীর মুখ বার বার মনে পড়েছে সরোজের। যামিনী গুপ্ত, সরোজ দত্তের পরিণতির কথা যেমন বলেছে, সরোজ আবার তাদের আন্দোলনের ভ্রান্তি ও ব্যর্থতার কথাও বলেছিল। পার্টির নানারকম হতাশা মতবিরোধের কারণ হিসাবে বলেছিল—

> বিরোধ ছিল খতম নিয়ে, গেরিলা অভ্যুত্থানের পদ্ধতি নিয়ে, মূর্তি ভাঙা নিয়ে, পুলিশের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া নিয়ে। প্রশ্ন ছিল বাংলাদেশ নিয়ে, চীনের ভূমিকা নিয়ে, পাকিস্তানের

ভূমিকা নিয়ে। যারা এই কাজে অংশগ্রহন করেছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই ভুল বুঝতে পারছিল কিন্তু কী ভুল করছিল অথবা কেন এই ভুল, সেই তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের কাণ্ডজ্ঞান অধিকাংশেরই ছিল না।[৯০]

সরোজ এই না বুঝতে পারার দলেই ছিল, তবে এটা জানত কৃষকরা তাদের দিয়ে জোতদার খুন করিয়ে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি ও সাময়িক অর্থনৈতিক সুবিধা পেতে চেয়েছিল। গরিব চাষিদের থেকে ভিন্ন প্রতিক্রিয়াও পেয়েছিল সরোজ, একটি সংখ্যালঘু মুসলিম প্রধান অঞ্চলের কৃষকেরা সরোজকে প্রচার শেষে সাবধান করে ফিরিয়ে দিয়েছিল। শহর থেকে গ্রামে যারা যেত তাদের দিয়ে জোতদার খুন করানো হত না, কৃষকদের মধ্য থেকে গেরিলাবাহিনী তৈরি করে তাদের এই কাজে নিযুক্ত করা হত। কিন্তু বাস্তবে তা হত না, শহর থেকে আসা অনেকেই আবেগসর্বস্বতায় ভেসে এই কাজে এগিয়ে আসত।

যামিনী গুপ্তের উবে যাওয়া, সরোজ দত্তের নিখোঁজ হওয়া, ময়দানে যে কবন্ধ পড়ে ছিল তা যামিনী গুপ্তেরই এমন সন্দেহ, জ্যান্ত মানুষের হৃৎপিণ্ড খুবলে নেওয়া, মেয়েদের স্তন কেটে, যোনিতে লোহার রড ঢুকিয়ে খুন করা, তরতাজা যুবকের মাথা থেঁতলে খুন করা কিংবা জোতদারের কাটা মুণ্ডু লোকালয়ে কোথাও গেঁথে রাখা এসব নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে গিয়েছিল সেই সময়। এই ধরনের ভয়াবহ সব মৃত্যু যে বিপ্লবের অঙ্গ, সরোজ বার বার তারই সমালোচনা করেছিল আর আত্মসমালোচনাও। এমন সব রোমহর্ষক ঘটনা সমাজে কী পরিমাণ সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করেছিল তা বোঝা যায় সরোজের কথায়। মহানায়ক উত্তমকুমারকেও (১৯২৬-১৯৮০) কিছুদিনের জন্য বম্বে চলে যেতে হয়েছিল হুমকি পেয়ে। ময়দানে বায়ুসেবন করতে গিয়ে কিছু একটা ঘটনা দেখেই উত্তমকুমার সেখানে এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে গাড়িতে উঠেছিল। তারপর টেলিফোনে হুমকি এসেছিল—

আপনি যা দেখেছেন, তা কিন্তু আপনি দেখেননি। আপনি যা শুনেছেন, তা আপনি শোনেননি। আপনি যা বলেছেন, তা আপনি বলেননি![৯১]

উত্তমকুমারের দেখা, শোনা, বোঝা এসবকে এক ফোনেই বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছিল। যেভাবে জ্যান্ত মানুষগুলো সমস্ত অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও এক মুহূর্তে অস্তিত্বহীন হয়ে যায়। সরোজ এসব দৃশ্য দেখা ও শোনার পর থেকে নিজের অক্ষমতাকে বেশি বেশি করে বুঝতে পেরেছিল ফলে তার মধ্যে একটা আত্মগ্লানিও জন্মেছিল। 'জয় বাংলা' বলে হেয় করা পূর্ব

বাংলার একটা মুসলমান পরিবারের সঙ্গে সরোজের আত্মিক একটা সম্পর্ক ক্রমে দৃঢ় হয়েছিল, নিজের কামনার রেশ ধরে রাখতে না পেরে জেদের বশে কেবল মাত্র নিজেকে শাসন করে অসহায় পরিবারটির থেকে দূরে থাকার প্রয়াস করাতেও আত্মগ্লানি আরও বেড়েছিল। এসবের মাঝে যোগ হয়েছিল চিঠিতে মা বাবার উদ্বেগ প্রকাশ, পারিবারিক অভাব। ভয় হয়েছিল ক্যাম্পের অন্য ইনচার্জের মতো অসৎ রোজগারে জড়িয়ে না পড়ে। দাঙ্গার পর পূর্ব বাংলা থেকে অভিজিৎ সেনের বাবা-মা পশ্চিম বাংলায় চলে আসেন, দশ–বারো বছর আগে আসা তাদের সন্তানদের উপর ভরসা করেই। কিন্তু অভিজিৎ সেন চাকরি ছেড়ে নকশাল আন্দোলনে যোগ দেন ফলে বাবার একটা অভিযোগ ছিলই। এখানেও তাই আছে সরোজের বাবার অভিযোগ আসলে লেখকের বাবারই আক্ষেপ। এসবের মধ্যে সব ভাবনা গুলিয়ে উঠেছিল সরোজের মধ্যে, খবরের কাগজে দেখতে থাকে স্বাধীন বাংলাদেশের যুদ্ধে ইন্দিরা গান্ধির (১৯১৭-১৯৮৪) সাপোর্ট, মার্কিনিদের পাকিস্তানকে সহায়তার নামে কিছুটা বিভ্রান্ত, ব্রিটেন বিরূপ, চিন অস্বস্তিতে, আওয়ামী লীগের নানা ধরনের বিরোধ ও চক্রান্ত, আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে পুলিশের গুলিতে নকশালদের খুন এদের মধ্যে সরোজের পরিচিত কেউ আছে কিনা এমন ভাবনা ইত্যাদি। আসলে এসবের সঙ্গে সরোজের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগ ছিল তাই প্রতিটি খবর তার কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, আত্মসমীক্ষায় বসে তার অতীত তাকে আরও দ্বন্দ্বময় করে তুলেছিল এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে।

ঘর ও কাজ ছেড়ে যারা নকশাল আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল তাদের যেমন স্থিরতা ছিল না কোনো কিছুতেই আবার সরোজের মতো আন্দোলন ছেড়ে বেরিয়ে আসার পরেও তেমন স্থিরতা খুঁজে পায়নি। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ নিয়ে একটা অনিশ্চয়তা দেখতে পেয়েছিল সরোজ, তাই পূর্ব পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা হেনার প্রেমের আবেদনে সাড়া দিতে বুক কেঁপে উঠেছিল তার। কিন্তু একইরকম অবস্থা হেনাদের, তাদেরও স্থিরতা ছিল না জীবনে। নানান অস্থিরতার মধ্যে সরোজ 'জয় বাংলার' আবদুল কুদ্দুসকে নিয়ে কলকাতা এসেছিল। এখানে পরিচিত কমরেডদের সঙ্গে সেভাবে দেখা হয়নি কারণ কেউ হাসপাতালে, কেউ জেলখানায়, কেউ মৃত, কেউ নিখোঁজ কেউবা আত্মগোপন করেছিল। কলকাতায় তখন ইন্দিরা গান্ধি দেবী হয়ে উঠেছিলেন, এশিয়ার মুক্তিসূর্য হয়ে উদয় হবেন কিছুদিন পরে।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় মাঝের বন্দর নামের ছোট শহরটায় যুদ্ধের কামান, গোলা, বোমারু মানুষগুলোকে মুহূর্তে চঞ্চল করে তুলেছিল, নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে পুরো শহরটা কয়েক ঘণ্টায় ফাঁকা হয়েছিল। ভয়ের আবহের মধ্যেই সরোজ হেনার যৌন মিলনের সুখ দিয়েও হাড় হিম করা যুদ্ধের পরিবেশকে ম্লান করতে পারেনি বরং দুজনেই ভেবেছিল এভাবেই যদি মৃত্যু আসে আসুক। হেনার শরীরে বার বার মৃগীর ফিট এলেও, প্রায় নিষ্প্রাণ শরীরটাকে জড়িয়ে ধরে সরোজ ঘুমিয়ে গিয়েছিল। তারপর স্বপ্ন দেখেছিল—

> লাল, নীল, সবুজ, গেরুয়া, কমলা রঙের ঝান্ডা এবং নিশান হাতে অসংখ্য খেপাটে, ক্ষুধার্ত এবং বিস্ফারিত চোখের মানুষ হাত মুঠি করে, অশ্লীল অসম্ভব এবং উন্মাদ সব স্লোগান দিয়ে রাস্তা কাঁপিয়ে চলে যাচ্ছে। তাদের যেন শেষ নেই।[৯২]

স্বপ্নের মধ্যে এত নীলিমা যেগুলোকে বাস্তবেও উপেক্ষা করতে পারেনি সরোজ। নকশাল আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, দাঙ্গা, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ উপন্যাসে এসব বিষয়ের অবতারণা করেছিলেন অভিজিৎ সেন। সরোজের চরিত্রে নিজেই বার বার এসবের বিশ্লেষণ করেছেন, একটি আন্দোলনে যুক্ত হয়ে তিনি বুঝেছেন, যুদ্ধ ধ্বংসের নামান্তর, একরাশ ক্ষতি, লাভ সামান্যই সামান্য কয়েকজনের। কিন্তু অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বিপ্লবকে সরাতে পারেনি তাই ফেলে আসা বিপ্লব আর জুড়ে যাওয়া মুক্তিযুদ্ধের মুসাফির পরিবারের সঙ্গ তাকে মনে, স্থানে, স্বপ্নে জাগরণে কোনো স্থায়িত্ব দেয়নি। নকশাল আন্দোলনের শেষ পর্বে লেখকের দেখা মুক্তিযুদ্ধের পরিস্থিতি, শুধু দেখা নয়, মুক্তিযুদ্ধের সময় শেকড় ছেঁড়া মানুষের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ার ফলে উপলব্ধি করার অনেকটা সময় এই উপন্যাসের আখ্যান।

খ। *মৃত মানুষের সঙ্গে বসবাস*

মৃত মানুষের সঙ্গে বসবাস উপন্যাসটির অবয়ব ছোটো হলেও সত্তর দশকের আগে পরের বিভিন্ন অবস্থার কথা এবং নানা ধরনের চরিত্রের সংস্থান এতে এসেছে। এই চরিত্রগুলো নিয়ে লেখক মন্তব্য করেছিলেন আমাদের অফিস যেন একটা গোটা ভারতবর্ষ। এক ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর কর্মচারীদের জীবনের নানা মাত্রা উঠে এসেছে এই উপন্যাসে। তাদের সংসার আচার ব্যবহার, অফিসের কথোপকথন, পারদর্শিতা এমনকি আত্মহত্যা, গোপনীয়তা ইত্যাদি। এর পাশাপাশি নকশাল আন্দোলনের প্রসঙ্গ তুলে এনেছেন লেখক। উপন্যাসের কাহিনিতে কোথাও যেন লেখকের নিজের জীবনের ছাপ আছে তা বোঝা গেছে।

ওপাড় বাংলা থেকে অশোকের চলে আসা, বি.এ পড়তে পড়তে ইন্সিওরেন্স কোম্পানীতে চাকরি, পিসিমার বাড়ি থেকে পড়াশোনা এবং চাকরি ছেড়ে নকশাল আন্দোলনে যোগদান আবার ফিরে এসে স্বাভাবিক জীবনযাপন এসব তো লেখকের জীবনের স্মৃতি। অশোকের মধ্যে যে আসলে অভিজিৎ সেনের ছায়া আছে একথা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। চাকরি ছেড়ে নকশাল আন্দোলনে চলে যাওয়া এবং ফিরে এসে ভারতবর্ষরূপী অফিসটার পরিবর্তন দেখাই এই উপন্যাসের আখ্যান।

ষাটের দশকের অন্তিম লগ্ন থেকেই বাংলার রাজনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন শুরু হয়েছিল। এই পরিবর্তনের জোয়ারে বাংলায় একটা বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। সেই প্রেক্ষিতেই সাতষট্টিতে নকশালবাড়ির অভ্যুত্থান হয়েছে। *মৃত মানুষের সঙ্গে বসবাস* উপন্যাসের অশোক নকশালবাড়ির অনুপ্রেরণার কলেজ ইউনিভার্সিটির বন্ধুদের নিয়ে একটা পাঠচক্রের মতো সংগঠন তৈরি করেছিল। মার্কসবাদী লিটারেচার ব্যাখ্যা, চিনের বিপ্লব অনুসরণ করা এবং শিলিগুড়ি গিয়ে চারু মজুমদারের সঙ্গে দেখা করা এদের উদ্দেশ্য ছিল। জোতদার খতম করে গ্রামে মুক্তাঞ্চল তৈরি করতে চেয়েছিল। খতম অভিযানেই সমাজের শ্রেণিবৈষম্য শেষ করতে চেয়েছে তাই অশোকের পাঠচক্রের সবাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে 'গ্রামে চলো' অভিযানে সামিল হয়েছিল এক উন্মাদনায়। শুধু সময় আর সুযোগের অপেক্ষা। সুযোগ পেয়েই এরা দুর্গম গ্রামাঞ্চলে পাড়ি দিয়েছিল—

> একটা অসম্ভব উদ্দীপনা এবং উত্তেজনা, সবাইকে সারাক্ষণ মাতিয়ে রাখার মতো উন্মত্ততা। কী পেতে যাচ্ছি, কী হারাতে যাচ্ছি, যারা এই কাজে ঝাঁপ দিল, সম্ভবত, কেউই সে হিসাব করেনি। যারা গ্রামে গিয়েছিল অথবা যারা এই রাজনীতিতে অংশগ্রহন করেছিল, তারা সম্ভবত তাদের জীবনের সর্বাঙ্গ জুড়ে যে দুঃসহ অবক্ষয়ের আবর্তে পড়েছিল, তার থেকে তাৎক্ষনিক একটা মুক্তি পেতে চেয়েছিল। সমাজ, রাজনীতি, পরিবার, অভাব, দারিদ্র্য, অপমান, অসহায় জীবনযাত্রা এর যে-কোনো এক বা একাধিক কারণে তাদের ধিক্কার জন্মেছিল এই জীবনচর্চায়।[৯৩]

শুধু নিজেদের পারিবারিক জীবনের প্রতি ধিক্কার নয় সমাজের রাজনীতির একাধিক কদর্যতার প্রতি ধিক্কার ঘর ছাড়তে বাধ্য করেছিল এদের। ষাটের দশকের দুর্দিনেও মুখ্যমন্ত্রী মানুষকে ভাতের বদলে কাঁচাকলা খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। টালমাটাল সরকারের দুর্বলতায় মুনাফাখোর, মজুতদাররা তাদের অনৈতিক কাজ পুরোদমে চালিয়েছিল। বাজারের অবস্থা খুব খারাপ, ঠিক তখনই অশোক চাকরি ছেড়ে আন্দোলনের পথে নেমে গেছে। সমস্ত

পারিবারিক মায়া কাটিয়ে অনিশ্চয়তার জীবনে পদার্পন। সমাজে সাম্য ফিরিয়ে আনার লক্ষ্য, মেহনতি মানুষের অধিকার বুঝিয়ে দেবার লড়াই তাদের উজ্জীবিত করেছিল। অশোক যখন এই পথ ত্যাগ করে আবার ফিরে এসেছিল স্বাভাবিক জীবনে তার মোহ কটে যায়।

খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে অভিজিৎ সেন এই উপন্যাসে একজন যুবকের নকশাল আন্দোলনে যোগ দেবার মুহূর্ত ধরেছেন। অভিজিৎ সেন নিজে যেভাবে কোম্পানীর চাকরি ছেড়ে বিপ্লবে যোগ দিয়েছিলেন সেভাবেই। অশোক নামের সেই যুবক তার কর্মক্ষেত্রকে দেখেছিল একটা দেশ হিসাবে, সেই দেশের দুঃখ কষ্ট সবকিছু। তারপর সে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু আন্দোলন ছেড়ে আবার একবার ফিরে এসেছে অফিসটায় এবং শুনেছিল তার সহকর্মীরা কয়েকজন আত্মহত্যা করেছে সাংসারিক বা অন্য কারণে। এই খবরে অশোক বিচলিত হয়নি কারণ সেও উপলব্ধি করেছিল, আত্মহত্যা করে নতুন জীবনপ্রাপ্তি। কারণ সে নকশাল আন্দোলন থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে।

গ। *লাশকাটা ঘরের সামনে অপেক্ষা*

কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন এবং কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মী ছিলেন অভিজিৎ সেন। এবং কমিউনিস্টের ভাঙনের প্রতিটি পর্বে তিনি পরের দলটিতেই থেকেছেন, সি.পি.আই.এম.এল এর সঙ্গেও যুক্ত হয়েছিলেন। সত্তর দশকে এই দলটি 'সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে সশস্ত্র সংগ্রামের আগুন জ্বেলেছিল', অভিজিৎ সেন খুব কম সময় হলেও এই সংগ্রামের অংশীদার। এই সময়কে এবং বিপ্লবের ধারাকে অনেকটাই বুঝেছিলেন। সেই বোধ থেকেই অভিজিৎ সেন অনেকগুলি উপন্যাসে নকশাল আন্দোলনের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। *লাশকাটা ঘরের সামনে অপেক্ষা* সেই ধারায় আর এক সংযোজন। এই উপন্যাসে শুভব্রত ও বনানী এক বিপ্লবী আন্দোলনে মৃত সন্তানের দেহ সনাক্ত করতে গিয়েছিল মর্গে। তরতাজা সন্তানের লাশ শনাক্ত করা যে কী উদ্বেগের ছিল তা লাশকাটা ঘরের সামনে বসে বুঝতে পারত বাবা-মা। লাশকাটা ঘরের সামনে গিয়ে সারাদিন অপেক্ষারত শুভব্রত ফিরে গিয়েছিল সত্তরের বিপ্লবের দিনগুলিতে। সেই অতীত তার অস্তিত্ব অধিকার করে ছিল, একদা নকশাল বিপ্লবী শুভব্রত নিজের জীবনের স্মৃতি রোমন্থন করেছে যা এই উপন্যাসের আখ্যান।

শুভব্রতর অতীত ঘাঁটতে বসে মনে হয়েছে যে আন্দোলনে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না, যে আন্দোলনের অভ্যন্তরে নানান মতবিরোধ ছিল, যার কোনো সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎও ছিল না,

সম্পূর্ণ পন্থাটাই ভ্রান্ত ফলে সাফল্য আসা একপ্রকার অনিশ্চিত ছিল, তাতে যোগ দেওয়াটা ভুল নয় অন্যায়। যার খেসারত নিজের পরিবারকে নানাভাবে দিতে হয়েছে, এই অন্যায় থেকে সংশোধনের পথ নেই, ক্ষমা নেই। যদি শুভব্রত আস্তিক হত, কাঁদার জায়গা থাকত তবে একপ্রকার রেহাইয়ের বন্দোবস্ত হলেও হতে পারত কিন্তু সে বালক বয়স থেকেই নাস্তিক। শুভব্রতর স্ত্রী বনানীও মনে করত এই সমাজ পরিবর্তনের নামে বিপ্লব, অহেতুক হত্যা এসবের মধ্য দিয়ে আদৌ শ্রমিক কৃষকের কোনো উপকার হবে না। পিজি হাসপালের মর্গের সামনে অপেক্ষারত দালাল, মেথর, জমাদার, রাজনৈতিক লোকজন, মর্গের পচা মৃতদেহ ও গ্যামাক্সিনের মিলিত নারকীর গন্ধ সব মিলিয়ে অদ্ভুত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে শুভব্রতর অতীতের পাতা ওলটাতে শুরু করেছিল। যখন তার মতো অনেক যুবকের মনে হয়েছিল পচা গলা অসুস্থ সমাজটা বদলাতে হবে, আর অভাব, দারিদ্র্য, অপমান, লাঞ্ছনার সমাধান হাতের মুঠোয় ফলে গ্রামে যাবার ডাক শুনে ছড়িয়ে পড়েছিল। শুভব্রত গিয়েছিল সোরাব আলিকে নিয়ে, সোরাব আলির সঙ্গে আমিনপুরের মুসলমান প্রধান গ্রামে গিয়ে ভোল বদলে নিয়েছিল, জলকে পানি বলার অভ্যাস, লুঙ্গি পরা ও বিড়ি খাওয়া এমনকি নামও বদলে ফেলতে হয়েছিল। তার পথে এসব করতে হত, পুলিশের ও শত্রুপক্ষের থেকে রেহাই পেতে। কলকাতার বেহালাতে একটি গোপন সভায় একত্রিত হয়ে বারোজন পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল, তিনমাস পর জামিনে মুক্ত হয়ে, বারো জনের আটজন ঘরবন্দি হয়েছিল মুচলেখা দিয়ে, চারজন বেইল জাম্প করে অজ্ঞাতবাসে চলে গিয়েছিল, এই চারজনের একজন শুভব্রত। বঙ্কিমের স্ত্রী মাধবীর একটা সোজা প্রশ্ন ‘এই যে বাপ-মাকে কাঁদিয়ে বাড়ি ছেড়ে আসলে, এতে কি ভালো হবে?’ এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর শুভব্রত কেন কারো কাছেই ছিল না। বিপ্লবের পথে কোনো স্নেহের সম্পর্ক প্রাধান্য দিতে চায়নি এইসব যুবকেরা। পুলিশের তাড়া খেয়ে অসুস্থ হলে শুভব্রত এর আগে অসহায় দরিদ্র এক পাতানো দিদির কাছে এসে উঠত তারপর দুর্বলতা জমার আগেই সরে পড়ত সেখান থেকে। সোরাব আলির সঙ্গে রাতের গভীর অন্ধকারে মাঠ, নদী-নালা, সাপ উপেক্ষা করে চৌঘরা গ্রামের একটি বাড়িতে উঠেছিল বেলাল নাম নিয়ে। সোরাবের ভাবীর রান্না করা ভাত আর বেগুনের বিচিত্র তরকারি খেয়ে খিদে নিবারণ করতে হয়েছিল। নিজের সংসারের পর গ্রামে এসে দারিদ্র্য দেখেছিল শুভব্রত। নিজের বাড়িতে যখন কোনো বিপ্লবী বন্ধু এসে হাজির হত তার মা’ও অপ্রস্তুতে পড়ত। বাড়িতে রান্নার মতো চাল থাকত না, খোলা বাজারে চাল উধাও,

মজুতদারদের দৌরাত্মে বাজারে চালের দামে আগুন, টাকার অভাবে রেশন আনা হয়নি। বাধ্য হয়েই শুভব্রতকে বলতে হত আজ আমাদের বাড়িতে চাল নেই তুই অন্য কোথাও ব্যবস্থা কর। তার বন্ধু তখন বলত 'নেভার মাইন্ড, এই হচ্ছে কবিতা লেখার সময়, এই হচ্ছে বিপ্লব করবার সময়!' বাড়িতে হাড়ি না চাপার ফলে যে অপ্রস্তুত অবস্থা সেটা এড়াবার জন্য একথা নাকি বিপ্লবের আবেগে আপ্লুত হয়ে খিদেকেও দূরে সরাতে চেয়েছিল। অনেক যুবক তো এই দারিদ্র্য নিবারণে বিপ্লবে এসেছিল। ভাতের সঙ্গে বেগুনের তরকারি যেভাবে মেখেছিল শুভব্রত বিপ্লবের সঙ্গে দারিদ্র্য যেন সেভাবেই মাখামাখি ছিল। ভাঙা ঘরে, শক্ত বালিশে মাথা রেখে তার মনে হয়েছিল শ্রেণিশত্রু খতমের যে সংগঠন করেছে এতে কী সমাজের সত্যিকার অভ্যুত্থান হবে, এই দ্বন্দ্ব তার মনে চলত।

সত্তর দশকে যে দলটি সমাজের আমূল পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখে কাজ করে যাচ্ছিল তাদের নানান প্রতিকূলতার মধ্যে দারিদ্র্য একটি। মানিকের কাছে সোরাবের ভাবী কর্মীদের খরচ বাবদ টাকা চাইলে মানিক সেই অভাবের কথাই বলেছিল। সমাজ থেকে অভাবের চিহ্ন মুছতেই এদের লড়াই আর এই লড়াইতেও অভাবকে সঙ্গী করে নিতে হয়েছিল। মানিক বলেছিল—

> টাকা কোথায় পাব, ভাবী, আর পার্টির নিয়ম তো তোমার অজানা নয়। গ্রামে যারা থাকবে, তারা কৃষকের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেই থাকবে। সেভাবেই বাঁচতে হবে তাদের, দল কোনও টাকা পয়সা দেবে না।[৯৪]

যাদের লুকিয়ে থাকতে হবে তাদের টাকা জোগাড় করাটা খুবই কঠিন। শুভব্রত গ্রামে কেন এসেছে তার কথা মানিক আবার মনে করিয়ে দেয়, এই এলাকাতে পার্টির সংগঠন হলেও এখনো কোনো গেরিলা অভ্যুত্থান হয়নি, এই অ্যাকশন না হওয়াটা খুবই লজ্জার আর হতাশার ছিল। জেলা কমিটির নেতৃত্ব এতে একেবারেই খুশি হয়নি। পার্টির নিয়ম অনুযায়ী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণির মানুষ কোনো অ্যাকশনে অংশ নেবে না, স্থানীয় কৃষকেরাই এই কাজ করবে। কুখ্যাত জোতদারকে খতম করার নামই অ্যাকশন। এর আগে চেষ্টা হলেও জোতদার শুধু জখম হয়েছে ফলে ঐ অঞ্চলে ত্রাস সৃষ্টি করা গেছে। এবার কি করতে হবে মানিক শুভব্রতকে বুঝিয়ে দিয়েছিল। ভোর থেকেই তাই সে অনিশ্চিত পরের দিনের অপেক্ষা করেছে। এই গ্রামে এসেই নতুন নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে শুভব্রতর, গ্রামের মানুষ বহুকষ্টে

বেঁচে আছে, মুসলমান মেয়ের স্বামী পরিত্যক্ত জীবনের গ্লানি, ভাবীর ছেলে সঙ্কার মুখে শুনেছিল জোতদার মহাজনের জমি অধিগ্রহণের কথা। শুভব্রত গ্রামের অশিক্ষিত ভাবীকে বুঝিয়েছিল তাদের সংগঠনের সাফল্য আসবে, কিন্তু নিজের কানেই কেমন অসংলগ্ন, অসম্ভব, কেতাবি শুনিয়েছিল কথাগুলো। শুভব্রত ভেবেছিল, ভাবী তার এই কথা শুনে পঙ্গু স্বামী, কন্যা ও পুত্রের সব সমস্যার সমাধান দেখে ফেলেছে তাদের বিপ্লবের মধ্যে। শুভব্রত এসব নিয়ে ভাবতে গিয়ে নিজেকে অপরাধী করবে না, শুধু বিপ্লবের কথা ভাববে। অর্থাৎ কর্ম করে যাবে ফলের আশা করবে না। বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা অন্য সব খারাপ আসক্তিকে দূরে সিরিয়ে দেবে। তত্ত্বগতভাবে সব ঠিক মনে করে ভেবেছে, বিপ্লব সংগঠিত হলে সমাজ, রাষ্ট্র, ব্যক্তি, পরিবার যেখানে যতটুকু খামতি আছে তা স্বাভাবিক হবে সুন্দর হবে তবুও শুভব্রত নিজেকে নিঃসংশয় করতে পারেনি।

নকশাল বিপ্লবীরা গ্রামে থেকে মানুষকে তাদের কর্মকাণ্ডের যাবতীয় উদ্দেশ্য প্রচার করে মানুষদের সমর্থন আদায় করার চেষ্টা করত। শুভব্রত গ্রামের বাইরে না গেলেও চৌঘরার অল্পবয়স্কদের সমর্থন আদায় করেছিল। পাশের গ্রামের অত্যন্ত দরিদ্র পাড়ায় বক্তৃতা করেও এসেছে। শুভব্রত, ছেলে অমিতাভকেও বক্তৃতা দিয়ে দমিয়ে রাখতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনি, অমিতাভ তার নিজের যুক্তি, বুদ্ধি দিয়ে, মিডিয়ার ভূমিকা, রাজনীতির চরিত্র উন্মোচন করে খণ্ডন করেছিল শুভব্রতর যুক্তিকে। পাশের বাড়ির লোকটাকে স্ত্রী সন্তানের সামনে খুন করে সমস্যার সমাধান করা যায় না একথার উত্তরে অমিতাভ বলেছিল 'তোমার এই সিস্টেমের প্রতি মোহ জন্মেছে।' শুভব্রত বুঝেছিল তাদের মধ্যে বৃহৎ একটা গ্যাপ তৈরি হয়েছে। শুভব্রত বোঝাতে চেষ্টা করেছিল—

> পৃথিবীর কোনোও দেশে এভাবে শুধুমাত্র অস্ত্রের উপর ভরসা করে, শুধু নৃশংসতার উপর নির্ভর করে বিপ্লব হয়নি। হতে যে পারে না তা লাতিন আমেরিকা, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো অনেক বছর ধরে দেখে আসছে।[৯৫]

শুধু জাতীয় বিচারবোধ নয়, বিপ্লবের পথে ব্যক্তিগত অনুভূতিও গুরুত্বপূর্ণ। প্রচণ্ড জ্বরের মধ্যে মাত্র কয়েকদিনের আলাপ মাধবীর সেবা পেয়ে কৃতার্থ হওয়া, একজন ভবঘুরে বিপ্লবীর জীবনে এত মমতা অনেকটাই স্বস্তি দিয়েছিল শুভব্রতকে। তার রুক্ষ পথে এই সেবা কম গৌরবের ও সৌভাগ্যের ছিল না। বিপ্লবের কঠিন মাটিতে দাঁড়িয়ে এই অনুভূতি

বিপ্লবীদের জোতদার খতম, গেরিলা যুদ্ধ, সব কিছুকে এক মুহূর্তে সরিয়ে ফেলে অন্য তাৎপর্য এনেছিল তাই লেখক শুভব্রতর জ্বর ও মাধবীর সেবাকে বিস্তারিত দেখিয়েছেন। মাধবীর দাদার লাশ দক্ষিণেশ্বরে কোথাও রাস্তার ধারে পড়েছিল, পথের মানুষগুলোর দুর্দশা শুভব্রতকেও তো দ্বান্দ্বিক করেছিল। গায়ে জ্বর নিয়ে আমিনপুরের দলীয় আলোচনায় প্রতিটি অঞ্চলের রিপোর্ট এবং কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ শুনেছিল। জ্বরের ঘোরে শুভব্রতর মস্তিস্কেও চলছিল শ্রেণিশত্রু খতম করে মুক্তাঞ্চল তৈরির স্বপ্ন।

নকশাল বিপ্লবীদের শ্রেণিশত্রুর তালিকায় প্রথম ছিল সেইসব লোভী প্রবঞ্চক জোতদার যাদের নজর শকুনের মতো। যারা যে কারো জমি দখল নিতে পারত, যে কাউকে জমি থেকে উচ্ছেদ করতে পারত। আবার প্রয়োজনে খুন করিয়ে দিতেও পারত। আইন না মানলেও পুলিশ ও পার্টি হাতে রাখত এরা। এদের খাতায় শ্রমজীবী কৃষকের দেনার হিসাব প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলত। কাউকে জব্দ করতে তার পিতৃ পুরুষের দেনার খাতা খুলে দিলেই হত, লিখিত রূপকে উপেক্ষা করার সাহস কেউ দেখাতে চাইত না, তা সে যতই রেডিমেড হোক। সমাজের কৃষিজীবী বর্গাদার ভাগচাষি ও নিম্নবিত্ত মানুষকে এরা মাথা তুলতে দিত না, তুললেও খুব তাড়াতাড়ি সেই মাথা নামিয়ে দেবার ব্যবস্থা করত। একমাত্র নকশালরা ঝোপের আড়াল থেকে কোনো এক রাতে দু-একজন বেরিয়ে এসে জোতদারের মাথা ধর থেকে আলাদা করে দিত। বনানী, মাধবী, কিংবা সোরাব আলির ভাবী একে মানুষের কষ্ট নিবারণের পথ হিসাবে মানতে চায়নি, এমনকি শুভব্রত ও লেখক অজিজিৎ সেনও। ফলে সমস্ত কর্মকাণ্ডের মধ্যেও শুভব্রতর দ্বিধা কাটেনি। এই দ্বিধা নিয়েও কাজে টিকে ছিল—

> পারিবারিক ব্যক্তিগত কর্তব্য এবং দায়িত্বের দ্বন্দ্ব তাকে এখনো ভীষণভাবে কাটা-ছেঁড়া করে। নিজেকে ক্রমাগত অপরাধী মনে করার মধ্যে থেকে একটা বেপরোয়া হঠকারিতার জন্ম হয়। একটা সঠিক কষ্টকর, দুঃখহর, বিপন্নতাহর এবং সর্বোপরি মানবিক মুক্তির একটা উপায়, হোক সেটা স্বপ্ন, হোক সেটা অলীক, সেই লক্ষ্যেই ঝাঁপিয়ে পড়া— এই কি তাদের বিপ্লব! এবং শেষ পর্যন্ত ওই পথেই আপাতত মুক্তি![৯৬]

দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে শুভব্রতর ব্যক্তিগত অনেকগুলি সম্পর্কের কথা উপন্যাসে এসেছে। এর আগে বেলগাছিয়ার বস্তির বউদি তাকে তাড়িয়েছিল তুই তোকারিসহ নানা অশ্লীল শব্দ

প্রয়োগ করে। রাতে শুভব্রত ভিখারির পাশে শুয়ে কাটিয়েছিল। কিন্তু সোরাব আলীর ভাবীর পরিবারে, ভাবীর স্বামী পরিতক্ত্য মেয়ে ফুলজান, ভাবীর ছেলে সক্কা এদের সঙ্গে এক বছরে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বাল্যকালে শুভব্রতর গৃহশিক্ষিকা শ্যামলী, তার স্বামী অক্ষয় যে তাকে একপ্রকার সন্তানের স্নেহেই দেখেছে, শ্যামলী তার জন্য চোখের জলও ফেলেছিল। অভাব, কষ্ট, রোগভোগ এসবের মধ্যে মায়ার বাঁধন যা বিপ্লবের পথের কাঁটা, এসবের মধ্যে দিয়ে চলেছিল শুভব্রতর জীবন। অভিজিৎ সেন বিপ্লবের পাশে মানবিক সম্পর্কগুলো গুরুত্ব দিয়ে কাহিনিতে বৈপরীত্য এনেছেন।

শুভব্রত জানত এই বিপ্লবের পথে অনেক মূল্য দিতে হবে, রাশিয়া ও চিনের থেকে এদেশের বিপ্লবের পথ আলাদা হওয়া উচিত। ভারতীয় বিপ্লবীরা চিনের পথ অনুসরণ করেছিল যা অন্য ভুলগুলোর মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুল। অপরাধবোধ শুভব্রতকে পেয়ে বসেছিল তাই কলকাতায় শ্যামলিদির বাড়িতে ফিরে এসে মায়ের কাছে যেতে সংকোচ করে ভোররাতে পালিয়ে গিয়েছিল। শুভব্রত গ্রামে যেতে পেরেছিল তবে বেলাল হোসেন নাম নিয়ে। বিপ্লব অপেক্ষা গ্রামের মানুষদের সঙ্গে নানারকম ভারসাম্য ও পারস্পরিক বোঝাপড়ায় সহৃদয় সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। সক্কা ও তার বন্ধুদের সঙ্গে একত্রে বিড়ি খাওয়া, ফুলজানের প্রতি কিঞ্চিৎ ভালোলাগা শুভব্রতকে তৃপ্তি দিয়েছিল। বোহেমিয়ান জীবনে পথের আত্মীয়দের সঙ্গে একাত্ম হতে হতে ডাক্তার বন্ধু সন্দীপের কাছে কিছুদিন থেকে শরীর সুস্থ করেছিল। অস্থায়ী জীবন থেকে বাদ চলে গেছে কবিতা লেখা, বাদ চলে গেছে বাবা মায়ের প্রতি কর্তব্যবোধ। সন্দীপ জানতে চেয়েছিল সাচ্ছন্দ্য ও অবসর তাদের জীবনে আসবে কিনা, এই প্রশ্নের উত্তর শুভব্রতর কাছে ছিল না। সন্দীপকে সবকিছু বলতেও চায়নি, চারু মজুমদারের নিষেধ ছিল, রাজনীতির বাইরের লোকের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করা। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে মুক্তাঞ্চল গড়ে তুলতে হবে, সত্তর দশককে মুক্তির দশক হিসাবে গড়ে তুলতে হবে ভারতবর্ষে। সরকার উগ্র বিপ্লবকে সমূলে বিনাশ করতে চাইলেও, শুভব্রত দোলাচলতায় ভুগলেও, বিপ্লবে নীতিতে ভুল থাকলেও উদ্দেশ্য সৎ ছিল তাই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পরোক্ষ ও মৌন সমর্থন ছিল নকশাল আন্দোলনে। সন্দীপ অন্য জগতে বাস করে, তার চেহারা আভিজাত্য রুচিতে আধুনিকতার ছোঁয়া ছিল, সেও শুভব্রতকে কিছু টাকা দিয়ে জানিয়েছিল তার ডাক্তার বন্ধু ও ছাত্রদের তরফ থেকে আন্দোলনের সমর্থনে এসেছে এই টাকা। তবুও আন্দোলনের এই পথে পরোক্ষ ও মৌন

সমর্থন খুব একটা কাজের ছিল না, ঝাঁপিয়ে পড়ার সাহসটাই একমাত্র পথ ছিল। শুভব্রত যাদের কাছে প্রশ্রয় পেয়েছিল তাদের এই পথ পছন্দ ছিল না। মাধবী বিশ্বাস করেনি, অক্ষয়ের সন্দেহ ছিল, সন্দীপ তার আবেগের শরিক হতে চায়নি। তবে—

> কিশোর বয়স থেকে প্রবল প্রবঞ্চনা এবং দারিদ্র্যের পাশাপাশি একটা আদর্শবোধ কেউ কেউ তাকে জুগিয়েছিল। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস, রাজনীতি এবং বিজ্ঞান সেই আদর্শবোধকে জোরদার করেছিল। তারপর একদল মানুষ তাকে এবং তার মতো অনেককে ডাক দিল। আর সেই ডাকে অনেকের সঙ্গে সে সাড়াও দিল।[৯৭]

শুভব্রত ছেলের সঙ্গে তর্ক করেছিল বন্দুকের নল নাকি ধর্ম রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস এই বিষয়ে। ছেলেকে বোঝাতে চেয়েছিল শুভব্রত—

> ভারতীয় বামপন্থীরা একটা আন্তর্জাতিক চক্রান্তের শিকার হয়েছে অমিত। সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে এদেশের বামপন্থা, যারা অবশ্যই মানুষের জন্য অনেক কাজ করেছে ইতিমধ্যে। আর সেই চক্রান্তের একটা অংশ তোমরাও, শুধু বিদ্বেষ আর ঘৃণা দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে লড়াই করে জেতা যায় না।[৯৮]

কিন্তু এসব কথা বলতে পারেনি ছেলেকে কারণ তাকেও কেউ এসব বোঝাতে পারেনি বা সে শোনেনি কারোর কথা। তারপর পথে নেমে সে মানুষকে, নিজেকে, সমাজকে চিনতে শিখেছিল। পুরোনো দুই বিপ্লবী শক্তিনাথ ও তুহিনশুভ্র যখন বিপ্লব ছেড়ে আসার পর মিলিত হয়েছিল তাদের কথাবার্তায় সংগঠনের সময়ের অভিজ্ঞতা উঠে এসেছিল। শক্তিনাথ বুঝেছিল তাদের ভবিষ্যৎ বলতে জেলখানায় পচে মরা নাহলে পুলিশের গুলি খাওয়া। এমনকি শ্রেণিশত্রু কাদের নির্বাচন করা হবে সে নিয়েও একটা দ্বিধা ছিল। শক্তিনাথ দলত্যাগী, সে দেখেছিল কোথাও পৃথিবীতে সশস্ত্র ক্ষমতা দখল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয়নি। সারা পৃথিবীতে দশ বছর অন্তর একদল সশস্ত্র মানুষ বিপ্লব করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ত তারা আবার দশ বছর পর সরে যেত কিংবা অন্য রাজনৈতিক দলে গিয়ে সুবিধা নিত। শক্তিনাথ ল্যান্ডমাইন তৈরির দায়িত্বে ছিল সেই ল্যান্ডমাইনের ব্যবহার সম্পর্কে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল। ১৯৬৭-৬৮ সালে বামপন্থীরা জোতদারের লুকানো জমি উদ্ধারের জন্য আন্দোলন করেছিল। জোতদার গোবিন্দ ঘোষের অনেক জমি সরকার ভেস্ট করেছিল, কিন্তু কেউ নির্দিষ্ট করে জানত না কোন জমি ভেস্ট হয়েছে, ফলে গোবিন্দ ভেস্ট হওয়া জমির আধা ভাগ নিয়েই

চলেছিল, ভেস্ট হবার পর সে কিছু জমি বিক্রিও করেছে। সাতষট্টিতে যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় এলে গোপন হস্তান্তর, বে-আইনি বর্গা প্রকাশ হয়ে পড়েছিল, বামপন্থীদের কৃষক সংগঠন এইসব জমি উদ্ধারের জন্য মানুষকে সংগঠিত করেছিল। ফলে একটা বিরাট গন্ডগোল হয়েছে, বর্গাদারের একজন খুন হলে বর্গাচাষিরা ঘোষেদের আধপাকা ধান জোর করে কাটতে শুরু করেছিল নিজ খামারে তোলার আশায়। জোতদারের ভাড়া করা গুণ্ডাদের সঙ্গে বর্গাদারদের লড়াই সংগঠিত হয়েছিল। সুলতান গোবিন্দর ভাগচাষি, ফলে সেও লড়াইতে এগিয়ে এসেছে। এই সংঘর্ষ মাঠ থেকে গ্রাম, গ্রাম থেকে বর্গাদারদের ঘরবাড়িতে ছড়িয়েছিল, ফলে সুলতানের মতো অনেক চাষির বাড়িঘর সমতল করে লাঙল চলেছিল। আইনের হাতের থেকে বিচারের সময়সীমা আরও লম্বা, ফলে বিচার তার নির্দিষ্ট পথেই চলত অনন্তকাল ধরে। যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতা হারালে সব আবার ধামাচাপা পড়েছিল। কিন্তু বাড়ি হারানো মানুষদের বসে থাকলে চলে না, তারা তাদের ভাত জোগাতে ব্যস্ত হয়েছিল এই আশায়, যুক্তফ্রন্ট আবার ক্ষমতায় আসবে।

গঙ্গা উপত্যকা দিয়ে মুক্তিফৌজ মার্চ করবে, সত্তর দশক মুক্তির দশক হিসাবে চিহ্নিত হবে, সারা ভারতবর্ষে নকশাল আন্দোলনের আগুন জ্বলছিল, শ্রীকাকুলাম, কোরাপুট, লখিমপুর, খেরি, কেরালা, আসাম, ত্রিপুরা, পাঞ্জাবে গেরিলা দল শ্রেণিশত্রু খতম করছিল। ডেবরা, গোপীবল্লভপুরে সংঘবদ্ধ আক্রমণ চলেছিল, কলকাতা ও আশেপাশের শহরে পুলিশের চরের উপর আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে, এসবে গৌরব বোধ করেছিল উচ্চতর নেতৃত্ব। কিন্তু শুভব্রত এর মাঝে অভিযোগ করেছিল—

> কলেজ স্কোয়ারের বিদ্যাসাগর-মূর্তির মুণ্ডু কেটে ফেলা এবং বিভিন্ন জায়গায় স্কুল-কলেজ পোড়ানোর ঘটনা ঘটছে এবং আমাদের পার্টির কমরেডরাই জড়িত বলে শুনতে পাচ্ছি। কমরেড, পার্টি কি এ ধরনের কাজকর্ম অ্যাপ্রুভ করছে?[৯৯]

এসব কাজকর্মে পার্টির মূল্যবোধে আঘাত লাগলেও, বিপ্লবীদের উৎসাহ নষ্ট হতে দিতে চায়নি তাই এসব কাজে বাধা নেই নেতৃত্বের। তাছাড়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) অপেক্ষা কার্লস মার্কস অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন এদের কাছে। সিপাহি বিদ্রোহকে কার্লস মার্কস মনে করেছিলেন, ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ, তাতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর কলেজের ক্যাম্পাস খুলে দিয়েছিলেন ইংরেজদের থাকার জন্য। এই ছিল তাদের যুক্তি।

শুভব্রত এই যুক্তিটা মানতে পারেনি কিন্তু নেতৃত্বের কথা মেনে নিয়েছিল। জোতদার ফেলুবাবু দুপুরবেলা খাতায় কর্জ প্রাপকদের মহাজনি হিসাব দেখতে দেখতে খুন হয়েছিল। হাশেম তশিলদার নামের এক ব্যক্তি তশিলদারিতে সামান্য ঘুষ ও জাল জোচ্চুরি করে কিছু সম্পত্তি করেছিল সেও এক সন্ধ্যায় খুন হয়েছে, এসব খুনের পর পুলিশের সন্ত্রাস বেড়ে যেত। প্রতিটি খুনের মধ্যে শ্রেণিশত্রুর ভাবনা জাগ্রত ছিল ঠিকই কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে শ্রেণিশত্রু চিনতেও ভুল হত।

সশস্ত্র পথে বিগত পঞ্চাশ-ষাট তার বেশি বছর পৃথিবীতে একটাও সফলতা আসেনি, শুধু লক্ষ লক্ষ মানুষ মরেছে। শীলা হাতে হাঁসুয়ার কোপ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে বলেছিল 'কোনো ভয়ই আর আমার নেই। শুধুই আক্ষেপ,' শীলা অহংকার তৃপ্ত করতেই এই পথে নেমেছিল, ভেবেছিল সশস্ত্র বিপ্লববাদীর কাজটা তার উপযুক্ত নয়, কিন্তু অনেকের প্রশ্ন ছিল কাজটা কি উপযুক্ত? আবার খুন করার সময় হত্যাকারীও অনেক সময় জানত না কেন খুন করা হচ্ছে তাঁকে। সে প্রকৃত শ্রেণিশত্রু কিনা বা সে খুন হবার মতো অপরাধ করেছে কিনা তাই নিশ্চিত ছিল না। হাসেম তশিলদার জানত না তাকে কেন খুন করা হচ্ছে, সে তার খুনিকে চিনতে পেরে জিজ্ঞাসা করেছিল 'এ বলরাম, আমারে মারতেছিস ক্যান?' দুলেপাড়ার ছেলে বলরাম খুন করার পর কয়েকদিন গা ঢাকা দিলেও পেটের জ্বালায় ঘরে ফিরে আসে, এর মধ্যে দুলে পাড়া জ্বলল, অনেক নির্দোষ মানুষ গ্রেপ্তার হয়েছিল। সোরাব আলির ঘর তল্লাশি করা হলেও সোরাব আলি শুভব্রত কাউকেই পাওয়া গেল না। তারা করিম মণ্ডলের দলুজে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। পালিয়ে বেড়ানোর মধ্যেও সোরাব স্বপ্ন দেখেছিল তাদের বেঁচে থাকাটা মরার সামিল তাই দিন পরিবর্তন করাটা জরুরি ছিল। সেই দিন একদিন আসবে। এই উদ্দেশ্যেই পশ্চিমবঙ্গসহ অন্ধ্রপ্রদেশ, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, আসাম, ত্রিপুরা, কেরলের বিভিন্ন অঞ্চলে নেতাদের নির্দেশিত পথে গেরিলা অ্যাকশন মুক্তাঞ্চল গঠনের প্রয়াস চলেছিল। এসবের সত্যি-মিথ্যা কাহিনি রটিয়ে পুলিশ ও আধা মিলিটারি বাহিনী অনেক যুবককে গুলি করে মেরেছিল। জেলবন্দি নকশাল যুবকদের খুন করা হয়েছিল। এছাড়াও—

> কলকাতার রাস্তায়, পাড়ায় পাড়ায় নকশালপন্থীদের সঙ্গে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি, কংগ্রেস পার্টির সঙ্গে নকশালদের, এই ধরণের, কংগ্রেসের সঙ্গে মার্কসবাদীদের ব্যাপক গুলি-গোলার সংঘর্ষ এবং একে অপরকে খুন চলতে লাগল।[১০০]

এই সুযোগে সমাজ বিরোধী শক্তিগুলো পেয়ে বসেছিল, ফলে খুন লুঠ অনেক বেড়ে গিয়েছিল। নেতৃত্ব অ্যাকশন চাইত, অনেকগুলি অ্যাকশন হয়েছে, সেই রিপোর্ট জমা করে গ্রামের পাশাপাশি শেলটার নিয়ে থাকতে হত নাহলে কর্মীদের মনোবল নষ্ট হবে। কিন্তু সেখানে থাকা নিরাপদ নয় বলেই সোরাবের সঙ্গে কল্যানীতে যাবার কথা ভেবেছিল শুভব্রত, সোরাবের সঙ্গে রাজমিস্ত্রির কাজ করবে, এর আগে যেভাবে চৌঘরায় পাট নিড়ানির কাজ করেছিল, এবার সে সোরাবের জোগাড় দেবে। কল্যানীতে রাজমিস্ত্রির কাজে যোগান দিয়ে বুঝেছিল শ্রমজীবী মানুষের জীবনে শ্রম আসলে কী, তাদের লড়াই তো এই শ্রমজীবী মানুষদের জন্য। নানান দ্বন্দ্ব মাঝে মানুষের কষ্টগুলো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছিল শুভব্রত।

মুক্তিযুদ্ধ ও ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধকে কাজে লাগিয়ে নানা অনৈতিক কাজ যারা করে চলেছিল তাদের মধ্যে অন্যতম একজন পরেশ দাস নামের স্মাগলার। বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দুদের থাকার ব্যবস্থা পরেশ দাস করে চলেছিল সোনাবানের চর নামে একটি জায়গায়। সে শুভব্রতকে সেখানেই পাঠিয়ে দিয়েছিল। মানিক এই সোনাবানের চরকে তাদের বিপ্লবের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনি, এখানে শুভব্রত নিয়মিত গ্রুপ মিটিং করে রাজনীতি, ধনতন্ত্র, শোষণ, অর্থনীতি এসব নিয়ে তার যতটুকু বোধ তা কমরেডদের কাছে বলত, তবে জানত না কোনো কাজ হচ্ছে কিনা। সত্তর দশকের ভারতবর্ষ অনেক পরিবর্তিত, মানুষের চিন্তা চেতনায় অনেক পরিবর্তন এসেছিল, নিরন্ন মানুষের আত্মসম্মান হঠাৎ করে বেড়ে গিয়েছিল, কিছু বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছিল তাই তো গ্রামের যুবকরা একদিন শুভব্রতদের সভায় তাদের বক্তৃতা শুনে ফুঁসে উঠে জানিয়েছিল ‘সকালে সুয্যি ওঠার আগে নদী পাড় হয়ে যাবেন, বুইছেন?’ সত্তরের ভারতবর্ষের পরিবর্তনে মানুষের বিচারবোধ পুরোনো প্রকোষ্ঠে আর বদ্ধ ছিল না। কিন্তু এই পরিবর্তনের জন্য মূল্য কম দিতে হয়নি—

> পুলিশ, সামরিক বাহিনী, শাসক দলের গুন্ডারা দেশের যুবশক্তির একটা বড় অংশকে মেরে, খুন করে, পঙ্গু করে, বিতাড়িত করে, জেলে পুরে একটা প্রজন্মকেই প্রায় ধ্বংস করে ফেলল।[১০১]

লাভ ক্ষতির এই হিসাব, এই মূল্য বিনিময়ের হিসাব নিয়ে প্রশ্ন সেদিনেও উঠেছিল আজও এই প্রশ্ন ওঠে। সোনাবানে পুলিশি হানায় অনেকজন ধরা পড়েছিল, শুভব্রত তিন চারদিন

বনে-জঙ্গলে, নদী-নালায় ঘুরে তরকারির পাইকার সেজে ট্রেনে উঠেছিল, বঙ্কিমের সঙ্গে দেখা হলে উভয়ে অবাক হয়েছে যে তারা বেঁচে আছে। জীবনে বেঁচে থাকার স্বাদ বুঝতে পেরেছিল সেদিন। ডুব দিয়ে থাকা ইতরের জীবন তার ভালো লাগেনি, ইসলামপুরের একটি বাড়ি থেকে মিটিং চলাকালে গ্রেপ্তার হয়েছিল সবাই, জেলায় আন্দোলন বাঁচিয়ে রাখার মতো কেউ রইল না, শুভব্রত গ্রেপ্তার হয়ে স্বস্তি পেয়েছিল। নতুন বাম সরকারের আমলে মুক্তি পেয়ে অনেকে চিরতরে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল, কেউ আবার কোনো দলে যুক্ত হয়ে আখের গোছাতে চেষ্টা করেছিল। অনেকে কবি সাহিত্যিক হয়েছে, অনেকে ফিল্ম থিয়েটারে গেছে, মানবাধিকার নাগরিক সংগঠন করে গলা ফাটিয়েছে, একদল বামপন্থী হিসাবে সমাজে সক্রিয় থেকেছে। শুভব্রত বামপন্থী হয়েই থেকেছিল। স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফুলজান, সক্কা, ভাবী, সোরাব আলিকে মনে পড়লেও যায়নি আর, খোঁজ নেয়নি কোনোদিন। আজ এত বছর পার করে, সন্তানের মৃতদেহ সনাক্ত করতে এসে জঙ্গলমহলের লড়াইয়ের সমর্থকদের ঘোষণা শুনেছে, পুলিশ মিথ্যা সংঘর্ষ দেখিয়ে খুন করেছে। ঠিক জেলবন্দি নকশালদের মতো। শুভব্রত ভেবেছিল, নিজের স্ত্রীকে সন্তানহীন হিসাবে বাকি জীবন দেখবে, যেমন সন্তানহীনতার আকূতি মাধবীর ছিল। অভিজিত সেনের এই উপন্যাস একজন বিপ্লবীর বোহেমিয়ান জীবনের গতিকে, বিপ্লব ভাবনার দোলাচলতাকে, পথের পরিচিত অনেক মানুষের সঙ্গে মানবিক সম্পর্কের ওঠাপড়াকে চিত্রিত করেছে। রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের রুক্ষতা নয় বরং মানবিকতার ছোঁয়া দিয়ে এঁকেছেন চরিত্র ও আখ্যানকে। এই গল্প শুভব্রতর আড়ালে লেখকের নিজের জীবনের কিছু ইঙ্গিতও আছে। আর একেবারে হাল আমলের জঙ্গলমহলের সংগ্রামকে ছুঁয়ে গেছেন কম কথায় স্পষ্ট ইঙ্গিতে। এই উপন্যাস একাধারে সময়ের উত্তাপ, জীবনের কথা, মানবিক প্রক্ষালনে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকৃতি।

ঘ। *হলুদ রঙের সূর্য*

অভিজিৎ সেনের *হলুদ রঙের সূর্য* উপন্যাসটির মূল প্রেক্ষিত মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ থেকে আসা একটা উদ্বাস্তু গোষ্ঠীর ভূমির খোঁজ, সেই ভূমিকে বাসযোগ্য করা, স্বাভাবিক জনজীবনের সঙ্গে তাকে যুক্ত করার সংগ্রাম। এই গোষ্ঠীকে সরকারি সুযোগ সুবিধার আওতায় নিয়ে আসা জোতদারের করাল গ্রাস থেকে নিজেদের রক্ষা করে টিকে থাকা। কৃষকের ফসল ভরা জমি দেখলেই জোতদারের রক্তে অভিসন্ধি দ্রুত সঞ্চারিত হত। দয়া ঘোষের উত্তর পুরুষরা বেণীর উর্বর জমি দেখে লোভ সংবরন করতে পারেনি। দয়া ঘোষের

ভাই জোতদার বনমালী সহদেবের গোষ্ঠীকে বেণী থেকে উচ্ছেদের চেষ্টা করেছিল, আসলে জোতদার বলেই থাকে 'আইনে না পারি হুজ্জুতিতে পারমো, হাপসে মারবো তোদের' জোতদারের সঙ্গে 'নেংটা গরীব' কোনো কালেই পেরে ওঠে না। এসবের রাস্তা দিয়েই জোতদারের বিরুদ্ধে রাজনীতি প্রবেশ করেছিল বেণীর গিঁটে। এবং জোদতার খতমের অভিযান দিয়ে রাজনীতিতে প্রবেশ করা নকশাল এই দুই শ্রেণির মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছিল। নকশাল আন্দোলন যখন ক্রমশ স্থিমিত হয়ে আসছে, নকশাল বিপ্লবীদের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে যাওয়ার ফলে বেণীতেও প্রবেশ করেছিল।

উপন্যাসে আছে নামাবন্দর ও তার আশেপাশের ব্লকের গ্রামাঞ্চলে কিছু বন্দুক লুঠ হয়েছে, দু-একজন জোতদার খুন হয়েছে। শংকর নামের যুবকটি নকশাল বিপ্লবী, সে দাবি করেছে এই সব কাজ তাদের পার্টির সৈনিকরা করেছিল। তাদের পার্টি সমস্ত গরিব ও মেহনতি মানুষের পার্টি। বেণীর গিঁটকে তাদের বিপ্লবের দুর্ভেদ্য দুর্গ হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিল তারা। সহদেব বিশ্বাসকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল তাদের পার্টিতে। কিন্তু সহদেব এত গোপনীয়তা ও খতমের পথ চায়নি। দলটা মতাদর্শ সহদেবের পছন্দ হয়নি তাই এদের সঙ্গে একমত হতে পারেনি। আসলে নানা কারণে নানা দল থেকে বিতারিত বেশ কিছু সুযোগসন্ধানী নকশালদের দলে মিশে গিয়েছিল। শংকর সহদেবের লড়াকু ভাব কাজে লাগাতে চেয়েছিল। সহদেব অভিজ্ঞ মানুষ তাই সমঝদার, শংকরের সঙ্গে কোনোভাবেই একমত হতে পারেনি, শংকর বুঝিয়েছিল লক্ষ লক্ষ মানুষ বনমালী ঘোষের মতো কয়েকশো জোরদারকে কাটলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। সহদেব এবার অভিজ্ঞ বাস্তববাদী মানুষের মতো প্রশ্ন করেছিল—

> —সব সমাধান হবে? আধিয়ার জমির মালিক হবে? বাজারের মালপত্তরের দাম কমবে? সার, বীজ, ওষুধ চাষা সস্তায় পাবে? হাসপাতালের গরীব মানুষ চিকিচ্ছা পাবে? চাষাঘরের ছেলেমেয়ে বাবুঘরের ছেলেমেয়ের মতো লিখাপড়া শিখে চাকরি পাবে? সব হবে?[১০২]

এই প্রশ্ন নকশাল আন্দোলন নিয়ে অনেকের ছিল, লেখকের নিজেরও। সহদেব মার কাটের পথে যেতে রাজি হয়নি, সে মনে করেছিল এটা শাস্তি দেওয়া, যুদ্ধ নয়, 'যুদ্ধ এভাবে হয় না, শংকরবাবু'। অন্যদিকে কানু একটি রাজনৈতিক দলে বিশ্বাস করলেও নকশাল দলটির সঙ্গে গোপনে সম্পর্ক রেখেছিল, তার দ্বিধা ছিল 'সত্যিই মানুষের পক্ষে এসব কথা আচমকা

বিশ্বাস করা কঠিন'। এমনকি দলের মধ্যেই একটা আদর্শগত বিরোধ, কানু বেসরা ও শংকরের যুক্তি তর্কে সেটা বোঝা গেছে। সমিতির কর্মচারি সুদেব বেণীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল এবং সহদেবের সঙ্গে তার আন্তরিকতাও প্রবল। বেণীর উৎসবে নিমন্ত্রিত সুদেব জোতদার ও বেণীর দাঙ্গাটা সামনে থকেই দেখেছিল। এবং যেহেতু নকশালরা বেণীতে সহদেব বিশ্বাসের কাছে আসত তাই সুদেবের সঙ্গে নকশালদের যোগ আছে এমন সন্দেহে পুলিশি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিল সুদেব। সহদেবও গ্রেফতার হয়েছে। নকশালদের পুলিশ হত্যা এবং অস্ত্র লুঠের অপারেশনে সুদেব খুন হয়েছিল। এসব সত্ত্বেও সহদেব বিশ্বাস বা সুদেবের নকশাল আন্দোলনকে একেবারে উপেক্ষা করার সাহস ছিল না, কারণ নকশালদের শত্রু তাদের শত্রু, ক্রমে বেণীর মানুষগুলোর কিছুটা হলেও আস্থা অর্জন করতে পেরেছিল নকশালরা। তাদের সংগঠন বাড়াতে পেরেছিল, তাই বনধ্ করতে ব্যাপক প্রচার নয় শুধু একটি চিরকুটেই কাজ হয়েছিল। সহদেবের মতো উদ্বাস্তুর স্থায়ীকরণ, জোতদারের সর্বগ্রাসী মনোভব, বর্গাদারের লড়াই এসবের মাঝেও সারা ভারত জুড়ে সত্তর দশকে যে রাজনৈতিক বিপ্লব সেদিন সমাজের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল অভিজিৎ সেন দেখালেন সমাজের মূলস্রোতে কীভাবে তা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল।

অভিজিৎ সেন খুব কম সময় সত্তরের নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। তাঁর চাকরি ছেড়ে নকশাল আন্দোলনে যোগ দেওয়ার সময়ের ও আন্দোলন ছেড়ে আসার পরের অভিজ্ঞতা, নকশাল আন্দোলন নিয়ে লেখকের নিজের অভিমত, ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব, আক্ষেপ যেভাবে উপলব্ধি করেছেন। এসব অবিকৃতভাবে উপস্থিত *মৃত মানুষের সঙ্গে বসবাস*, *স্বপ্ন এবং অন্যান্য নীলিমা*, এবং *লাশকাটা ঘরের সামনে অপেক্ষা* ইত্যাদি উপন্যাসে। সময়ের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা তিনি বিশ্লেষকের মতো হাজির করেছেন। ব্যক্তিসত্তার প্রতিফলন নকশাল আন্দোলন নিয়ে লেখা এই তিনটি উপন্যাসে আছে, প্রসঙ্গক্রমে আরও বেশ কয়েকটি উপন্যাসে নকশাল আন্দোলনের প্রসঙ্গ এসেছে। *ক্রান্তিবলয়* উপন্যাসের অনিল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, জীবনে তার একটা চাকরি পাওয়াই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, সেখান থেকে মানুষের দুঃখ কষ্ট দেখে পরিবর্তিত হতে থাকে, নকশাল বিপ্লবীর আদলে নিজেকে তৈরি করেছিল। *ছায়ার পাখি* উপন্যাসে সত্তর দশকের রাজনীতিতে গোপালের মতো কমিউনিস্ট নেতারা যেভাবে আশাহত হয়েছিল তা বোঝাতে গিয়ে সত্তরের পরিবর্তমান রাজনীতিতে নকশাল আন্দোলনের কথা সামান্য

পরিসরে এসেছে। একইভাবে *নিম্নগতির নদী* (২০০৫) উপন্যাসে ত্রিদিব মিশ্রের রাজনৈতিক সত্তাকে পরিস্ফুট করতে প্রসঙ্গক্রমে সত্তরের নকশাল আন্দোলনের কথা এসেছে।

সত্তর পরবর্তী রাজনীতি

অধিকাংশ মানুষ রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। সত্তর পরবর্তীকালে আরও বেশি বেশি করে সমাজের প্রগতিতে, শিক্ষায়, সংস্কৃতি, ধর্ম সবেতে রাজনীতি প্রকোপ দেখিয়েছে। উচ্চবিত্তের অট্টালিকা থেকে নিম্নবিত্তের কুঁড়েঘরে, স্কুল, কলেজে, অফিসে রাজনীতি প্রবেশ করেছে। রাজনীতি সমাজের যে কোনো ব্যবস্থায় নাক গলিয়ে নিজেই নিয়ন্ত্রক হয়ে বসেছে। *অন্ধকারের নদী* (১৯৮৮) উপনাসে অভিজিৎ সেন দেখিয়েছিলেন রাজনীতি কীভাবে সমাজ ব্যবস্থায় ঘুণ ধরিয়েছে, *সমসাময়িক* (২০১২) ও *নাগকেশর অক্ষবাট* (২০১৩) এই দুটি ছোটো উপন্যাসেও সমকালের রাজনৈতিক আবহের কাহিনি এনেছিলেন।

ক। *অন্ধকারের নদী*

নদী জীবনের ও সমাজের বহমানতার প্রতীক, এই বহমানতাকে রুদ্ধ করে অন্ধকার। সমাজে ও জীবনে অন্ধকার নেমে এলে শুধু সমাজের গতি রুদ্ধ হয় না, সমাজ ও জীবন নষ্ট হয়ে যেতেও পারে। *অন্ধকারের নদী* উপন্যাসে সেই অবক্ষয়ের কথা এসেছে, একটি সমাজের বহমানতাকে অর্থাৎ প্রগতিকে এবং মানুষের শুভ চিন্তা, শুভ বোধকে অন্ধকার কীভাবে আচ্ছন্ন করেছিল। পাশাপাশি একটি সমাজের নীচ থেকে উপর পর্যন্ত গোটা সিস্টেমকে পঙ্গু করে দিয়ে সমস্ত অনৈতিক সুবিধা নিয়েছে কিছু মানুষ। এই পঙ্গুত্বকে সারিয়ে তোলা কোনো একক ব্যক্তির সাধ্য নয় তবু যখন কারও এই প্রচেষ্টা থাকে তাকে ওই সুবিধাবাদী মানুষ বশে আনতে চায় নয়তো তাকে দমন করে। অভিজিৎ সেন এই উপন্যাসে সেই অন্ধকারকেই দেখিয়েছেন। সমাজকে ও মানুষের গতিকে কালো অন্ধকারে ছেয়ে ফেলেছে রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার দ্বারা। সমাজের নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছে রাজনীতি।

ব্লকের ডেভলপমেন্টের কাজে প্রবলভাবে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং কর্তৃত্ব আজকের সমস্যাও বটে। সবথেকে অনুন্নত পানজোড়া ব্লকের বি.ডি.ও অশোককে মানুষের জন্য কাজ করতে গিয়ে নানা সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। সবক্ষেত্রে তার প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক ক্ষমতায় পুষ্ট কোনো অসৎ ব্যক্তি। 'বি ডি ও-দের পুরোনো খাতির সম্মান আর নেই। বস্তুত, তারা

এখন পঞ্চায়েত সমতির সভাপতির এক্সিকিউটিভ অফিসার।' বি.ডি.ও একজন পাশ করা অফিসার আর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির রাজনৈতিক ক্ষমতাবলে প্রাপ্ত পদ। কিন্তু প্রায় সব ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টির অলিখিত ক্ষমতা অনেক বেশি ছিল। প্রথম জন দ্বিতীয় জনের দ্বারা চালিত হয়। আবার কোনো বি.ডি.ও অফিসার কোনো রকম দ্বন্দ্বে না গিয়ে নির্লিপ্তভাবে কাজ করে যায়, তাদের ভারসাম্য রেখে চলার সুবাদে কোন অসুবিধায় পড়তে হয় না। যেমন পানজোড়া ব্লকের আগের বি.ডি.ও নিয়ন্ত্রণ রেখে শুধু সময় অতিবাহিত করেছিল—

> পানজোড়া ব্লকের পূর্বতন জনৈক জিম্বা বড়বাবুর ভরসায় অফিস করত এবং বাড়িয়ে দেওয়া যে-কোনো কাগজে সই করত। তার উদ্দেশ্য ছিল একটাই, কোনোরকমে মেয়াদ শেষ করে এবং মুরুব্বি ধরে দার্জিলিংয়ে গিয়ে খুঁটি গেড়ে বসা। সে প্রচেষ্টা তার সার্থক হয়েছে এবং অশোকের জন্য বেশকিছু পাপ সে ফেলে রেখে গেছে। কাঞ্চনপুরের কুয়ো খোঁড়া তার মধ্যে একটি।[১০৩]

এই কুয়োর খবর এবং অন্যান্য কাজের খবর পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে নিতে গেলে অশোক জেনেছিল তার কাজের কোনো হিসাব নেই। কেরানি সরকারি চাকুরে কিন্তু প্রধানের সামনে এ বিষয়ে কার গাফিলতি সেকথা বলতে চায়নি। প্রধান অমরনাথ লোকটা আগে জোতদার ছিল তেজারতির ব্যাবসাও করত তাই চোখে মুখে ধূর্ততা তার। অশোক কুয়োর খবর নিলে তার চোখে অস্বস্তি ফুটে উঠেছিল। 'নিয়মকানুন কাগজপত্তরের ধার কেউ ধারবে না' অমরনাথও না, তাই বি.ডি.ও-কে বসিয়ে রেখে নিজের কাজে যায় এবং খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। এটা আসলে বি.ডি.ও-কে একধরনের পীড়া দেওয়া। বাড়ি থেকে ডেকে কুয়ো পরিদর্শন করে দেখা যায় তিন চার হাতের গর্ত এক একটা কুয়োর বদলে, তাতে জল উঠেছিল কিনা সেই এলাকার লোক জানত না। কুয়ো দেখে ফেরার পথে অমরনাথেরই পার্টির গ্রাম সদস্য সুপিন বর্মনের আবেদন শুনতে হয়েছে। যার বাবা তেভাগায় প্রাণ দিয়েছিল ফলে সুপিনের একটা পেনশন পাবার কথা মন্ত্রীরা ঘোষণা করেছিল কিন্তু সেই পেনশন সুপিন পায়নি। তাই সে অশোকের সাহায্য চেয়েছে। মন্ত্রীদের প্রতিশ্রুতি সুপিনের সমস্যার সমাধান করে দিতে পারেনি।

আগের বি.ডি.ও-র আমলে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অনাদি সরকারি টাকায় একটা বাইক কেনে যা নিয়ে অশোকের সঙ্গে আসল বিরোধটা বেঁধেছিল। অনাদি শুধু বাইক নয়, রোজ সরকারি জিপ থেকে দু-লিটার করে পেট্রোল ঢেলে নিত। অশোক বাধা দিয়ে

তেল দেওয়া বন্ধ করে পঞ্চায়েতের নিয়ম অনুযায়ী চেয়ারম্যানের গাড়ি রাখা যায় কিনা সেটা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। 'আপনি যে ডেভলপমেন্টের টাকায় মোটর সাইকেল কিনেছেন, এই পুরো ব্যাপারটা বে-আইনি হয়েছে।' বিরোধ এখানেই থামেনি, কালভার্টের টেন্ডার নিয়ে আরও একটা বিবাদ তৈরি হয়েছিল। সরকারি কাজে টেন্ডার পেতে রাজনৈতিক ভাবে স্বজন-পোষন এবং টাকার খেলা চলে এই নিয়ম বহুকাল থেকেই চলে আসছে। অশোক সরকারি নিয়ম-কানুন অনুসরণ করতে চেয়েছিল, তাই ওয়ার্ক অর্ডার দেবার আগে বলেছে—

> যে ঠিকাদারের টেন্ডার আমরা অ্যাকসেপ্ট করেছি, তার ক্রিডেনশিয়াল দেখতে চেয়েছি আমি। আর একটা সার্টিফিকেট চেয়েছি যে এর আগে অন্তত লাখ টাকার কাজ সে একসঙ্গে করেছে।[১০৪]

এতদিন ধরে নির্বিচারে যে কাজ চলে আসছে সেই কাজে বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল অশোকের নৈতিকতা। অনাদি এত সহজে মেনে নেয়নি এই ব্যাপারটা। ড্রাইভার বিনয় জানায় 'স্যার বড়ো কঠিন জায়গায় হাত দিয়েছেন। ...টেন্ডার পেয়েছে বিপ্লব, সদরের এক বড়ো নেতার ভাইপো।' টেন্ডারের নিয়মে সবাই দরখাস্ত জমা দিতে চেয়েছিল কিন্তু বিপ্লব রিভলভার দেখিয়ে সকলের হাত থেকে ফর্ম কেড়ে নিয়েছে। এবং পূর্বচুক্তি অনুযায়ী নেতার ভাইপো 'প্যাক্ট মানি' তিরিশ হাজার টাকা নিয়ে হাজির হয়েছিল, সেই টাকা বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ হয়েছিল নেতাদের মধ্যে। কোটি টাকার টেন্ডার, এইসব টেন্ডার পেয়েই ঠিকাদাররা ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। এবার বাধা হয়ে দাঁড়াল নতুন বি.ডি.ও অশোক। কারণ—

> অশোক যুবক হয়েছে সত্তরের দশকে। সত্তরের দশকে যারা যুবক হয়েছে, তাদের মধ্যে একটা অংশ অবশ্যই দশকের কাছ থেকে নৈতিকতা ও সাহসিকতার শিক্ষাটা পেয়েছে। এরকম এর আগে কখনও হয়েছে কিনা সন্দেহ। বিনয়ের মুখ থেকে সবিস্তারে শোনার পর নিজের নিরাপত্তার কথা তৎক্ষণাৎ ভাবে না সে। সে ভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক অধঃপতনের ব্যাপকতার কথা।[১০৫]

সত্তর দশকের শিক্ষায় নৈতিকতার সঙ্গে অশোক ব্যতিক্রমী হতে চেয়েছিল, ব্যতিক্রমী হতে তার ভালোই লাগত। কিন্তু তার এই স্বতন্ত্রতার জন্য বিপ্লব তাকে হুঁশিয়ার করেছিল 'ওয়ার্ক অর্ডারটা দিলেই ভালো করতেন।' অশোকের অফিসটা গরম ভ্যাপসা হয়ে উঠেছে, অফিসের দেওয়াল জুড়ে উন্নয়নের চিত্র। অশোক ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেছিল—

> পুরোনো বাড়ির ড্যাম্প-ধরা দেওয়ালে গান্ধীর ছবিতেও ড্যাম্প। ছবিখানা এখন প্রাচীন উদ্ভিদের জীবাশ্মের মতো দেখায়। ডানদিকের দেওয়ালে জওহরলাল নেহেরুর রোগা চেহারা, একখানা অত্যন্ত সাধারণ কাঠের চেয়ারে উপবিষ্ট।[১০৬]

অন্যদিকেও সভাপতির চেম্বারের দেওয়ালে কার্লস মার্কস, ভ্লাদিমির লেনিন, হরেকৃষ্ণ কোঙারের চিত্র পুরোনো হয়ে নোনা আর ঘুণের শিকার হয়েছে। সত্য, ন্যায়, নীতি, শান্তিতে এভাবেই ঘুণ ধরেছিল, শুধু এই ব্লক নয় সমাজেও। আর এসবের মধ্যে নিয়ন্ত্রক হিসাবে প্রবেশ করে গিয়েছিল রাজনীতি।

পানজোড়া ব্লক হাসপাতালের ডাক্তার ইরাবতীর সঙ্গে অশোকের ভাবনা অনেকটাই মেলে তাই অশোক ইরাবতীর কাছে গিয়ে মনে জমে থাকা সমস্ত হা-হুতাশ ব্যক্ত করে সাময়িক স্বস্তি পেত। ইরাবতী অশোককে বুঝিয়েছিল একই সঙ্গে মানুষের সৎ, নিরপেক্ষ, নির্বিরোধ থাকাটা সম্ভব নয়। চাকরি করতে গেলেও লড়াই করেই করতে হত। ইরাবতীর হাসপাতালের একই অবস্থা, অ্যাম্বুলেন্স নেই, হাসপাতালের একটাই মাত্র গাড়ি সেটা সি.এম.ও.এইচ নিয়ে রেখে দিয়েছিল। কিন্তু গাড়ি মেনটেনেন্স খরচের বিল হাসপাতাল থেকেই হত, হাসপাতালের ওষুধ কোনোদিন কেনা না হয়ে উঠলেও বিল পেমেন্ট হত। এমন পরিস্থিতিতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে গেলে হয় চোরের দলে নাম লেখাও নয়তো বিরুদ্ধে গিয়ে টেনশন কর। অশোক বিরুদ্ধে গিয়ে টেনশনেই পড়েছিল। ক্ষমতার অপব্যবহার করে নেতারা আইন ছেড়ে নিয়ম তৈরি করত, অশোক আইন মানতে চেয়েছিল, নিয়ম মানতে চায়নি। আইন লিখিত রূপ, নিয়ম হল আইনকে সামনে রেখে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে অনৈতিকতার পদ্ধতিগুলো রপ্ত করা। অশোক সেই আইন মোতাবেক কাজ করতে গিয়ে নিপীড়নের শিকার হয়েছিল, প্রথম ধাপটা আসে নারীঘটিত ব্যাপারে। ইরাবতীর কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে দেখে দেওয়ালে লেখা আছে 'বিডিও+লেডি ডাক্তার।' যা অশোককে তো বটেই ইরাবতীকেও যথেষ্ট অস্বস্তি ও অপমানে ফেলেছিল। আসলে—

> নিপীড়নের কখনও কোনো চরিত্র থাকে না। নিপীড়ন শুধুই একটা পদ্ধতি। এবং যেহেতু এর কোনো চরিত্র থাকে না, পদ্ধতি ক্রমাগত আরও নির্মম, আরও হৃদয়হীন উৎকর্ষের দিকে এগিয়ে যায়।[১০৭]

এই নিপীড়নের ফল কি হবে অশোক কল্পনা করেছিল, ইরাবতীর দিক থেকে করুণ প্রতিক্রিয়া হতে পারে কারণ দেওয়ালের লেখা ভীষণ শক্তিশালী। সহজে মোছা যায় না, ঘষে উঠিয়ে ফেলা যায় না। তার মনে পড়েছিল ‘লেনিন দীর্ঘজীবী হোক’ এমন একটা লেখাকে চুন দিয়ে ঢাকতে গেলে চুন শুকিয়ে সেটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। শারীরিক বল প্রয়োগ করে এর প্রতিকার করতে গিয়ে অশোককে অনেক নিচে নামতে হয়েছিল, একজন অফিসার, পাড়ায় বেয়াড়া ছোকড়াদের প্রহার করে শাসন করছে, সরকারি চাকরি করতে এসে। এছাড়া অশোকের আর কি করার ছিল, একজন নারীর সম্মান জড়িয়ে ছিল এই ঘটনায়। স্বার্থপর দুনিয়ার একটা প্রতিরূপ হয়ে উঠেছিল বি.ডি.ও অফিসটা। অশোক তার সততা দিয়ে বাঁচতে গেলে তার সামনে সেই রূপ প্রকট হয়ে উঠেছিল। নিজের অন্তরাত্মাকে প্রশ্ন করেছিল অশোক, কেন এমন একটা পরিবেশে কাজ করব যেখানে শুধু স্বার্থপর মানুষ, টেবিলের সাজানো ফাইল দেখেও ভয় হত কোনোটাতে সই করে বিপদে না পড়তে হয়। গত বছরের একশো চল্লিশ ফুটের টিউবওয়েলের পঞ্চাশ ষাটটা পেমেন্ট হয়েছিল। অশোক সমীক্ষা করে দেখেছিল সেগুলো ষাট সত্তর ফুটের বেশি নয়। অশোকের অধস্তন পরিমল অশোকের কাগজপত্র খোঁজ নেওয়াকে পাত্তাই দিতে চায়নি। সে জানত এসবের গরমিল সংক্রান্ত খবর এবং তারই সইসাবুদে এসব কাজ হয়েছে উলটে অশোককে জানিয়ে দিয়েছিল আপনার কোনো প্রশ্ন করার এক্তিয়ার নেই, চাইলে ব্যবস্থা নিতে পারেন। কারণ পরিমলের মতো ব্যক্তিরা টাকার তছরূপ ও গরমিলের কাজ অসীম সাহসের সঙ্গে করত, তাদের প্রশ্রয় এমন জায়গা থেকে আসত যেখানে আইনের হাত পৌঁছাতে পারবে না সহজে। অশোকের ন্যায় নীতিকে অতিসক্রিয়তা বলে দাগিয়ে দিয়ে তাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা চলতে থাকে অফিসে। বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা করেনি কেউ অশোককে, স্বার্থের দুনিয়ায় অশোক খুব একা ও অসহায় হয়ে পড়েছিল।

অফিস স্টাফদের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন পড়েছিল, এই গণতান্ত্রিক অধিকার সবার আছে শুধু অশোক ছাড়া। অশোক তার কাজ থেকে বিরত থাকতে চায়নি কারণ সে অন্যায় কিছু করেনি। আর অন্যায়ের সঙ্গে আপস করা মানে এসব স্বার্থপর লোকের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে করুণা ভিক্ষা করা, অশোকের মন এটাকে সায় দেয়নি। ফলে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়েছিল। সভাপতি অনাদি ও রাজনৈতিক ক্ষমতাবান আরও দুজন অশোকের অফিসে আসে, তারা এসেছে অনেক বোঝাপড়া করতে। কারণ এই বি.ডি.ও সাহেব তাদের

অনৈতিকতার সাম্রাজ্যে বিরাট প্রতিকূলতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অশোকের সঙ্গে আলোচনায় তাদের ভিতরের ক্ষোভ ফুটে উঠেছিল। ব্লকের অনুন্নোয়নের দায় অশোকের ঘাড়ে চাপিয়ে নিষ্কৃতি পায়নি, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার সঙ্গে জাড়াতেও চেয়েছে। তাই বলেছিল—

> লোকসভার নির্বাচন খুব শিগগিরি হবে। কাজেই এই ব্লকের ভোট যদি আমাদের বিপক্ষে যায় তবে সেক্ষেত্রে বিফলতার জন্য কিন্তু আপনার দায়িত্বও এড়াতে পারবেন না।[১০৮]

এই ব্লকে মাস চারেকের চাকরি জীবনে এসব দায় কীভাবে বর্তায় তার ঘাড়ে তা অশোক জানত না। দাম্ভিকতার সঙ্গে নেতা তড়িৎ কাগজ পেন ধরিয়ে দিয়ে অশোকের কাছে উনয়নের কাজের হিসাব চেয়েছিল। কিন্তু এই লোকগুলি আসলে এসেছিল পঞ্চায়েতের উন্নয়ন খাতের টাকা ও কালভার্টের ওয়ার্ক অর্ডার আদায় করতে, সভা না ডেকে মিটিঙের খাতায় সিদ্ধান্ত লিখে নিতেও চেয়েছিল অশোককে দিয়ে। ক্ষমতাবান তড়িৎবাবু বলেছে, আমি বলছি তাই আপনি এসব করবেন, আপনার ডি.এম আমার কথা শোনে। অন্য আর এক ব্যক্তি অনন্ত অনুরোধ করে 'গরীব মানুষের উন্নয়নের প্রশ্নে এত আইনকানুন কি সবসময় মানা যায়?' অশোক এতক্ষণ সামনের লোকগুলোকে চাঁদা প্রার্থীর মতোই দেখেছিল, তাদের মানসিক নিগ্রহ সহ্য করেছে, ক্ষমতার প্রদর্শন দেখেছে। বার বার ভিতর থেকে প্রতিবাদের ভাষা তাকে উৎসাহিত করেছে কিন্তু শিষ্টাচার তাকে দমিয়ে রেখেছিল। সে জানত এই রাজনৈতিক মানুষগুলো তার প্রতিপক্ষ হিসাবে কতটা ভয়ংকর হতে পারে। তাই একসময় ভিতরের কথা বেরিয়ে এসেছিল—

> হ্যাঁ তড়িৎবাবু, আমি চোদ্দোশো টাকা মাইনের আমলা, আপনাদের চার কাপ চা খাইয়ে মনে মনে পয়সার হিসাব করছি। একটা সস্তা সিগারেট খেয়েছি, ঘড়ি ধরে অপেক্ষা করছি, আর-একটা কখন খাব। শত অস্বস্তিতেও নিয়ম সহজে ভাঙতে পারি না। আর আপনি পার্টির হোল-টাইমার হয়ে এই সময়ের মধ্যে গোটা পাঁচেক আটটাকা প্যাকেটের সিগারেট খেলেন বিলিতি লাইটারে ধরিয়ে।[১০৯]

অশোক তাকে সমস্ত রকমে অপমানের জবাব দিয়েছে। 'আমাদের প্রশাসনের আমলারা যখন সতীত্বের বড়াই করে, সে শুনতে ভারী মজা লাগে!' তড়িতের এই কথা একেবারেই মিথ্যা ছিল না। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে বি.ডি.ও-র সঙ্গে পঞ্চায়েত ও সমিতির চেয়ারম্যানের সম্পর্ক ভালো, হয় তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শে মিল নয়তো উভয়ে উভয়কে ম্যানেজ করেছে বা উভয়েই অসৎ। তাই অশোক এই কথাকে মিথ্যা প্রমাণ করবে সেটা

তার ক্ষমতায় কুলোবে না। ফলে ব্লকের সমস্ত অনৈতিক কাজ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে, অফিসটা পরিষ্কার করতে চেয়ে পরিমলের বদলির সুপারিশ করেছিল সদরে। কিছুটা প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে পড়েছিল অশোক। সদরে সুদীপের কাছে পরামর্শ করলে সুদীপ জানিয়েছিল চাকরি করতে হলে নমনীয় হতে হয় কিন্তু 'মান সম্মান, সুস্থ অনুভূতি বিসর্জন' দিতে চায়নি অশোক।

সত্য, সৎ, ন্যায়, নীতি, আদর্শ ধরে থাকা মানুষগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সমাজে গুরুত্ব ও তার যোগ্য সম্মান পায় না বা যখন পায় তাতে অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। এতে আমাদের সমাজের শৃঙ্খলাই দায়ী। অশোক সমাজকে ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারেনি, তার অভিজ্ঞতা কম ছিল। তাই সে যখন সুদীপের থেকে জানতে পারে কালেক্টরেট, বি.ডি.ও সাহেব এরা অনেকক্ষেত্রে কেমন হয়—

> কোন বি ডি ও কনট্রাক্টরের সঙ্গে সিমেন্টের বন্দোবস্ত করে নিজের গ্রামের বাড়ি পাকা করছে, দেখবি কোন ডেপুটি রাস্তাতেই গাড়ির তেল বেচে মদের বোতল কিনছে, কেউ স্টেশনারির এক বিল চারবার পেমেন্ট করছে, দোকান থেকে স্টিরিও, টেপ-রেকর্ডার ইত্যাদি কিনছে— তার বিল অন্য কেউ দিচ্ছে। বড় সাহেবদের মরা বাপের শ্রাদ্ধের খরচ নেজারত থেকে বিলে পেমেন্ট হচ্ছে...[১১০]

এছাড়াও কোন ঝিয়ের পেটে এক আই.এ.এসের বাচ্চা এসেছিল, গর্ভপাতের খরচটাও রিলিফের নামে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। এসব শোনালেও সুদীপ অশোকের সততাকে উপেক্ষা করতে পারেনি। তবে গোটা বন্দোবস্তের একটা চিত্র তার সামনে তুলে ধরেছিল। এগুলিও সিস্টেমের এক একটা অঙ্গ, তাই এসব মানুষের সয়ে গেছে। সুদীপ অশোককে আপস করার পরামর্শ দিতে পারেনি, আর অশোক ডিপ্রেশন থেকে কীভাবে মুক্তি পাবে সেই রাস্তাও দেখতে পায়নি, কারণ সে নিজেও জানে না। এসব চুরি, ছল, চতুরতা সমাজের বহুদিনের ব্যবস্থার মধ্যেই ছিল, ভিতর থেকে বাইরে পর্যন্ত ঘুণ ধরে ছিল। বিরোধ মিটিয়ে নিজেকে ছোটো করা আবার নিশ্চুপে মেনে নিয়ে কাজ করা এর কোনোটাই পারেনি অশোক। যারা পারত এমন বি.ডি.ও অফিসারদের কপালে পার্টি থেকে নিগ্রহ জুটত। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির আইন না মানলেও চলত, কিন্তু সরকারি কর্মচারীদের আইন মানতেই হত। এদের ক্ষেত্রে দুটি বিকল্প ছিল—

হয় চুরি-চামারি করো, ঘুষ খাও, সমস্ত কিছুর সঙ্গে আপস করো, ভালো ভালো জামাকাপড় পরো, সব সাধারণ মানুষকে পোকামাকড়ের সমান জ্ঞান করো। লোকে বলবে, হ্যাঁ একটা ডেপুটি বটে! হাঁটলে পরে গুম গুম শব্দ হয়! আর অন্যটা হল, কঠোর অধ্যাবসায়ের। সঙ্গে নিজেকে আইনের কাঠামোর মধ্যে ধরে রাখবে, যাতে কেউ তোমাকে কিছু না বলতে পারে, আবার বিবেকও বেশ নিরুত্তেজ থাকে। যদি নেহাতই কখনও সামান্য বাঁয়ে হেলতে হয়, পরক্ষণেই ডাইনে হেলে ভারসাম্য ঠিক করবে।[১১১]

এর সঙ্গে বিবেক, নিরপেক্ষতা, সততা এসবের কোনো শ্রেণি হয় না, কিন্তু আইন শ্রেণি বিশেষে হয়। তাই আইনের সঙ্গে শ্রেণি জুড়ে দিলেই প্রশাসনিক কাজে শান্তি আসবে, অন্তত ভারসাম্য রাখা যাবে।

অপমানে অবহেলায় অশোক ক্রমশ রেষারেষিতে চলে গিয়ে অন্য এক পর্যায়ে নেমে এসেছিল। পরিমলের বদলির আদেশ আদায় করতে পেরে নিজেকে জয়ী ভাবতেও শুরু করেছিল। কিন্তু একটা পরিমলকে সরালে সব জঞ্জাল সরানো যাবে না। বদলির খবর পরিমল আগেই পেয়েছিল তাই পরিমল সেই চিঠি ধরবে না বলেই কিছুদিনের ছুটি নিতে চেয়েছিল। অশোক তাকে ছুটি দিতে চায়নি ফলে একটা হাতাহাতির আগের পর্যায় পর্যন্ত বিবাদ চলেছে। পরিমলের ক্ষেত্রে এই বদলি অনেকটাই বেগ দেবে। কারণ কিছুদিন সময় পেলে কাগজে যে সব গরমিল আছে তা ঠিক করে নিতে পারত, অভিযোগের ভিত্তিতে বদলি হলে তার পদন্নোতির ক্ষতি হতে পারে। তাছাড়া বে-আইনি রোজগারের সংগঠনের সঙ্গে এই ব্লকে সে যুক্ত ছিল। এখানে পঞ্চায়েত এবং সভাপতির সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালো, অসৎ রোজগারে দুজনের মধ্যে সখ্যতা ছিল, অন্য ব্লকের সভাপতি এমন নাও হতে পারে। পরিমল অশোকের তোয়াক্কা না করেই বাড়ি চলে গিয়েছিল, অশোক তার বদলির চিঠি ডাকে পাঠিয়ে দিয়েছে। এই সংঘাত আসলে সৎ ও অসতের সংঘাত, এই সংঘাতের জন্য অশোকের দীর্ঘ প্রস্তুতি ছিল না তাই তাকে দাম দিতে হয়েছিল অনেক। ব্লকের অফিসে সে ক্রমশ একা হয়ে বিষাদ, অবসাদে ভুগছিল। তার বিরুদ্ধে ডেপুটেশন পড়েছে, সরকারি সম্পত্তির অপচয়, উন্নয়নের কাজ ফেলে রাখা ইত্যাদি, এসবের সঙ্গে পরিমলের বিরুদ্ধে অভিযোগ লিখিতভাবে প্রত্যাহার করার দাবিও ছিল। অন্যদিকে হাসপাতালে রাতে ডাক্তার আসতে দেরি হলে এক গর্ভবতী মহিলা মারা যায়, এবং তার সন্তানটিকেও বাঁচানো যায়নি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে গণ্ডগোল হয় তাতে ইরাবতীকে উত্তেজিত নারীদের দ্বারা বিবস্ত্র করিয়ে নিগ্রহ করা

হয়েছিল। অনাদির যে শালা ইরাবতী ও অশোককে নিয়ে নোংরা পোস্টার দিয়েছিল সেই এক্ষেত্রে মস্তানের ভূমিকা নিয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিল। ইরাবতী জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তার এই নিগ্রহের পিছনে অশোকের একটা পরোক্ষ দায় ছিল। কারণ অনাদির শালা পরিকল্পনা মাফিক এ কাজ করেছে, অশোকের উপর রাগের প্রতিশোধ নিয়েছে। ইরাবতী আক্ষেপ করেছিল, জ্ঞানত সে অন্যায় করেনি, তবুও এই আঘাত তাকে পেতে হয়েছে। সে ভয় পায় কখন নিয়ম মাফিক চাকরি করতে শুরু করবে, শুধু পয়সা রোজগারের জন্য। তার সেবার আদর্শ ভেঙে যাবে। অনাদি রাইটার্স থেকে পরিমলের বদলির ক্যানসেলেশন অর্ডার এনেছে। আর সত্তরের রাস্তায় লাল ঝান্ডার মিছিলের মতো আজ পানজোড়ার ব্লকে অশোকের বিরুদ্ধে লালঝাণ্ডার মিছিল। কৃষক সংগঠন ও অর্ধ শিক্ষিত-অশিক্ষিত বক্তারা দেশ, রাজ্য, ব্লকস্তরের সমস্যা নিয়ে মাইকে নানারকম ভাষণ দিয়েছিল। সবটাই আসলে অশোককে নিগ্রহ করার চক্রান্ত। পরিকল্পনা অনুযায়ী অশোক ঘেরাও হয়েছিল। অশোক বুঝেছে এরা তাকে বে-ইজ্জত করতে চায় না শুধু, জখম করতেও চায়। অশোক বাইরে এসে মাইকে কৃষক সংগঠনের সেক্রেটারি গগন মণ্ডল ও অনাদির কৃতকর্মের কথা বলেছে মানুষকে, কিন্তু চাষিরা বোঝেনি। এত বড়ো ষড়যন্ত্র জটিল তাদের কাছে, তারা সার বীজ এসব পাবে কিনা জানতে চেয়েছিল তবু কিছু মানুষ বুঝেছিল। এর মাঝেই একটা ইট এসে লেগেছিল অশোকের মাথায়, গায়ে আরও দুটো। যারা ইট ছুঁড়েছিল তাদের মধ্যে ভবেশ ছিল এই দলের মধ্য থেকেই কয়েকজন এসে ভবেশকে আধমরা করেছে। সুদীপ এ.ডি.এম পুলিশ নিয়ে হাজির হয়েছিল। অশোক রক্তাক্ত হলেও প্রশাসনের দিক থেকে কোনোরকম প্রতিরোধ চায়নি। পরে হাসপাতালে শুয়ে মনে হয়েছে অন্ধকারের নদীতে ভেসে যেতে পারেনি সে, ইরাবতীও পারেনি। অশোক ভেবেছিল সে জিতেছে, বিষণ্নতা থেকেও মুক্তি পেয়েছে ইরাবতীর সঙ্গে সম্পর্কে সব সংকোচ ও বাধা সরিয়ে ফেলেছে সে। সরকার তার উপর বিরক্ত, সরাসরি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ও পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্তের বে-আইনি বিরোধিতার শাস্তি হিসাবে দু-মাসের ছুটি দিয়েছে অশোককে।

অন্ধকারের নদী উপন্যাসের পানজোড়া ব্লক একটা সমাজ, একটা রাষ্ট্র। যে রাষ্ট্রতে বি.ডি.ও অফিসের নোনা ধরা দেওয়ালের মতো নোনা ধরেছে, যার পলেস্তারা খসে পড়ছিল, আর ক্রমশ নগ্ন চেহারা বেরিয়ে এসেছিল। রাজনীতির দুর্নীতি সমাজকে কুরে কুরে খেয়েছে, গোপন ব্যাধি ক্রমশ সংক্রমণের রূপ নিয়েছিল। অশোকের একার পক্ষে এই নোনা সারানো,

ডাক্তার ইরাবতীর একার পক্ষে এই ব্যাধি সারানো সম্ভব নয়। একটা ধারাবাহিক সিস্টেমের ভাঙচুর এত সহজে সম্ভব নয়, ভাঙতে গিয়ে নিজেকে আরও বেশি ভাঙতে হয়েছে অশোককে। এই কাহিনি অভিজিৎ সেনের কল্পিত কাহিনি নয়, উপন্যাসে কাহিনিকে যে কোনো প্রদেশের সঙ্গে মিলিয়ে নিলেই হল। এই সমস্যা সেদিনের যেমন ছিল, আজকেরও।

খ। *সমসাময়িক*

সমাজে, সংসারে, সম্পর্কে মানুষের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা যায়। কিন্তু বর্তমানে দলীয় রাজনীতিতে দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা একটু মুশকিল। দলীয় রাজনীতি মানুষের একটা আলাদা সত্তা তৈরি করেছে। এই সত্তা ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলোর কাছে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই সত্তাকেই সমাজ স্বীকার করেছে, ব্যক্তিগত কোনো ক্ষেত্রকে নয়। অভিজিৎ সেনের উপন্যাসে এমন অনেক কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন চরিত্র আছে যাদের প্রথম পরিচয় রাজনীতিবিদ কিন্তু তারপরেও তারা সমাজের যে কোনো সম্পর্কের সঙ্গে স্বাভাবিক। যেমন *ছায়ার পাখি* ও *নিম্নগতির নদী* উপন্যাসের যথাক্রমে গোপাল ও ত্রিদিব। *সমসাময়িক* উপন্যাসে প্রতিটি চরিত্র রাজনৈতিক এমনকি সতীনাথ ভাদুড়ির *জাগরী* (১৯৪৫) উপন্যাসের মতো একই পরিবারে বহুদলীয় রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী মানুষের সহাবস্থান। কিন্তু গোপাল ত্রিদিবের মতো *সমসাময়িক* উপন্যাসের চরিত্ররা মুক্ত চরাচর নয়, একটি সত্তায় বাঁচে। আসলে মানুষের হিংসা লোভ অসততা রাজনীতিকে কলুষিত করেছে, মানুষকে বিচ্ছিন্নও করেছে। একটি রাজনৈতিক খুনকে কেন্দ্র করে দল ও পরিবারের টানাপোড়েন এবং বর্তমান রাজনীতির একটি রূপকে চিত্রিত করেছেন অভিজিৎ সেন এই ছোটো উপন্যাসটির মধ্যে।

'পৃথিবীতে রক্তের সম্পর্ক বলে আর কিছু নেই' কারণ শিবু তার পরিজন সদানন্দ এবং ভাই কৃষ্ণকে এড়িয়ে যেত তারা বিরোধী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে। কিন্তু রাজনীতি দল বিভাজনের মতো মানুষের মন বিভাজিত করে দিতে চাইলেও সম্পূর্ণরূপে পারেনি। তাই লোকাল ট্রেনে বসে সদানন্দ চিন্তিত হয়েছিল শিবুকে সেই ট্রেনে দেখে। শিবু বিধায়ক ফলে তার শত্রু চারিদিকে, তার দেহরক্ষী জগন্নাথ আজ তার সঙ্গে নেই। ট্রেনটা তাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে রাত বারোটা বাজবে, সব মিলিয়ে কিছুই স্বাভাবিক লাগছিল না সদানন্দের। মাঝরাতে স্টশনে নামার পর শিবু খুন হয়েছিল, রিভলবারের একাধিক গুলি শিবুর শরীরকে বিদ্ধ করেছিল। এই খুন রাজনৈতিক প্রতিহিংসাজনিত এটা স্পষ্ট কিন্তু সেই

রাজনৈতিক প্রতিহিংসাতেই একাধিক তত্ত্ব বেরিয়ে আসতে থাকে। পরবর্তী নির্বাচন, প্রতিশোধ স্পৃহা ও দলীয় স্বার্থ। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হবার কারণে খুনের সন্দেহ থেকে বাদ যায়নি শিবুর নিজের পঙ্গু অধ্যাপক ভাই কৃষ্ণ ও শিক্ষক মামা সদানন্দ। কারণ পারিবারিক পরিচয়ের ঊর্ধ্বে, রক্তের সম্পর্কের ঊর্ধ্বে রাজনৈতিক পরিচয় প্রকট হয়ে উঠেছিল। এই মানুষগুলো একসময় অভাবী থাকলেও এখনের পরিস্থিতি আগের মতো ছিল না। শিবু বিধায়ক, সদানন্দ মাস্টার, কৃষ্ণ অধ্যাপক হয়েছিল। এবং প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা দলীয় রাজনীতির শরিক ছিল।

বিধায়ক শিবুর কর্মব্যস্ততা বেড়ে গিয়েছিল, এমনকি মাঝে মাঝে বাড়িও আসত না রাতে, রাজনীতি যারা করে তাদের পরিবার এটা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। শিবুর স্ত্রী অনুরাধাও এটা মেনে নিয়েছিল, কারণ সে নিজেও রাজনীতি করা মেয়ে। সেদিন ফিরতে রাত হবে এমনটাই জানত অনুরাধা, শেষ রাতে ঘুম ভাঙিয়ে পুলিশ শিবুর মৃত্যু খবরটা দিয়েছিল। এভাবে আশা করতে পারেনি অনুরাধা যদিও সে জানত শিবুর উত্থান সবে শুরু হয়েছিল তার দল এতটাও শক্তিশালী ছিল না, সামান্য কয়েকজন বিধায়কের মধ্যে শিবু একজন তবে শাসক দলকে যথেষ্ট বেগ দেওয়ার মতো শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। পুলিশ অনুরাধার সামনে বসে যখন বিস্তারিত খবর দিয়েছিল তখন কৌশলে সদানন্দের ঘটনাস্থলে উপস্থিতির কথা বলে হয়তো সন্দেহকে একটু উসকেই দিতে চেয়েছিল। শিবু খুব দ্রুত ছাত্র নেতা থেকে যুব নেতা হয়ে উঠেছিল, কলেজের যে নির্বাচনে তার জেতার কথা ছিলই না হঠাৎ করে অসাধ্য সাধন করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। তবে—

> কলেজের নির্বাচনে জেতার জন্য শিবনাথ এবং সুদর্শন মারদাঙ্গা, নানারকম চক্রান্ত ও মিথ্যাচার কোনও কিছুই বাকি রাখেনি। সেই জয়ের স্বাদ তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে আকাশছোঁয়া করেছিল।[১১২]

শিবুর এই পথের সাথী সুদর্শন জোতদার ঘরের ছেলে, তার এই দলে আসা শ্রেণিগত কারণেই। কলেজে বিপক্ষ পার্টির সঙ্গে সংঘর্ষে পুলিশ সতীশ মজুমদারের নেতৃত্বে লাঠিচার্জ করেছিল তাতে সুদর্শন মার খেয়েছিল। সেই সতীশ আজ শিবুর মৃত্যু খবর দিতে এসেছে তার কৌতুহল ছিল এই খবরে, প্রতিক্রিয়া দেখার কৌতুহল। আর রাজনৈতিক স্বার্থে খুন তাই মিডিয়া, বুদ্ধিজীবী, বিপক্ষ, সরকার দীর্ঘ নাটক চালাতে থাকে। এসব খুনে প্রতিপক্ষের উপর দোষ বর্তায়, কোনো ব্যক্তিকে, এমনকি প্রতিপক্ষ পুরো দলটাকেই অভিযুক্ত করা হয়।

বুদ্ধিজীবীরা সুবিধা বুঝে প্রেস কনফারেন্স করল কোনো দলের সমর্থনে। সদানন্দ বামপন্থী, শিবুর বিপক্ষ এবং ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী তাই তাকে থানায় ভোর পর্যন্ত থাকতে হয়েছিল। থানায় শিবুর দলের এক প্রবীণ নেতা সদানন্দকে তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করেছিল সুযোগ পেয়ে। শিবুর মারা যাবার সময় কতটা কাছে সে ছিল, সে গ্রেপ্তার হয়েছে কিনা ইত্যাদি। প্রবীণ লোকটি ধরেই নিয়েছিল এটা সদানন্দর দলের কাজ। থানায় বসে সদানন্দের মনে পড়েছিল কৃষ্ণ ও শিবু দু-ভাইয়ের সখ্যতা, শিবুর প্রতি সদানন্দের স্নেহ উথলে উঠেছিল। স্নেহ-ভালোবাসা, ব্যক্তিগত অনুভূতির সঙ্গে রাজনৈতিক জবাবদিহি, কর্তব্য সব মিশে গিয়েছিল। অভিজিৎ সেন বিশ শতকের আটের নয়ের দশকের রাজনীতির কথা বলছেন এই উপন্যাসে। এই সময়ের সমাজ ও রাজনীতি অনেক নীচে নেমে গিয়েছিল। হিংসায় সম্পর্ক, সৌহার্য্য সব খসে গিয়েছিল। তাই সদানন্দকে প্রবীণ লোকটি বলেছিল 'আপনাদের মরণঘণ্টা বেজে গেছে। সব খুঁজে এক এক করে বদলা নেব!' শিবুর মধ্যে প্রবীণ মন্ত্রী হবার সম্ভাবনা দেখেছিল। আর সদানন্দ মৃত্যুকালে শিবুর করুণ পরিণতি দেখেছিল, সদানন্দের হাঁটুর উপর মারা গিয়েছিল শিবু তাই তার শরীরে শিবুর রক্ত লেগে ছিল সেটার জন্যও জবাব দিতে হয়েছিল সদানন্দকে। রাজনীতি এখন বদলার পর্যায়ে চলে এসেছে, রাজনীতি শব্দটাই ভয় উদ্রেককারী, চিন্তার আর সমস্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিরাও যেন ত্রাসের, ভয়ংকর। এমন ধারণা এমনি তৈরি হয়নি মানুষের মধ্যে, যথেষ্ট কারণ ছিল।

সদানন্দের মেয়ে প্রিয়া বামপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী, মহীতোষ সদানন্দের ছাত্র এবং প্রিয়ার সহপাঠী। মহীতোষ সদানন্দের বাড়িতেও মাঝে মাঝে আসত। কিন্তু শুধুমাত্র রাজনৈতিক মতবিরোধের কারণে, মহীতোষ শিবুর দলে নাম লিখিয়েছিল বলেই প্রিয়া তাকে বাড়িতে আসতে দেয়নি। উপন্যাসের প্রায় প্রতিটি চরিত্র রাজনৈতিক। রাসু রাজনৈতিক সংগঠক, কুন্তি রাসুর পূর্ব পরিচিত হলেও কুন্তি জমি চাইলে রাসু হাজার দুর্বলতা সত্ত্বেও সহজে দিতে পারেনি। রাসু তার দেশের লোকেদের জমি দিয়ে রাস্তাঘাট, নির্মাণ ইত্যাদির নাম করে টাকা নেয়নি। কুন্তির প্রতি পক্ষপাতও করেনি। কুন্তিকে জানিয়েছিল—

> কলোনির দখল করা জমি তো আর হাতে ধরে রাখা যায় না। সবই দখল হয়ে যায়, দখল দিয়ে দিতে হয়। তবু তুমি আমার কাছে এসেছ, এ কথাটা মনে থাকবে আমার।[১১৩]

রাসু বলেছিল জগন্নাথ সুস্থ হলে তাকে পাঠাতে। সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে রাজনীতির ঊর্ধ্বে গিয়ে রাসুর ভাবনা নতুন রূপ লাভ করেছে, মানবিকতার বোধে রাসু প্রকৃতই নেতা হয়ে উঠেছিল। আসলে রাসু পরিবর্তমান সময়ের পূর্বের মানুষ।

কৃষ্ণ, সদানন্দ কেউই বুঝে উঠতে পারেনি শিবুকে হত্যা করে কার লাভ হল বা হবে। তবে এই হত্যার পুরোপুরি ফায়দা নিয়েছিল শিবুর নিজের দল। বামপন্থীদের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া এসেছিল শিবুর খুন তাদের দলের অন্তঃকলহ, কিন্তু শিবুর পক্ষ থেকে জোরালো যুক্তিও এসেছে। শিবুর দলের সমর্থক, প্রেস এবং বৈদ্যুতিন মিডিয়া দিনের প্রারম্ভিক সংবাদ পরিবেশনে এসব প্রচার করে নির্বাচনের হাতিয়ার করেছিল। এমনকি নির্বাচনকে সামনে দেখে শিবুর দাদা কৃষ্ণ ও মামা সদানন্দকেও রেহাই দেয়নি খুনের দায় থেকে। কৃষ্ণ তার কর্মক্ষেত্র কলেজে নিগৃহীত হয়েছিল। ইউনিভার্সিটিতে পড়তে এসে নিজেকে মার্কসবাদী আদর্শের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছিল কৃষ্ণ। যদিও এক্ষেত্রে তার প্রাথমিক পাঠ মায়াগ্রামের গোকুল মাস্টারের কাছে। গোকুল মার্কসবাদী, কোনো নির্দিষ্ট দলে দায়বদ্ধ ছিল না, সমাজতন্ত্রী পার্টি থেকে জিতেছিল। গোকুলের সংস্পর্শে কৃষ্ণ তাই হল, শিবুকেও নিয়ে যেত গোকুলের কাছে কিন্তু সে পছন্দ করেনি, ফলে শিবুর পথ বদলে গেল। সুন্দর চেহারার শিবু স্বাস্থ্যবান যুবক কংগ্রেসি ছাত্র সংগঠনের নেতা হয়ে গেল। অনেকেই সেদিন ভেবেছিল সে যেহেতু কৃষ্ণর ভাই তাই বামপন্থী দলেই আসবে। শিবুর চেহারা বুদ্ধি তাকে অল্পদিনেই নেতা করে দিয়েছিল সম্ভত রাসুর জিনের কারসাজি ও তার মদতে এসব সম্ভব হয়েছিল।

উপন্যাসে প্রতিটি চরিত্র দলীয় রাজনীতিতে যুক্ত, পরিবারে রাজনীতি প্রবেশ করে সম্পর্কগুলোকে সন্দেহপ্রবণ ও কলুষিত করেছে। শিবু মারা গেলেও তার স্ত্রীর নেতা হওয়া আটকায়নি। সদানন্দের মেয়ে প্রিয়া রাজনৈতিক মতবিরোধের কারণে বন্ধু ত্যাগ করেছিল, কৃষ্ণকে ভাইয়ের মৃত্যুর দায় থেকে ক্লিনচিট নেওয়ার লড়াই করতে হয়েছে। পরিবার পরিজন ও মানবিক আবেদন ধ্বংস হয়ে রাজনৈতিক সম্পর্ক আসল পরিচয় হয়ে উঠেছে মানুষের। অভিজিৎ সেন অল্প পরিসরে এসবই দেখিয়েছেন এই উপন্যাসে।

গ। *নাগকেশর অক্ষবাট*

ধারাবাহিক জীবনে যে কোনো রাজনৈতিক অভিঘাত বেশিরভাগ সময়ে খুব সাধারণ ঘটনা বলে মনে করা হয়, এমনকি রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় মৃত্যুও। দিন যত এগিয়ে চলেছে মানুষও সেসব ঘটনার সাধারণত্বকেই স্বীকার করে নিয়েছে। আবার যে কোনো ছোটো অভিঘাতও মানুষকে হতবাক করেছে, কারো যুগ যুগ সঞ্চিত নৈতিকতা, আদর্শ, ত্যাগ, সাধনাকে ধুলিস্যাৎ করেছে। একমাত্র রাজনৈতিক অভিঘাতই পারে একসঙ্গে অনেকগুলো শুভ বোধকে ধ্বংস করতে। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে রাজনীতির রূপ ক্রমশ উগ্র প্রকট হয়েছিল। এই ক্ষমতাকে উপেক্ষা করা মানুষের সাধ্যাতীত। নাগকেশর নামের একটি গ্রামের স্কুল কমিটির নির্বাচনে বোমাবাজি হলে স্কুলটির প্রতিষ্ঠাতা বৃদ্ধ অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের গুরুতর জখম ও মৃত্যু একটি সমাজের অন্ধকার দিককে উন্মোচিত করেছিল। *নাগকেশর অক্ষবাট* উপন্যাসে অভিজিৎ সেন রাজনীতির সেই দিক সম্পর্কে বলেছেন, যাতে কিছু মানুষের তুচ্ছ স্বার্থ যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত আদর্শ ঐতিহ্যের হত্যা করেছে। কথিত আছে, এই নাগকেশর গ্রামে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩) রাত্রিবাস করেছিলেন। এর প্রমাণ হিসাবে বহুকাল প্রতিনিধিত্ব করে এসেছিল একটি প্রাচীন অক্ষবাট। কিন্তু সময়ের সঙ্গে স্বার্থের মোহে মানুষ নাগকেশর থেকে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেম ভক্তি সরিয়ে অক্ষবাটকে করে তুলেছে সত্যিকারের যুদ্ধস্থান, মল্লভূমি।

মালদা জেলার নাগকেশর গ্রামের স্কুল কমিটির নির্বাচনে বোমাবাজি হলে স্কুলের দুজন শিক্ষকের সঙ্গে প্রাক্তন শিক্ষক মনোহর দাস গুরুতর জখম হয়েছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনীতির প্রয়োজন আছে কী নেই বিষয়টা তর্কের। তবে আচ্ছন্নতা বোধহয় সব ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক গতিকে রুদ্ধ করে দেয়। বাংলার স্কুল কলেজগুলিতে রাজনীতি অনেকসময় শিক্ষার গতিকে রুদ্ধ করেছে একথাকে একেবারেই অস্বীকার করা যাবে না। অভিজিৎ সেন লিখেছেন—

> দলবাজি, রাজনীতি এবং আনুষঙ্গিক আরও নানাপ্রকার উৎপাতের কারণে আজকাল শিক্ষকরা আর বিশেষ কেউই প্রধান শিক্ষকের দায়ত্ব নিতে চায় না।[১১৪]

স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সব ক্ষেত্রেই একই অবস্থা। নাগকেশর গ্রামের স্কুলের প্রধান শিক্ষক রামানুজ এই স্কুলেরই ছাত্র ছিল। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা যে কোনো বাধা অতিক্রম

করতে পারে। মনোহর দাস স্থানীয়, নাগকেশর স্কুল তার নিজ হাতেই তৈরি ছিল, এলাকায় বঞ্চিত মানুষের আশ্রয়স্থল ছিল মনোহরের তৈরি স্কুল ও হাসপাতাল। সে একজন নিবেদিত শিক্ষাবিদ, নিজের অঢেল সম্পত্তি ছেড়ে গ্রামকে শিক্ষিত করার কাজে ব্রতী হয়েছিল। পরবর্তীকালে যে সব কাজ সরকারের দায় নিয়ে করা উচিত ছিল সেসব কাজ অনেক বছর আগেই মনোহর নিজের কাজ বলে করতে শুরু করেছে। নিজের গণ্ডির মধ্য থেকে গ্রামের মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছিল তবুও তো বোমার সপ্লিন্টার তার শরীরের অনেক অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিল। এমনকি তাকে যাতে বড়ো হাসপাতালে তাড়াতাড়ি নিয়ে যেতে না পারে তার জন্য চক্রান্তকারীরা হাসপাতালের এ্যাম্বুলেন্সের চাকার হাওয়া খুলে রেখেছিল। আইনি ঝামেলা মানুষ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছে চিরকাল। কিন্তু তা যে কোনো দিক থেকে আসতে পারে, তেমনভাবেই নাগকেশর স্কুলের আগের প্রধান শিক্ষককে নারীঘটিত ব্যাপারে জড়িয়ে তাকে স্কুল ছাড়া করা হয়েছিল, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার খুব ভালো পথ এটা। নিপীড়নের কোনো পদ্ধতি হয় না, যে কোনো দিক দিয়েই নিপীড়ন করা যায়।

নাগকেশর স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনে নতুন করে উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। তিনটি রাজনৈতিক দল এই নির্বাচন ঘিরে তৈরি হয়েছিল, তার মধ্যে একটি দল ভোটের কিছু লোক নিয়ে স্কুলের অফিসে ঢুকে তাণ্ডব চালিয়েছে এবং ফেরার সময় মনোহর দাসের চেয়ার লক্ষ করে তিনটি বোমা ছুঁড়েছিল। এমনকি ভোট যে ঘরে চলছিল সেই ঘরেও গিয়ে সব তছনছ করে স্কুলের বারান্দায় দুটি বোমা ফেলেছিল। নির্বাচনকে প্রভাবিত করার আধুনিক উপায় ছিল সন্ত্রাস সৃষ্টি করা, সারা দেশ জুড়ে ভোটকে প্রভাবিত করতে এই কৌশল অবলম্বন করা হয় এখনো। প্রতিটি প্রদেশের প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতেও এই কৌশল ক্রমে রপ্ত করা হয়েছে। এই কৌশল যে বেশ ফলপ্রসু হয় এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, এক্ষেত্রেও দেখা গেল থানায় ডায়েরি লেখানোর সময় রামানুজকে বিষ্ণুবাবু পরামর্শ দিয়েছিল নাগকেশরেও যখন বোমা বন্দুক আমদানি হয়েছে তখন থানায় কারো নাম করাটা ঠিক হবে না। কিন্তু রামানুজ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকতে পারেনি ব্যাপারটায়, এড়িয়ে যেতে পারেনি। তার এই সাহসটুকু স্থানীয়তার, সততার সাহস। বিষ্ণুবাবুও চায়না ঘটনা এড়িয়ে যেতে কিন্তু বাস্তবতার মধ্যে বাঁচতে হত সকলকে। বিষ্ণুবাবু তাই বলেছিল—

> গ্রাম দেশের যা অবস্থা, যে পরিমান দলাদলি বেড়েছে, মানুষের স্বার্থপরতা এমন সীমাহীন মাত্রা পেয়েছে, যে কিছুতেই আর ভরসা হয় না।[১১৫]

এই দলাদলির ফলে অনেক সম্পর্ক হারিয়ে গিয়ে দল প্রাধান্য পেয়েছে। ভয়, লোভ, প্রতিশ্রুতি, মিথ্যা, ধর্ম, সম্প্রদায় নিয়ে রাজনীতি চলছে। কেউ কোনো সুযোগ হাতছাড়া করতে চায় না। মনোহর তার কাজের পথ সুগম করতে একটা রাজনৈতিক পন্থা অবলম্বন করেছিল, তার দল মনোহরকে কলকাতার পি.জি হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করেছিল। অভিজিৎ সেন লিখেছিলেন—

> রাজনৈতিক কোনও দলই এখন আর কোনো সুযোগ হাতছাড়া করে না। জনদরদি সাজার সুযোগ যদি স্বয়ং এসে হাজির হয়, তবে তো কথাই নেই। নেতা, মন্ত্রীরা পর্যন্ত ইদানীং তুচ্ছ ঘটনাকেও মর্যাদা দিতে ছুটে যান। প্রতিবিধানের অঙ্গীকারের সঙ্গে সঙ্গে দুষ্কৃতীর দণ্ডদানের দিনক্ষণ পর্যন্ত আগাম ঘোষণা করে দিয়ে আসেন তাঁরা।[১১৬]

এই অতিসক্রিয়তার ফলে অত্যাচারিতের স্ত্রী-পুত্রর জন্য চোখের জল ফেলা, চাকরি প্রদান, নগদ টাকা দেওয়া ইত্যাদি করে থাকে নেতারা। কিন্তু অপরাধীর গোড়া উপড়ে ফেলার কথা বললেও সেই গোড়ার ধারে কাছে কেউ যায় না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। আইনকে আইনের পথে কয়েক দশক চলতে দিয়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকে সবাই। ফলে অন্যান্য অনেক গ্রামের মতো নাগকেশর গ্রামের রাস্তাঘাট, স্কুল, কলেজ, সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে এগিয়ে চলেছে তা সত্ত্বেও সমাজের অধঃপতন আটকানো যায়নি।

সমাজ থেকে যাবতীয় মূল্যবোধ খসে পড়েছে, যেন মানবিক কোনো কিছুই নেই এই পৃথিবীতে, এসব শুধু লোক ঠকানোর নামান্তর। বোমার আঘাতে মনোহরের সঙ্গে এক শিক্ষিকা মালবিকা জখম হয়েছিল। মালবিকার বাবা সিদ্ধার্থ তার অভিজ্ঞতার কথায় এই মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কথা বলেছিল। সিদ্ধার্থ ব্যাংকে চাকরিকালে ব্যাংকের চেয়ারম্যানের কথামতো বন্দুকের লাইসেন্স রিনিউয়ের জন্য এক জোতদারকে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট নিতে বললে, জোতদার দম্ভের সঙ্গে বলেছিল 'তুই কেরে আমাকে সার্টিফিকেট দেওয়ার! দেব গুলি চালিয়ে—' এই ব্যক্তির জোতদারি দাম্ভিকতার সঙ্গে এই বেপরোয়া ভাব ছিল কারণ সে কংগ্রেসের জেলা কমিটির নেতা। এই নেতারাই বলে আইন আইনের রাস্তায় চলবে। সবমিলিয়ে বিশ শতকের নাগকেশর অক্ষবাট হয়ে রইল উত্তপ্ত। শ্রীচৈতন্যদেবের

পাদস্পর্শে নাগকেশরে যে শাখা গড়ে উঠেছিল তা ক্রমে সামাজিক অবক্ষয়ের সঙ্গে পঙ্গু হয়ে যায়, নাগকেশর তার ব্যতিক্রম নয়। যুগ যুগ অবক্ষয়ের শিকার হয়ে নাগকেশর শুধুই অক্ষবাট হয়ে রইল। বনমালী বাবার হাত ধরে নাগকেশরে এসে মোহান্তর কাছে আশ্রয় নিয়েছিল। যে অক্ষবাটের কাছে গৌর-নিতাই মন্দিরের সামনে বনমালী মনোহরকে দত্তক নিয়েছিল সেই অক্ষবাটে মনোহরের পিতার সমাধির পাশে গড়ে তুলল স্কুল যা ক্রমে বড়ো হয়েছিল, অনেককে আশ্রয় দিয়েছে মনোহর কিন্তু তার আশ্রয় হাসপাতালের বিছানায় হয়েছে। মৃত্যুমুখে দাঁড়িয়ে আবার সে আচ্ছন্নতার মধ্যে নাগকেশরে ফিরতে চেয়েছিল, সেই পুরানো নাগকেশর অক্ষবাটে। যারা মনোহরকে বোমা মেরেছিল স্কুলে তাণ্ডব করেছিল, তাদের কয়েকজনকে চিনেছে মালবিকা, সে জানত নাগকেশর স্কুলের নির্বাচন বিধানসভার থেকে কম গুরুত্বের নয়। পুলিশকে আগে থেকে জানানো হলেও তারা ব্যবস্থা নিতে পারেনি। পুলিশকে নির্দেশমতো কাজ করতে হয় স্বাধীনভাবে কাজ করতে গেলে সরকার ও সংবাদ মাধ্যমের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। আসলে 'সবকিছুর মধ্যেই রাজনীতি ঢুকে গেছে। কোনো কিছুই আর নিরপেক্ষভাবে বোধহয় দেখা সম্ভব নয়।' মালবিকার মা মাধুরীর মতে রাজনীতি সবকিছুর মধ্যে থাকে এবং আছে, সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ নিজের বোধ বুদ্ধি ও প্রয়োজন মতো তাকে আশ্রয় করে কাজে লাগায়। মালবিকার পুরো পরিবার সুসজ্জিত রাজনৈতিক পরিবার তাই এসব যুক্তি তর্কে সিদ্ধহস্ত। মাধুরী ঠিকই বলেছে কারণ মালবিকা যখন স্কুলে জয়েন করতে গেলে তাকে বাধা দেওয়া হয়েছিল বাইরের লোক বলে। নিজেদের এলাকার লোককে আগে সুযোগ দিতে হবে, এই দাবি এখনো আছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে। ফলে মালবিকাকে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে চাকরি করতে হয়েছিল। এই 'সান অব দি সয়েল' ব্যাপারটা আইনের তোয়াক্কা না করে ক্ষমতাবলেই করা এক প্রকার দাবি।

মালবিকা পুলিশকে কারো নাম বলেনি, সে জানত কারো নাম বললেই বিশেষ কিছু কাজ হবে না তবে ঝামেলা আরও হতে পারে। কারণ সে আরও জানত—

> আমাদের দেশের রাজনীতিতে কিছু একটা বিপর্যয় ঘটে গেছে। সব কিছু দখল করতে হবে, পাড়ার ক্লাব থেকে সংসদ পর্যন্ত কোথাও কোনো প্রতিপক্ষ থাকবে না, এরকম একটা ব্যবস্থা যেভাবে হোক, যে পদ্ধতিতেই হোক, করে ফেলতে হবে এবং সে ব্যাপারটাকে ভাড়াটে দিয়ে হোক, ভয় দেখিয়ে হোক, তাত্ত্বিকভাবে জাস্টিফায়েড দেখাতে হবে।[১১৭]

মালবিকার এই কথাগুলোকে জাস্টিফায়েড করার দরকার নেই, রাজনীতি সচেতন অচেতন সব মানুষই জানে এর সত্যতা। তবে মনোহর দাস কংগ্রেসের আদর্শবাদী নেতাদের আমন্ত্রণে গ্রামের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতির জন্য পার্টি জয়েন করেছিল। মনোহরের পৈত্রিক সম্পত্তি বেহাত হলেও আক্ষেপ ছিল না, তার স্কুলের ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উন্নতি করেই সে খুশি হয়েছিল। পরবর্তীকালে স্কুলকে উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে গ্রামীণ হাসপাতালে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছিল মনোহরের অদম্য চেষ্টায়। মনোহর এসব করতে গিয়ে রাজনৈতিক সাহায্য নিয়েছিল একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, কিন্তু রাজনীতিকে পেশা হিসেবে নেয়নি। কোনোদিন লোকসভা, বিধানসভা, রাজ্যসভায় যাওয়ার রেষারেষিতে ছিল না। তাহলে প্রমাণ হয় রাজনীতির মধ্য দিয়ে মহৎ কাজ করা যায়। তবে আধুনিককালের রাজনীতিতে যা হয় তাই ঘটেছে মনোহর দাসের ক্ষেত্রে। মনোহর যখন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেছে, অন্যদিকে তার বিপক্ষ, সপক্ষ দল ও বুদ্ধিজীবীরা দুঃখ ব্যক্ত করেছে, মিছিল হয়েছে, প্রতিবাদের ধ্বনি উঠেছে, আততায়ীদের সম্পর্কে চরম নিন্দার বাণী প্রয়োগ করছে, টেলিভিশনে এই ঘৃণ্য ঘটনার কথা দিনের পর দিন আলোচনা হয়েছে। এবং আশঙ্কা ব্যক্ত করেছে স্কুলের নির্বাচনে যদি মনোহরের মতো সজ্জন ব্যক্তি আক্রান্ত হতে পারে তাহলে পঞ্চায়েত বিধানসভা লোকসভার নির্বাচনে কী হতে পারে। এসবের সময়সীমা পরবর্তী এমন আর একটি ঘটনা পর্যন্ত তারপর মনোহর দাস খবরের ভিড়ে হারিয়ে যাবে, তার আবক্ষ মূর্তি স্থাপন হবে নাগকেশরে। এসব ঘটনা চলতেই থাকবে জন্ম-মৃত্যুর মতো, ভালো খারাপের শেষ বিচার করবে মানুষ, মানুষ যাকে সমর্থন করবে সে নির্দোষ প্রমাণিত। বোম মারা, ঘর জ্বালানো, প্রিন্সিপাল শিক্ষককে নিগ্রহ, এমনকি মনোহরের মতো কেউ খুন হয়ে যাবার মতো ছাত্র ও নেতাদের 'দুষ্টুমি' শেষ পর্যন্ত বিচারের দাড়িপাল্লায় আসবে, পাবলিক কী বলছে তাতেই ন্যায়নীতি ঠিক হবে। মনোহর দাসের ন্যায়নীতি ঠিক করেছিল তার বিপক্ষরা, কারণ মনোহরের দলের তখন উঠে আসার ক্ষমতা ছিল না, বামপন্থীরা একাধিপত্য শাসন করেছে, স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি ঠিক করে ফেলেছে। মনোহর স্কুলের শিক্ষক পদে স্বজন-পোষণ করেছিল, স্কুলের জন্য প্রচুর টাকা আসে সরকার থেকে সেসব মনোহর কয়েকজনকে নিয়ে লুটেছে এসব ধারণাই ছিল মনোহরের বিপক্ষদের। কিন্তু মনোহরের বাবার সম্পত্তির তিন ভাগের দু-ভাগ স্কুলের জন্য ব্যয় করেছে, হাসপাতালের সঙ্গে সঙ্গে সে কলেজ করবে নাগকেশরে এমন ইচ্ছাও ছিল সেসব অজানা থেকে গেল

অনেকের। অভিজিৎ সেন দেখিয়েছেন স্বার্থসর্বস্ব রাজনীতির রূপ। এরপর স্কুলে দুটি সভা হয়েছিল প্রথমটিতে হাজার বারোশো লোক হয়েছিল গ্রামবাসী ও স্কুলের ছাত্রদের অভিভাবক শিক্ষক মিলিয়ে। যারা মনোহর দাসের সুস্থতার প্রার্থনা করেছিল, দ্বিতীয়টি সেও আমূল পরিবর্তন পন্থীদের যাতে বাস ট্রাকে করে লোক এসেছিল হাজার হাজার, যারা মনোহর দাস ও প্রধান শিক্ষককে 'শাপান্ত-বাপান্ত' করেছে। আর জানিয়ে দিল সাত দিনের মধ্যে নতুন ম্যানেজিং কমিটি গঠন করতে হবে নাহলে লাশ পড়বে, হাসপাতাল অব্দি যেতে হবে না। এর দুদিন পরে মনোহর দাস আচ্ছন্নতার মধ্যে যে ঘোড়াকে খুঁজেছিল সেটা পেয়েছে। সেই ঘোড়া ডানা ভর করে মনোহকে নিয়ে উড়ে চলল, নীচে পড়ে ছিল নাগকেশর অক্ষবাট।

৪। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি

সত্তর দশকে এই বাংলা তথা সাড়া ভারত জুড়ে চলেছিল সশস্ত্র নকশাল আন্দোলন, যাতে ভ্রান্তি ছিল, আবেগ ছিল, আর ছিল সমাজের ব্যবস্থাটা বদলে দেবার স্বপ্ন। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার দাবিতেও চলেছিল ব্যাপক সংগ্রাম। এই দুটি বিষয় বাংলা সাহিত্যে প্রভাব ফেলেছে। নকশাল আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা হয়েছে অনেক গল্প ও উপন্যাস। অভিজিৎ সেনও তাঁর অনেক গল্প ও উপন্যাসের প্রেক্ষিত রচনা করেছেন এই দুটি বিষয় নিয়ে। অভিজিৎ সেন যেহেতু **১৯৭০-৭১** সালে দিনাজপুরে থাকতেন তাই পুর্ব পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী এই অঞ্চল কীভাবে শরনার্থীতে ভরে উঠেছিল তা তিনি দেখেছিলেন ফলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসা মানুষের তালিকা তাঁর উপন্যাসে বেশ দীর্ঘ। অধ্যাপক গোপা দত্ত লিখেছিলেন—

> অভিজিৎ সেনকে মনে হয় নিরাশ্রয়তার কথাকার। বাস্তুহীনের বেদনা তাঁর উপন্যাসে বারম্বার আবর্তিত।[১১৮]

অভিজিৎ সেন নিজেও ছিন্নমূল হয়ে এসেছিলেন এদেশে, নিরাশ্রয় ছিলেন বহুদিন, তাই ছিন্নমূল মানুষের যন্ত্রণা তিনি মর্মে উপলব্ধি করতে পারতেন সহজেই। এমন অনেক মানুষের কথা তিনি তাঁর লেখায় এনেছেন, মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে *স্বপ্ন এবং অন্যান্য নীলিমা* এবং *নক্ষত্র নদী ও নারী* উপন্যাস লিখেছেন।

ক। *স্বপ্ন এবং অন্যান্য নীলিমা*

স্বপ্ন এবং অন্যান্য নীলিমা (২০০০) উপন্যাসে অভিজিৎ সেন অনেকটা সময়কে ধরেছেন, দেশভাগ, দাঙ্গা, নকশাল আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের সময় পর্যন্ত। এই সময়কালের মধ্যে অভিজিৎ সেন নিজের জীবনের ঘটনার সঙ্গে আবদুল কুদ্দুস, চিঙ্গিস, সতী, হেনার ফেলে আসা পূর্ব পাকিস্তানের কথা বলেছিলেন। স্বাধীনতার লড়াইয়ের কথা, নিজেদের দুর্ভাগ্য, খান সেনাদের অত্যাচারের কথা ইত্যাদি মিশিয়ে সময়ের পরিপূর্ণ অধ্যায় তুলে এনেছেন। সেই সময়ের ইতিবৃত্ত সহজে তো ভুলে যাবার নয়, আজীবন মনে রাখার মতো বেদনাময় স্মৃতি।

সতী শিক্ষিত রুচিশীল মেয়ে। সময়ের উত্তাপ আর অযোগ্য স্বামীর অবহেলায় সতীর মতো লক্ষ লক্ষ মেয়ের জীবন নরক হয়ে উঠেছিল। ঐতিহাসিক বিপর্যয়, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, পথের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল। ছাত্রজীবনে কলকাতায় পড়তে গিয়ে সাম্প্রদায়িক

বিদ্বেষের শিকার হয়েছে সতী। কলকাতার হোস্টেল থেকে শুধুমাত্র মুসলমান হওয়ার কারণে নানভাবে অপমান সহ্য করতে হয়েছিল সতীকে। এমন বিচিত্র অভিজ্ঞতার পরেও সাংসারিক জীবনে স্বামীর উপেক্ষা ও তার সঙ্গীত চর্চায় স্বামীর 'স্যানস' খুঁজে না পাওয়ার ফলে ব্যক্তিজীবন বিষিয়ে উঠেছিল। সতীর মতো তার বোন হেনা, মা রুমেলা, মামা আবদুল কুদ্দুস এবং চিঙ্গিসের মতো অনেক মানুষ এই দেশে এসে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিল। প্রত্যেকের বেদনাময় অতীত নিয়ে অনেক কিছুই বলার থাকে কিন্তু 'কে হায় হৃদয় খুড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে?' তাই সেসব নিয়ে নিজেদের মধ্যেও আলোচনা করার কথা ভাবতে চায়নি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবিতে মেয়েরাও পিছিয়ে থাকেনি, সতী হেনার মতো মেয়েরা আবেগে নয়, বুঝেই এসেছিল মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে। সীমান্ত অঞ্চলে ভারতীয় বাহিনীর পরিচালনায় মুক্তিবাহিনীর সার্বিক নিরাপত্তা ছিল কিন্তু হেনার মতো গ্রামাঞ্চলে যারা মুক্তাঞ্চল গড়ে তুলেছিল তাদের অবস্থা ভারতীয় নকশাল বিপ্লবীদের মতো। ফরিদপুরের দূর্ভেদ্য যুগীর বিলে গড়ে উঠেছিল হেনাদের মুক্তাঞ্চল। এই ধরনের ঘাঁটিগুলোয় হানাদারেরা মোটরচালিত নৌকা নিয়ে প্রবেশ করে গুলিবর্ষণ করত। কখোনো কখনো রাজাকারদের সাহায্যে ঢুকেও পড়ত। ফলে বীরত্ব আর নৃশংসতার মিশ্রন দেখা যেত পাকিস্তান বাহিনীর। অস্ত্র গোলাবারুদের কোনো সংস্থান ছিল না মুক্তিযোদ্ধাদের। হেনা বোরখায় সর্বাঙ্গ ঢেকে চানু মিয়ার বিবি সেজে ফরিদপুরে এসেছিল। 'তারা কেউ বিছানায় শুয়ে মরবে না' এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ ছিল। হয় রণাঙ্গনে মরবে নয়তো বিজয় উৎসব করবে। যুগীর বিলে আসার পর তার মৃত্যু চিন্তাটা প্রখর হয়ে উঠেছিল। যেভাবে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় তার মনে হয়েছিল। মামা আবদুল কুদ্দুসকে চিঠিতে জানাতে চেয়েছিল ইন্ডিয়া তাদের সবাইকে মেরে ফেলবে কিনা, ঢাকা শহরে বোম পড়বে কিনা, ওরা কেন আমাদের মারবে ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর। আবদুল কুদ্দুস জানিয়েছিল খুব তাড়াতাড়ি যুদ্ধের আবহ কেটে যাবে এবং আমরা একসঙ্গে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখব। হেনা সেদিন বোঝেনি রংপুর থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার প্রসঙ্গ কীভাবে এসেছিল। যুগীর বিলে আসার পর তার স্মৃতি আরও জেগে উঠেছিল, জগন্নাথ হলে পাকিস্তান সেনাদের অত্যাচারের কথা, ছাদের আলিশায়, জলের ট্র্যাঙ্কে, বইয়ের আলমারির পিছনে লুকিয়ে দেখা অত্যাচারের কথা, রাইফেল সাবমেশিনগান দ্বারা নির্বিচারে গণহত্যা, ধর্ষন দিশেহারা করেছিল তাদের।

মুক্তিবাহিনীর রাজনীতি ও স্বাধীন বাংলাদেশের রূপ কেমন হবে এ বিষয়ে তাদের স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। তবুও মুক্তিরা তাদের লড়াই চালিয়ে যেতে চেয়েছিল। এদিকে উদ্বাস্তুতে ভরে অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি হয়ে উঠেছিল ভারতের ক্যাম্পগুলো। বাড়ি ভাড়া পাওয়া কঠিন ব্যাপার এদেশে, পেলেও ভাড়া তিনগুণ বেড়েছিল। বাতাসে যখন যুদ্ধ ও বিপ্লবের গন্ধ তখন সেই ঝড়ে অনেকেই আম কুড়োবার সুবিধা নিয়েছিল। কেউ কেউ কোনো একটি পক্ষের হয়ে চরবৃত্তিও করে নিজের আখের গুছিয়েছে। জুলফিকারের মতো ভয়ংকর দর্শন মুক্তির কাছে এক গর্ভবতী মহিলা প্রাণ ভিক্ষা করেছে তার স্বামীর, জুলফিকারের বন্দুকের নলের সামনে সেই স্ত্রী লোকটির স্বামী, যে রাজাকার বা প্রাক্তন রাজাকার অথবা অনুরূপ কিছু। তবে নিশ্চিত কিছু নয়। তাতেই তার কপালে প্রহার জুটেছিল। একেবারেই নকশালদের জোতদার খতমের মতো। জয়বাংলার পথে এরাই বাধা সৃষ্টিকারী তাই এদের নিস্তার নেই। স্বাধীন বাংলাদেশ চেয়েছিল মুক্তিযোদ্ধারা, কয়েক লক্ষ মানুষের মৃত্যু, কয়েক লক্ষ উদ্বাস্তু আর কয়েক লক্ষ নারীর ধর্ষিত হওয়ার বিনিময়ে পেয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশ। পূর্ব পাকিস্তানের মাওপন্থী কমিউনিস্টরা পশ্চিমবঙ্গের নকশাল বিপ্লবীদের মতোই গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার কর্মসূচী করেছিল। হেনার মতো মেধাবী ছাত্রীরাও এই কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আগেই ঢাকার সেনাবাহিনী ও রাষ্ট্রশক্তি প্রবলভাবে জনগণের উপর আক্রমণ করতে শুরু করেছিল ফলে মুক্তিবাহিনীও দুর্গম জায়গায় চলে যায়। এরপরেও যেভাবে লক্ষ লক্ষ নারীর জীবন খান সেনাদের অত্যাচার আর ধর্ষণে কলুষিত হয়েছিল হেনারও তাই হয়েছে। গোপন ডেরাতে ধরে আনা দালাল ও রাজাকারদের হত্যা করে নৃশংসতার অভ্যাস করত মুক্তিরা। সীমান্তের ওপার থেকে ধরে আনা বা এপারে ধরা পড়া রাজাকার ও শান্তিবাহিনীর লোককে হাত বেঁধে গুলি করে নদীর স্রোতে ফেলে দিত। কিন্তু এই গোপন ডেরাগুলোতেও ভেজাল মিশতে থাকে, পার্টির লোকজনের সঙ্গে অনেক পালিয়ে আসা মানুষ মিশতে থাকে ফলে 'কমিউনের নামে বাধাহীন যৌনতা' বেড়ে গিয়েছিল। হেনাও তার শিকার হয়ে সেখান থেকে ঝুঁকি নিয়ে দিনাজপুরে পালিয়ে এসেছিল। নকশালদের মধ্যেও কিছু ভেজাল মিশেছিল সেভাবে মুক্তিবাহিনীর মধ্যেও কিছু লোক ছিল যারা ব্যক্তিগত লোভ লালসা চরিতার্থ করতে ঢুকে পড়েছিল।

আবদুল কুদ্দুসের মতো স্বাধীন বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যারা বসে ছিল তারা অনেকেই জানত না স্বাধীন বাংলাদেশের শাসক কারা হবে। তবে পাকিস্তানের হাত থেকে

মুক্তি দরকার আপাতত। আর এই মুক্তির দাবিতে একদিকে যখন স্বপ্নালু চোখের যুবক-যুবতীরা প্রাণ দিয়েছে অন্যদিকে ক্যাম্পগুলোকে কেন্দ্র করে ঠিকাদার, রাজনৈতিক নেতারা প্রচুর টাকা রোজগার করে নিয়েছে। সরকারি কর্মযজ্ঞে যে টাকা উড়ছিল তা ধরে নিয়েছে এরা। কমিউনিজমে বিশ্বাসী লাহোর জেল ফেরত আবদুল কুদ্দুস মনে করেছিল—

> ভারতীয় বাহিনী ওদেরকে না-পাঠিয়ে নিজেরা সরাসরি হস্তক্ষেপ করলে ব্যাপারটা বোধহয় সবদিক দিয়ে ভালো হত। বোধহয় দু-চারদিনেই নিষ্পত্তি হয়ে যেত তা হলে।[১১৯]

ওদের বলতে আবদুল কুদ্দুস সেইসব স্বপ্নালু চোখের মুক্তিদের কথা বলেছে। কিন্তু আবদুল কুদ্দুস কয়েকমাস আগে স্বাধীন বাংলাদেশ চাইত না, এখন চায়, তার এই দ্বিধা রয়ে গেছে মনে। তাই স্বপ্নালু চোখের ছেলে আয়নালের বিপ্লবী থেকে প্রতিবিপ্লবী হবার আশঙ্কার কথা বলেছিল। গৃহযুদ্ধের ভয়ংকর রূপ দেখে 'এসব বন্ধ করার জন্য মানুষকে যদি পরাধীন থাকতে হয়, বোধহয় তাও ভালো' এমন কথাও বলেছে। এই স্বাধীনতা পেতে ভয়ংকর যুদ্ধ লড়েছিল বাঙালি জাতি—

> এমনকি হতে পারে যে মুক্তিযুদ্ধকে যারা সমর্থন করেছিল, তার থেকে অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ করেনি? অন্তত এমন কথা তো বলাই যায় যদি অর্ধেক বাংলাদেশি স্বাধীনতা চেয়ে থাকে, তবে বাকি অর্ধেক চায়নি। যারা স্বাধীনতার জন্য লড়েছিল আর যারা পাকিস্তানের জন্য লড়েছিল, দুই যুযুধান পক্ষকেই কি কোনো একটা জায়গায় একই ধরনের আবেগতাড়িত আদর্শবাদী হিসাবে দেখানো যায়?[১২০]

আসলে সরোজ বলতে চেয়েছে, অনেক গোপন খবর, অনেক চক্রান্ত, ক্রূর ষড়যন্ত্র থেকে বাদ যায়নি মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রাম। জাহির কলকাতা থেকে ঢাকায় এসে জেনেছিল তার বড় ভাই সাংবাদিক, লেখক, কমিউনিস্ট শহীদুল্লা কায়সার নিখোঁজ। তাকে খুঁজতে খুঁজতে অজানা ফোনে ভাইয়ের সন্ধান এলে, ব্যাকুল হয়ে ছুটে গিয়েছিল, কিন্তু তার আগেই জাহিরকে খুন করা হয়েছিল। জাহিরও স্বাধীন বাংলাদেশে চিরদিনের মতো হারিয়ে গিয়েছিল, এমনভাবেই হত্যা ও ষড়যন্ত্র চলত।

মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা এদেশে চলে এসেছিল, বিশেষ করে মেয়েরা কেউই অক্ষত আসেনি, হেনার গর্ভপাত করাতে হয়েছিল, রোজি পারভেজের মতো শিক্ষিত মেয়েরাও দলে দলে পালিয়ে বেঁচেছিল। রোজি বলেছিল—

> আমাদের পুরুষেরা খুন হয়েছে, আমাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, আমরা হোমলেস, রেপড অ্যান্ড— [১২১]

রোজি পশ্চিম পাকিস্তানের মেয়ে, হেনা পূর্ব পাকিস্তানের, দুজন সহপাঠী ছিল। এখন পুর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান একে অপরকে আঘাত করে, অত্যাচার করে, দেশছাড়া করছে। প্রত্যেকের স্মৃতিতে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, খুন ধর্ষণের অভিজ্ঞতা। হেনাও একদিন ফরিদপুরের গোপন ডেরা থেকে চেয়েছিল যুদ্ধটা হৃদয়হীন না হয়ে একটু মানবিক হোক, কিন্তু তা হয়নি। বীরত্ব ও নৃসংশতা এক হয়ে গিয়েছিল তখনই হেনা পালিয়ে আসার কথা ভেবেছিল। বহু পথ অতিক্রম করে, নারীত্বকে বিসর্জন দিয়ে, সব সংস্কার হেলায় সরিয়ে এখন সে বেহিসেবি। রোজি পারভেজের মতো যুক্তিবাদী মেয়েরাও সব যুক্তি সরিয়ে রেখে এখন বাঁচার জন্য, খাদ্যের জন্য শরীরকে যে কোনো বয়সের পুরুষের হাতে সঁপে দিতেও রাজি ছিল। শেকড়ছেঁড়া মানুষের জীবনযন্ত্রণা কত কঠিন হয় তা নারীদের দিয়ে ভালো বোঝা যেত। পরিস্থিতির কারণে প্রাথমিক চাহিদা পূরণ করতেই হিমশিম খেতে হয়েছিল এসব শিক্ষিত মেয়েদের। ছয় মাস আগে যেভাবে জীবনযাপন করেছে ভাবতেই পারেনি ছয়মাস পরে এভাবে সবকিছু বদলে যাবে, সব কিছু অনিশ্চিত হয়ে যাবে। যুদ্ধের কষাঘাত মানুষের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ তৈরি করে দেয়, যুদ্ধের ফল নিয়েও স্পষ্ট ধারণা ছিল না যুদ্ধ জয়ী ও পরাজিত মানুষগুলোর কাছে। আবদুল কুদ্দুস ও সরোজ দুজনেই শিক্ষিত, রাজনীতি সচেতন মানুষ তাদের কাছে বাংলাদেশের জন্ম যখন নিশ্চিত হয়ে উঠেছিল তখন তাদের ভাবনা—

> বাংলার প্রত্যেকটি সচেতন মানুষের কাছে খুব ক্ষীণভাবে হলেও এই প্রশ্ন উঠেছিল যে দুই খণ্ডে খণ্ডিত বাঙালি জাতি, তাহলে পৃথকভাবে বিকশিত হবে। তার শিক্ষা, সংস্কৃতির রূপও ভবিষ্যতে কি পৃথক হবে? যদি হয়, কীরকম হবে? যদি না হয় বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বিকাশের যে-গতিমুখ, উদ্যোগ বা আন্তর্জাতিক গুরুত্ব পাবে, পশ্চিমবঙ্গে সেসব তো কখোনই সম্ভব নয়।[১২২]

সরোজ ও আবদুল কুদ্দুস এই দুটি মানুষের রাজনৈতিক বিশ্বাসে আদর্শগত বিরোধ থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের খণ্ডিত অবস্থা মানতে পারেনি। পরবর্তীকালে আবদুল কুদ্দুস দুই বাংলার এক হয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু হায় মুক্তিযুদ্ধ, চক্রান্ত যার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। সরোজ আবদুল কুদ্দুসকে নিয়ে কলকাতায় বাংলাদেশ হাই কমিশনে গিয়ে দেখেছিল প্রচুর বিখ্যাত শিল্পী সাহিত্যিক সেখানে আনাগোনা করছে, তাদের উচ্ছ্বাস চোখে পড়ার মতো। এদের সম্পর্কে কুদ্দুস বলেছিল—

> বেশির ভাগই ধান্দাবাজ, সময় থাকতে কেটে পড়ে কলকাতায় এসে মাতব্বর হয়ে বসেছে। তুমি ভেব না এরা সব বাংলাদেশপন্থী। আওয়ামি লিগের কয়েকজন সাংসদকে আমি চিনি তাদের বেশির ভাগই পাকিস্তানীদের পক্ষে। এখানে এসেও চুপ করে নেই, নানারকম চক্রান্তের চেষ্টা করে যাচ্ছে। কেউ কেউ বিভিন্ন জায়গা থেকে ভালো পয়সাও পাচ্ছে।[১২৩]

উত্তপ্ত সময়েও যারা নিজেদের গুছিয়ে নেওয়ার তারা নিয়েছিল। কিন্তু রোজি পারভেজ, সতী, হেনা, আবদুল কুদ্দুস কিংবা রুমেলার মতো মানুষেরা স্রোতের খড়কুটোর মতো ভেসেই চলেছিল। অথচ তারা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিয়ে বাঁচতে পারত, কিন্তু তা হয়নি। বেতারে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব যখন ঘোষণা হল তখন বোমা, গুলি কামানের শব্দে মৃগীর রোগী হেনার ফিট হয়ে মারা যাওয়া দেহটা থেকে কবরের মধ্যে মাংস খসতে শুরু করেছিল। কলকাতার হাসপাতালে প্রস্টেটের ব্যর্থ অপারেশনের পর ক্যান্সারে মারা যাবার আগে কয়েক ঘণ্টার জন্য জ্ঞান ছিল সতী ও হেনার বাবা আলমগীর মনসুরের। এখন নিখোঁজ সে, বেঁচে আছে কিনা সে খবর কেউ জানত না। এমন হাজার হাজার ঘটনা ও পরিণতির বিনিময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এসেছিল—

> নতুন বছরের পাঁচ তারিখে অন্য অসংখ্য মানুষের সঙ্গে সতী এবং তার মা রুমেলা তাদের মুক্ত স্বদেশের পথে যাত্রা করল। সেখানে তাদের জন্য আর কোন কোন দুঃখ, আর কী অনিশ্চয়তা অপেক্ষা করে আছে, তা তারা জানে না। এই মুহূর্তে জানতেও চায় না। তবুও সেই প্রাচীন সময় থেকে মানুষ জানে যে, বন্ধ বাক্সের মধ্যে আশা শেষ পর্যন্ত থাকেই, সেই আশাই পাথেয় হয়। তারা আশা করে নতুন স্বাধীন দেশ তাদের সমস্ত অভাব এবং শোক পুষিয়ে দেবে।[১২৪]

স্বদেশে কী পেয়েছিল বা স্বদেশ তাদের কী দিতে পেরেছিল তা দেখার থেকে উপলব্ধি করার দায় বেশি। তবে স্বাধীনতার বিনিময় মূল্য অনেকটাই দিতে হয়েছে সতী, হেনা ও রোজি, আলমগীর মনসুরদের। অভিজিৎ সেন মুক্তিবাহিনী, পাকিস্তান, সেনা, স্বাধীন বাংলাদেশের দাবি এসবের মধ্যে ভারতে চলে আসা একটি পরিবারের বিশেষ করে মুক্তিবাহিনীতে কিছু সময় থাকা মেয়েদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা বলেছেন। এছাড়াও আবদুল কুদ্দুস ও সরোজের মধ্যে দিয়ে কমিউনিস্টদের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করেছেন। আবদুল কুদ্দুস ও সতী হেনাদের স্বাধীন বাংলাদেশ কী দিল তার মূল্যায়ন লেখক করেছেন তাতে শুধু অপচয় দেখেছেন তিনি, প্রাপ্তি কম।

খ। *নক্ষত্র নদী ও নারী*

'হতভাগী কাঞ্চনমালা বাংলাদেশ যুদ্ধের অসংখ্য বলির মধ্যে একটি অনুপম চরিত্র', অভিজিৎ সেন তাঁর এই কাঞ্চনমালাকে নিয়ে ২০০৯ সালে খুব ছোটো আকারে *কাঞ্চনমালা* উপন্যাসটি লিখেছিলেন *আজকাল* শারদ সংখ্যায়। গ্রন্থাকারে *নক্ষত্র নদী ও নারী* (২০১৫) নাম হয়ে, উপন্যাসটির কলেবর বৃদ্ধি হয়েছিল তাতে কাঞ্চনমালার হতভাগী রূপ আরও প্রকট হয়েছে। অনেক বন্ধুর পথ অতিক্রম করে কাঞ্চনমালা মুক্তিযুদ্ধের সময় এদেশে এসেছিল। পথে প্রান্তরে নির্যাতিত হয়েছে, একজন ছিন্নমূল মানুষের যাবতীয় কষ্টের সঙ্গে স্থায়ী জীবনেও অশেষ লাঞ্ছনা তাকে সাহসী ও জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞ করে তুলেছিল। এদেশে আসার পথ থেকে তার লাঞ্ছনার শুরু, যা থেমে থাকেনি কোনোদিন। সারাজীবনে তার অভিজ্ঞতায় সে শুধু অসহায় ও হতভাগী।

'যুদ্ধ মানুষকে পিশাচ বানায়। যুদ্ধের মহত্ত্ব বা বীরত্ব বলে কিছু নেই।' একথা কাঞ্চনমালা তার তের-চোদ্দ বছর বয়সে জেনে গিয়েছিল। একাত্তরের স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার যুদ্ধে অনেকের মতো গ্রাম ছাড়া হয়েছিল কাঞ্চনমালা। দলে দলে সীমান্তের দিকে মানুষ এগিয়ে যেত, দিনে পথ চলত রাতে লুকিয়ে থাকত। ভারত সীমান্তে এসে রেহাই পাবে এই বিশ্বাস তাদের ছিল। বৃদ্ধ বাবা-মাকে কাঁধের বাঁকের একদিকে, অন্যদিকে কিছু জিনিসপত্র, এভাবে দিনের পর দিন পথ চলা মানুষগুলোর চেহারা হয়েছিল খুনির মতো। কাঞ্চনমালাও একটি দলে সীমান্তের দিকে এগিয়ে আসছিল, কাঞ্চনমালা যে দলে ছিল তাদের কখনো জলে পানার নীচে নাক জাগিয়ে শরীর ডুবিয়ে আবার ধানখেতে আত্মগোপন করতে হয়েছিল রাজাকর, আলবদর, পাকিস্তানের মিলিটারির ভয়ে। যে ফকির হিন্দু বাড়িতে কোনোদিন ভিক্ষা চায়নি, যে মোল্লা গোছের লোকটি আজীবন ভারত বিদ্বেষী ছিল তারাই পরিত্রাণ পেতে ভারতে আসতে চেয়ে দলপতিকে জিজ্ঞাসা করেছিল 'ইনডিয়া' আর কতদূরে। একটি পরিত্যক্ত স্কুলে আশ্রয় নিয়ে জল ও খাবারের খোঁজে বাড়ি খুঁজত, সেই বাড়ি কোনো হিন্দুর হলেও অসুবিধা নেই। একরাতের স্বস্তি ও সুদিনের সম্ভাবনা তাদের সাহস দিয়েছে তাই সেই ফকির ও মোল্লাকে নিয়ে রসিকতাও করেছে এই ভারতপথগামী দলটি। কিন্তু এই দলটির স্বস্তি বেশিক্ষণ থাকেনি, ভোরের আগেই তাদের সামনে এসে হাজির হয়েছিল সশস্ত্র এক বাহিনী। 'ক্ষুধার্ত, জিঘাংসাপীড়িত, কামতাড়িত নেকড়ের মতো' এই সশস্ত্র বাহিনী আগত দল থেকে নারী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলমান আলাদা করেছিল বেছে

বেছে, ভীত আশাহত মানুষগুলো কিছুই বুঝতে পারছিল না এসবের অর্থ। শেয়ালে যেমন ছাগলের কান কামড়ে জঙ্গলে নিয়ে যায় সেভাবে নারীদের অর্থাৎ যে দলে যুবতী, বালিকা, শিশু ছিল তাদের স্কুল বাড়ির ভিতরে নিয়ে গিয়েছিল। মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল—

> যাও, মুসলমানের বাচ্চারা, পাকিস্তানে যাও। তোমাদের জানমালের দায়িত্ব হামাহোরের। তোমরা আল্লার বান্দা, যে যার নিজের নিজের গেরামেত্ ফিরে যাও।[১২৫]

হিন্দুদের দলটাকে অস্ত্রধারীরা বলেছিল—

> চলো, তোমাহরে হিন্দুস্থানে রাখি আসি। হিন্দুস্থানে তোমাহরের তংকে ভালো ভালো খাবার, দালান কোঠা সাজায়ে রাখিছে। ভালো থাকবা, ভালো খাবা। মোছলমানের দ্যাশে থাকপা ক্যান?[১২৬]

অস্ত্রধারী মানুষগুলোর অভিপ্রায় বুঝে যারা দৌড়ে পালাতে চেয়েছিল তাদের মধ্যে কয়েকজন বেঁচে থাকল বাকিরা গুলি খেয়ে মরেছিল। বছরখানেক ধরে হত্যাযজ্ঞ চালানো এই সশস্ত্র দলটি ধাওয়া করেনি কাউকে বরং তাদের উৎসাহ বন্দি স্ত্রীলোকদের প্রতি বেশি। এই নাটকীয় ঘটনা একাত্তরের ভয়াবহ দিনগুলিতে অবাক করার মতো ছিল না।

ঊনসত্তর সালের পর থেকে ছাত্র আন্দোলন, শাসক গোষ্ঠীর চক্রান্ত, সন্ত্রাস তারপর স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য মুক্তিযুদ্ধ পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানকে তছনছ করেছে। দু-দশক আগে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের স্মৃতি কাঞ্চনমালার নেই তবে মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্ মুহূর্তের উত্তাপ কাঞ্চনমালার দেখা হয়েছিল। ‘ইসলামি মৌলবাদীদের সঙ্গে বাস্তববাদী বাঙালি জাতীয়তাবাদের দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তির হেতু’ অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের ফলে কাঞ্চনমালা এতদিন খুন ধর্ষণের যে সব ঘটনা শুনে এসেছিল এবার নিজেও সেই ঘটনার মধ্যে পড়ল। আসলে যুদ্ধে সবথেকে বেশি আক্রান্ত, ধর্ষিত, নিহত স্ত্রীলোক ও শিশুরা হয়। অন্য মেয়েদের সঙ্গে কাঞ্চনমালাও বন্দি হয়েছিল। সাবির তালুকদার নামের এক রাজাকর কাঞ্চনমালাকে পছন্দ করে, অন্য কেউ হাত দেবার আগে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। লোকটি কাঞ্চনমালাকে বিবি বলে ডেকে খুব যত্ন সহকারে মাংস ভাত খাইয়েছিল, সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করার প্রস্তাবও দিয়েছিল। তবে বয়ঃসন্ধির কাঞ্চনমালার বুঝতে অসুবিধা হয়নি এই লোকটির মতলব। লাউডগার মতো বেড়ে ওঠা কঞ্চনমালার প্রতি কামনায় কাতর ছিল সাবির, সেই কাতরতায়

সে তৃতীয় বিয়ে করতেও রাজি। সাবির নিজের বৃহৎ হাত দুখানা নিজের সামনে মেলে ধরে দেখেছে, যে হাতকে সে খুব ভালোবাসত। সেই সবল পাশবিক হাত দিয়ে সে ছিনিয়ে নিত, আঘাত করত, যা ইচ্ছে তাই করত। সেই হাত দিয়ে ঘুমন্ত কাঞ্চনমালার জামার হুক খুলেছে। ঘুম ভেঙে সচেতন হয়ে কাঞ্চনমালা সাবির তালুকদারের থেকে রেহাইয়ের কল্পনা করতে থাকে, যে বাড়িতে তাকে আটকে রাখা হয়েছিল সেটা কোনো হিন্দুর বাড়ি এটা বোঝার বয়স কাঞ্চনমালার হয়েছিল। বাড়ির নানা উপকরণ পোশাক দেখে কাঞ্চনমালা বুঝেছিল এই বাড়িতে কারো সদ্য বিয়ে হয়েছে। যে শাড়ি, শায়া, ব্লাউজ ব্যবহারের জন্য কাঞ্চনমালা নিয়েছিল সেগুলো দেখে তার মনে হয়েছে 'কার জামা-কাপড়... সে হতভাগীই-বা এখন কী অবস্থায় আছে, কোথায় আছে কে জানে।' কাঞ্চনমালা পালানোর ব্যবস্থা এত তাড়াতাড়ি করেনি, লুঠ করে আনলেও সাবির এখনো তার সঙ্গে তেমন ব্যবহার করেনি বরং তার সুবিধা অসুবিধার দিকে নজর রেখেছিল। তাই এখনি পালিয়ে যাওয়ার মতো বোকামি সে করল না। সাবির তালুকদার এই যুদ্ধ শেষ হলে দেউনিয়া, ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান হবে। কাঞ্চনমালাকে পাটরানি করে রাখতে চেয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ও দাঙ্গার কবলে পড়া নারীর থেকে কাঞ্চনমালার ভাগ্য বোধ হয় একটু ভালো। সাবিরের সেবা পাওয়া, পাটরানির প্রস্তাব, হোক না বাপের বয়সী তবু বেঁচে তো থাকবে কাঞ্চনমালা।

সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ ও হত্যা করার পিছনে একটা উদ্দেশ্য থাকে। তাদের কর্মকান্ড মানুষ যেমন মেনে নেয় না আবার তাদের কর্মকান্ডের যে নির্দিষ্ট কারণ আছে সেটাও অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু পাকিস্তানিদের এই নির্বিচার মুক্তিবাহিনী হত্যা ও ধর্ষণের নির্দিষ্ট কোনো কারণ সবসময় ছিল না। হত্যার নেশায় মেতে উঠেছিল পাকিস্তানি সেনারা। মুক্তিবাহিনীদের কোনো প্রতিবাদ দেখলেই গুলি চালিয়ে, পুড়িয়ে মারতে দ্বিধা করত না পাকিস্তানীরা। 'মৃত অক্ষরের অধীনও সে আর থাকছে না, সেই শাস্ত্রের বিধি নির্দেশও সে আর মানছে না।' বাংলাদেশের অস্তিত্ব সর্বশক্তি দিয়ে আটকাতে গিয়ে কয়েক কোটি মানুষের দুঃখ দুর্দশা, মেয়ে ও শিশুর উপর অত্যাচার, কয়েক লক্ষ মানুষের খুন করেছিল পাকিস্তানিরা—

> বাংলাদেশের ওপরে যে বাছবিচারহীন হত্যা ও ধ্বংস সংগঠিত হয়েছিল, তার সঙ্গে একমাত্র হিটলারের হত্যা-ক্যাম্পের তুলনা করা যায়।[১২৭]

এসবের গ্রাসে কাঞ্চনমালার গ্রামটাও একদিন চলে গেল। সশস্ত্র সৈনিকদের সঙ্গে গুণ্ডা বদমায়েশ এবং পাকিস্তানপন্থী কিছু মানুষের আনাগোনা বাড়ে। সাবিরের অধীনে বন্দি থেকে কাঞ্চনমালার মনে পড়েছিল গ্রামের দত্তবাড়ির পদ্মালক্ষ্মীর বন্দি দশার কাহিনি। পালিয়ে আসার পথে মুক্তি বাহিনীর সঙ্গে দেখা তাদের স্বপ্নের স্বাধীন বাংলাদেশের কথা, পথের সমস্ত সাবধানতা, তার সঙ্গীদের কথা বাবা-মায়ের কথা, যে মেয়েটির পোশাক পরে আছে সেই মেয়েটির কথা তার চিন্তায় এসেছে। একসময় সাবিরের হাত থেকে মুক্তির বাসনা প্রবল হয়ে উঠেছিল। সাবিরকে আঘাত করে পালিয়ে আসার চেষ্টা করেছে। তার আগে মুক্তিবাহিনীর হাতে কোনোরকমে প্রাণ বাঁচিয়ে চলে আসা সাবিরের কাছে কাঞ্চনমালার এই আঘাত যতটা জোরালো ছিল সাবিরের ক্রোধ আরও জোরালো হয়েছে। ফলে সে তার আসল রূপ পরিগ্রহ করে, কাঞ্চনমালাকে বীভৎসভাবে ধর্ষণ করেছে। 'মায়ামানুষ হওয়ার জন্য অতিরিক্ত মাশুল' দিয়েছে কাঞ্চনমালা। মুক্তিরা কাঞ্চনমালাকে অন্য কয়েকজন মেয়ের সঙ্গে উদ্ধার করে এবং সাবির তালুকদার ও তার সঙ্গীকে খুন করে। সাবির তালুকদারের মতো মানুষগুলো গ্রাম দখল করে এভাবে অত্যাচার চালিয়ে যেত। পালটা দিতে মুক্তবাহিনীও সংগঠন স্থাপন করেছিল। স্কুল বাড়ি থেকে উদ্ধার করে মেয়েদের মালদা হাসপাতালে ভর্তি করেছিল মুক্তিবাহিনী। হাসপাতালে ডাক্তারদের পা ফেলার জায়গা ছিল না, লক্ষ লক্ষ ওপাড়ের মানুষের ভিড়ে। ইয়াসিন বুলবুল নামের মুক্তিবাহিনীর ছেলেটি কাঞ্চনমালার পাশে বসে অভয় দিয়ে বলেছিল, তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠো স্বাধীন বাংলাদেশে যেতে হবে। কাঞ্চনমালা সুস্থ হয়েছিল তবে স্বাধীন বাংলাদেশে যেতে পারেনি। স্বাধীন বাংলাদেশ দেখার আগেই ইয়াসিন বুলবুলও শহীদ হয়েছিল। মালদা শহরেই জীবনসংগ্রাম শুরু করেছিল কাঞ্চনমালা ও তার মা সুখী।

মুক্তিযুদ্ধ কাঞ্চনমালা ও সুখীকে দিয়ে গেছে সারাজীবনের না ভোলার মতো অভিজ্ঞতা। জীবনের এই পর্বটাকে না ভুলে গেলেও বেশি গুরুত্ব দিতে না করেছিল মুক্তিবাহিনীর এক মহিলা। কাঞ্চনমালা ও সুখী বেঁচে ছিল, এটাই আশ্চর্যের তবে সেই পর্বটাকে গুরুত্ব না দিলেও, সেই পর্ব তাদের যে ভবিষ্যৎ দিয়েছে তাকেও গুরুত্ব দিতে গিয়ে হিমশিম খেয়েছে কাঞ্চনমালা। বাংলাদেশের জন্ম, যুদ্ধ, বাবার খুন, কাঞ্চনমালার লুঠ হয়ে যাওয়া এসবের পরেও জীবন ধীরে ধীরে জোড়া লেগেছিল। তবুও কাঞ্চনমালার সামনে এক অদৃশ্য প্রতিপক্ষ সারাজীবন দাঁড়িয়ে রইল যাকে প্রতিহত করতে পারেনি কাঞ্চনমালা

কোনোদিন। তার বাকি জীবন সেই অদৃশ্য প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করে কেটেছে। নিজের কম বয়সী কন্যাকে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারেনি, স্বামীকে বেঁধে রাখতে পারেনি সংসারে, নানান কামুক লোক ও পুলিশের প্রলোভনের শিকার হতে হয়েছে। কাঞ্চনমালার অদৃষ্টে যন্ত্রণা লিপিবদ্ধ হয়েছিল তাকে চেষ্টা করেও মুছতে পারেনি সে। কন্যার সম্মানের জন্য যে লোকটিকে খুন করেছে তার শাস্তি সে নিজেই পেতে চেয়েছিল। স্বামী নিরুদ্দেশ হবার পর ব্যাংক কর্মচারী অমৃতর সঙ্গে সম্পর্ক আসলে তার শারীরিক ক্ষেদ মেটানো। একটা ভালোবাসার আশ্রয় এবং মেয়ের জন্য একজন অবিভাবকের বিশেষ প্রয়োজনে। এসবের পরেও একাত্তরের যুদ্ধ কাঞ্চনমালার মতো মেয়েদের জীবনে যে অভিশাপ এনেছিল তাকেই বয়ে বেড়াতে হবে সারাজীবন।

গ। *সমসাময়িক*

সমসাময়িক (২০১২) উপন্যাসে আধুনিক রাজনীতির বিষবাষ্প কীভাবে মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতি ও মানবিক সম্পর্ককে দূষিত করেছে তা দেখিয়েছিলেন অভিজিৎ সেন। এর সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষিতও উঠে এসেছে। উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্রগুলো বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় এদেশে চলে এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু তাদের বর্তমান পরিস্থিতিতেও অতীতের দিনগুলোকে সামনে দেখেছে বারম্বার। শেকড়ছেঁড়ার যন্ত্রণা আনন্দে ও দুঃখে উপলব্ধি করে এবং করবে সেই মানুষগুলো, যাদের খুব কম সময়ে সমূলে উৎপাটন হয়ে অন্য একটি দেশের মাটিতে স্থায়ী হবার সংগ্রাম করতে হয়েছিল।

এম.এল.এ শিবুর খুন দিয়ে উপন্যাসের শুরু। তার মামা সদানন্দ স্মরণ করেছে তার নিজের এবং শিবুর বাবা-মায়ের এই দেশে আসার মুহূর্তগুলো। *হলুদ রঙের সূর্য* উপন্যাসের সহদেবের মতো রাসুর ছিল নেতৃত্ব দেবার মতো সাহস ও বুদ্ধি। আত্মত্যাগ করার মতো বুকের পাটাও ছিল। সেও সহদেবের মতো এই দেশে এসে তার পরিজনদের জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছিল, যদিও সে এসেছে দাঙ্গার পরে। এদেশে এসেই শাসক দল কংগ্রেসের উল্লেখযোগ্য নেতা হয়েছিল রাসু। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে তার মতো উদ্বাস্তুদের মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিয়েছিল। সদানন্দও একজন শরণার্থী, তার জন্য রাসুর কাছে ছুটে গিয়েছিল তার দূর সম্পর্কের দিদি অর্থাৎ শিবুর মা কুন্তি 'ও রাসুদাদা, ও রাসুদাদা, আমার ভাইডারে একখান ঘর তোলার মাটি দেন।' তারপর সদানন্দের চার কাঠার

একটা প্লট হয়েছিল। কুন্তি নিজের জন্য রাসুর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ‘ঘর করার জন্য একটুকরো জমি চাই আমাদের’ কুন্তিও জমি পেয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ফলে এইসব মানুষগুলো শুধু জমি হারায়নি, হারিয়েছে তাদের পরিজনদের। সদানন্দ পূর্ব পাকিস্তান থেকে স্কুল ফাইনাল পাশ করেছিল, সদানন্দর বাবা যুদ্ধের সময় তাকে এদেশে পাঠিয়ে দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়ে শহীদ হয়েছে, তার চল্লিশ বছর বয়সের মা হারিয়ে গিয়েছিল সেদিনের অনেক মা বোনের মতোই। মেয়েদের হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে প্রধান একটি বিষয় বয়স, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সময় বয়সটা অত গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এদেশে এসে উদ্বাস্তু কুন্তির কাছেই আশ্রয় পেয়েছিল সদানন্দ। খান সেনাদের তাড়া খেয়ে, ধর্ষিত হয়ে যারা এদেশে এসেছিল তাদের অধিকাংশ আর ফিরে যায়নি। স্বাধীন বাংলাদেশে তাদের পুরুষরা গিয়েছিল ওদেশে যা ছিল বিক্রি করতে। উদ্বাস্তুদের বাস করার জায়গা পেতে হুড়োহুড়ি শুরু হয়েছিল, সরকার তাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছে। তবুও মানুষগুলোকে নতুন করে লড়াই করতে হয়েছে একেবারে গোড়া থেকে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে। ওদেশের অনেকের মতোই রাতারাতি আর্থিক স্বচ্ছলতা উবে গিয়েছিল জগন্নাথের। তার গঞ্জের দোকান ভাঙচুর হয়েছে। এদেশে আসার পর তাকে রুগ্ন, নেশাতুর জীবন কাটিয়ে কম বয়সেই মরতে হয়েছে। দেশভাগ, যুদ্ধ, দাঙ্গা মানুষের নানারকম ক্ষতি করেছে, সমাজের শৃঙ্খলা নষ্ট করেছে, মানুষকে হতাশায় আরও অমানুষ হতে বাধ্য করেছে। আবার লড়তে শিখিয়েছে, তাই কুন্তি তার সামান্য শিক্ষাটা কাজে লাগিয়ে বেঁচেছিল।

স্বপ্ন এবং অন্যান্য নীলিমা এবং *নক্ষত্র নদী ও নারী* উপন্যাসের প্রেক্ষিত ও মুল চরিত্রগুলো পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা মানুষদের নিয়ে। অভিজিৎ সেনের অন্যান্য উপন্যাসের অসংখ্য চরিত্র মুক্তিযুদ্ধের সময় পূর্বপাকিস্তান থেকে আসা মানুষের মধ্য থেকে উঠে এসেছে। তাদের সমস্যাগুলো ভিন্ন, তাদের চাহিদাও ভিন্ন। *হলুদ রঙের সূর্য* উপন্যাসের সহদেব বিশ্বাস ও তার গোষ্ঠী ভারতে এসে তাদের বাসের জমি খুঁজে সেই জমি টিকিয়ে রাখার লড়াই করে জীবন অতিবাহিত করেছে। *মেঘের নদী* (২০০৫) উপন্যাসের মহিম, *সবুজ শ্যাওলা ঢাকা জল* (২০০৯) উপন্যাসের অদিতি দেশভাগের সময় এদেশে চলে আসে। *সমসাময়িক* উপন্যাসের চরিত্রগুলো দাঙ্গা ও মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে এসে বাঁচার সংগ্রাম করেছে।

৫। সাম্প্রদায়িকতা ও দাঙ্গা

সাম্প্রদায়িকতা বা সম্প্রদায়গত স্বার্থের ফলেই মানুষ সংহতি ভুলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় লিপ্ত হয়। অনেক সময় মানুষ নিজেকে অসাম্প্রদায়িক ও সম্প্রদায় বিশেষে সমান মনোভাবাপন্ন প্রচার করলেও অন্তরে সাম্প্রদায়িকতা পোষণ করে, সুযোগ পেলেই সেই সত্তা বেরিয়ে আসে। ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ইতিহাস ধারাবাহিক। দেশের স্বাধীনতাকাল থেকে আজ পর্যন্ত শান্তি ও সম্প্রীতির বাণী শুনিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ করা যায়নি। একদিকে সম্প্রীতির বার্তা প্রচারিত হলে অন্যদিকে প্ররোচনার বার্তাও তাল মিলিয়েছে। তাইতো একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকেও দাঙ্গা হয়েছে। ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার অনিবার্য পরিণাম দেশভাগ, তারপরেও মানুষ দাঙ্গা প্রবণতা জিইয়ে রেখেছে। মানুষের স্পর্শকাতর জায়গা ধর্ম তাই এই জায়গাতে উস্কানি দিলেই মানুষ রক্তপিপাসু হয়ে ওঠে, এরই অনিবার্য পরিণতি দাঙ্গা। তবে সাম্প্রদায়িক মানুষ মাত্রই দাঙ্গাবাজ নয়, কিন্তু সম্প্রদায়গত বিভেদের বোধ যখনই আসবে মানুষ পাশবিক হয়ে পড়বে। অভিজিৎ সেন মনে করেন ‘একজন দাঙ্গাবিরোধী সবসময়ই একজন সুপ্ত বা সম্ভাব্য দাঙ্গাবাজ।’ তিনি *আঁধার মহিষ* ও *স্বপ্ন এবং অন্যান্য নীলিমা* উপন্যাসে দেখিয়েছেন সাম্প্রদায়িকতা মানুষ কীভাবে পোষণ করে এবং তা থেকেই কিভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রূপ পায়।

ক। *আঁধার মহিষ*

অভিজিৎ সেন *আঁধার মহিষ* উপন্যাসে শুধু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার চিত্র ও ক্ষয়ক্ষতি দেখাননি। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের নিজ ও পরধর্ম সম্পর্কে ভাবনাগুলো ব্যক্ত করেছেন শিক্ষিত-অশিক্ষিত পরিবেশে সর্বোপরি সংসারে। যেভাবে ‘কাক’, ‘কলাপাতা’ গল্পে দেখিয়েছিলেন। *আঁধার মহিষ* উপন্যাসে দুটি আলাদা ধর্মের মানুষ কামাল-অলকানন্দার দাম্পত্য জীবনে সম্ভাব্য সমস্যা যুক্তি বিচারে তাদের নিজেদের এবং তাদের চারপাশের মানুষের ভাবনা উঠে এসেছে। মুসলমান কামাল ও হিন্দু অলকানন্দার এই বিবাহ তার চারপাশের মানুষের মধ্যে শুধু বিস্ময় নয়, গর্হিত অপরাধ। কিশোর রফিকুল থেকে অধ্যাপক সুভদ্র কারো কাছেই এই সম্পর্ক স্বাভাবিক ছিল না যেন। সুভদ্রর ভগ্নিপতি কামাল বাধ্য হয়েছিল এই সম্পর্ক গোপন রাখতে। আপাতভাবে ভাবনাগুলো উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের কাছের বিস্ময়ের কিন্তু পীরের শরগাছে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় ত্যানা বাঁধে, মুসলমানের মানত করা গোস্ত ভাত হিন্দুরাও খায়, হিন্দুরাও পীরের কাছে দই চিড়ে মানত

করে এসব ব্যাপার মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। কামাল-অলকানন্দার বিয়ে হয়েছে কিন্তু অলকানন্দার ধর্মান্তকরণ এখনো হয়নি এই নিয়ে গ্রামের তাবলিগ জামাত সভা করেছে। এভাবে কাফেরের সঙ্গে সহবাস করলে সমাজ উচ্ছন্নে যাবে। কামাল এসব মানত না, সে যুক্তিবাদী তাই তাকে নিজের ধর্মের কাছেও কৈফিয়ৎ দিতে হবে। শিক্ষা দিয়েও পরিত্রাণ নেই গ্রন্থকেন্দ্রিক ধর্ম থেকে। রফিকুল জানিয়েছিল তারা গ্রামে একঘরে কারণ তারা স্কুলে যায় তাবলিগে যায় না। কিন্তু শিক্ষার সঙ্গে গোঁড়ামির তফাৎ করা মুশকিল, সুভদ্র বলেছিল—

> বহু ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী আছে দেখবে, বেশ গোঁড়া তারা। হালের বৈশিষ্ট্য বোধ হয় এই যে স্কুল-কলেজে শিক্ষিত মানুষই বেশি গোঁড়া।[১২৮]

রফিকুলের পরিবার যেভাবে গোঁড়ামি ও রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে লড়েছিল সেভাবে কামাল অলকানন্দাকেও নিজেদের অবস্থানে লড়তে হয়েছে। গোঁড়ামি মানুষের রক্তে মিশে থাকে, অধ্যাপক অমৃতলাল পায়েসে একটু নুন মিশিয়ে খেয়ে শুনেছিল দুধে নুন গোরক্ত ও পায়েসে নুন গোমাংসের সমান এটুকু শুনেই বমি করেছে। আবার পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের হাতে দশখানা আংটি। সুভদ্রর পিসেমশায় বলত 'শ্যাখের সঙ্গে দোস্তি,/ল্যাজা রাখবা মধ্যস্তি। যদি শ্যাখ রোখে, ল্যাজা মারবা কোখে!' বাঙালির লুঙ্গি পড়া, জলকে পানি, কথায় কথায় জি বলা পিসেমশাইয়ের পছন্দ হত না। সুভদ্র প্রতিবাদ করেও বিশেষ কিছু করতে পারেনি। আসলে বিধর্মীর প্রতি বিদ্বেষ মনে থাকলে, তাদের রুচি বিদ্বেষীদের কাছে অরুচি এটা হিন্দু-মুসলমান উভয়ের ক্ষেত্রেই সমান। এক্ষেত্রে যুক্তি, বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের ধার ধারে না কেউই।

অভিজিৎ সেনের *আঁধার মহিষ* যখন প্রকাশ পেয়েছিল তার দু-মাস পরেই বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয়েছে। অর্থাৎ সেই সময়ের সামাজিক স্থিতি সহজেই আন্দাজ করা যায়। এই উপন্যাসের সময় সেই সময়টাই যখন বাবরি মসজিদ ধ্বংসের একটা পরিকল্পনা তৈরি হয়েছিল আর হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা হিংসার বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল—

> তখন রামজন্মভূমি-বাবরি মসজিদ খবরের পাগজের পাতা ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষেরও চিন্তাজগতে উঁকি মারতে শুরু করেছে। পিরগঞ্জেও এর ব্যতিক্রম হয় না। পিরগঞ্জ-জিনিহারে জামাত এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এই উভয় পক্ষের লোকজন যাতায়াত করতে থাকে।[১২৯]

এই উপন্যাসের পটভূমি পীরগঞ্জ নামের জায়গাটিতেও প্রভাব পড়েছে। রামজন্মভূমি ফিরে পেতে মানুষের মধ্যে জেদ তৈরি হয়েছিল। অন্যদিকে মুসলমান তাদের এই ধর্মস্থান বাবরি

মসজিদ ধরে রাখতে চেয়েছে। তাবলিগে আলোচিত হত মুসলমান কীভাবে সরকারি সুযোগ, চাকরি, এমনকি নিজের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে সংখ্যাগুরুর অত্যাচারে। তারাও নিরাপদ সংরক্ষণের সঙ্গে ধর্ম ও ব্যক্তিগত আইন নিরাপদে রাখতে চেয়েছে। পীরগঞ্জের এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনকে মহরমের আগেই প্রস্তুতি নিতে হয়েছে যাতে কোনো দাঙ্গা না বাঁধে। তাদের সাবধানতায় অন্যান্য কাজের সঙ্গে উঠে এসেছে কামাল ও অলকানন্দার প্রসঙ্গ। অলকানন্দা শিক্ষক পদের জন্য যে ইন্টারভিউ দিতে যায় তাতেই কামালের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা শুনে ইন্টারভিউ বোর্ড নড়েচড়ে বসেছিল। যেন এই দুটি নারী-পুরুষ বিধর্মে বিয়ে করে গর্হিত অপরাধ করেছে এমনই শারীরিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়া সকলের। প্রতিটা দাঙ্গার শুরুর একটি বিশেষ উপাদান হল গুজব, কোনো মসজিদে হিন্দু মন্দিরের কোনো নিদর্শন পাওয়া গেছে, কোনো হিন্দু শিশুর পেচ্ছাপ মুসলমানের গায়ে লাগাতে সেই মুসলমান লোকটি শিশুটিকে দুপা ধরে ছিঁড়ে ফেলেছে, প্রতিমার গায়ে কোনো মুসলমান নাকি পেচ্ছাপ করেছে এমন নানা গুজব। মুসলমানরাও নানা গুজব ছড়িয়ে একটা হিংসার পরিবেশ তৈরি করত। এসব গুজব ১৯৪৬ সালে এবং আজও লক্ষ লক্ষ মানুষকে উত্তেজিত করে আতঙ্কগ্রস্থ করে। কারণ—

> ধারণার উৎপত্তি যেখানে বিশ্বাস সেখানেই উৎপন্ন। এমনকি সন্দেহের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয় বিশ্বাসেরও গোড়াপত্তন। সন্দেহ বোধ হয় অবচেতনের সংরক্ষিত প্রকোষ্ঠে গিয়ে জমা হয়ে রয়েছে।[১৩০]

যেভাবে তাবলিগ জামাতে মুসলমানদের মধ্যে বঞ্চনার ক্যাসেট শোনানো হত তেমন ভাবেই কাশীর হিন্দু ব্রাহ্মণদের প্রচার পত্রে হিন্দু ধর্মের বিপন্নতার কথাও শোনানো হত। সীমান্ত অঞ্চলে দেশ বিরোধী, ধর্ম বিরোধী কাজকর্ম চলত, হিন্দু নারীদের মুসলমান কতৃক জোর করে বিয়ে, হিন্দু গ্রাম লুণ্ঠন, অযোধ্যায় রামের জন্মভূমি জোর করে দখল করে গোরক্তে কলুসিত করা এসব কথা প্রচার করে হিন্দুদের একত্রিত হবার ডাক দেওয়া হয়েছিল। ফলে একে অন্যের ধর্মের প্রতি বিদ্বেষী হয়েছে ক্রমশ, রক্তের উত্তাপও বেড়েছে। কাগজ বিলি করে একজন পণ্ডিত, মানুষকে বুঝিয়েছিল এটা নিজে পড়বে অন্যদের পড়াবে, অযোধ্যা মথুরা যবনদের হাত থেকে মুক্ত করতে হবে। পণ্ডিতের কাছাকাছি যে মানুষগুলো ছিল তারা ভেবেছিল, সত্যিই তো রামমন্দির তৈরি করা একান্ত প্রয়োজন। এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তার জন্য চাঁদা তুলেছিল। এই ঘটনার পর নৌকা থেকে রফিকুল পূর্ব দিকে তাকিয়ে দেখেছিল সন্ধ্যা

ঘনিয়ে এসেছে, এই সন্ধ্যার আঁধার মানুষের জীবনে নেমে এসেছিল, এখান থেকে আলোয় ফেরা খুব কঠিন।

আমজাদ হোসেন শিক্ষক, সে চেয়েছিল তার স্কুলে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক কোনো মুসলমান হোক। স্কুলের কতৃত্ব কোনো মুসলমানের হাতেই থাকুক। এই লড়াইয়ে সে কামালকে সঙ্গী করতে চেয়েছে, কারণ সে ভেবেছিল কামাল শিক্ষিত এবং ধর্মপ্রাণ। আমজাদ মনে করত কোরান হাদিসের নির্দেশিত পথে মানুষের উৎপত্তি। কিন্তু কামাল মনে করেছে মুসলমানের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক এমনকি ব্যক্তিগত জীবন কোরান হাদিস নির্দেশিত। যে কোরান পরিবর্তিত হয়েছে মানুষের প্রয়োজন মতো। তাই কোরান হাদিসের বিপজ্জনক মতবাদে সে আস্থাশীল নয়। আমজাদ হোসেন কামালের এইসব কথা শুনে আহত হয়েছিল। কামাল বলেছিল—

> আপনি দুঃখ পাচ্ছেন, কিন্তু মানেন না আপনিও। সেভাবে বিচার করলে কোনো মুসলমানই মানে না। আপনি যে হার্ট-ট্রাব্‌লের জন্য বুকে প্রেসমেকার বসিয়েছেন, তার কোনো বিধান কি হাদিস-নির্দেশিত চিকিৎসা বিধিতে আছে? আসলে মানা যে আর সম্ভব নয়, এটাই আমরা সবাই মানতে পারছি না।[১৩১]

একথা শোনার পর আমজাদ হোসেন নিজেকে আধুনিক প্রমাণ করতে চেয়েছে। সে যে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করেছে, ধর্মান্ধ নয়, বহুবিবাহ, মুসলিম ব্যক্তিগত আইন, তালাক, মৌলবিদের ফতোয়া এসব ইসলামকে কলুষিত করেছে, এসব ইসলামের শাস্ত্র বহির্ভূত আইন, ইসলামে অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষের স্থান নেই এসব কথা শুনিয়েছে। আসলে পৃথিবীর প্রতিটা ধর্মই যে পরধর্ম বিদ্বেষী, নিরপেক্ষ ও সহনশীল নয়, প্রত্যেকেই নিজের ধর্মের নিয়ম অমর করে রাখতে চায় এবং শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে অন্য ধর্মকে খাটো করে দেখে। ধর্ম যেহেতু দর্শন নয় তাই তর্ক চলে না হানাহানি কাটাকাটি চলে। হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের গতিও অনুরূপ। শরিয়তের যে নিয়মকে একশো কোটি মুসলমান মানতে বাধ্য তা কামাল মানেনি। একশো কোটি মুসলমানও অনেক নিয়মই মানে না, যেগুলোর উপযোগিতা আছে সেগুলোও মানে না। কামাল বলেছিল—

> আমি তো শুধু একটা গোঁড়ামিকে মানছি না। ...আমি সেই অর্থে মুসলমান নই কিংবা আমার স্ত্রী অলকানন্দা সেই অর্থে হিন্দু নয়। আমরা শুধু এই দুই সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করেছি। হিন্দু কিংবা

> মুসলমান কিংবা পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মই শুধু মানুষের আচরণ বা জীবনযাত্রার বিধি তৈরি করেনি। মানুষের শুভবুদ্ধি, যুক্তি এবং প্রাকৃতিক নিয়ম যুগ যুগ ধরে, বিশেষ করে গত তিন-চারশো বছর ধরে নতুন এক বিধান তৈরি করেছে।[১৩২]

যুগ যুগ ধরে যে বিধিবিধান চলেছে তাতে অনড় থাকতে চায়নি কামাল। অনেক হিন্দু মেয়ে মুসলমান বিয়ে করে ইসলাম গ্রহণ করেছে আবার অনেক মুসলমান মেয়ে হিন্দু ঘরে গিয়ে হিন্দু আচার-আচরণ বেশ ভালোভাবেই রপ্ত করেছে, এসবই তো বিদ্বেষী সমাজের ভয়ে। কামাল বা অলকানন্দা এসব চায়নি, তারা এই দুই অবস্থানের বাইরে থাকতে গিয়ে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের শত্রু হয়েছে তবু সমাজের কাছে মাথা নোয়ায়নি।

হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শুধু অশিক্ষিত নিচু শ্রেণির মানুষের মধ্যে একে অপরের প্রতি বিদ্রূপ-বিদ্বেষ ছিল না, শিক্ষিত উচ্চ সমাজের মানুষের কাছেও অন্যের ধর্মের রীতি-নীতি নানান ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ রসিকতার খোরাক ছিল। তবে এর সবটাই ছিল একটা বিশেষ মহলে কয়েকজন মানুষের তর্ক-বিতর্কের মধ্যে। প্রকাশ্যে করতে সাহস হত না, হিন্দু সংস্কৃতি নিয়ে যদি বা প্রকাশ্যে বলা যায় ইসলাম নিয়ে বলা খুব কঠিন, 'টিকি নিয়ে যতই টিটকিরি করুন, নুর নিয়ে কিন্তু নয়।' কামাল অলকানন্দাকে এতদিন একটি শিক্ষিত জগতের প্রশ্ন ও প্রস্তাবের মুখোমুখি হতে হয়েছিল, এবার একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়েছে যা কাঙ্ক্ষিত ছিল। কিন্তু কামালের মতো আত্মসম্মানযুক্ত মানুষের কাছে অপ্রত্যাশিতও ছিল। ইসকান্দার নামের এলাকার মস্তান লোকটি মহরমের চাঁদা চাইতে এসেছে, যে লোকটি আগে অলকানন্দাকে নানাভাবে বিরক্ত করেছিল। অনেক বেশি টাকা চাঁদা তারা দাবি করার কারণ গতবছরের দাঙ্গায় মুসলমানের যে ক্ষতি হয়েছে তা যাতে আর না হয় তার রক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা করা হবে তাতেই টাকা লাগবে। কামাল হিন্দুর ক্ষতির জন্য টাকা দেয়নি এবারেও দিতে নারাজ। ফলে ইসকান্দার অলকানন্দাকে জড়িয়ে কামালকে চরম অপমান করেছে। ইসকান্দার বলেছিল—

> বিবির কাছে বলেছেন তো চম্পাতলার বাসস্ট্যান্ডে সেদিন হিন্দুর বাচ্চারা কেমন আপ্যায়ন করেছে আপনাকে? এই ইসকান্দার হোসেন সেদিন ওখানে না-থাকলে বেইজ্জতের কিছু বাকি রাখত না ওইসব হারামির বাচ্চারা। হিন্দুরা আপনাকে আমাদের থেকেও বেশি ঘেন্না করে। বাঁচালে আমরাই বাঁচাব। আর শুনুন, ভালো কথা বলছি, বিবিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কলমা পড়াবেন মসজিদে গিয়ে।[১৩৩]

ইসকান্দাররা রক্ষা করবে, তবে এমনি নয়, তাদের কথা এবং ধর্মের রীতি মেনে চলতে হবে। না মানলেও শুধু রক্ষা করবে না তা নয়, শান্তিতে থাকতেও দেবে না। কামাল মাথা নোয়াবে না, এসবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়াই করার প্রস্তুতি নিয়েছে মনে মনে তবুও এই অপমান তার কাছে অপ্রত্যাশিতই। এদেশে তাদের দাম্পত্যজীবনের প্রাপ্য কী তা কামাল জানে, তারা বাড়িভাড়া, কাজের লোক, সম্মানজনক চাকরি কিছুই পাবে না। তার নিজের চাকরি তো দয়ায় পাওয়া। ইসকান্দার যা বলে গেল তা তো সত্যিই। 'ভারতীয় মুসলমানের এই অসহ একাকীত্বে তুমিই বা সাধ করে কেন এলে, অলকানন্দা?' সঙ্গীত, সিনেমা ও সাহিত্য জগতের কৃতিরা সম্মানের সঙ্গে বেঁচে আছে কিনা সে বিষয়েও কামাল আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল। যুক্তি বুদ্ধির আধার কামালকে এখানে একটু অসহায় লেগেছে শুধু অপমানিত নির্যাতিত হয়েছে বলে নয়, কোথাও তার যুক্তি বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়েছে। হতে পারে চম্পাতলার হিন্দুদের হাতে নির্যাতন বা ইসকান্দারের অপমান। কারণ অসহায় একাকীত্ব অবস্থার উপর নির্ভর করে যে কোনো মানুষই বুদ্ধিভ্রষ্ট হত। শুধু ভারতে হিন্দু, বাংলাদেশে মুসলমান বলে নয়। বাংলাদেশের যে মুসলমান অত্যাচারিত হিন্দুর পক্ষ নেয় অথবা ধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে কথা বলে তারাও তো নিজের দেশে অসহায় একাকী এমনকি প্রাণের ঝুঁকিও থাকে। কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনায় বড়ো সিদ্ধান্ত যুক্তিতে দাঁড়ায় না। কামাল যদি হিন্দু হত অলকানন্দা যদি মুসলমান হত তাহলে ইসকান্দার তাকে চম্পাতলার হাটে বাঁচাতে যেত না, আর ঘোষিত চাঁদা না পেয়ে তার শুধু মুখ নয় হাত চলত অস্ত্রসহ। এমন সম্ভাবনা এড়িয়ে যাওয়া যায় না। কামালকে এখানে খুব সেন্টিমেন্টাল মনে হয়েছে। অলকানন্দা অভিযোগ করেছিল কামাল কমিউনাল হয়ে যাচ্ছে। তার যুক্তির বিরুদ্ধে বাংলাদেশ পাকিস্তানের প্রসঙ্গ এসে তার মুখ বন্ধ করে দিতে পারে অলকানন্দা। কামাল দাবি করেছে সে ভারতীয় মুসলমান, তাকে বাংলাদেশ, পাকিস্তান দিয়ে বিচার করা হবে কেন। অলকানন্দা বলেছে 'হ্যাঁ, তুমি ভারতীয় মুসলমান, কিন্তু পাকিস্তান ক্রিকেটে জিতলে সে খোলস মুহূর্তেই খসে পড়ে।' এর কারণ হিসাবে কামাল বলেছে 'আলবাত পড়বে। সংখ্যাগুরু কি আমাকে ভারতীয় মনে করে? কোনো কিছুতে কি এদেশে আমার সমান অধিকার আছে?' কামাল আরো বলেছে 'তোমাদের চোখে আমরা হলাম— ধর্ষক, কসাই, গুণ্ডা, কামুক, বহুগামী...' কামাল বলছে তোমাদের অর্থাৎ হিন্দুদের। তবে নিজেকে এসবের বাইরে প্রমাণ করতে বিয়ে করছে অলকানন্দাকে? নাকি আদতে কামালের গোঁড়ামি নেই। অলকানন্দাও কি তাই

যেমন কামাল বলেছিল, কারণ অলকানন্দাও তো কামালকে তর্কে ছেড়ে দেয়নি। মুসলমান পুরুষ ও এদেশে মুসলমানের সমানাধিকার সম্পর্কে অলকানন্দার ধারণা—

> কোনো সমানাধিকার তোমরা পাবে না। কেন-না সমানাধিকার পাওয়ার যোগ্যই নও তোমরা। আজ থেকে দুশো-আড়াইশো বছর আগে রামমোহন কি বিদ্যাসাগর যে সাহস দেখাতে পেরেছিলেন, আজকের দিনেও কি তোমাদের একজন তার সিকিভাগ সাহস দেখাতে পারছে? কাপুরুষের দল, নিজের ধর্মের, নিজের সমাজের যাবতীয় অনাচার মুখ বুজে সহ্য কর, আবার অন্যকে সমালোচনা! যারা নিজেদের সম্মান করে না, নিজেদের স্ত্রীলোকরদের জন্তু-জানোয়ারের বেশি কিছু ভাবে না বা ভোগ্যপণ্য মনে করে তাদের সঙ্গে অন্য মানুষ...[১৩৪]

অসম্ভব যুক্তিবাদী শিক্ষিত অলকানন্দা ও কামাল। মনে পড়ে 'ব্রাহ্মণ্য' গল্পের কেতকী ও নচিকেতাকে। যারা ব্রাহ্মণতন্ত্রের ঊর্ধ্বে গেলেও একদিন কেতকী নচিকেতার কাছ থেকে পৈতা উদ্ধার করেছিল। ইসলামের ঊর্ধ্বে গেলেও কামাল একসময় নিজের সংখ্যালঘু হবার হতাশা ব্যক্ত করেছে। জাত্যভিমান, ধর্মীয় আবেগ মানুষের শরীর ও মনের কোথায় বাস করে মানুষ তা নিজেই জানে না। আসলে কামাল-অলকানন্দার জগৎটা আলাদা হয়ে গেছে সেই আলাদা জগৎ থেকেই তাদের আপনজন খুঁজে নিতে হবে। যে কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে তারা এর পরেই গভীর খাত। সেই খাতের সামনে গিয়ে কামাল একবার ভেবেছে সে কমিউনাল হয়ে যাচ্ছে আবার ভেবেছে তার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও চাকরি দিল না মুসলমান বলে। এই দোলাচলতা শুধু নির্যাতন থেকে নয়, শরীরে বাসা বেঁধে আছে ভাবনাগুলো, যেভাবে অনেকের থাকে।

পৃথিবীর কোন প্রান্তে গেলে মুক্তি মিলবে তাদের কামাল-অলকানন্দা জানে না, শুধু জেনেছে ভয় পেলে চলবে না, ভয় পেলেই রেহাই পাওয়া মুশকিল হবে। কোথাও পালিয়ে যেতে চায় না অলকানন্দা, কারণ সে হিন্দুও নয় মুসলমান নয়, দাঙ্গায় কোনো পক্ষই তাকে কিছু বলবে না। কিন্তু সে কোনো পক্ষের নয় বলেই দুই পক্ষের শত্রুর তালিকার বাইরে ছিল না এটা বোঝেনি। মহরমের আগে পুলিশ বোঝে তাদের কি করা উচিত আর কি করা উচিত নয়। পুলিশ, প্রশাসন, শিক্ষক, নৌকার যাত্রী সব মহলেই ধর্মীয় বিদ্বেষের আলোচনা। ফলে আন্দাজ করা যাচ্ছে সময়টাকে। এই সময়ের মধ্যেই অলকানন্দা কামালকে সুখবর দিতে এসেছিল। তবে এই সুখবর মোটেই সুখকর নয় কামালের কাছে বরং উদ্বেগের। কারণ তাদের অবস্থান সমাজে কী তা জানত কামাল। যদিও এই সুখবরটা ছিল অলকানন্দের

আত্মীয়ের সন্তান আগমণের। তবে কামালের উদ্বেগ, তাদের যখন সন্তান হবে কী নাম রাখবে তাদের, কার পরিচয়ে পরিচিত হবে, কোন স্কুলে যাবে, সহপাঠীদের অত্যাচার সে কোন ধর্ম দিয়ে ঠেকাবে। সে কি পদবী ছাড়াই নাম লিখবে, চাকরির দরখাস্তে ধর্মের জায়গায় কি লিখবে এমন নানা প্রশ্ন তাকে ব্যথিত করে তুলেছিল। সামনের খাতটা খুব কাছ থেকে দেখতে পেয়েছে কামাল। অলকানন্দা বলেছিল—

> আমাদের সন্তান— সে হিন্দু নয়, মুসলমান নয়— সে হবে শুধু মানুষ। যে নামে তাকে ডাকব আমরা আদর করে, তাই হবে তার নাম। স্কুল ভরতির দরখাস্তে পদবির জায়গায় কিছু বসাব না আমরা, ধর্মের জায়গায় শূন্য রাখব। যদি এর জন্য আমাদের সব জায়গায় লড়াই করতে হয়, সব জায়গাতেই লড়াই করব। আমাদের সন্তান তার সঙ্গী খুঁজবে এই দেশের অসংখ্য মানুষের মধ্যে।[১৩৫]

যে গন্তব্যে যেতে চাইছে অলকানন্দা সেই দেশ কি বাস্তবের ভূমিতে আছে কোথাও। তাদের শিশুকেও একদিন কামাল-অলকানন্দার মতো মাটিতে নামতেই হবে আর তখন দেখতে হবে শূন্যতা, সেই শূন্যতা নিজস্ব শূন্যতা। সমাজ ধর্ম, মানুষ, প্রকৃতি সব থাকবে তবু চরম শূন্যতা গ্রাস করবে।

পীরগঞ্জে কাঙ্ক্ষিত দাঙ্গা হয়েছে মহরমের দিনে। পুলিশের গুলিতে পাঁচজন মারা গেছে। দেশে যে স্থানগুলোয় হিন্দু-মুসলিম পাশাপাশি বাস করে সেখানের প্রকৃতিও যেন সাম্প্রদায়িক চক্রান্ত করত। দেবস্থানের গাছের ডাল এমনভাবে বেড়েছে যে মহরমের তাজিয়ার মাথায় ঠেকে, আবার তাজিয়াও বছর বছর বাড়তে থেকেছে। এটা একটা উপলক্ষ্য মাত্র, মহরমের মিছিল কালীমন্দিরের সামনে দিয়ে নিয়ে যাবার চক্রান্ত করলে ব্রাহ্মণরা রাস্তা আটকে দেয়। যে ব্রাহ্মণরা রামমন্দিরের জন্য প্রচার করেছিল এতদিন। একদিকে 'রামজন্মভূমিকী জয়, ভারত মাতা কী জয়, রামচন্দ্রমহারাজকী জয়' ধ্বনি উঠেছে অন্যদিকে ধ্বনি উঠেছে 'হায় হাসান হায় হোসেন, আল্লা হো আকবর', শোকের আগুনে দগ্ধ হয়ে ইসলামের পবিত্র হওয়ার দিন মহরম। অন্যদিকে হিন্দুরা রামজন্মভূমির শোকে দগ্ধ হচ্ছে বহু বছর ধরে। 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ' আটের দশকের প্রথম থেকেই দেশজুড়ে জেগে উঠেছিল, রামজন্মভূমি আন্দোলন গণসাম্প্রদায়িকতার জন্ম দিয়েছিল, হিন্দুর শোক প্রবল ভাবে আজই জেগে উঠেছে আবার। এই দুই শোক তাদের উন্মত্ত করেছে পুলিশের

সাবধানবাণী অগ্রাহ্য করে দুই পক্ষই। কিন্তু তারা প্রস্তুত হয়েই ছিল, তাই পুলিশের গাড়ির সামনে বোমা পড়ে আর ছুড়ি নিয়ে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কাটাকাটি শুরু হয়েছিল। কত তুচ্ছ ঘটনা মানুষকে অমানুষ করে তোলে, খুন করতে ধর্ষণ করতে ঘর জ্বালাতে উৎসাহ দেয়। মুসলমান ও হিন্দু লোকেরা অলকানন্দাকে ধর্ষণ করেছে, কামালকে আহত করেছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিরপেক্ষতায় নিস্তার নেই, যেমন হিন্দু-মুসলমান কোনো পক্ষের কাছে নিস্তার পায়নি কামাল-অলকানন্দা। নিষ্কৃতি নেই আমাদেরও, তাই অভিজিৎ সেন বলেছেন—

> সারা দেশজোড়া সাম্প্রদায়িক সন্দেহ বিদ্বেষ, মিথ্যাচার ইত্যাদি কারণে আরো অনেকের মতো আমি নিজে এত বিক্ষুব্ধ হয়েছিলাম মানবিকতাকে এত বিপন্ন দেখেছিলাম, যে মনে হয়েছিল এ থেকে বোধহয় আমাদের আর নিষ্কৃতি নেই।[১৩৬]

এই উপন্যাসে দাঙ্গার চেয়ে মানুষের সম্প্রদায়গত ভাবনা বেশি উঠে এসেছে, একটি বিশেষ সময়ের প্রেক্ষিতে হলেও সম্প্রদায় বিশেষে ভাবনা আসলে চিরকালের। মনে সুপ্ত সাম্প্রদায়িক বোধ থেকেই দাঙ্গার সৃষ্টি হতে পারে তাও লেখক দেখিয়েছেন।

খ। *স্বপ্ন এবং অন্যান্য নীলিমা*

স্বপ্ন এবং অন্যান্য নীলিমা উপন্যাসটির কাহিনিতে দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, নকশাল আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সময়কে বিস্তৃতি দিয়েছেন অভিজিৎ সেন। উপন্যাসে সরোজ পঞ্চাশ-বাহান্ন সালে পূর্ব পকিস্তান ছেড়ে ভারতে এসেছিল, তারপর ১৯৬৪ সালে দাঙ্গার প্রকোপে তার বাবা-মা অবশিষ্ট ভাই বোনদের নিয়ে কলকাতায় চলে এসেছিল। লেখক নিজেও পঞ্চাশ-বাহান্ন সালেই ভারতে আসেন, তারপর দাঙ্গার সময় তাঁর বাবা-মা ও ভাইবোনেরা কলকাতায় চলে আসেন। দাঙ্গার প্রকোপে মানুষ দিশেহারা হয়ে ছুটতে থাকে এদিক থেকে ওদিক। কাশ্মীরের হজরতবাল মসজিদ সরোজ বা তার বাবা-মা নাই চিনে থাকুক, কিন্তু সেই মসজিদ থেকে কেশাধার চুরির ঘটনা তাদেরকেও এবং অনেক মানুষকেও ছোটাবে এটা মেনে নিতে হত।

স্বাধীন বাংলাদেশের লক্ষ্যে যখন পাকিস্তান সেনাবিহিনীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের লড়াই চলেছে সেই পরিস্থিতিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে এদেশে চলে এসেছিল। এই উপন্যাসের সতী তাদেরই একজন। সতী সাতষট্টি-আটষট্টি সালে কলকাতায় পড়তে এলে একটা হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু সতী মুসলমান বলে আবাসিকরা নানাভাবে

বিরক্ত করছে। ফলে সতীর বিছানা সুটকেস বাইরে ছুড়ে ফেলা হয়েছিল। সাম্প্রদায়িকতা কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না শিক্ষার জগৎকেও গ্রাস করেছিল। দাঙ্গা আসলে বোতাম টিপে আলো জ্বালানো ও নেভানোর মতো। সরোজ পূর্ব পাকিস্তান থেকে যখন এদেশে চলে আসে তখন স্টিমারের মধ্যে দুজন সর্বোচ্চ অফিসারের দাঙ্গার চক্রান্ত শুনেছিল সঙ্গে হিন্দু বিরোধী নেতাও ছিল। তাদের চক্রান্ত বিশেষ কাজে না এলে রটিয়ে দিয়েছিল কলকাতায় ফজলুল হককে হিন্দুরা খুন করেছে। এরপর দাবানলের মতো দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছিল—

> এমন দাবানল যা আর কোনো জল দিয়ে নেভানো যায় না। হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অবাধে চলল কয়েকদিন। তার সঙ্গে অগ্নিসংযোগ। পুড়ে খাক হয়ে গেল শয়ে শয়ে বছর ধরে তৈরি মানুষের সহনশীলতা, মানুষের বাড়িঘর-আসবাবপত্র।[১৩৭]

কাশ্মীরের হজরতবাল মসজিদে কেশাধার চুরি বা চুরির চক্রান্ত এমন কিছু প্রচার দাঙ্গা বাঁধিয়ে দিতে পারত, গুজবের ক্ষমতা মারাত্মক। সরোজ এদেশে আসার পর ট্যাংরায় থাকাকালীন দাঙ্গার চাঁদা না দেওয়াতে নিরাশ্রয় হয়ে ঘুরতে হয়েছিল। সরোজ বুঝেছিল দাঙ্গা দাঙ্গাবাজদের ঐক্যবদ্ধ এবং ক্রমশ শক্তিশালী করে। প্রতিটি দাঙ্গায় দাঙ্গাবিরোধীদের একাংশ দাঙ্গাবাজদের সঙ্গে যোগ দিত। দাঙ্গার ফলে রোজি পারভেজ নামের যে শিক্ষিত মেয়েটি ছুটে এসেছে এদেশে যাদের পুরুষেরা সব খুন হয়েছিল, নারীরা ধর্ষণ হয়েছিল, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এদেশে আসার পর তাদের সাহায্যকারী লোকেদের শরীর দিতেও রাজি ছিল রোজি পারভেজ।

সাম্প্রদায়িকতাকে গতি দিতে গরু আর শুয়োর নিয়ে তরজা বহুকাল ধরে চলেছে। খানসেনাদের অত্যাচারে অনেক মানুষ হিন্দু থেকে মুসলমান হয়েছে, কয়েকশো বছর পিছিয়ে গেলে বৌদ্ধ থেকে মুসলমান, আর মগ দোষে দুষ্ট অনেক হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিস্টান হয়েছে। ধর্মীয় পরিচয় মানুষের গোড়া থেকে খুঁজতে গেলে দেখা যাবে প্রাণ ও মান বাঁচাতে ধর্মকে এত গুরুত্ব দেয়নি মানুষ এবং ধর্ম এত গুরুত্ব পাবার জিনিসও ছিল না। গৃহীত ও বাধ্য হয়ে পালিত ধর্মের প্রতি আজকের দরদ মানুষকে অহংকারী করে তুলেছে। ইতিহাস ঘাঁটলে সেই অহং এক মুহূর্তে ভেঙে পড়বে।

৬। সামাজিক সমস্যা— নারীপাচার

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের নারীরা আপন ভাগ্য জয় করার অধিকার দাবি করেনি, ভাগ্যকে জয় করে বিজয় নিশান স্থাপন করেছে। শুধু সাংসারিক চৌহদ্দি নয় রাষ্ট্রের সীমানা পেরোতে সাহসে পাখনা বিস্তার করেছে। শিক্ষা, স্বভাবে, সাহসে, কর্মে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এসবের মধ্যেও এই একবিংশ শতকেও চোরাস্রোত ধরে অনেক নারীর জীবন ও স্বপ্ন চোরাপথে চালান হয়েছে। সমাজে কিছু লোভী, হৃদয়হীন, চতুর ব্যাবসায়ী নারীকে নিয়ে রমরমিয়ে ব্যাবসা চালিয়েছে। গ্রামের অথবা শহরের অভাবী নারীদের লোভ দেখিয়ে বেশ্যাবৃত্তির মতো বিপজ্জনক কাজে লিপ্ত করেছে। আবার শরীরের অঙ্গ বিক্রির মতো অমানবিক ব্যাবসাও করেছে, এক্ষেত্রে শিশুরাও বাদ যায়নি। আবার জোর করে বা ফুসলিয়ে সব সময় আনা হয় এমন নয়, কেউ কেউ নিজের ইচ্ছায় ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় এই পথে বলি হতে এসেছিল। সাধারণত অভাব ছিল এইসব মেয়েদের ভাগ্যবিপর্যয়ের কেন্দ্রবিন্দু। এইসব মেয়েদের নিয়ে একটা গোপন বাজার তৈরি ছিল সবসময়। লেখক অভিজিৎ সেনের কথায়, নারী এমন এক বিক্রয়জাত পণ্য যার বাজার সবসময় খোলা। নারীপাচার সমাজের বৃহত্তর ক্ষত, এই ক্ষত নিবারণে সদর্থক পদক্ষেপ সরকার বা প্রশাসনের তরফ থেকে নেওয়া হলেও সম্পূর্ণরূপে নিবারণ করা সম্ভব হয়নি। রেডলাইট এলাকার প্রতিটি মেয়ের প্রায় একইরকম একটা করে অতীত থাকে সেই অতীত খুব সরল হয় না বাস্তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় যেসব মেয়েরা দেহ ব্যাবসায় এসেছে তাদের কপাল পোড়ার কাহিনি গল্প উপন্যাসে এসেছে একথা স্বীকার্য, তবে কখনো মূল কাহিনির পাশে উপকাহিনি হিসাবে অথবা একটি বা দুটি চরিত্রের মাধ্যমে। বিস্তৃতভাবে খুব কমই দেখা গেছে। অভিজিৎ সেন নারীপাচার ও নারীদের দেহ ব্যাবসার সমস্ত প্রেক্ষাপটকে তথ্যসহ তুলে এনেছেন মুর্শিদাবাদ জেলাকে কেন্দ্র করে। মুর্শিদাবাদের গ্রামের মেয়েরা কীভাবে কোন পথে পাচার হয়েছে, কোন মানসিক অবস্থায় তারা হারিয়েছে সংসার থেকে, তারা কোথায় স্থানান্তরিত হয়েছে, শেষে তাদের পরিণতিই বা কী হয়েছিল। এক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা পুলিশের ভূমিকা কী এসব বিষয়ের অঙ্কুরোদগম দেখা যায় অভিজিৎ সেনের *সবুজ শ্যাওলা ঢাকা জল* (২০০৯) উপন্যাসে যা মহীরুহ হয়ে দাঁড়ায় *শিরিন এবং তার পরিজন* (২০১৭) উপন্যাসে।

নারী পাচারের মতো সমস্যাটা অভিজিৎ সেন শুধু জানতেন তা নয়, সমস্যাটার গোড়ায় পৌঁছেছিলেন। ব্যাপারটাকে বাস্তবতার আলোয় আনতে লেখককে সাহিত্যিক কম সাংবাদিকের ভূমিকা বেশি পালন করতে হয়েছে। উপন্যাসের আখ্যান নির্মাণে লেখককে বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে। অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের আখ্যান বিন্যাস সম্পর্কে অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য একটি প্রবন্ধে বলেছিলেন—

> আখ্যানের গ্রন্থনায় বিপুল পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। লেখক কখনো কথকের ভূমিকা নিচ্ছেন, কখনো বা পরে নিচ্ছেন ভাষ্যকারের আঙ্‌রাখা আর কখনো সাংবাদিকের জোব্বা। এতে উপন্যাসের বহুস্বরিক প্রতিবেদন স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে ক্রমশ। এই রূপান্তরের সূচনা বিন্দু হিসাবে সত্তরের দশককে চিহ্নিত করা যেতে পারে।[১৩৮]

পরিবর্তমান কালে সাহিত্যের বিষয় আঙ্গিকে নতুনত্ব এসেছে, অভিজিৎ সেন স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে নতুনত্বের খোঁজ করেননি কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি তাকে উৎসাহ দিয়েছে। গল্পের মতো উপন্যাসেও তিনি সাংবাদিক ও ভাষ্যকারের ভূমিকা নিয়েছেন।

ক। *সবুজ শ্যাওলা ঢাকা জল*

সবুজ শ্যাওলা ঢাকা জল উপন্যাসে অধ্যাপক অদিতি দেশভাগের গ্লানি নিয়ে অপারেশন টেবিলে শুয়ে আচ্ছন্নতার মধ্যে অতীতে ফিরে গিয়েছিল। তার সমস্ত অতীত বর্তমানের মধ্যে সেইসব নারীদের কথা ছিল যারা চোখের সামনে থেকে হঠাৎ করে হারিয়ে গেছে। দ্বিতীয়বার অপারেশন টেবিলে যাবার সময় আয়া হিসাবে জয়া নামের মেয়েটিকে দেখে অবাক হয়েছিল অদিতি। কারণ এর আগে অদিতির বাড়িতে মাধুরী নামের যে মেয়েটি কাজ করত হুবহু জয়ার মতোই দেখতে জয়াকে। অধ্যাপক অদিতি ব্যক্তিজীবনের হাজার গ্লানি নিয়ে বেঁচে ছিল। স্মৃতি-সত্তা-বর্তমান জুড়ে অগাধ অতৃপ্তি এবং দেশত্যাগ ও দারিদ্র্যতার গ্লানি ছিল। বাংলাদেশের জমিজমা ফসল বংশানুক্রমিক নিরাপত্তা সর্বোপরি স্বচ্ছল জীবন ছেড়ে কলকাতায় চলে এসেছিল। তারপর বস্তির রূঢ় বাস্তবতায় নিজেদের আর দশজন উদ্বাস্তুর থেকে আলাদা মনে করতে পারেনি। তাদের মতোই সাংসারিক অস্বচ্ছলতার মধ্যে দিন কাটাতে হয়েছিল। এছাড়াও অন্তরে শেকড়ছেঁড়ার যন্ত্রণা তো ছিলই। বর্তমানে মধ্যবিত্ত অধ্যাপকের আর্থিক স্বচ্ছলতার মধ্যেও তার একাকী সত্তা তাকে শান্তি দিল কই? স্বামী দিবাকর সময় দিতে পারত না, তার অক্ষমতার কারণে অদিতি মাতৃত্বের অনুভূতি থেকে

বঞ্চিতই থেকেছিল। এসবের মাঝেও অদিতির মধ্যবিত্ত সুবিধাবাদী সত্তা সজাগ ছিল। এন.জি.ও থেকে মাধুরী নামের যে অল্পবয়সী মেয়েটিকে নিজের বাড়িতে কাজে নিযুক্ত করেছিল তাতে নিজের একাকীত্ব ঘুচিয়ে কিছু সুবিধা পেতেই চেয়েছিল—

> আসলে অদিতি ঘরের কাজের জন্য মেয়ে চেয়েছিল, এটা যেমন ঠিক, তেমনি চেয়েছিল এমন একটা মেয়ে, যার সামান্য দোষ ঘাট থাকবে, এবং সে কারণে ঝট্ করে কাজ ছেড়ে চলে যাবে না। এরকম একটা সুবিধাজনক ব্যবস্থা সে ভেবেছিল, যেমন আর দশজন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মহিলারা আজকাল ভাবতে শিখেছে।[১৩৯]

এমন একটা মেয়ে অদিতিকে দিয়েছিল তার সহকর্মী বিজন। বিজন একটা এন.জি.ও মারফৎ হারিয়ে যাওয়া মেয়েদের খুঁজে বের করে তারপর তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছিল। এন.জি.ও থেকে মেয়েদের কারোর বাড়িতে কাজে দেওয়া আইন বিরুদ্ধ তবুও বিজন একান্ত অসুবিধায় পড়ে, মাধুরীকে রাখার উপযুক্ত স্থান না পেয়ে অদিতির কাছে রেখেছিল। অদিতির সমস্ত গ্লানির মধ্যে সেইসব অভিজ্ঞতাও সঞ্চিত হয়েছিল, সিনেমার নায়িকাদের নামে জয়া, মাধুরীর মতো মেয়েরা সত্যি তাদের জীবনকে উপলব্ধি করতে চেয়েছিল। তারপর সেই পথে ব্যর্থ হলেও অন্য পথের সাময়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্থের লোভে আরও কিছুদিন, তারপর কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল স্বপ্নসহ গোটা মানুষটা।

জয়াকে দেখে মাধুরীর কথা মনে পড়েছিল অদিতির, জয়া যে মাধুরীর জমজ বোন সেকথা প্রথমত অস্বীকার করেছে জয়া। অদিতি জয়ার কাছে মাধুরীর বম্বে যাওয়ার স্বপ্ন তারপর কাটিহার, বেগুসরাই, সাহেবগঞ্জ এপথ সেপথ দিয়ে শেষ হয়ে যাওয়ার বৃত্তান্ত ব্যক্ত করেছিল। এবার জয়া আবেগ ধরে রাখতে পারেনি, 'কাকিমা তা হলে তুমিই সেই? মরার আগে খালি তোমার কথাই বলত—' এবার জয়া স্বীকার করেই ফেলেছে। আসলে জয়া হারিয়ে যাওয়া মেয়েদের কালিমা জানত। সমাজ তাদের কীভাবে দেখে সেটাও জানত তাই গোপনীয়তা রেখে যতটা মানুষের বাঁকা দৃষ্টি থেকে রেহাই পাওয়া যায় সেই চেষ্টা করত। বিজনদের সংগঠন হারিয়ে যাওয়া এসব মেয়েদের হয়ে লড়াই করেছে। তাই সে জানে ফিরিয়ে আনার পর এসব মেয়েদের অতীত-ভবিষ্যৎ কী। বিজন বলেছিল—

> আমাদের সংগঠন যে সব মেয়েকে খুঁজে বের করে, তাদের অতীত থাকে, অদিতিদি। সমাজ সাধারণভাবে যাকে মন্দ বলে, তাদের অতীত সেইসব মন্দ নিয়েই।[১৪০]

যেভাবে অদিতির স্বামী দিবাকর জয়া সম্পর্কে হীন মনোভব দেখিয়েছে। দিবাকর দিল্লি বদলি হবার পর অদিতি জয়াকে নিজের কাছে রাখতে চাইলে দিবাকর প্রথমে জয়াকে মাধুরী ভাবে এবং পূর্ব প্রসঙ্গ টেনে সে জয়া সম্পর্কে পুলিশি ভেরিফিকেশন করার কথা বলেছে। অদিতি জানত পুলিশি ভেরিফিকেশন হলে অনেককিছু উঠে আসবে ফলে জয়াকে নিজের কাছে রাখতে পারবে না। কারণ অদিতি জানত মন্দ মেয়ের উপাখ্যান কীভাবে রচিত হয়। বিজন যখন তার কাছে মাধুরীকে দিয়ে গিয়েছিল তখন অদিতি জেনেছে মাধুরী আসলে মুসলমান মেয়ে, তার বাড়ি ছিল মুর্শিদাবাদের নদিয়া সীমান্তের কাছে। দিনমজুর বাবা-মার সংসারে অভাব নিত্যসঙ্গী ছিল। তাই এসব মেয়েদের ভুল পথে চালিত হবার প্রধান কারণ দারিদ্র্য। চোরা পথের শিকারীরা অভাবী সংসারের মেয়েদের সামনে তাদের টোপ ফেলত আর সহজেই শিকার সেই টোপ খেত। বিজনের কাছে সে এল কীভাবে অদিতির এই প্রশ্নের উত্তরে মাধুরীর চোখ দিয়ে জল ঝরেছে অঝোরে, অতীতকে মনে করে। 'সেসব কথা জানলে তুমি আমাকে ঘেন্না করবে, কাকিমা' এরপর অদিতি জোর করেনি তার অতীতকে জানতে। মাধুরী অতীত ভুলে সুস্থ জীবনযাপন করতে চেয়েছিল। অদিতির জীবনযাপন প্রণালী তাকে মুগ্ধ করেছে গভীরভাবে ভালোবেসে ফেলেছে অদিতিকে। তাই যখন হোমে যাবার কথা ওঠে মাধুরী যেতে চায়নি, অদিতির কাছে থাকতে চেয়েছিল। দু-বছর থাকার পর একদিন হঠাৎ না জানিয়ে কোথাও চলে গিয়েছিল, পরে অদিতিকে চিঠি দিয়ে ক্ষমা চেয়েছে। আর জানা গিয়েছিল—

> একটা নাচের দলের সঙ্গে কাটিহারে গেছে মাধুরী। প্রতি শো বাবদ একশো টাকা করে দিচ্ছে এরা, খাওয়া থাকা ফ্রী।[১৪১]

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল অদিতি, হয়তো মাধুরীর উপর তার অনেক নির্ভরতা ছিল তার মাঝেও কোথাও তো মায়ার টান ছিল একথা অস্বীকার করা যায় না। নাচের দলে যোগ দিতে যাওয়া মেয়েটা কবেই যে নাচ শিখল তা অদিতির স্বামী দিবাকরের প্রশ্ন। সমাজ যখন পশ্চিমি আদর্শে চলছিল, সামাজিক রীতি রেওয়াজ ফেলে নষ্টামির প্রতিযোগিতায় নেমেছিল সাংস্কৃতিক জগৎ। এই সুযোগে ফাঁদ পাতা ছিল চারিদিকে, তাই—

> সবদিকে শাড়ি, গাড়ি, গয়না, বাংলো, খাওয়া-দাওয়ার এই প্রবল সীমাহীনতার মধ্যে মাধুরীরাই বা বঞ্চনার শিকার হয়ে পরের বাড়িতে কাপড় কেচে বাসন মেজে অর্ধভুক্ত, অপূর্ণ সাধ বেঁচে থাকবে কেন?[১৪২]

মাধুরীর বাবা-মা যখন অদিতির বাড়িতে মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসে হাতে কিছু টাকা পেয়েছে, গ্রামীণ বৃদ্ধ জবুথবু এই দুই নারী-পুরুষের হাতে টাকা পড়তেই চোখে মুখের অভিব্যক্তি বিস্ময়কর হয়ে যায়।

অদিতি তার দাম্পত্য তথা সাংসারিক জীবনে শূন্যতা ছাড়া কিছুই দেখেনি। জীবনের কুড়ি বছরের গ্লানি নিয়ে সে এবার বিজনের এন.জি.ও-তে কাজ করতে চেয়েছে। হাসপাতালে জয়ার খোঁজ করে যখন সে জানতে পেরেছে সেও তার দিদি মাধুরীর মতো নাচের দলে চলে গেছে আর তার কোনো খবর নেই। অদিতি এবার জয়াকে খোঁজার মধ্য দিয়ে তার কাজ শুরু করেছে। বিজন জানে এসব কাজে কিছু বাধা বিপত্তি আছে, পরিবারের আগ্রহ থাকা চাই, আবার হারিয়ে যাওয়া মেয়েরাও অনেক সময় ফিরতে চায় না স্বাভাবিক জীবনে। এছাড়াও এন.জি.ও-র মধ্যে অসৎ প্রবৃত্তিও লক্ষ্য করা যেত, কেউ কেউ এই গোপন ব্যাবসায় উৎসাহ দিত, পয়সা রোজগার ও এইসব মেয়েদের ব্যবহারও করে। বিজনের থেকে অদিতি জেনেছে এসব কথা। সমাজের ভয়ে অনেকেই আর ফিরতে চাইত না। নিজেদের এই অন্ধকার জগৎকে মানিয়ে নিয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে চাইত। বিজন বলেছিল—

> অনেক সময় মেয়েরা নিজেরাই বাধা দেয়, ভাবে পুলিশ, এনজিও এরা সব ভাঁওতা। এক জায়গা থেকে আরেক যায়গায় তাদের চালান করার ধান্দা। তার থেকে যেখানে আছি, সেখানেই ভালো। আবার কেউ ভাবে যদি ঘরে ফিরে যাই, সেখানে গিয়ে কী পাব? সেই তো পুরানো আধপেটা-খাওয়া পুরানো জীবন! উপরন্তু নষ্ট মেয়ের দাগ লেগে যাবে।[১৪৩]

অভিজিৎ সেন এই উপন্যাসে 'নষ্ট মেয়ের' নষ্ট হবার কাহিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখাননি। তাদের এই পথের ঠিকানা, কারণ, পারিবারিক অভিব্যক্তি, এন.জি.ও-র ভূমিকা এবং এই মেয়েদের লোভের উৎস ও নিজেদের মনোভব খুব সংক্ষেপে দুই বোন মাধুরী ও জয়ার মধ্য দিয়ে বলেছেন। নাচের দলে যোগ দিয়ে তারা কেউ সিনেমার মাধুরী, জয়া হতে পারেনি। সমাজের কাছে ঘৃণার জীবন পেয়েছে মাধুরী, শেষে মারা গেছে। জয়াও সে পথ ধরেছে, বম্বে গিয়ে

নাচ গান করার আকাঙ্ক্ষা তার পুর্বেই হয়েছিল, তার দিদির অভিজ্ঞতা আছে তার ছিল। তাই তো অদিতির নগ্ন শরীর দেখে সিলিকন দেওয়া বুক বা ওয়াক্স করার কথা বলেছে, অদিতির মতো শরীর না পাবার আফসোস করেছে। অভিজিৎ সেন অদিতিকে অন্য ভূমিকায় এনেছেন, নিজের জীবনের একটি পর্বের ইতি ঘটিয়ে অদিতি এমন হারিয়ে যাওয়া মেয়েদের খোঁজে বাকি জীবন সমর্পণ করছে। অদিতি জানত এইসব আকাঙ্ক্ষা করে যেসব মেয়েরা ঘর ছাড়ে তাদের পরিণতির কী হয়। অদিতি পরিবর্তমান সমাজের সংস্কৃতির অত্যাধুনিকীকরণ বিষয়েও জানত। তাই জয়ার নাচ গানের দলে চলে যাওয়া প্রসঙ্গে তার মনে হয়েছিল—

> বেশ্যাবৃত্তি আদিমতম সামাজিক ব্যবসা। পৃথিবীর কোনও সমাজই এই ব্যাবসাকে উৎখাত করতে চেয়েছে কিনা, এখন সেই প্রশ্নটাই উঠছে। সেই কথাই বলছি বেশ্যাবৃত্তি দেহের যৌন ব্যাবসা, মডেলিংও দেহের যৌন ব্যাবসা, এইসব স্থূল যৌনমুদ্রা প্রদর্শন যে সব নাচের প্রধানতম, বলা যায় একমার ভঙ্গী— সেটাও তো দেহেরই যৌন ব্যাবসা। সামান্য তারতম্যের পার্থক্য শুধু। উচ্চতর সমাজ ব্যাপকভাবে এসব ব্যাবসায়ে নেমেছে এবং সারা পৃথিবীতে কোটি কোটি কোটি কোটি ডলারের বাণিজ্য চলছে এসব নিয়ে। আমাদের মাধুরীরা কী দোষ করল? টাকাপয়সা হলে উচ্চতর সমাজে সহজেই আশ্রয় পাওয়া যায়। উচিত-অনুচিত সমাজে সর্বত্রই অর্থকৌলিন্যেই স্থির হয়। ব্যাবসাটাকে আইনি স্বীকৃতি দিলে মাধুরীদের পক্ষে সাধারণ মানুষের মতো বাঁচা সহজ হয়।[১৪৪]

সমাজের উচিত অনুচিত অর্থকৌলিন্যে ঠিক হয় একথা তো একেবারেই সত্য। মাধুরীর মতো মেয়েরা চটুল নাচ দেখিয়ে, দেহ দেখিয়ে অর্থ উপার্জন করেছে শুধু তাই নয় এখান থেকে দেহ ব্যাবসায় তাদের উৎসাহিত করা হয়েছে।

বাংলার যে জেলাগুলো থেকে সবথেকে বেশি নারী বিভিন্ন পথে চালান হয়ে যেত তার মধ্যে মুর্শিদাবাদ, নদিয়ার মতো জেলাগুলি ছিল। *সবুজ শ্যাওলা ঢাকা জল* উপন্যাসেও মাধুরীর বেপাত্তা হয়ে যাওয়ার কাহিনি অনুরূপ। মুর্শিদাবাদের গ্রামের মুসলমান পরিবারের মেয়ে মাধুরী, সালারে তার খালার বাড়িতে এসেছিল। রেলস্টেশন সংলগ্ন এই শহরে ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য সবই ছিল। মাধুরীর তেরো চোদ্দ বছরের বাড়ন্ত শরীর দেখে তার খালার জ্ঞাতি সালেহা বেগম টোপ দিয়েছিল মাধুরীর খালাকে। 'তোমার শালির বেটির তো বাবু ঘরের মেয়ের মতো চেহারা।' কলকাতায় বড়ো বাড়িতে কাজ, ভাল মাইনে এবং আগাম টাকার লোভ দেখিয়েছিল। বড়ো বাড়িতে কাজ করতে গেলে কাজের দক্ষতা লাগে নাকি

সুন্দর চেহারা লাগে তা সালেহা বেগমের মতো দালালরা জানত। সালেহা বলেছে খোন্দকারদের মেয়ে সায়রার বিয়ে হয়েছে, সে এখন বছরে এক আধবার আসে, সুন্দর শাড়ি গয়না পড়ে। গাজিয়াবাদ না কোথায় বিয়ে হয়েছিল খুব বড় বাড়িতে। প্রথমে মানুষ ভুল বুঝলেও এখন সব ঠিক হয়ে গেছে। এমন আরও চোখের আড়ালের উদাহরণ দিয়ে মাধুরীর বিশ্বাস আদায় করেছিল। ফলে একদিন সালেহার সঙ্গে গোপনে ট্রেনে উঠেছিল সেও—

> দশকান করলে চলবে না। মেয়ে কোথায় গেল? না, খালার বাড়িতে। কে পয়সা খরচ করে খুঁজে দেখতে গেছে। সালেহা মাঝে মাঝে কিছু টাকা এনে দেয় বাপের হাতে।[১৪৫]

এরপর টাকা আসা অনিয়মিত হয়েছে, বাবা-মা মেয়ের খোঁজ করলে সালেহা বলেছে সে নিজে কলকাতা থেকে কয়েকদিন আগেই ঘুরে এসেছে, মাধুরী ভালো আছে, ভালো স্বাস্থ্য হয়েছে। কলকাতা থেকে কেউ আর গ্রামে আসতে চায় না, তার কিছুদিন পর বলেছে, মাধুরী কোনো ছেলের সাথে পালিয়ে গেছে, এসব কাহিনি সাজানো থাকত এবং এরপরে কী হতে পারে, কতদূর ব্যাপারটা এগোতে পারে সেসব জানা ছিল সালেহাদের। পুলিশি সাহায্য নেবার তৎপরতা সালেহা নিজে দেখিয়েছিল তারপর সালেহাকেও আর বাড়িতে পাওয়া যায় না। পুলিশ বছরখানেক পর এসে মাধুরীর বাবা মায়ের খোঁজ করেছে। পুলিশ জানত এসব ঝামেলার কেসে বেশি কিছু হয় না, এন.জি.ও-র চাপে শুধু সৌজন্যতা দেখায়। দালালরা যে চক্রব্যূহ তৈরি করে তাতে পাড়া গাঁয়ের বাবা-মায়ের আহার নিদ্রা ভঙ্গ আর দুশ্চিন্তা ছাড়া কিছুই করার উপায় থাকত না। মামলার ঝামেলার মধ্যে অচেনা লোক টাকা দিতে আসত, কেউ মেরে ফেলার ভয় দেখিয়ে কেস তুলে নিতে বলত। মাধুরীকেও উদ্ধার করা হয়েছিল, আইনি ঝঞ্ঝাটে একটু ভাটা পড়লে সালেহাও জামিনে মুক্ত হয়েছে অন্যদিকে মাধুরীর কাছেও নতুন করে প্রস্তাব আসতে শুরু করেছে। ফেলে আসা দিনগুলো চোখের সামনে উঠে আসত, মামলার ঝামেলার মধ্যেও নতুন নতুন প্রতিশ্রুতির সঙ্গে স্বপ্নে চোখ ভার হয়ে আসত ফলে আবার একদিন ঘর ছেড়ে উধাও হয়েছিল মাধুরী। সালেহার সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাবার পর সালেহা কৌশলে মাধুরীর মধ্যে সিনেমার নায়িকা মাধুরীর সম্ভাবনা প্রবলভাবে জাগিয়ে দিয়েছিল, নায়িকার সাফল্যের গল্প শুনিয়ে গতি দিয়েছিল মাধুরীর মনকে। এরপর আর ধরে রাখে কে মাধুরীকে—

> বিহারের গ্রামেগঞ্জে হাটে মেলায় ঘুরল তিন মাস। নৌটংকি, গান নাচ, আর সস্তা যৌনতার রাস্তা ঘুরে ফের কলকাতা। তারা ভেবেছিল নতুন কোনো দলের হাতে। কিন্তু ততদিনে মাধুরী কিংবা মাধুরীর মত কারো কারো মনের ভিতরে এ ধারণার ভিত পাকা হয়ে বসে গেছে যে, চেষ্টা করলে, অধ্যবসায় থাকলে শ্রীদেবী কিংবা মাধুরী দীক্ষিত না হলেও, কিছু একটা হওয়া সম্ভব। অন্তত প্রচুর টাকাপয়সা, গহনা এবং কর্ত্তৃত্বের অধিকারী হওয়া যায়।[১৪৬]

একটা কর্তৃত্ব, কিছু টাকা, ভালো শাড়ি, গহনা পেলে যে কোনো নারীর রূপ ঝলমলিয়ে উঠত। চিরকাল অভাবে অভুক্ত যুবতীর শরীরে কোনোদিন একখাবলা তেল জুটলে তার রূপ ঝলমলিয়ে ওঠে একথা অভিজিৎ সেন বলেছিলেন। এমন স্বাচ্ছন্দ্যের পথ যে নারী পেয়েছে সে দ্বিতীয়বার যাবেই না বা কেন, আর অন্য কাউকে পথ দেখাবে না কেন? মাধুরীর বোন জয়াও হয়তো সিনেমার জয়া হতেই চেয়েছিল সেও জয়া না হতে পারলেও 'কিছু একটা' হবে তারপর আরও অন্য মেয়েরা। মাধুরীর মতো জয়াও একদিন মারা যাবে। এই অন্ধকার পথের সম্পূর্ণ ইতিহাস মানুষের সামনেও আসত না। গোপনীয়তার মধ্যে সমস্ত কার্যপ্রণালী চলত, গোপনেই তার পালা শেষ হয়ে যেত। উপন্যাসের শুরু হয়েছিল এমন নারীর কথা নিয়েই, শেষেও অদিতি এমন নারীদের উদ্ধারের সংকল্পে জীবন সমর্পন করেছে। অভিজিৎ সেন কম পরিসরেও সমাজের অন্ধকার জগতের হাল-হদিশ দিয়ে গেলেন এই উপন্যাসে। সঙ্গে শিক্ষিত সমাজের চেতনায় সজোরে আঘাত করেছেন, এই পথের সমস্ত অশুভ শক্তির রূপকে চিনিয়ে। তারপরেও সমাজ এইসব নারীদের সঙ্গে সেই সু-ব্যবহার করেনি যা সম্বল করে মাধুরী বা জয়ারা নতুন করে সভ্য সমাজে বাঁচতে পারত। সমাজ আয়োজন করে এই অন্ধকারের আর সমাজই সেই অন্ধকার জগতের মানুষকে উপেক্ষা করে তাই হয়তো বার বার নিরুদ্দেশ হতে হয়েছে এইসব মেয়েদের সমাজ থেকে পৃথিবী থেকে।

খ। *শিরিন এবং তার পরিজন*

অভিজিৎ সেনের 'আনোয়ারা খুন হয়েছে' গল্পের পরিবর্ধিত রূপ *শিরিন এবং তার পরিজন* উপন্যাস। মুর্শিদাবাদ জেলায় গরিব মেয়েদের মাঝে মাঝে উধাও হয়ে যাওয়া ও তাদের নিয়ে আইনি বে-আইনি যেসব ঘটনা ঘটত তা এই উপন্যাসের উপজীব্য। মুর্শিদাবাদ জেলার মহালগঞ্জ গ্রামের শিরিন কলকাতায় থেকে ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা করেছে। কলকাতায় বসে শিরিন তার মায়ের চিঠির শেষ বাক্যে মহালগঞ্জ বা আশেপাশের গ্রামের উল্লেখযোগ্য খবরগুলো পেত। যেমন 'আয়েষা এবং করিমা পাঞ্জাব কিংবা কাশ্মীরে চালান হয়ে গেছে',

আবার ‘শেখপাড়ার লালি, বেবি এবং নাসিমাকে তাদের বাপের বয়সী মানুষেরা বিয়ে করে কোথায় যেন নিয়ে গেছে।’ প্রতিশ্রুতি, লোভ, ভালোবাসা, প্রতারণা, কাজের সুযোগ ইত্যাদির নামে গ্রাম থেকে মেয়েরা হাতফেরি হয়ে যেত। এই সমস্যা মুর্শিদাবাদের গ্রামগুলোয় অহরহ চলত। এই উপন্যাসে আনোয়ারা সেই মেয়ে যে সমাজ, সংসার, দারিদ্র্যে, উদাসীন ধর্মভীরু পিতা ও নিজের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে খুন হয়েছিল। লালির মতো মেয়েরা হঠাৎ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পেয়ে নিজেদের রাণী মনে করেছে, শিরিনের এমন অনেক পরিজনের কথা এসেছে যাদের দেখতে দেখতে শিরিন তার পড়াশোনা, শিক্ষক জীবন শুরু করে শেষ পর্যন্ত তাদেরই উদ্ধারকার্যে নেমেছিল। শিরিন তার পরিজনদের বিভিন্ন দুর্দশা দেখেছে, কিন্তু তার সহপাঠী খেলার সাথীদের সন্দেহজনক ভাবে অজানা পথে উধাও হয়ে যাওয়া এবং তাদের জীবনের দুঃখজনক পরিণতি সবকিছুই ভাবিয়েছে শিরিনকে। এন.জি.ও-র মাধ্যমে শিরিনও শেষপর্যন্ত তার পরিজন উদ্ধারে নেমে পড়েছিল।

শিরিনের বাল্যবন্ধু আনোয়ারা খুন হয়েছিল, কিন্তু কীভাবে যে খুন হয়েছে তার কোনো হালহদিশ কারো কাছেই ছিল না। তবে আনোয়ারার জীবনের প্রেক্ষাপট দেখলে বোঝা যাবে মেয়েটি কীভাবে খুন হয়েছে। তাবলিগে যোগ দেওয়া উলেমা গোছের পিতার নিত্যদিনের অত্যাচারে আর সাংসারিক অভাবে অতিষ্ট পাঁচ ভাইবোন ও মায়ের সংসার ছিল আনোয়ারার। আনোয়ারাকে বারে বারে অন্ধকার অথচ রঙিন পথ হাতছানি দিয়েছে। কলকাতা থেকে ফিরে এসে শিরিন বার বার জানার চেষ্টা করেছে আনোয়ারা কীভাবে খুন হয়েছে। বাবা করিম চৌধুরীর কাছে জেনেছে, দিল্লির না পাঞ্জাবের ঠিকাদারের দালাল জাফর আলি পঁয়ত্রিশ জন স্ত্রী-পুরুষ নিয়ে গাড়িতে উঠেছিল। সেই লাইনের মধ্য থেকে আনোয়ারার বাবা গোলাম রসুল যাকে আচমকা টেনে বার করে আনল সে আনোয়ারা। জাফর আলি লালগোলার লোক, গরু পাচার করত, গুজরাট দিল্লি পাঞ্জাবের কনস্ট্রাকশন সাইটে লেবার যোগান দিত, এখন মানুষ পাচার করে। এবং সে পার্টির হোমরা চোমরা নেতাও বটে। আসলে জন পিছু জাফর আলি পাঁচ হাজার টাকা অগ্রিম দিয়েছে সঙ্গে গাড়িভাড়া, পুলিশ খরচ মিলিয়ে সে এই ব্যাবসায় একটা মোটা অঙ্কের টাকা ব্যয় করেছে। লাইন থেকে আনোয়ারাকে বের করে নিলে জাফরের সঙ্গে গোলাম রসুলের ধাক্কাধাক্কি হয়েছিল। এর ফলস্বরূপ গোলাম রসুল আনোয়ারার পিঠে একটা মোটা কঞ্চি ভেঙে রক্তাক্ত করেছে। করিম চৌধুরী আনোয়ারা সম্পর্কে জানিয়েছিল—

> সে যেকোনো ধরনের কাজের খোঁজে দিল্লি যাচ্ছিল। আমার একথাও মনে হয়েছিল দিল্লিগামী দলে তার কোনো প্রেমিক কিংবা বোঝাপড়া হওয়া পুরুষসঙ্গী ছিল।[১৪৭]

আনোয়ারার কাজের খোঁজ তার পারিবারিক অভাব থেকেই। তার বাবা সংসার দেখত না বরং আনোয়ারার মা বিড়ি বেঁধে একটু একটু করে যে টাকা সঞ্চয় করেছে সে টাকাতেও ভাগ বসাত। অন্য দায় দায়িত্ব না নিলেও গোলাম রসুল ধর্মীয় অনুশাসনের নিগড়ে বেঁধে রাখার চেষ্টা করত পরিবারকে। আনোয়ারা গোলাম রসুলের কোনো অনুশাসন মেনে নেয়নি। শিরিন আগেই জেনেছিল আনোয়ারা 'বে-ইছলাম' কাণ্ড করছিল। উলেমা বাবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল—

> চোটেপাটে কথা বলত বাপের মুখে মুখে। বলত, ভন্ড, বেইমান তুমি! দুনিয়ার মানুষকে মুসলমানি শেখাতে গেছ তুমি ঘর-সংসার আল্লার হাতে ছেড়ে দিয়ে। পেটে ভাত নাই, পরনে কাপড় নাই, দুনিয়ার মানুষ তোমার বিবি-বেটিদের বে-পরদা দেখে। আর তুমি? তুমি গাঁয়ে-গঞ্জে ঘুরে ঘুরে মুসলমানদের পরদা শেখাও। বাঃ রে আমির ছাহেব, বাঃ![১৪৮]

আনোয়ারার এই প্রতিবাদ বাবার কর্ণকূহরে প্রবেশ করলেও কোনো দায়িত্ববোধ জাগেনি বরং আনোয়ারার কপালে প্রহার জুটত। এই অভাববোধ থেকেই আনোয়ারা কাজের খোঁজ করে জাফর আলির খপ্পরে পড়েছিল। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল আনোয়ারার। গোলাম রসুলকে জানিয়ে দিয়েছিল—

> আমার কথা কোনো খোদার বান্দা আমির ছাহেবের ভাবতে হবে না। আমার ভাবনা আমি নিজে ভাবব। এই শরীর আমার, এই শরীরের ভীতরে যে-জান আছে, তা-ও আমার। আমার জান-মান-দেহ নিয়ে আমার যা খুশি আমি তাই করব। যা ভালো বুঝি, তাই করব। খবরদার! খবরদার! আমারে মহাপাপ করতে বাধ্য কোরো না, আমির ছাহেব![১৪৯]

আনোয়ারার মধ্যে একটা জেদ চেপেছিল, এর আগে সে শিরিনের কাছে একটা সিনেমা বিষয়ক পত্রিকা নিয়ে পড়েছিল। তারপর শিরিনকে প্রশ্ন করেছিল যে সব মুসলমানের মেয়েরা সিনেমা, মডেল বা বিজ্ঞাপণে কাজ করে, শরীর দেখিয়ে, প্রায় উলঙ্গ হয়ে, নোংরা অঙ্গভঙ্গি করে নাচে তারা তো তাহলে কোরান-হাদিস মানে না। এইসব প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পারেনি শিরিন বা শিরিনের আধুনিক শিক্ষা। শিরিন শুধু বলেছিল পয়সা হলে সমাজ কিংবা ধর্ম কেউ কিছু বলতে পারে না বা বললেও কার কি যায় আসে। আসলে আনোয়ারার

মধ্যে একটা প্রতিজ্ঞা ছিল, যেটা গ্রামের স্বচ্ছল ঘরের মেয়েদের মধ্যেও দেখা যেত না। আনোয়ারা পারিবারিক দুর্দশার পাশে তার মনের ঘরে এবং শরীরে একটা দাবদাহ তৈরি হয়েছিল। আনোয়ারার সুডৌল শরীর দেখে ছোকড়া থেকে বুড়ো সকলেরই বাঁকা নজর ছিল। এমনকি মাদ্রাসার শিক্ষক জাকির হোসেনের কাছে ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি পেয়েছিল। কিন্তু সেই ভালোবাসা শরীর পর্যন্ত পৌঁছে বুঝিয়ে দিয়েছিল এসব ভালোবাসা নয়। আনোয়ারার কথায় 'সে আমার লাভার নয় কিন্তু সে আমাকে কিস করে, সবকিছু করে।' আনোয়ারা ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছিল তাই এই ব্যাপারটা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি আর বেরিয়ে আসতে গেলেও বিকল্প কিছু দরকার ছিল। তার স্বপ্ন ছিল—

> সে মুম্বাই যাবে, নাচ শিখবে, গান শিখবে, হোটেলে মদের দোকানে নাচবে, অনেক অনেক টাকা রোজগার করবে— দুবাই যাবে— আম্মান যাবে— আমেরিকা, কানাডা যাবে—[১৫০]

আনোয়ারার এসব সাধ পুরণ হয়নি। তার খুনের কেউ প্রত্যক্ষদর্শী নেই, তবে সবাই জানত কে আনোয়ারাকে খুন করতে পারে। আনোয়ারার ভাই সিদ্দিক জানিয়েছিল আনোয়ারা জেদ করেছিল সে যাবেই তার বাবা তার গলায় হেঁসো চেপে ধরে বলেছিল 'ফের বল' আনোয়ারা বলেছিল 'যাব যাব যাব' তারপর গোলাম রসুলের হেঁসো চলেছিল।

আনোয়ারা পাচার হয়ে যায়নি, কিন্তু সমস্ত সম্ভাবনা ছিল। হারিয়ে যাবার আগে যে পথ ও প্রেক্ষাপট দরকার হয় তা নির্মিত হয়ে গিয়েছিল। এই পথেই তার তিন বোন নাসিফা, জাহানারা, আলিমা হারিয়ে গিয়েছিল। তাদের দাদা সিদ্দিক নিজে তাদের বাসে তুলে দিয়ে এসেছে। আনোয়ারা যেটা পারেনি তার পরের তিন বোন সেই 'জাহান্নাম' এর খোঁজ পেয়েছিল। তাদের নিয়ে গেছে লালি, সে মহালগঞ্জেরই মেয়ে। শিরিনকে সে জানিয়েছিল 'আমার বে হয়েছে লখনৌ শহরের এক রইস ফেমিলিতে, আমার বরেরা নবাবের বংশ।' লালির বাপ ভাই দিনমজুরি করলেও গ্রামে তাদের বাড়ির আতিশয্য চোখে পড়ার মতো ছিল, আর্থিকভাবে স্বচ্ছল এখন লালিরা। আনোয়ারা খুন হয়ে যাবার প্রসঙ্গ উঠতে সে শিরিনকে জানিয়েছিল—

> আন্নুকে আমি বলেছিলাম, আমার সঙ্গে চল, ভালো জায়গায় বিয়ের ব্যবস্থা করে দেব। পয়সার মুখ দেখতে পাবি। ভালো থাকবি, ভালো পরবি, ভালো খাবি। ও রাজি হয়নি।[১৫১]

শিরিনের মায়ের নিষেধে আনোয়ারা রাজি হয়নি। কারণ শিরিনের বাড়ির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ভালো ছিল। লালি পয়সার মুখ দেখেছিল তাইতো তার পরের বোন শায়রাকেও সেই পথ দেখিয়েছিল। এবং তার পরের ছোটো বোন পারভিনকেও নিয়ে যাবে পরিকল্পনা করেই রেখেছিল। এই পথের নারীরা একটা চেইন তৈরি করত, যার মাধ্যমে শায়রাকে কোথায় রেখেছিল লালির মা পর্যন্ত জানত না। তার এক চাচা লালির বিয়ের সম্পর্ক এনেছিল, লালিকে যে নবারের বংশধর বিয়ে করতে এসেছিল তাকে ভদ্র সম্প্রদায়ের লোক বলেও মনে হয়নি গ্রামের লোকের। কিন্তু লালির আর্থিক স্বচ্ছলতা গ্রামের লোকের ঈর্ষার কারণ ছিল। বাংলার গ্রামে মেয়েদের যে দুর্গতি হয় সেই দুর্গতদের মাঝে লালি সৌভাগ্যবতী হয়েছিল। এই সৌভাগ্য অন্য মেয়েরাও খুঁজেছিল একথা বললে একেবারে ভুল হবে না। কারণ—

> না খেয়ে না পরে মুসলমানি ইজ্জতে পরদা ঢেকে বছর বছর রোগাভোগা বাচ্ছা পয়দা করে জীবন কাটাতে এখন আর অনেকেই রাজি নয়।[১৫২]

লালি এই জীবন মেনে নেয়নি, তার রহস্য অধরাই থেকে গেছে। কিন্তু সে যে পণ্য থেকে ব্যাবসায়ী হয়ে উঠেছে তা জানা গেছে। নাসিফা, জাহানারা, আলিমাকে সে নিয়ে যাবার পর দু-মাস সময় নিয়েছিল বলি দিতে। এই দু-মাসে পেট ভরা ভালো খাবার দিয়ে রূপকে দ্বিগুণ করেছে, যেমন ‘বৃষ্টির জল পাওয়া কচি পাটগাছ’ তারপর দেড় লক্ষ টাকায় বিক্রি করেছিল। লালি কোনো বড় মাপের মানুষের সংস্পর্শে থাকে একথা পুলিশের অনুমান থেকে জানা গিয়েছিল। আর তার কোনো স্থায়ী ঠিকানা ছিল না, হায়দ্রাবাদ অথবা উত্তরপ্রদেশের কোথাও থাকত সে, এসব পুলিশের অনুমান ছিল। নাসিফাকে কোনো ব্যক্তি বিয়ে করে কুয়েতে নিয়ে গেছে। জাহানারাকে হায়দ্রাবাদের বেশ্যাপল্লি ‘সোহেলা মঞ্জিল’ এর কর্তা ধর্মা রাও নিজের জন্য ভালো দাম দিয়ে লালির থেকে কিনেছে। তাকে নিয়ে ধর্মা রাও মুম্বাই, গোয়া হয়ে আরও কোথাও ঘুরত। শিশু পাচারকারী সুর্‌মা ধরা পরে গণপিটুনিতে মারা যাবার পর তার বোন নুর্‌মা সঙ্গী বাঁকাচাঁদকে নিয়ে এই ব্যাবসা শুরু করেছিল। লালি নুর্‌মার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করত। কিংবা মেন্তি নামের যে মেয়েটি, যাকে তার প্রেমিক নিয়ে গিয়ে মালদায় কিছুদিন থাকে তারপর পেটে বাচ্ছা এলে মালদা শহরের বেশ্যালয়ে পৌঢ় গনিকার কাছে বিক্রি করে পালিয়ে গিয়েছিল। যাকে নিয়ে শিরিনের স্কুলের ছাত্র কালা

সাহানা বোলানের গান বেঁধেছিল। এই মেস্তি বাচ্ছা কোলে ফিরে এসে এখন পড়াশোনা করতে চেয়েছে। এমন সব কাহিনির বাস্তবায়ন হয়েছিল মুর্শিদাবাদের মেয়েদের দ্বারা।

কলঙ্ক চিহ্ন নিয়ে ফিরে আসা মেয়েরা সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসতে চাইলেও তাদের পরিবার বা সমাজ এখনো সেই স্বাভাবিকতা বা উদারতা দেখাতে পারেনি। তাই অনেকেই ফিরে এসেও পুরোনো পথে পুনরায় চলে যেত। উদ্ধারকারী ‘নন্দিনী’ সংগঠনের কর্মকর্তা সংযুক্তা নৈতিক সাহায্য করত পথবেশ্যাদের। যারা মুর্শিদাবাদ নদিয়ার সীমান্তে ৩৪ নং ন্যাশনাল হাইওয়ের পাশে থাকত। মালা, মমতাজ, পার্বতী, বিলকিস, সুচিত্রা, মাগদালির মতো পথবেশ্যারা রাস্তার পাশে ঘর ভাড়া নিয়ে দেহ ব্যাবসা করত। এরা রাস্তার পাশে ঘর ভাড়া নিয়ে দেহ ব্যাবসা করত। রাস্তার দুধারে আড়াই হাজার এমন পথবেশ্যা আছে, যাদের ভরসা দুরপাল্লার ট্রাক চালকরা। এদের সন্তানেরা এদের কাছে থাকত না, নিজেদের সঞ্চয় দিয়ে সন্তানের লেখাপড়া, বীমা, রোগের চিকিৎসা ‘নন্দিনী’র সাহায্যে করেছে। এদের ইচ্ছা সন্তানেরা অন্যরকম মানুষ হবে, একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ পাবে। এদের প্রত্যেকের একটা অতীত আছে যা প্রায় একইরকম। মালার স্বামী তাকে ছেড়ে চলে গেছে, নিজে বাঁচতে সন্তানকে মানুষ করতে সে এই পথ বেছে নিয়েছিল। মমতাজের বাড়ি বাংলাদেশে, ‘বাংলাদেশের মেয়েদের বে-আইনি এবং অনৈতিক পাচারের একটা বড়ো রাস্তা মুর্শিদাবাদের দেড়শো কিলোমিটার’। ফলে বসিরহাট সীমান্ত দিয়ে তার ভারতীয় প্রেমিক তাকে নিয়ে এসেছিল তারপর স্বামী-স্ত্রীর পরিচয়ে কিছুদিন কাটিয়ে বউবাজারের মাসির কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। অন্যদের কাহিনিও অনেকটা একইরকম। অভিজিৎ সেন মুর্শিদাবাদের কয়েকটি গ্রামের নারীদের কথা শুধু বলেননি সাংবাদিকের মতো তথ্য তুলে ধরেছেন। ভারতের শতকরা বিয়াল্লিশ জন পাচার হওয়া নারী পশ্চিমবঙ্গের আর এই সংখ্যার অধিকাংশ মুর্শিদাবাদের।

সরল স্বভাবের সিদ্দিকের মনে হয়েছিল লালি যদি এত সুখ পেতে পারে তার বোনেরা সুন্দরী হয়েও পাবে না কেন। সিদ্দিকের প্রত্যয় হয়েছিল লালির কথায়, সুন্দর চেহারা ও নরম স্বভাবের বাঙালি মেয়েদের উত্তরপ্রদেশ ও কাশ্মীরের মতো জায়গায় বিয়ের বাজারে খুব চাহিদা ছিল। লালি তার বাবা-মাকে গ্রামে দালান তুলে দিয়েছিল। সবজি বিক্রেতা বাবার ভোটার লিস্টে নাম তুলিয়ে দিয়েছিল, ফলে তাকে অবিশ্বাস করা সম্ভব

হয়নি। কিন্তু এই বাবা-মায়েরা কেউই সঠিকভাবে জানত না তাদের মেয়েদের কার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। তারা কোথায় থাকে, যে শহরের নাম তাদের বলা হয়েছিল শুধু নামটাই জানত। কোনো দিন এই বাবা-মায়েরা মেয়ের বাড়ি যায়নি, তারা জেনেছে তাদের মেয়েরা 'নসিব' ফেরাতে গেছে। এন.জি.ও ও পুলিশি তৎপরতায় ব্যাপারগুলো গুলিয়ে উঠেছিল। বাবা-মায়েদের পুলিশি জেরায় সম্বিত ফেরে, পুলিশ বাস্তবটা তুলে ধরেছিল এই সব অভিভাবকদের সামনে। এই সচেতনতা মানুষের মধ্যে জাগ্রত হওয়া দরকার ছিল। গ্রামে গ্রামে আড়কাঠি আর দালালদের হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে শিক্ষার দরকার। শুধু মুর্শিদাবাদ কেন অনেক জেলার গ্রামেই সেই শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। শিরিন স্কুলে পড়াতে গিয়ে দেখেছিল তার গ্রামের ছেলে-মেয়েরা অনেকেই পড়াশোনায় তেমন ভালো নয়। অভিভাবকদের মধ্যে সেই সচেতনতা আসেনি। অষ্টম শ্রেণি পড়াতে গিয়ে শিরিন দেখেছিল বেশ কয়েকজন বিবাহিত। এবং জানতে পেরেছে গ্রাম থেকে মেয়েদের পাচার হবার কাহিনি এসব ছাত্র-ছাত্রীদের অবিদিত ছিল না। মায়ের চিঠির উপসংহারগুলো এত রহস্যময় ছিল বাস্তবক্ষেত্রে তা তখন বোঝেনি শিরিন। তার ধারণাও ছিল না হাভাতে ঘরের মেয়েরাও কানাডা, আমেরিকা যাওয়ার স্বপ্ন দেখেছে। তার সাতপুরুষের মহালগঞ্জ গ্রাম এমন বিশ্বাসহীনতায় ভুগছে। শিরিন জেনেছিল—

> ইদানীং ভরতপুর, সালা, বড়েঞ্জা, টেঞ্জা, বেলডাঙা, এইসব থানা বা গ্রামের নাম বার বার খবরের কাগজে উঠে আসছে একটা বিশেষ কারণে। খবরের কাগজ এবং টেলিভিশনের খবরেও বিশেষ উদ্‌বেগ প্রকাশ করা হচ্ছে যে, আমাদের এইসব গ্রামাঞ্চল থেকে অল্প বয়সের মেয়ে, এমনকি শিশুও, পাচার হয়ে যাচ্ছে।[১৫৩]

আশঙ্কাও ছিল এসব ঘটনা তার গ্রাম মহালগঞ্জে ঘটছে কিনা। পরে জেনেছিল তার গ্রাম এই তালিকায় আছে। লালি, জাহানারা, আলিমা, নাসিফা, মেন্তি, শায়রা তার গ্রামের মেয়ে। এন.জি.ও 'নন্দিনী'র সঙ্গে যুক্ত হয়ে শিরিন তার গ্রামের মেয়েদের উদ্ধার করতে চেয়েছে, পুলিশের সাহায্য নিয়ে হায়দ্রাবাদের পতিতাপল্লি থেকে শুধুমাত্র আলিমাকে উদ্ধার করতে পেরেছিল। যাকে পতিতাপল্লীতে বিক্রি করেছিল লালি। এই আলিমা অনেক পড়তে চেয়েছিল চাকরি করতে চেয়েছিল। শিরিনের মতো কলকাতায় গিয়ে পড়তে চেয়েছিল। এমন অনেক আলিমা দেশে বিদেশে কারো সেবা দাসী বা যৌন দাসী হয়ে আছে। কিংবা রাস্তার ধারে কোনো ট্রাক চালকের নেশাগ্রস্ত শরীরের নীচে তাদের সপ্নসহ নিষ্পেষিত হয়েছে।

রেডলাইট অঞ্চলের পরিবেশ, কর্তা, দালাল সবমিলিয়ে যে গমগমে পরিস্থিতি তা থেকে পুলিশ বা এন.জি.ও-র ক্ষেত্রে একটা মেয়েকে উদ্ধার করা সহজ কাজ ছিল না। এছাড়াও থাকে নানান প্রতিবন্ধকতা, যুগ যুগ ধরে নারীর পতিত হওয়ার যে ধারা চলে এসেচছে তার জন্য কোনো ভাবেই কোনো একটা সিস্টেমকে দায়ী করা যায় না। আইন সক্রিয়ভাবে কাজ করতেও পারে না, সাবালিকা মেয়েদের জোর করে উদ্ধার করা আইনের ফ্যাকরায় আটকে যেত। কলকাতা বা মুর্শিদাবাদ থেকে গিয়ে হায়দ্রাবাদে বা অন্য প্রদেশ থেকে মেয়েদের উদ্ধার করে আনার ক্ষেত্রে পুলিশকে যে অপারেশন করতে হত, সেটা একপ্রকার লড়াই। প্রশাসন পুলিশ সরকারি বেসরকারি সংগঠন, টেলিভিশন, আদালত, কেউই এসব মেয়েদের পরিণতি বা এসব কাহিনির ধারাবাহিকতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। একবার ঝলমলে আলো, নাচ গান সিনেমা, ভালো থাকা, খাওয়া, হাতে নগদ টাকা এসব পেয়ে অতীতের হাড়ভাঙা পরিশ্রম, আধ পেটা খাওয়া, স্বামীর লাঞ্ছনা এসবে ফিরতে চাইত না মেয়েরা। এদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনাটাও বড়ো চ্যালেঞ্জ। ফিরিয়ে এনে সরকারী বা বেসরকারী হোমে এদের রাখার ব্যবস্থা করা হত কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সেখান থেকেও পালিয়ে যেত। একথা এই উপন্যাসে যেমন আছে বাস্তবেও দেখা যায়। অভিজিৎ সেন এসব তথ্য দিয়ে বাস্তবতার সঙ্গে তার কাহিনিকে একাত্ম করেছেন। পাচারের হিসাবে কীভাবে পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম উল্লেখযোগ্য স্থান ধরে রেখেছিল। বাঙালি মেয়েদের দিল্লি, হরিয়ানা, মুম্বাই, হায়দ্রাবাদে প্রবল চাহিদা, একটা মেয়ের জন্য কুড়ি হাজার টাকা খরচ করলে তাকে আড়াই লক্ষ টাকায় বিক্রি করা যেত। এসব কী উপন্যাসের কাহিনির অঙ্গ নাকি সমীক্ষাজাত তথ্য। 'আনোয়ারা খুন হয়েছে' গল্পের চরিত্র ও কাহিনি যে বিস্তার চেয়েছিল তা অকারণ নয়, সত্যি বিস্তারের প্রয়োজন ছিল সমাজের একটা গোড়ার সমস্যাকে জানতে। এবং তা থেকে সমাধানের উপায় খুঁজতে, নারীকে রক্ষা করতে, আমাদের সচেতন হতে।

৭। প্রেম ও যৌনতা: জটিলতার গ্রন্থিমোচন

প্রেম ও যৌনতা পরিপূরক নয়, প্রেমের মধ্যে যে স্নিগ্ধতা, পেলবতা, কোলমতা আছে যৌনতায় এসবের বালাই নেই। 'ক্ষয়িষ্ণু, যন্ত্রণাময় মানবিক অস্তিত্বে একমাত্র ভালোবাসাই অমৃতশক্তি ধারণ করে' প্রেমের প্রাপ্তির সুখ দীর্ঘস্থায়ী যৌন প্রাপ্তির সুখ ক্ষণিক। তবে মানুষের জীবনে দুটোই অপরিহার্য এবং সত্য, উপেক্ষা করাও কঠিন। অভিজিৎ সেন তাঁর উপন্যাসে প্রেম ও যৌনতাকে এনেছেন মাটি থেকে, মাধুর্য সৃষ্টি করতে রঙ চড়াননি। তিনি প্রেম ও যৌনতাকে মার্জিত রূপে দেখাতে চাননি, বৈধ-অবৈধ, নন্দিত-নিন্দিত সব ক্ষেত্রকে ছুঁয়েছেন। অভাব ও দারিদ্র্য আচ্ছন্ন মানুষের আদিম প্রবৃত্তি দেখাতে কোনো সৌখিনতা আনেননি, বরং নির্লজ্জ প্রকাশকে গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রেমে কৃত্রিমতা ও টানাপোড়েন এনে চমক সৃষ্টি করার দলে অভিজিৎ সেন নেই বরং জটিল সম্পর্কের মধ্যে অবগাহন করে রক্ত মাংসযুক্ত প্রেম যৌনতাকে তুলে এনেছেন তিনি। কখনো প্রেম থেকে স্বাভাবিক যৌনতা এসেছে আবার যৌনতা থেকে প্রেম এসেছে। এই দুইয়ের রসায়নে বাস্তবতা ধরে রেখেছেন লেখক। *বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর* (১৯৯৫), *নক্ষত্র নদী ও নারী* (২০১৫), *নগ্ন নির্জন হাত* (২০০৯) উপন্যাসে তারই প্রমাণ দিয়েছেন।

ক। *বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর*

মানুষের মনের অবাধ গতিকে রাষ্ট্র, আইন, বিচার, স্নেহ, কর্তব্য কিছুই বেঁধে রাখতে পারেনি। বালার মনের গতিকে রুদ্ধ করতে পারেনি এসব কিছুই। মায়নোমতি দু-দিন উপোস করে, দু-ক্রোশ কাদায় ডোবা রাস্তা দন্ডি দিয়ে, বুক চিরে রক্ত দিয়ে বিষহরির কাছে মানত রক্ষা করে সন্তান পেয়েছিল। তার সেই সন্তান বালাকে কোনোভাবেই আটকে রাখতে পারেনি মায়নোমতি। যৌবনের ও প্রেমের ধর্মে বালা জাত, কুল, শুচি-অশুচি উপেক্ষা করে ভেসে গিয়েছিল। বালা তার প্রেমিকা বিদ্যাধরীকে নিয়ে পালিয়েছে, বিদ্যার প্রতি অন্য নারীর এই অধিকার মায়নোমতি মেনে নিতে পারেনি। বার বার সন্তানকে ঘিরে থাকা অতীত জেগে উঠেছে তার। পঞ্চায়েতের কাছে বিচার চেয়েছে মায়নোমতি, পঞ্চায়েত তাকে বিচার দিতে অক্ষম। বালার বাবা রাজকিশোর দশটা তাঁতের মালিক। বালা নিজেও সেই কাজ করত। বালা যে তাঁতে বসে সেই তাঁতের পাড়ডোবার ভিতরে একটা সাপ ঢুকেছিল, এই সাপ শুধু পাড়ডোবায় নয়, বালার ও তার বাবা রাজকিশোরের মনেও প্রবেশ করেছিল। সাপকে যৌনতার প্রতীক হিসাবে ধরে নিলে দেখা যাবে বালা যৌবনের টানে বাড়ি ছাড়া। অন্যদিকে

বালার চিন্তায় নির্ঘুম, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, বিধ্বস্ত বাবা রাজকিশোর কাজের মেয়ের ঝুঁকে ঝাঁট দেওয়া, সুডৌল উরু, গায়ের গন্ধতে আকাঙ্ক্ষাগ্রস্ত হয়েছিল, এসবই যৌনতার পরিচয়।

মায়নোমতি বালার অমঙ্গল স্বপ্নে কাতর হয়ে পড়েছে। তার সন্তানস্নেহ এত প্রবল করে দেখিয়েছেন অভিজিৎ সেন তাতে সে শুধুই একজন মা। সন্তান হারিয়ে তার রক্তক্ষরণ যেন থামতেই চাইছে না। অন্যদিকে তার বাবা রাজকিশোর বাস্তবতা ও যৌবনের টান বুঝেছে। মায়নোমতির সই শৈলীও কামনাকে বোঝে কারণ সে নিজেও দুজন পুরুষের সংসার করেছে। বালার সম্পর্কে মজা করে সে বলেছিল 'সেকালে দেখা হলে মঁয়ই খাইয়ে লিতাম হয়তো বা।' কিন্তু মায়নোমতি যৌবনের ধর্মকে প্রাধান্য দিতে চায়নি, সে শুধু মাতৃত্বের প্রতিরূপ। সে এখনো তার পালিয়ে যাওয়া সন্তানকে কোনো দোষ দেয় না, তাকে ডান নিয়ে গেছে অর্থাৎ বিদ্যাকে ডান বলেছে মায়নোমতি। এলুয়ার দহে ঘূর্ণিতে পড়েছিল বালা, তাই তার মা মায়নোমতির কবিরাজ গুণমানের কাছে সিধা পাঠিয়ে এসব বিপদ থেকে রক্ষা পেতে চেয়েছে। বালা বিদ্যাকে প্রথম দেখেছে কবিরাজের বাড়িতে সিধা দিতে গিয়ে। সিধা নিতে এসেছিল কবিরাজের বউ বিদ্যাধরী—

> সে রকম স্ত্রীলোক সারাজীবনে আর কখনো দেখেনি বালা লখিন্দর। দেখার কথাও নয়। মানুষ সারাজীবনে তো একবারই এরকম দেখে।[১৫৪]

বিদ্যার ঝলমলে রূপ, পোশাক মোহিত করেছিল বালাকে। 'হলুদ ইষ্টিকুটুম পাখির মতো' দেখতে বিদ্যাকে দ্বিতীয়বার বালা যেদিন দেখেছিল সেদিন বিদ্যার হাত থেকে বাতাসা নিতে গিয়ে পড়ে যাওয়া বাতাসা তুলতে উদ্যত দুজনের হাতে হাতে স্পর্শ হয়েছিল। তারপর বালার শরীরে বিদ্যুৎ খেলেছিল। জোয়ান বালা অবিবাহিত, মায়ের কড়া প্রহরায় থাকে সে সে, সুন্দরী পাত্রীর অভাবে তার বিয়ে হয়নি। ফলে এই স্পর্শের গভীরতা বালার কাছে ছিল অন্য রকম। বিদ্যার প্রতি আকর্ষণ ক্রমে বাড়তে থাকে বালার, যাকে সে উপেক্ষা করতে পারেনি। খিদে, ঘুম, কাজ কমে গেল বালার, পরের বার কবিরাজের বাড়িতে এল বালা 'নিষিদ্ধ এক উত্তেজনা' নিয়ে। আলাপ জমিয়েছে বালা সংকোচ কাটিয়ে, বিদ্যা তার বিড়ালকে আদর করলে ঈর্ষাবোধ করেছে বালা। 'ভারী কাঙাল ছিল তারা দুজনেই সেই প্রথম দর্শন থেকেই।' ছাব্বিশ বছরের জোয়ান পুরুষকে মায়নোমতি বোঝেনি, রাজকিশোর

বুঝেছিল কারণ পঞ্চাশ পার করা রাজকিশোর এখনো কাজের মেয়েটির প্রতি কাতর হত প্রেম নয়, যৌন উত্তেজনায়।

বিদ্যাধরী সম্পর্কে মায়নোমতি হাটভাতারি, লুঠ হওয়া, ঢেমনাভাতারি, পাঁচ হাত ঘোরা মেয়েমানুষ একাধিক বিশেষণ প্রয়োগ করেছিল। এসবের সব সত্যি না হলেও এসব বলার কারণ অবশ্য ছিল। বিদ্যার পরিবারের অতীত তার কপালে এসব বিশেষণ লিখে দিয়েছে। বিদ্যার বাবা বিদেশী জামাকাপড়ের একটি ছোট দোকানে বসত। তা থেকে সামান্য রোজগারে কোনোরকম চলত, কিন্তু বিদেশীর চেহারা পোশাক জীবনযাপনে দারিদ্র্য ছাপ ফেলতে পারেনি। চটকদার জীবনশৈলীর জন্য বন্ধুরা বলত 'বিদেশী পাশে দাঁড়ালে আ-ডাকা বাঁজা গাইও গরম হয়ে পাল চাইবে। বিদেশী যেখানে থাকে সেখানেই মেয়েমানুষের ঝামেলা এসে জুটত। জুয়া, মদ মেয়েমানুষে আপত্তি নেই বরং আগ্রহ ছিল বিদেশীর। ফলে সাংসারিক অভাবের মধ্যে চলে বিদ্যার বাবা-মায়ের সংসার। তবুও—

> তারা সুন্দর, সবাই সুন্দর, সে, তার বাবা, তার মা— তারা সবাই উজ্জ্বল চেহারার মানুষ। একখাবলা তেল যদি পেল কোনওদিন, তবে সেইদিনই ঝলমলিয়ে উঠত তাদের রূপ। একসন্ধ্যা যদি পেট ভরে খাওয়াদাওয়া জুটল, তো সাতদিন ধরে তাদের চেহারা চিক্কণতা দেখাত।[১৫৫]

এসবের পরে বিদ্যার মা বকুলবালা রোগে ভুগত। যে রোগে তার মাসিক বন্ধ হত না, শরীরের সমস্ত রক্ত বেরিয়ে যেত। রোগের চেয়ে ছেঁড়া কাপড় জোটানো কঠিন হয়ে পড়ল। সে সংসার উদাসীন স্বামী বিদেশীর মন বুঝে একদিন ছেঁড়া কাপড়ের বিকল্প সরূপ প্যাকেটের জিনিসটি চেয়েছিল। যুবতী বিদ্যা ও বকুলবালা জেনেছিল প্যাকেটের জিনিসটি শুধু মাসান্তিক নিগ্রহের পট্টি নয় রোগ থেকে উদ্ধারের উপায়ও। তাতে বিদেশী গালাগাল দিয়ে তিরস্কার করেছে বকুলবালাকে। এসবের পরেও যখন কিছুটা রক্ত জমত বকুলবালার শরীরে, তাতে তার রূপ ফুটে উঠত তখন বিদেশী সংসারে মনোযোগ দিত। বিদেশী স্ত্রীকে ভোগ্য বস্তু ছাড়া কিছুই ভাবেনি, যতক্ষণ স্বাদ থাকে ততক্ষণ গুরুত্ব দেয় তারপর অন্য কোথাও আসর জমায়। এমনভাবেই একদিন ঘটনাক্রমে বাসের মধ্যে এক যুবতীর চোখে আগুন দেখল, বিদেশীর অসম্ভব এই ক্ষমতা ছিল। যুবতীর নাম সনেকা, তার সঙ্গে ছিল মাসিশ্বাশুড়ি সরস্বতী। সরস্বতীকে সামনে রেখে সনেকার সঙ্গে এক বিচিত্র খেলায় মেতে উঠেছিল বিদেশী। 'জোয়ারের জলে ভেসে আসা নৌকা, তার দেহের উপরে ছইয়ের ঢাকনা

নেই’ এমন মেয়েটির সঙ্গে লোকদেখানো একটা সম্পর্ক পাতিয়ে নিয়ে সর্বনাশা খেলায় মেতেছিল বিদেশী, তাতে বকুলবালাকেও সামিল করেছিল। পাতানো সম্পর্কের জন্য বকুলবালার কোনো আপত্তি ছিল না। সরস্বতী বকুলবালাকেও জয় করে নিয়েছিল কারণ তাকে জয় করতে দুটো ছেঁড়া শাড়ি আর একটা নতুন আয়না যথেষ্ঠ ছিল। সরস্বতী বকুলবালার কাছে বিদেশীর একটা ভাগ চেয়েছিল ছিনিয়ে নিতে চায়নি। সরস্বতীকে ব্যবহার করে সনেকাকে নষ্ট করতে বেশি সময় লাগেনি বিদেশীর। বিবেচনা শূন্য দুর্দম প্রেম ও যৌন আবেদনে কোনোকিছুই বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি বিদেশী-সনেকার কাছে। সনেকাকে নিয়ে বেপাত্তা হয়ে গেল বিদেশী। স্ত্রী কন্যাকে পথে নামিয়ে দোকান বেচে ধার দেনা করে নানা তীর্থস্থান ঘুরে দেড় বছর পর অন্তঃসত্ত্বা সনেকাকে নিয়ে বাড়ি ফিরেছিল। ততদিনে বিদেশী বুঝেছিল ‘চেহারা নিজের আর অন্যের সব্বোনাশ করে।’ তার এই বোধের খবর আর কেউ নেয়নি, নেওয়ার উপায় ছিল না। যে যৌনতার খেলায় মেতেছিল বিদেশী তাতে সে একটা ঘোরের মধ্যেই ছিল। সনেকার স্বামী কেদারের পক্ষ থেকে আঘাতটা জোরালো আসে। কেদারের দাঙ্গাবাজ ভাইয়েরা বাজারে হাজার লোকের সামনে একটা ইচ্ছাকৃত সন্ত্রাস তৈরি করে, সাক্ষী রেখে, বিদেশীকে খুন করেছিল। বিদেশীর মধ্যে প্রেম এসেছে এমন প্রমাণ তার সারাজীবনের ঘটনা ধারায় পাওয়া যায়নি, তার উদ্দেশ্য একটাই, যৌনতা। কামুক স্বভাবের বিদেশীর পছন্দ অপছন্দর একটাই মাপকাঠি ছিল, নারীর চোখের ও দেহের আগুন মাপতে পারত, তার যে কোনো নারী হলেই চলত।

বিদ্যাধরীর রূপকে তার মা খুব যত্নে রেখেছিল, কারণ সে চাইত কোনো সুপুরুষ তার মেয়েকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। বিদ্যার শারীরিক সৌন্দর্য ধরে রাখতে নানান লৌকিক উপাচার করেছে বকুলবালা। তবুও তার শুচিতা ধরে রাখতে পারেনি। ট্রাক চালকের যৌন পিপাসার শিকার হয়েছে বিদ্যা। অদৃষ্টের এই পরিহাসে সমাজে সে পরিহাসের পাত্র, বৃদ্ধ কবিরাজ বিদ্যার এই দুর্বলতাকে আশ্রয় করে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করতে চেয়েছে। বিদেশীর বেপাত্তা হবার পর ধান সিদ্ধ করার কাজ করেছে মা-মেয়ে। ভোর রাতে ধান শুকোবার জায়গা ধরতে গিয়ে লরি চালকের দ্বারা অপহৃত হয়েছিল, দশদিন পর বিদ্যাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল লরি চালকর, এই দশ দিন ধর্ষণ করার ফলে গর্ভবতী হয়েছে বিদ্যা, তা থেকে রেহাই পেতে কবিরাজের আশ্রয়ে এসেছিল। বৃদ্ধ কবিরাজের দু-বার সংসার করা হলেও তার স্ত্রীরা কেউ বেঁচে নেই। তাই সে গর্ভবতী বিদ্যাকে রেখেছিল শুধু তার

নিজের বংশধারা বজায় রাখতে। বিদ্যার ভরা যৌবন কবিরাজের যৌন কামনাকে জাগিয়ে তুলতে চাইত, শিকড় বড়ি খেয়ে বিদ্যাকে কাছে টানত কবিরাজ। বিদ্যার উন্মুক্ত বুকের দিকে তাকিয়ে থাকত, স্পর্শ করত, ক্ষোভ বাড়ত, সম্ভোগের পুরোনো স্মৃতি জেগে উঠলেও শরীর জেগে উঠত না। কাঁপা কাঁপা হাতে বিদ্যার শরীরের বস্ত্র একটার পর একটা খুলত কবিরাজ, শুধু অসহায়ের মতো এসব করত আর বিদ্যাও নিজেকে অসহায়বোধ করত। রাত হলে মানুষটা সোহাগ পেতে চাইত শিশুর মতো, হতাশায় কেঁদে ফেলত বিদ্যা—

> পরিপূর্ণ একটি শরীরের পাশে কৃশকায় এক জরার ভৌতিক ছায়া দেওয়ালে কাঁপত। বুক ফেটে কান্না বেরিয়ে আসতে চাইত তার, তবুও কবিরাজকে বাধা না-দেওয়া ছাড়া আর কোনোওরকম সহযোগিতা করতে পারত না সে।[১৫৬]

কবিরাজের এই ব্যর্থ প্রয়াস বিদ্যার যৌন আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়েছিল শুধু, কোনো তৃপ্তি দিতে পারেনি। এই অতৃপ্তির সুযোগ নিতে চেয়েছিল কবিরাজের শিষ্য শংক। বিদ্যা জানত করিরাজের এই সম্ভোগ প্রচেষ্টার পুরো দৃশ্য দরজার ফুটোয় চোখ রেখে দেখত শংক, বিদ্যার হতাশা যদি তার সৌভাগ্যের কারণ হয় এই আশায়। শংক শুধু যৌনতা দিয়ে বিদ্যাকে পেতে চেয়েছিল, যেভাবে ট্রাক চালকরা চেয়েছিল। তখনও বিদ্যা বাধা দিলেও কিন্তু সে বাধা তার কুমারীত্ব বাঁচাতে পারেনি। তবে কবিরাজ বিদ্যাকে কন্যা-স্ত্রীর মিলিত এক অদ্ভুত ভালোবাসায়, স্নেহে চেয়েছিল, বালা চেয়েছিল শুধু ভালোবাসায়। শংক যেদিন বিদ্যাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরেছিল সেদিনেই বাধা দিয়েছে বিদ্যা, তারপর শংককে অদ্ভুত উপায়ে খুন করেছে বিদ্যা। বিদ্যা জানত শংককে সারাজীবন ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। যেদিন ঝড় বৃষ্টির রাতে কবিরাজ ব্যর্থ চেষ্টা করে ঘুমিয়ে গেল, বিবস্ত্র বিদ্যা মূর্তির মতো বসেছিল। ঘরে কবিরাজের রাখা সাপিনী ছিল, তারপর একটা প্রকান্ড সাপকে বিদ্যা ঘরে দেখেছে। ইঁদুর বা কবিরাজের সাপিনীর গন্ধে এসেছে সাপটি। কবিরাজ তো মূর্তিমান সাপিনী সরূপ বিদ্যাকেও রেখেছিল যার টানে শংকর মতো সাপ মিলনের আকাঙ্ক্ষায় এসে পড়েছে। বিদ্যা জানত দরজায় কে আছে, তাই হুড়কোটা খুলে দিল। আলোর টানে পতঙ্গ যেমন এগিয়ে আসে শংক আহ্বান মনে করে ঘরে প্রবেশ করেছিল। তার লালসা চরিতার্থ করার সুযোগকে কাজে লাগাতে এগিয়ে এসেছে বিদ্যার দিকে। তারপর—

> সেখান থেকে সে বসে থাকা বিদ্যার নিতম্বের সুদৃশ্য ডৌল দেখতে পেল। দেখতে পেল পরিপূর্ণ স্তনের একটি, অন্যটির অংশ এবং তাদের নীচে বিদ্যার ঈষৎ উঁচু পেট।[১৫৭]

নেশাগ্রস্ত শংক এগিয়ে গিয়ে সাপের ছোবল খেয়ে আর্তনাদ করে বেরিয়ে গিয়েছিল, ঝড় বাদলের রাতে জল কাদায় শংকর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে পরের দিন। এ ধরনের হিংস্রতা যৌনতাতে সম্ভব। এমন উন্মত্ততা কামনা তাড়িত হলেই সম্ভব যেটা শংকর হয়েছিল। সাপের উপস্থিতি গর্জন তার কানে পৌঁছায়নি, এমনই কাতর হয়েছিল সে।

বালার জীবনে প্রথম প্রেমের উন্মেষ ঘটেছে, তাই বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে বালা প্রথম প্রেমের যাবতীয় সুন্দর মুহূর্তগুলো হৃদয়ে ধারণ করতে চেয়েছে। তার শরীর ও মনে অনভিজ্ঞ প্রেমিকের যাবতীয় লক্ষণ ফুটে উঠেছে। খিদে ঘুম চলে গেছে, কাজে মন ছিল না, তাঁতে বসে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে উদাস হয়েছে। অসুস্থতার ঘোরে বিদ্যার বিড়াল বেনারসীর ও বিদ্যার নাম ধরে বিড়বিড় করতে থাকে। মহেন্দ্রর মুখে বিদ্যার যাবতীয় পারিবারিক কেলেঙ্কারি ও বিদ্যার অসম্মান শুনে রাগ করেছে। এসব লক্ষণে বোঝা যায় বালা সত্যি একজন প্রেমিকের মুকুট পড়েছে। এতগুলো যৌন দৃশ্যের মাঝে অভিজিৎ সেন বালাকে প্রেমিক হিসাবে স্থাপন করেছেন তার আপন দক্ষতায়। প্রেম যে অন্ধ, নিয়তি নির্ধারিত তা বালাকে দিয়ে বুঝিয়েছেন। বালা ও বিদ্যার কথোপকথনে বালা বিদ্যার অতীত জেনেছিল। যে মেয়ের পিছনে, খুন, ধর্ষণ অভিশাপের মতো লেগে ছিল তাকেই বালা গ্রহণ করতে চেয়েছে নির্দ্বিধায়। ততদিনে বেনারসীর আদর প্রাপ্তি ও বৃদ্ধ গুণমানকেও বালা ঈর্ষা করতে শুরু করেছিল। প্রেমে পড়া মানুষ নিতান্ত ছেলেমানুষ হয়ে যায় আর তার চারপাশের মানুষকে সহ্য করতে পারে না, ধৈর্য ধরতেও পারে না। বালা-বিদ্যার দু-বছরের সম্পর্কের পর কবিরাজের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ বিদ্যা, কবিরাজের বন্ধনকে ও বালার আহ্বান উপেক্ষা করা দুটোই অসাধ্য ছিল বিদ্যার কাছে। বিবেকের দংশনে কাতর বিদ্যা পীড়া অনুভব করেছে, বার বার মনে হয়েছে কবিরাজকে সে ঠকাচ্ছে না তো। বালার এসব বোঝার সময় ছিল না কারণ 'তার তরুণ যৌবন ভীষণভাবে বিদ্যার শরীর চাচ্ছিল।' বালার এই উত্তরণ বিদ্যার প্রতি প্রেম থেকেই এসেছিল নির্দিষ্ট পথ ধরে। স্ত্রী সংসর্গে অনভিজ্ঞ বালাকে স্ত্রীসঙ্গের অভিজ্ঞতা লাভ করতে হয়েছে বিদ্যার কাছ থেকেই। দাওয়ায় বসে গোমা সাপের কসরত নিয়ে আলোচনা করেছিল বিদ্যা ও বালা কিন্তু কখন তাদের মনের মধ্যে সেই সাপ প্রবেশ করেছে তা টের পায়নি। বিদ্যার শরীর ক্রমশ বাড়ছিল—

> সেফটিপিন খুলে যেতে বিদ্যার প্রচুর এবং ভারী স্তনদ্বয়ের বিস্তৃত গোলাপি আভাস অন্তত আধাআধি দৃশ্যমান হল। বিদ্যা তার ডান-পা চৌকাঠের ভিতরে ঢুকিয়ে বাঁ-পাও টেনে নেবার আগে অন্তত আরেকবার পিছন ফিরে বালার চোখে তাকাল। বালা সেই চোখের ভিতরে আবহমান কালের আহ্বান দেখল।[১৫৮]

অনিভিজ্ঞ বালা দস্যুর মতো বিদ্যার খোলা বুকের আশ্রয় নিতে গেলে সেফটিপিন হাতে বিদ্ধ হয়েছে। দুজনেই সেদিন ভয়-ভীতি, লোকাচার ভুলে গিয়েছিল। রক্তাক্ত হয়েই যৌন স্বাদ পেয়েছে বালা। কবিরাজ মারা যাবার আগে বিদ্যাকে বলেছিল সে যেন তার মনের মতো মানুষের সঙ্গে ঘর বাঁধে। বালা তার সেই মনের মানুষ, যে গভীর প্রেমে জিতে নিয়েছিল বিদ্যার জীবন-যৌবন।

বালা এলুয়ার দহে পড়লে ভয় পেয়েছিল মায়নোমতি। কবিরাজের মৃত্যুর পর তার বিধবা বিদ্যাকে নিয়ে বালা সেই এলুয়ার দহ দিয়ে নদীতে ভেসে গিয়েছিল, এখন এলুয়ার দহকে ভয় নেই। দুহাতে নৌকা ঠেলে জলের গভীরে দিকে গেছে। নৌকার একপাশে জবুথবু, মৃত্যুপযাত্রী কবিরাজের সেবা করে ক্লান্ত বিদ্যা বসে অনিমেষ দেখেছিল তার প্রেমাস্পদ দৈবপুরুষ বালাকে। রাতের নদীতে বালা বিদ্যার এই অভিসারে বিদ্যা হারিয়ে গিয়েছিল বেহুলার ভেসে যাওয়ার মিথে। বিদ্যাধরী বিহ্বল হয়ে পড়েছে, সমস্ত ভয়, হতাশা, লোভ জয় করেছিল এই পুরুষটির পথ চেয়ে। নৌকা থেকেই বিদ্যা দেখেছিল কবিরাজ চিতা থেকে মুখখানা নদীর দিকেই করে আছে। একখানা শীর্ণ বরাভয়ের মতো হাত চিতা থেকে বেরিয়ে এসেছে, বিদ্যার মন হু হু করে উঠেছিল। কবিরাজ দানপত্রে বিদ্যাকে সব সম্পত্তি দিয়ে গেছে কিন্তু বালা বিচারসভায় জানিয়েছিল—

> কবিরাজ গুণমানের সম্পত্তির উপর হামার লোভ নাই, দাবি তো না-ই। মঙ্গলার মায়ের থানৎ মায়ের সিঁদুর ছোঁয়ায়া মঁয় যাক বিহা করিছি, তার খাওয়া পরা মঁয়ই জুটাবা পারমো, এ বিশ্বাস হামার আছে।[১৫৯]

প্রেম বালাকে পরিণত করেছে, দায়িত্বশীল করেছে, বালা এখন চ্যাংড়া নয়, কর্তা হয়ে উঠেছে। বিচার সভার শেষে বিদ্যা ও বালার দিকে তাকিয়ে রাজকিশোর ভেবেছে ‘কী মানিয়েছে দুজনকে, যেন সত্যি বেহুলা লখিন্দর।’ একটা বয়সে মুনিঋষি চরিত্রের মানুষও নির্লজ্জ হয়ে হয়ে যায়, মনে পড়েছে তার প্রথম যৌবনের কথা। মা মারা যাবার পর অশৌচের কৃচ্ছসাধনের বিছানায় স্ত্রীকে নামিয়ে এনেছিল ঘুমন্ত শিশুর মুখ থেকে স্তন বৃন্ত

ছিন্ন করে। বালাও আজ চলেছে ‘প্রেমের দুঃসাধ্য যাত্রাপথে, যেখানে স্বপ্ন এবং কুহক বাস্তবের থেকে অনেক বেশি বাস্তবিক।’ কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে যাওয়া মায়ের গতি অন্যদিকে, বিদ্যার প্রেম কোনদিকে যাবে সাময়িক এই ভাবনা দিশেহারা করেছিল বালাকে। মাকে বলেছিল ‘তোর মোর সুখ দুঃখের বাইরে আরও কিছু থাকে।’ বালা খুবই অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিল, মায়ের আঁচলের ছায়ায় বেড়ে ওঠা বালা আজ সমাজ, জীবন, নারী, সুখ-দুঃখ বুঝে গেছে শুধু প্রেমের শক্তিতেই, তার এই শক্তির উৎস বিদ্যাধরী একথা সে জানত।

মানুষের জীবনে প্রেম ও যৌনতার যে অনিবার্য গতি আছে তাকে উপলব্ধি করেছেন অভিজিৎ সেন এই উপনাসে। অসংখ্য প্রতীকের মধ্যে, বকুলবালা ও মায়নোমতির মতো নারীর জীবনের বুক ফাটা কষ্টের মধ্যে এই উপন্যাস এগিয়ে চললেও একটি প্রেম ও একাধিক যৌনতার পরিমণ্ডলের অকৃত্রিম উপস্থাপন এই উপন্যাসকে সত্যের সন্ধানে ব্রতী রেখেছে। কোথাও এতটুকু সৌখিনতা নেই, হিংস্রতা, ভয়াবহতা সবকিছুর মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনের চরম সত্য উন্মোচিত হয়েছে। বিদেশীর খুন যারা করল তারা সমাজের রক্তচক্ষু প্রহরাকে উপেক্ষা করে নিজেদের সঘোষিত ভয়াবহ কানুন স্থাপন করেছে। বিদ্যা নিষ্ঠুরতার সঙ্গে শংককে খুন করেছে, মায়ের কাছ থেকে ছেলেকে জিতে নিয়ে তৃপ্তি পেয়েছে। বিদেশী, রাজকিশোর, শৈলী, শংক, ট্রাক ড্রাইভার, সনেকা এমনকি বালার যৌন আকাঙ্ক্ষার মধ্যে এতটুকু অস্বাভাবিকতা নেই। আবার বালার প্রেমের দুর্বার গতিতে কোনো চতুরতা, কোনো কৃত্রিমতা লেখক দেখাননি। প্রেমে ও যৌনতায় মানুষ যে কী পরিমাণ আত্মপ্রকাশ করে, সমস্ত রহস্যময়তার আবরণ খসিয়ে ফেলে উন্মুক্ত হয় তা পরতে পরতে দেখিয়েছেন লেখক।

খ। *নগ্ন নর্জন হাত*

অভিজিৎ সেনের উপন্যাসে প্রেম এসেছে বাস্তবের ভূমি থেকে, সে প্রেমে কোমলতা, মাধুর্য, যৌনতা, হিংস্রতা স্বার্থপরতা সবই ছিল। মানুষের জীবনাচরণে প্রেমকে লেখক অভিন্ন ভাবেননি। কিন্তু সম্পূর্ণ প্রেমকে আশ্রয় করে *বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর* এবং *নগ্ন নির্জন হাত* উপন্যাস লিখেছেন, এই দুটি উপন্যাসের মধ্যে কোনো তুলনা অপ্রাসঙ্গিক। *বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর* উপন্যাসের প্রেম অন্য মাত্রা এনেছে সেখানে *নগ্ন নির্জন হাত* অনেকটা সৌখিন প্রেমের কাহিনি, অতৃপ্ত প্রেমের উপাখ্যান। তবে উপন্যাসে বয়ঃসন্ধিক্ষণের অবিবেচক

প্রেমিকের শরীর মনে প্রেমের লক্ষণ কীভাবে ফুটে ওঠে এবং অতৃপ্তির আগুনে পুড়ে প্রেম কীভাবে অন্তরের ব্যাকুলতাতে ঘুরপাক খায় তার আভাস দিয়েছিলেন লেখক।

কৈশোরের একতরফা প্রেমে ন্যায়নীতির বোধ বিশেষ থাকে না। সুশান্ত তার বন্ধু মৃণালের মামাতো দিদি সুপ্রিয়াকে বড়দি বলেই ডাকত, কিন্তু সুশান্ত ক্লাস এইটে পড়ার পর থেকে প্রায় দেড় বছরের বড় সুপ্রিয়ার সম্পর্কে ভাবনা অন্যদিকে বইতে শুরু করেছে। সুশান্ত ও সুপ্রিয়ার কবিতা আসক্তি তাদের কাছাকাছি আসার একটা উপায় করে দিয়েছিল। ফলে অন্য ভাবনাও গতি পেয়েছে। এভাবেই সুশান্তর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সময়টা অর্থাৎ যে বয়সে যুবকরা দুর্বার হয়ে ওঠে, শরীর ও মনে প্রেমের লক্ষণ ফুটে ওঠে সুশান্তরও তাই হয়েছিল। নিরালায় পড়ার অভ্যাস করতে গিয়ে নিঃসঙ্গ কাটিয়েছে। বইয়ের এক পাতায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে থেকেছে, খিদে, ঘুম উধাও হয়েছে। বাস্তবের দিকে ভাবনা দু-একবার এগিয়ে গেছে যেমন সুশান্ত ভেবেছিল, সুপ্রিয়ার সঙ্গে তার মিলন কোনোভাবেই সম্ভব নয়। কারণ আর দু-তিনবছরের মধ্যে সুপ্রিয়ার বিয়ে হতে পারে অন্যদিকে তার প্রতিষ্ঠিত হতে আট-দশ বছর লাগবে। তাছারা সুপ্রিয়ার দিক থেকে তেমন কোনো ইঙ্গিত এখনো আসেনি। সুশান্ত কোনোরকমে এই যুক্তিকে জীবনে কাজে লাগাতে পেরেছিল। তার এই একতরফা প্রেমকে দমিয়ে দিতে পেরেছিল তবে সেটাও সাময়িক। জীবনের অনেকগুলো বছরে পার করে বুঝতে পেরেছে হৃদয়ের গোপনে সেই প্রেম সংরক্ষিত ছিল অজান্তেই, যা পরে দুর্বার হয়েছে। সুপ্রিয়ার ছেলের পৈতে উপলক্ষে সন্তোষ মামার সঙ্গে সুপ্রিয়ার বাড়ি যাবার পথে পূর্বপ্রেমের কথা ভেবে সুপ্রিয়ার প্রতিক্রিয়ার কল্পনা করতে থাকে সুশান্ত। সাঁইত্রিশ বছরের অবিবাহিত জীবনের ভয়, হতাশা, ঈর্ষা তাকে পেয়ে বসেছিল। সুপ্রিয়ার বাড়ি যাবার পথে বাস থেকে সন্তোষ পেচ্ছাপ করতে যাবার নাম করে অদৃশ্য হয়েছিল। ফলে সুশান্ত উদ্বিগ্ন হয়ে সন্তোষের পরিচিত নিত্যানন্দের হোটেলে রাতে আশ্রয় নিয়েছিল। সেখানে পাশের ঘরের দম্পতির সহবাস তাকে পীড়া দিয়েছে, সুশান্তর শরীর যৌনতায় জেগেছিল। সন্তোষের সন্ধান নিয়ে জানা যায় সে এক ভৈরবীর কাছে গেছে যার কাছে বার বার যেত সে।

সতের বছর পর সুপ্রিয়ার সঙ্গে দেখা হয়েছে সুশান্তর। মনের মধ্যে কল্পিত নায়িকার আগের রূপ আর নেই, অনেক বেশি ঝলমলে হয়েছে সুপ্রিয়া। সুপ্রিয়ার বিয়ের পর তার থেকে ইচ্ছে করে দূরে থাকতে চেয়েছে নাকি মনে মনে ভীষণভাবে কাছে আসতে চেয়েছে

যৌবন পার করে এসে সেটাই বুঝতে চেয়েছে সুশান্ত। যতদিন দেহ জাগেনি অর্থাৎ প্রথম প্রেমের উন্মেষের দিনগুলিতে বার বার সুপ্রিয়ার কাছে কিসের টানে ছুটে যেত সুশান্ত তা সাঁইত্রিশ বছর বয়সে সুপ্রিয়ার বাড়িতে স্নানের ঘরে আয়নার সামনে বিবস্ত্র দাঁড়িয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছে। একতরফা ব্যর্থ প্রেমিকের যাবতীয় অস্থিরতা তাকেও তো সহ্য করতে হয়েছে। প্রথম যৌবনের নির্ভেজাল প্রেমে কবেই যে যৌবনের ধর্ম এসে গিয়েছিল তা বুঝতে না পারলেও আজ উপলব্ধি করেছে। যেদিন সুপ্রিয়ার ব্লাউজের একটি হুক খুলে গেলে গোপন অঙ্গ দেখে সুশান্ত বুঝেছিল 'বিগত চার বছর ধরে শরীর বিস্ময়করভাবে নিজের অস্তিত্ব শুধু নয়, কর্তৃত্বের দাপটও ক্রমশ জানান দিচ্ছিল।' বয়ঃসন্ধিক্ষণের জেগে ওঠা শরীরকে দমন করা সমাজের সর্বকালের নিয়মের মধ্যে পড়ে, তবে—

> বয়ঃসন্ধি এবং যৌবন পরিবার কিংবা সমাজের নয়, প্রকৃতির সম্পত্তি। ফলে যে সব আচরণকে স্বেচ্ছাচার কিংবা বদামি বলে, হাজার বিধি নিষেধ থাকলেও মানুষ সে সবের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় না।[১৬০]

সুশান্ত যৌবন অতিক্রম করার পরে টের পেয়েছে শরীরের ও মনের কর্তৃত্ব। সেদিনের মতো অনুভূতিগুলো আজও জেগে আছে মনে। জীবনানন্দের 'নগ্ন নির্জন হাত' কবিতার সঙ্গে সুপ্রিয়ার নগ্ন নির্জন ডান হাতের কী সাদৃশ্য আছে তা সুপ্রিয়া খুঁজেছে, সুশান্তও খুঁজেছে। না পাওয়ার যন্ত্রণা তৃপ্ত করতে যত পদ্ধতি রপ্ত করেছে সে সবের ব্যর্থতা বিক্ষুব্ধ করেছে সুশান্তকে। সুপ্রিয়াকে ভুলতে না পারা, এতদিন অবিবাহিত জীবনের গ্লানি তাকে বিব্রত করেছে বার বার, আজ আবার নিজেকে বেয়াব্রু দেখল সুপ্রিয়ার সামনে। মধ্য বয়সের সুপ্রিয়াকে দেখে তার হয়তো অর্থহীন অজৈব রোমান্টকিতা থেকে মোহমুক্তি হবে ভেবেছিল সুশান্ত কিন্তু তা হয়নি। সুপ্রিয়ার শরীর তাকে বার বার বিশৃঙ্খল করেছে।

আজ দুজনেই যে বয়সে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে সমাজের উচিত অনুচিত বোধ তাদের না মানলেও হবে। তবে নতুন কোনো বিপর্যয় সম্ভব নয় আর, হলেও কি এসে যায়। এত বছর পরে সুশান্তর অবিবাহিত জীবন নিয়ে সুপ্রিয়ার অহংকার বোধ এসেছে। সুপ্রিয়ার মনের মধ্যেও সেই অব্যক্ত প্রেম জমেছিল যাকে সে সুশান্তর কম বয়সের ছেলেমানুষি ভেবেছিল। আজ সেসবের বাস্তবতা নিজের মুখে ব্যক্ত করেছে সুপ্রিয়া। কিন্তু ছেলেমানুষীর গভীরতা সুপ্রিয়ার মধ্যেও ছিল, তাই আজ সুশান্তর হাত ধরে নেশাগ্রস্ত স্বামীকে পরনারীর

কাছে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত করতে অনুরোধ করে। মদ্যপান করে অচৈতন্য অবস্থায় স্বপ্নে বাস্তবে সুপ্রিয়ার সঙ্গে মিলনের মধ্য দিয়ে সুশান্তর মনে হয়েছিল—

> ভৈরবীর মন্দির চাতালের সেই সাপটার কথা মনে পড়ল আমার। মৃত্যুর ধার ঘেঁষে এসে কি আমার এমন তীব্র ভোগসর্বস্ব জীবনের আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছে?[১৬১]

সন্তোষ মামার থেকে আলাদা করতে পারেনি নিজেকে। সন্তোষ তাকে যেভাবে বিব্রত করেছিল, সুশান্ত তা ভুলে গেল অন্যমনস্কতায়। ভৈরবীর চাতালের সাপটা শুধু সন্তোষের মধ্যে নয় তার মধ্যেও প্রবেশ করেছে, যে সাপকে সে ভয় পেয়েছিল অনেক। মধ্য বয়সে দাঁড়িয়ে সারাজীবনের হতাশা দুশ্চিন্তার অস্থিরতার নিষ্পত্তি হয়নি। উদাসীনতা নিয়ে সে আর বাঁচতে পারবে না, কারণ সুশান্ত উপলব্ধি করেছে তার ভিতরের 'ঘুমিয়ে থাকা চিতাবাঘ তার অতৃপ্ত বিরংসা এবং ক্ষুধা নিয়ে জেগে উঠেছে' এখান থেকে নিস্তার পাওয়া কঠিন। তাই সন্তোষের মতো ছুটে গেছে ভৈরবীর কাছে, তন্ত্র-মন্ত্রের সাহায্যে অসাধ্য সাধন করতে। ভৈরবীর কাছে অমোঘ শক্তির মন্ত্র নিয়ে সারাজীবন ভুলতে না পারা প্রেমিকাকে লাভ করতে। মন্দিরের চাতালে সটান শুয়ে পড়েছে সে, আজ আর গোক্ষুর সাপকে ভয় পায়নি আসুক বেরিয়ে, হয় গোক্ষুর, নয়তো ভৈরবী।

উপন্যাসে আর একটি প্রেমের পর্ব আছে, বার্ধ্যকের প্রেম। যার মহিমা যুবক-যুবতীর বোঝা সহজ নয়। উপন্যাসের মৃণালের মামা সন্তোষ কুমার চক্রবর্তী এক ভৈরবীর প্রেমে উন্মাদ ছিল। যে ভৈরবী নাকি তাকে বাতাসে বাণ মেরে টেনে নিত, সন্তোষের পরিবারের একথা অজানা নয়। *নিম্নগতির নদী* উপন্যাসের ত্রিদিব বার বার দেয়াশিনীর কাছে ছুটে যেত শুধু কষ্ট ভুলতে নয়, তার প্রতি প্রেমের টানেই। সন্তোষও শুধু মরে যাওয়ার দুশ্চিন্তা থেকে নয়, অন্য কিছুর টানেও ছুটে যেত ভৈরবীর কাছে, মৃত্যুভয় তাকে পেয়ে বসেছে, ভৈরবীর প্রেম তার আয়ু বাড়াবে এই তার বিশ্বাস।

প্রেম ও যৌনতা ভীষণ শক্তিধর, এই দুয়ের মিলিত শক্তিকে বাগে আনা মানুষের অসাধ্য হয়ে যায় কখনো কখনো। শুধুমাত্র প্রেমের প্রবাহকে সারাজীবন ধরে আটকে রেখেছিল সুশান্ত। কিন্তু তার সঙ্গে যৌনতা এসে মিশে গেলে তাকে আর আয়ত্তে রাখা সম্ভব হয়নি—

> ক্রমশই আমি টের পেতে লাগলাম আমার এতকালের ধৈর্যশীল, দুঃখী, নিরূপায় জীবনটা বদলে গেছে। আমার ভিতরের যুক্তিবাদী নাগরিক অভ্যাস সংস্কারে অভ্যস্থ মানুষটির মৃত্যু হয়ে গেছে।[১৬২]

ভৈরবীর কাছে গিয়ে সে মুক্তি চেয়েছে ঠিকই সে কৃচ্ছসাধনে নয়, প্রাপ্তিতে। ক্রমশ বেগবান যে অস্থিরতা তাকে চৌচির করেছে তা থেকে মুক্তি পেতে অসাধ্য সাধন মন্ত্র চেয়েছে ভৈরবীর কাছে। উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীসহ বাহ্যিক আবরণে সৌখিনতা থাকলেও মনস্তত্ত্বের গভীরতর স্তরকে উন্মোচন করেছেন অভিজিৎ সেন তাঁর সহজসাধ্য ভঙ্গিতে।

গ। *নক্ষত্র নদী ও নারী*

নক্ষত্র নদী ও নারী উপন্যাসের কাঞ্চনমালা জীবনের অভিজ্ঞতায় শুধু মানুষকে চিনেছিল অস্থি-মজ্জায়। তের বছর বয়সে পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে পালিয়ে আসার সময় রাস্তার কঠিন পরিস্থিতিগুলো তাকে অনেক শিক্ষা দিয়েছে। তাদের পুরো দলটাকে ছিন্ন ভিন্ন করে নারীদের নির্বিচারে ধর্ষণ করেছিল রাজাকাররা। জীবনের রুক্ষ বাস্তবতা পেড়িয়ে সুস্থ স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে অনেকের মতো সামিল সেও। এই রুক্ষ পথেই প্রেম এসেছে কাঞ্চনমালার জীবনে। শেকড়ছেঁড়ার যন্ত্রণার পর বিবাগী স্বামী ও অসৎ সঙ্গ পেয়ে নষ্ট হওয়া মেয়ে তাকে আরও অসহায় করে তুলেছে। সেই অসহায়ত্বের সুযোগ নিতে চেয়েছে অনেক পুরুষ কিন্তু কাঞ্চনমালা ধরা দেয়নি। তবুও তার একটা নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য আশ্রয়ের দরকার ছিল, এই বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে হাজির হয়েছিল অবিবাহিত ব্যাংক কর্মচারী অমৃত। কাঞ্চনমালা তাকে শরীর ও মন দিয়ে উপেক্ষা করতে পারেনি। অপরিসীম দুঃখের মাঝে কাঞ্চনমালা কখন প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে তা সে নিজেই জানত না। কাঞ্চনমালার বিচিত্র জীবনে প্রেম ও যৌনতা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

কাঞ্চনমালা যৌনতার প্রথম পাঠ নিয়েছে নৃশংসতায়, ধর্ষণের মধ্যে দিয়ে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসার সময় রাস্তা থেকে সাবির তালুকদার নামের দানব তাকে অপহরণ করে এবং কাঞ্চনমালার প্রেমে পড়েছিল, তার সেই প্রেম যৌনতার নামান্তর ছিল। কাঞ্চনমালার বাড়ন্ত শরীর সাময়িকভাবে সাবিরের মধ্যে প্রেমকে জাগিয়েছিল। এই প্রেম শুধুমাত্র ভোগবাসনার আগের রোমান্টিক পরিবেশ নির্মাণ। অপহৃত কাঞ্চনমালা বিদ্রোহী হলেই সাবির নির্মমভাবে তাকে ধর্ষণ করেছে। এই নারকীয় অধ্যায় পার করে কাঞ্চনমালা স্বাভাবিক জীবনে এসেছে। সংসার করেছে স্বামী ভুবনের সঙ্গে, কিন্তু স্বামী নিরুদ্দেশ হলে জীবনসংগ্রাম আরও কঠিন হয়েছে। কাঞ্চনমালার স্বামী ভুবন ফুটবল খেলোয়ার ছিল, হঠাৎ

করেই নিরুদ্দেশ হয়েছিল। ব্যাংকে তাদের নামে ঋণ থাকায় ব্যাংক কর্মচারী অমৃত ঋণ আদায়ের জন্য কাঞ্চনমালার বাড়ি প্রায় যাতায়াত করত ফলে দুই প্রার্থীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সেই সম্পর্কে গভীরতা ছিল, কাঞ্চনমালাই অমৃতর ভবিতব্য হয়ে উঠেছিল একসময়। কাঞ্চনমালার সঙ্গে জীবনে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে অবিবাহিত অমৃত বুঝতে পেরেছিল প্রথমবার প্রেমে পড়ার আনন্দ, উত্তেজনা, উদ্বেগ, পুর্ণতা উৎকণ্ঠা, অনিশ্চয়তা। দুজনেই এই সম্পর্কের পরিণতি নিয়ে ভেবে কোনো সমাধানে আসতে পারেনি।

অমৃত কাঞ্চনমালার দুঃখ কষ্টকে বুঝেছিল প্রথম থেকেই, ভুবন ফিরে আসবে এই সান্ত্বনাও দিয়েছিল। কাঞ্চনমালার কষ্টের সঙ্গে আন্তরিক হতে হতে তার বয়স একটা সীমা অতিক্রম করেছিল, যে বয়সটায় নতুন করে ভাবার কিছু থাকে না। জীবনের সঞ্চিত ও অর্জিত উপাদান দিয়ে বাকি জীবন কাটাতে হত, সেই অর্জিত জীবনে কাঞ্চনমালার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ভুবন না থাকার কারণে কাঞ্চনমালার সঙ্গেই তার ঋণ সংক্রান্ত যাবতীয় কথা হত। দু-আড়াই বছর এভাবে চলতে থাকলে পরস্পরের বোঝাপড়ার ভিত্তিতে একটা অঘোষিত আত্মীয়তা গড়েও উঠেছিল। যাতায়াত বেড়েই চলেছিল অমৃতর ফলে ভুবনের অস্তিত্ব কাঞ্চনমালার কাছে ফিকে হয়েছে, অমৃত সেই স্থান পূরণ করেছে প্রেম ও যৌনতা দিয়ে। অন্য অনেক দিনের মতো সেদিন ঝড়ের রাতে বিধ্বস্ত অমৃত কাঞ্চনমালার সঙ্গে যৌন সংসর্গ করতে গিয়ে গ্রামের লোকের কাছে ধরা পড়েছে তবুও তাদের বোঝাপড়া ছিল—

> অমৃত দরকার হলে বারো বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করবে কাঞ্চনমালাকে পুরোপুরি পাবার জন্য। বারো বছর অপেক্ষা শুধু শাস্ত্র আর আইনকে বাঁচাবার জন্য।[১৬৩]

আইনের দ্বারা কাঞ্চনমালার বেপাত্তা স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে অমৃতর সঙ্গে নতুন করে ঘর বাঁধতে পারবে। একজন অল্পবয়স্ক স্ত্রী দীর্ঘদিন স্বামী সঙ্গ না পেলে স্বাভাবিক ভাবেই তার কপালে সমাজ দ্বারা লাঞ্ছনা এসে জুটত সে যতই সতী হোক। কাঞ্চনমালা সতী নয়, তবে তার অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে নতুন করে বাঁচা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তার সামনে পড়ে আছে দীর্ঘ জীবন। তা ছাড়া ভোগসর্বস্ব সমাজ তাকে দিয়েছে বিচিত্র অভিজ্ঞতা। অমৃত তার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছিল, কাঞ্চনমালার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে। কিন্তু বন্ধ ঘরে কাঞ্চনমালার সঙ্গে ধরা পড়ে সাসপেন্ড হয়েছিল আর অমৃতর উদ্দেশ্যে কাঞ্চনমালার চিঠি

প্রকাশ্যে এলে দুজনেই হতাশায় নিমজ্জিত হয়েছে। 'পঞ্চাশ কিলোমিটার তফাতে দুই প্রেমিক-প্রেমিকা প্রাচীন দেবদেবীর মতো অভিশপ্ত হয়ে গেল।'

লাঞ্ছনা যখন লেগেছে কাঞ্চনমালার শরীরে সেই লাঞ্ছিত শরীরে ব্যাংকের আর এক কর্মচারী কামুক মহীপদর নজর পড়েছিল। কাঞ্চনমালাকে গায়ে-গতরে ঋণ শোধ করার প্রস্তাবও দিয়েছে মহীপদ। তার লাঞ্ছনা ও স্বামীর উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন মেয়ে কলিকে নষ্ট করে ফেলেছে। মেয়েকে তার আয়ত্বের বাইরে দিদিমার আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিলেও মফঃস্বলের আধুনিক জীবনাচরণ কলিকে নেশাগ্রস্ত ও যথেচ্ছ মেলামেশার ইন্ধন দিয়েছিল। অন্যদিকে কাঞ্চনমালা অমৃতকে চিঠি দিয়েছিল 'আমার শুধু পাগল হওয়া বাকি আছে। আমাদের কি আর সারাজীবনে দেখা হবে না।' কাঞ্চনমালা মেয়েকে বাড়ি নিয়ে এসেছে। বেঁচে থাকার জন্য কিছু শাক সবজি ফেরিওয়ালা একটি ছেলেকে বিক্রি করত। একটা আশ্রয় ও মাথার উপর একটা অবিভাবকের হাত দরকার ছিল, যে কাঞ্চনমালার উচ্ছন্নে যাওয়া মেয়েকে ও কাঞ্চনমালার অভিশপ্ত জীবনের দায়িত্ব নেবে। তাই তাদের সম্পর্কের কথা মাকেও জানিয়েছে কাঞ্চনমালা। মা সুখী যেন আশার আলো দেখেছে নতুন করে, অমৃত মা-মেয়ের মনে আশা বিশ্বাসের আলো জ্বালিয়ে আপাতত ব্যস্ত। তের বছর বয়সে অভাগী কাঞ্চনমালার জীবনে লেগে যাওয়া দুঃখ তার পরবর্তী জীবনকে এক বিন্দু শান্তি দেয়নি। ক্রমাগত পুড়তে পুড়তে একসময় ভয়ংকরী মুর্তি দিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় যে লাঞ্ছনা সে পেয়েছে তাতে প্রতিপক্ষ ছিল না, অদৃশ্য প্রতিপক্ষর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে পারেনি। কিন্তু এবার একজন প্রতিপক্ষ পেয়েছে। কাপড়ের ব্যাবসায়ী কামুক রাধানাথ সাটিয়ার, যৌনতায় যার কোনো বাছবিচার ছিল না, অর্থ মানুষকে কীভাবে ভোগী করে তোলে রাধানাথ তারই দৃষ্টান্ত। যৌন সুখের যাবতীয় আয়োজনে তার দ্বিধা ছিল না, যে কাউকে বিছানায় এনে ফেলতে রাধানাথের জুড়ি মেলা ভার। তার শিকারের তালিকায় কাঞ্চনমালার মেয়ে কলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কাঞ্চনমালা রাধানাথকে কুপিয়ে খুন করেছে। কাঞ্চনমালার জীবনে আলাদা মোড় তৈরি করেছে এই খুন। রাধানাথ যে শয্যায় খুন হয়েছে তার পাশের শয্যায় ছিল কাঞ্চনমালার প্রেমিক অমৃত। ব্যাংকের কাজে তাকে সেদিন রাধানাথের কাছে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। ফলে অমৃত এই খুনে দুভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। খুনের প্রত্যক্ষদর্শী ও সে খুনীর প্রেমিক। ফলে পুলিশ, আইন আদালত, সদ্য বেড়ে ওঠা সংবাদ মাধ্যম সব কিছুর মুখোমুখি হতে হয়েছে অমৃত মজুমদারকে।

কাঞ্চনমালার মতো আজীবন লাঞ্ছিত নারীর জীবনে অমৃত হয়তো অমৃতর ভাণ্ডার নিয়ে উপস্থিত হতেই পারত। কিন্তু সমাজ তাকে বাধা দিয়েছে পদে পদে। অমৃত যেদিন প্রথম দেখেছিল কাঞ্চনমালাকে সেদিন তার সমস্ত ব্যক্তিগত আগলগুলো আলগা হয়ে পড়েছিল। কাঞ্চনমালা স্নান করে চুলে গামছা বেঁধে খোপাকে বড়ো করে ভিজে কাপড় ছুঁড়ছিল লোহার তারের মধ্যে, আর—

> উত্তোলিত দুই হাতের কারণে উত্তমাঙ্গে কোনো আড়াল তেমন ছিল না। আর ভিজে শাড়ি ওভাবে ছুঁড়ে দিলে শরীরে তো আলোড়ন ওঠেই মেয়েমানুষের। অমৃতের চোখে এই স্বাস্থ্যবতী বউটিকে অভিনব লেগে গেল।[১৬৪]

শুধু মনের মিলনে প্রেম আসে তা নয়, শরীর দিয়ে প্রেম শুরু হতেই পারে তবে সবসময় যে তা দেহসর্বস্ব হয়েই থাকবে এমন নয়। অভিজিৎ সেন বাস্তবের এই আবেদনকে তাঁর কোনো লেখাতেই মেকি করে দেখাননি। কাঞ্চনমালার অতীতের ইতিহাস, তার অবাধ্য মেয়ে, সমাজের রক্তচক্ষু, অপবাদ সব কিছুকেই উপেক্ষা করে কাঞ্চনমালাকে নতুন জীবন দিতে চেয়েছিল অমৃত। এমনকি পরবর্তীতে কাঞ্চনমালার প্রতি নৈতিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যেভাবে বিপদের সম্মুখীন হয়েছে তাতেও পিছিয়ে আসেনি। বাবা-মায়ের ছেলেকে সংসারী দেখার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে না পেরেও কাঞ্চনমালার প্রতি দায়িত্বশীল হতে চেয়েছে বার বার। নীতির সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নিয়েছিল সে। কোর্টে কাঞ্চনমালার 'হাটভাতারি' বিশেষণ তাকে ব্যথিত করেছে, আইনি ব্যবস্থার মাঝে কাঞ্চনমালার সঙ্গে কাটানো সময়ের অনুভূতি তাকে অসহায় করেছে। মানুষের ভিতরের জটিল জগৎ অভিজিৎ সেন কাটাছেঁড়া করতে চাননি তাই অমৃতর স্বার্থপর অনুভূতিগুলো তুলে এনেছেন অবিকৃতভাবে। জেলখানায় দেখা করতে গিয়েও কাছাকাছি গিয়ে অমৃত বুঝতে পেরেছিল 'আশ্লেষ আকাঙ্ক্ষায় তার শরীর যেন একটা বোমায় রূপান্তরিত হয়েছে। ফেটে পড়তে পারে যে-কোনো মুহূর্তে।' অসহায় কাঞ্চনমালা অমৃতর হাত দুখানা ধরে কিছু খুঁজতে চেয়েছে, অমৃত তার শরীরের গন্ধে ঘণ্টা দেড়েক বসে থেকেছিল। সে জানত কামনায় তার নিজের অপেক্ষা কাঞ্চনমালা বেশি অস্থির। বন্দি গরাদে এই দুই অসামাজিক প্রেমিক-প্রেমিকা আসলে যৌনতা দিয়ে সমস্ত দুর্ভাগ্যের মধ্যে মনের নিভৃতে একটা আশা জাগিয়ে রাখতে চেয়েছিল, যে আশা কাঞ্চনমালা বাঁচিয়ে রেখেছিল—

> সে আশা করত একদিন অমৃত মজুমদার এসে এই সমস্ত দুর্ভাগ্য, এই সমস্ত গ্লানি, অপমান, ক্ষুদ্রতা থেকে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে।[১৬৫]

এমন কিছু ঘটেনি, অমৃত ভালো মানুষ তার সঙ্গে নির্ঝঞ্ঝাট জীবন কাটানো যায় তবে ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ জীবনের সঙ্গী হওয়ার উপযুক্ত অমৃত ছিল না।

অমৃত বুঝেছে বাইরে একটা দমকা হাওয়া এল, যে হাওয়ায় 'একটানা চলতে থাকা দাবদাহ খুব দ্রুত কমে গেল।' অমৃত মজুমদার দেহ মনের উপর নিদারুণ চাপ অনুভব করেছে। কাঞ্চনমালার বন্দি দশা এবং তার নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা, সমস্ত যুক্তি বুদ্ধির ঊর্ধ্বে উঠে গেছে অমৃত, আশা আকাঙ্ক্ষার সীমায় নিজেকে সে আর আটকে রাখতে পারেনি। কনস্টেবলকে টাকা খাইয়ে জেলে দেখা করতে গিয়েছিল কাঞ্চনমালার সঙ্গে। একটু নিভৃত আলাপের জন্য এক মাসের বেতনের অর্ধেকটা খরচ করেছে সে। এটা আসলে অমৃতর বে-আইনি বিপজ্জনক ঝুঁকি—

> তার দীর্ঘকালের বঞ্চিত এবং অভুক্ত দেহে ধিকিধিকি আগুনের মতো জ্বলছে গত কয়েকদিন ধরে। শুধু কথা বলার জন্য, শুধু চোখের দেখা দেখার জন্য অমৃত মজুমদারের টাকা পয়সা খরচ করে এই গোপন এবং বিপজ্জনক ব্যবস্থা করার কোনোই দরকার ছিল না।[১৬৬]

কাঞ্চনমালাও যেন দীর্ঘ সময়ের প্রস্তুতি ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বসে ছিল। আগুনে ঘি পড়ার মতো জ্বলে উঠেছিল। যেমন প্রথম দিন ঝড়বৃষ্টির রাতে, জেলে দেখা করার সময় প্রথম যৌন মিলনের উন্মাদনা ছিল এখনো তাই আছে কাঞ্চনমালার মধ্যে। সে একজন প্রেমিকা, প্রেমের আস্বাদে নতুন করে বাঁচতে চেয়েছিল। তারপর একজন মা, মেয়ের উপর কোনো লাঞ্ছনা সে মেনে নিতে পারবে না তাই খুন করেছে, নতুন জীবনের স্বপ্ন উপেক্ষা করেছে। বার বার জেরার মুখে সচেতন থেকেছে যাতে তার মেয়ে কলির প্রসঙ্গ না আসে, অমৃত যাতে জড়িয়ে না যায়। একা মরার বাসনা কাঞ্চনমালার, শিলিগুড়ির উপান্তে রিসর্টে স্বামী-স্ত্রী সেজে সাত দিন থাকার সময় একাই নদীতে লাফ দিতে চেয়েছিল, যদিও এটা ছিল প্রেমিক যুগলের কাল্পনিক লঘু ফুরফুরে কথাবার্তা। তাই তো একটা সময় বাঁচার আর্তি প্রবল হয়ে উঠেছিল, আশঙ্কা তাকে ঘিরে ফেলেছে, খুন নয়, অন্য এক অপরাধবোধ তাকে পেয়ে বসেছে। পৃথিবীর সবার কাছে কেঁদে কেঁদে ক্ষমা চাইতে ইচ্ছা হয়েছে। এই বাঁচার আকাঙ্ক্ষা তার অতৃপ্তি থেকে এসেছে, জেলের বাইরে একটা প্রেমময় জীবনের জন্য অপেক্ষা, যা তাকে প্রেমে যৌনতায় সুখী করত।

যৌন আকাঙ্ক্ষায় এমন এক শক্তি আছে যা সাময়িক দুঃখ, ভয়, কষ্ট, সতীত্ব, সমাজ সব কিছুকে ভুলিয়ে দিতে পারে। এই বিরূপ মানবিক পরিস্থিতিগুলো যৌন মিলনের প্রতিবন্ধক হতে পারে না। তাই দ্বন্দ্বে ছিন্ন ভিন্ন হলেও কাঞ্চনমালা নিজেকে আঘাত করেছে কিন্তু তারপরেই অমৃতর কাছে আশ্রয় নিয়ে তৃপ্ত হয়েছে। কিন্তু আজ কাঞ্চনমালার বাঁচার আকাঙ্ক্ষা বড় হয়ে উঠেছে। তাই রতির সময় বারে বারে তার মধ্য থেকে যে রাক্ষসী বেরিয়ে আসত জেলখানায় অমৃতর আবেদনে রাক্ষসী তো পরের কথা কাঞ্চনমালার শরীর সাড়া দিল না। অমৃত মামলা সংক্রান্ত ও তাদের পরবর্তী জীবন নিয়ে আশার কথা শোনালেও কাঞ্চনমালার ভিতরে যে আশাহীন, সহায়হীন, আশ্রয়হীন বোধ জন্মেছে তা সরে যায়নি। অমৃত তার জন্য অপেক্ষা করেছে, তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দেবে, মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে বিয়ে দেবে এসব নিশ্চয়তা দিয়েও কাঞ্চনমালার ভিতরের রাক্ষসীকে জাগাতে পারেনি। অমৃত চেয়েছিল টাকা দিয়ে যে দামি রাতটা কিনেছে সেটাকে কিছুতেই নষ্ট হতে দিলে চলবে না, অনেক চেষ্টাতেও কাঞ্চনমালা ও অমৃত কেউই তাদের আগের শরীরস্মৃতিকে জাগিয়ে যৌন বুভুক্ষার লেশ মাত্র ফিরিয়ে আনতে পারেনি। কাঞ্চনমালা 'হতবল মুমূর্ষু শিকারের মতো শিকারীর চারহাত ও পায়ের নীচে পরে রইল।' অমৃতর নিজেকে নৃশংস অপরাধীর মতো মনে হয়েছে। আপাতভাবে অমৃতকে স্বার্থপর লোভী মনে হলেও যদি মানুষ তার মনোগহনের সমস্ত জটিল প্রক্রিয়াগুলো বুঝতে চায় তাহলে অমৃতর এই প্রবৃত্তিকে স্বাভাবিক মনে হবে। অভিজিৎ সেন সেই স্বাভাবিকতাকে ধরে রেখেছেন হতভাগী কাঞ্চনমালার করুন কাহিনিতে। এই প্রেম দেহসর্বস্ব নয় যেমন আবার দেহবর্জিতও নয়। কাঞ্চনমালা বলেছিল—

> দেহই আমার মন, অমৃতদা। দেহ আর মন পৃথক কিছু নয়। আমাদের দেহ একদিন চেয়েছিল বলেই আমরা আজ এখানে। আজ যে অফুরন্ত সুখ আমরা দুজনে উপভোগ করছি দেহ আর মনকে আলাদা করিনি বলেই সেটা সম্ভব হয়েছে।[১৬৭]

দেহের অস্তিত্ব অস্বীকার করেনি কাঞ্চনমালা। দেহের আবেদন সব দেহধারীর থাকে, কাঞ্চনমালা অমৃত তো তার বাইরে নয়। কিন্তু বিষণ্ণতা, শূন্যতা, মৃত্যুভয় কাঞ্চনমালাকে মৃত্যুর দিকে টেনেছে। বিষনণ্ন মূর্তিময়ী কাঞ্চনমালা যেন জাগতিক বিষয় থেকে এক অসীম একাকীত্বের জগতে সরে গেছে। অমৃত জেলখানায় তাকে বার বার বলেছিল আমার জন্য বেঁচে থেকো, আমাদের ভালোবাসার জন্য।

ভাগ্যহত শুধু কাঞ্চনমালা নয়, অমৃতও। নিখাদ প্রেম থাকা সত্ত্বেও দশ বছরেও তাদের মধ্যেকার বাধাকে সরিয়ে উঠতে পারেনি। রাধানাথ সাটিয়ারের খুনের মামলার ফাইলে ধুলো জমতে শুরু করেছিল, দীর্ঘ অপেক্ষা করেছে অমৃত, বছরখানেক পরে কাঞ্চনমালা জামিন পেয়ে হয়তো তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাবে। বহরমপুরের সেন্ট্রাল জেলে যাওয়ার পথে জেলরক্ষী অযোধ্যাপ্রসাদ ঘুমের ওষুধ মেশানো চা খাইয়েছিল কাঞ্চনমালাকে। ঘুমের মধ্যে কাঞ্চনমালা টের পেয়েছে তার শাড়ি পায়ের দিক থেকে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। এসব কাজে অভ্যস্থ অযোধ্যাপ্রসাদ, কাঞ্চনমালার দেহের লোভ উপেক্ষা করতে পারেনি। তারপর কাঞ্চনমালা অযোধ্যাপ্রসাদের মাথা রাতের অন্ধকারে গাড়ির ভিতরে লোহার গরাদে বেশ কয়েকবার ঠুকে মেরে ফেলেছিল। সঙ্গে অমৃতর ও নিজের আগামী জীবনের সম্ভাবনাকেও।

সত্তর পরবর্তী গ্রাম বাংলার দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে সমাজ ব্যবস্থার অনৈতিকতা বেড়েছে। জেল, আইন, আদালতের অনিয়ম, মামলা মোকদ্দমার গতিপ্রকৃতি, মিডিয়া ক্ষমতা দেখিয়েছে ক্রমশ। ব্যাংক কর্মচারীর বকেয়া আদায় সংক্রান্ত শ্রেণিভিত্তিক তোষণ ও পীড়ন, ব্যাবসার নানা দিক, একটি ধনী পরিবারের গৃহকর্তার উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন। এবং যুগের স্রোতে কিশোর কিশোরীদের অসৎ পথে অগ্রসর, এসব সামাজিক অভিঘাতের মাঝে অনিল মিশ্রর মতো মানবিক পুলিশ অফিসার, সাবিত্রী ও সুখীবালার মতো বিবেচক মহিলা, উকিল বিকাশ দত্ত, চতুর লোভী মহীপদ এসব এই উপন্যাসের বিন্দু হলেও কেন্দ্রবিন্দু হতে পারেনি। মুক্তিযুদ্ধ ও দুই ভাগ্যহত নারী পুরুষের সম্পর্ক ও পরিণতি এই উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু। যে সম্পর্কে মিলেমিশে একাকার হয়েছে প্রেম ও যৌনতা, কাঞ্চনমালার অতীত শুধু বিচিত্র নয় অবর্ণনীয় দুঃখ আর ক্লেশে ভরা। দৈব অভিশাপ বলে মেনে নিতে নিতে কখন কাঞ্চনমালা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। কৈশোরে যৌন নিপীড়নের শিকার হয়ে, ভরা যৌবনে স্বামীসঙ্গ বিচ্যুত হয়ে তার ঝলসে ওঠা রূপ দিয়ে মহীপদ, রাধানাথ সাটিয়ার বা অন্য কোনো কামুক মানুষকে স্বীকার করলে কাঞ্চনমালা রাণীর মতো বাঁচতে পারত। কিন্তু আজীবন লাগামহীন কষ্টের মাঝে সে তার অবশিষ্ট শুচিতা, শরীর, প্রেম, মনটুকু উপহার দিতে চেয়েছিল তার মেয়েকে, মাকে আর যে মানুষটি তার সামনে ভরা প্রেমপাত্র নিয়ে হাজির হয়েছিল সেই অমৃতকে। তাই সেই পথের জঞ্জাল সরাতে সরাতে কাঞ্চনমালা হারিয়ে গিয়েছিল। অভিজিৎ সেন তাঁর এই হতভাগী নায়িকার জীবনবেদ রচনা করেছেন যেন তার সঙ্গে থেকে। প্রেম ও যৌনতা সরলরেখায় চললেও একে অপরকে কলুষিত করেনি।

উল্লেখপঞ্জি

১। সেন, অভিজিৎ, *মৌসুমি সমুদ্রের উপকূল, একের মধ্যে পাঁচ*, জে এন চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃষ্ঠা- ১৩৬

২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৪৬

৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৪৬

৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৭৭

৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৬৯

৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৮১

৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৮৬

৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৮৬

৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২০৪

১০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২০৯

১১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২০৯

১২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৮৭

১৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২১০

১৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৩২

১৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৩৩

১৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৫২

১৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৫৯

১৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৭০

১৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২১৯

২০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৩০

২১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৩৫

২২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৪৭

২৩। সেন, অভিজিৎ, *রাজপাট ধর্মপাট, একের মধ্যে পাঁচ,* জে এন চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃষ্ঠা- ২০

২৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৬

২৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫৭

২৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৭৯

২৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৮৫

২৮। তদেব, পৃষ্ঠা- ১০৯

২৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৮

৩০। কালকূট, *জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য,* রিডার্স কর্ণার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৬৬, পৃষ্ঠা- ১৬৬

৩১। সেন, অভিজিৎ, *রাজপাট ধর্মপাট, একের মধ্যে পাঁচ,* জে এন চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃষ্ঠা- ৫২

৩২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৭৮

৩৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৮৩

৩৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১০০

৩৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১০২

৩৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১০৩

৩৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৮৭

৩৮। গিরি, সত্যবতী, 'আধুনিক বাংলা উপন্যাসে চৈতন্যজীবনের উপাদান', রাজ্যেশ্বর সিন্‌হা (সম্পাদিত), *বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা,* যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২৩ তম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০২১, পৃষ্ঠা- ৯৯

৩৯। সেন, অভিজিৎ, *ধর্মাযুধ,* সুপ্রকাশ, নদীয়া, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা ২০২০, পৃষ্ঠা- ৮

৪০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২০

৪১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৪

৪২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৫

৪৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩০

৪৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫৫

৪৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৮৫

৪৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৭

৪৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৮৯

৪৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৬

৪৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৮

৫০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৬৬

৫১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১২১

৫২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৩১

৫৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৩২

৫৪। চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, 'ইতিহাসের আখর, সম্পর্কের আলো', *এই সময়* (গ্রন্থ পরিচয়), কলকাতা, ৭ জুন ২০২০

৫৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিমল, *ভূমি ও ভূমিসংস্কার সেকাল একাল,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ মার্চ ২০১৭, পৃষ্ঠা- ১০

৫৬। উমর, বদরুদ্দিন 'সত্তর দশকের কৃষক আন্দোলন', অনিল আচার্য (সম্পাদিত), *সত্তর দশক* (খন্ড এক), অনুষ্টুপ, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ ২০১০, পৃষ্ঠা- ৭২

৫৭। ইসলাম, নজরুল, 'ফরিয়াদ', *সঞ্চিতা,* ডি.এম. লাইব্রেরি, একসপ্ততিতম সংস্করণ, মাঘ ১৪১৭, পৃষ্ঠা-৮৫

৫৮। সেন, অভিজিৎ, 'গল্পও বিষয়ে ভাবনা চিন্তা', অমিত দাস ও অনিরুদ্ধ ভৌমিক (সম্পাদিত), *উত্তরাধিকার* (সাম্প্রতিক বাংলা গল্প সংখ্যা, এক), ১৯৯৬, পৃষ্ঠা- ২৬

৫৯। সেন, অভিজিৎ, *বর্গক্ষেত্র, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৭৮৭

৬০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৭৮৮

৬১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৭৯৩

৬২। অভিজিৎ সেনের সাক্ষাৎকার, বিকাশ শীল (সম্পাদিত), *জনপদপ্রয়াস* (অভিজিৎ সেন সংখ্যা), চুচুড়া, হুগলী, বইমেলা ২০০৬, পৃষ্ঠা- ৯

৬৩। সেন, অভিজিৎ, *বর্গক্ষেত্র, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৮০৯

৬৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৮১৪

৬৫। সেন, অভিজিৎ, *ক্রান্তিবলয়,* জে এন চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৫, পৃষ্ঠা-১০

৬৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৪

৬৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৯

৬৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪০

৬৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫০

৭০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫৪

৭১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৭৭

৭২। সেন, অভিজিৎ, *হলুদ রঙের সূর্য, একের মধ্যে পাঁচ,* জে এন চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৪, পৃষ্ঠা- ৩৮৮

৭৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৯০

৭৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৯৬

৭৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৯৬

৭৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৯৮

৭৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪০৮

৭৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪১২

৭৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪১৯

৮০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪২১

৮১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪২৩

৮২। সেন, অভিজিৎ, *রহু চণ্ডালের হাড়, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৮৯

৮৩। সেন, অভিজিৎ, *স্বপ্ন এবং অন্যান্য নীলিমা, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৫০৪-৫০৫

৮৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫০৫

৮৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫২২

৮৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫০৪

৮৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫২৫

৮৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫৭৮

৮৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫৮৬

৯০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫৮৯

৯১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫৯১

৯২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৬৬৩

৯৩। সেন, অভিজিৎ, *মৃত মানুষের সঙ্গে বসবাস,* জে এন চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৪২৫, পৃষ্ঠা- ১২১

৯৪। সেন, অভিজিৎ, *লাশকাটা ঘরের সামনে অপেক্ষা,* জে এন চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৩৪

৯৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৬১

৯৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৯৩

৯৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১১৪

৯৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১২৭

৯৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৬৪

১০০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৯৪

১০১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২০২

১০২। সেন, অভিজিৎ, *হলুদ রঙের সূর্য, একের মধ্যে পাঁচ,* জে এন চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং ,কলকাতা, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃষ্ঠা- ৪৪১

১০৩। সেন, অভিজিৎ, *অন্ধকারের নদী, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ১৮২

১০৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৮৭

১০৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৮৭

১০৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৮৮

১০৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৯১

১০৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৯৯

১০৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২০২

১১০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২০৪

১১১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২০৭

১১২। সেন, অভিজিৎ, *সমসাময়িক*, অশোক দাশগুপ্ত (সম্পাদক), *আজকাল* (শারদীয়), কলকাতা ১৪১৯, পৃষ্ঠা- ২১৯

১১৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২২৫

১১৪। সেন, অভিজিৎ, *নাগকেশর অক্ষবাট*, অশোক দাশগুপ্ত (সম্পাদক), *আজকাল* (শারদীয়), কলকাতা, ১৪২০, পৃষ্ঠা- ১৩৭

১১৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৪২

১১৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৪৩

১১৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৫৩

১১৮। দত্ত, গোপা, 'অভিজিৎ সেনের কথা জগৎ', শেখর সমাদ্দার (সম্পাদিত), *বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা,* যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, একবিংশতি সংখ্যা, মার্চ ২০১৮, পৃষ্ঠা- ১২৯

১১৯। সেন, অভিজিৎ, *স্বপ্ন এবং অন্যান্য নীলিমা, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৫৮৫

১২০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫৯১

১২১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৬০৭

১২২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৬৩৮

১২৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৬৪৯

১২৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৬৬৯-৬৭০

১২৫। সেন, অভিজিৎ, *নক্ষত্র নদী ও নারী,* স্বস্তিক প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৫, পৃষ্ঠা- ১০৯

১২৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১০৯

১২৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৩১

১২৮। সেন, অভিজিৎ, *আঁধার মহিষ, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৩৮৩

১২৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৮৯

১৩০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৯৪

১৩১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৯৯

১৩২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪০১

১৩৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪১০

১৩৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪১২

১৩৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪২৩

১৩৬। অভিজিৎ সেনের সাক্ষাৎকার, বিকাশ শীল (সম্পাদিত), *জনপদপ্রয়াস* (অভিজিৎ সেন সংখ্যা), চুঁচুড়া হুগলি, বইমেলা ২০০৬, পৃষ্ঠা- ১৯

১৩৭। সেন, অভিজিৎ, *স্বপ্ন এবং অন্যান্য নীলিমা, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৫৪৯

১৩৮। ভট্টাচার্য, তপোধীর, 'অভিজিৎ সেন-এর ঔপন্যাসিক সন্দর্ভ', সুবল সামন্ত (সম্পাদিত) *বাংলা উপন্যাস: বীক্ষা ও অন্বীক্ষা,* এবং মুশায়েরা, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০১১, পৃষ্ঠা- ২০৬

১৩৯। সেন, অভিজিৎ, *সবুজ শ্যাওলা ঢাকা জল, নগ্ন নির্জন হাত,* স্বস্তিক প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৮০

১৪০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৮০

১৪১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৮৮

১৪২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৯০

১৪৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৫৬

১৪৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৯০-৯১

১৪৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৯৩

১৪৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৯৪

১৪৭। অভিজিৎ সেন, *শিরিন এবং তার পরিজন,* অক্ষর প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৭, পৃষ্ঠা- ৬০

১৪৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৭৭-৭৮

১৪৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৭৯

১৫০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৭৯

১৫১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪০

১৫২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১২২

১৫৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৬৯

১৫৪। সেন, অভিজিৎ, *বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৪৪২

১৫৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৫১

১৫৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৭৪

১৫৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৭৫

১৫৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৭৬

১৫৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৮৯

১৬০। সেন, অভিজিৎ, *নগ্ন নির্জন হাত, নগ্ন নির্জন হাত,* স্বস্তিক প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৪৭

১৬১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৬৪

১৬২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৬৫

১৬৩। সেন, অভিজিৎ, *নক্ষত্র নদী ও নারী,* স্বস্তিক প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৫, পৃষ্ঠা- ১৬২

১৬৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৮

১৬৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১০৪

১৬৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৯৮

১৬৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২০১

চতুর্থ অধ্যায়

অভিজিৎ সেনের উপন্যাস: বিষয়বৈচিত্র্যের অন্যদিক

প্রথম পর্ব

অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের বিষয়বৈচিত্র্যকে পূর্ববর্তী অধ্যায়ের কয়েকটি পর্বে ধরতে চেয়েও কিছু উপন্যাসকে ধরা যায়নি। এই বিভাগ যেহেতু বিষয়ের নিরিখে তাই বেশ কয়েকটি উপন্যাসকে পৃথকভাবে আলোচনা করা হল। যেমন— বাজিকর গোষ্ঠীর জীবনসংগ্রাম নিয়ে *রহু চণ্ডালের হাড়*, গ্রাম জীবনের দ্রুত পরিবর্তন ও রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রসার নিয়ে *ছায়ার পাখি*, মালদা জেলার বন্যা পরিস্থিতি ও গঙ্গা নদীর ভূমিকা নিয়ে *নিম্নগতির নদী*, মাতৃ পরিত্যক্ত বালকের আত্মবেদনা নিয়ে *ঝড়*, মঙ্গলকাব্য ও সাপ কেন্দ্রিক একটি বিশেষ অঞ্চলের মিথ নিয়ে *নাগমঙ্গল* ইত্যাদি। এই জাতীয় উপন্যাসগুলিকে তাই পৃথক অধ্যায়ে আলোচনা করা হল।

১। *রহু চণ্ডালের হাড়*

বঙ্কিম পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস *রহু চণ্ডালের হাড়* অভিজিৎ সেনের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির মধ্যে একটি। যদিও লেখকের এই উপন্যাস অপেক্ষা *ছায়ার পাখি* উপন্যাসে পক্ষপাত বেশি। *এক্ষণ* পত্রিকার সম্পাদক নির্মাল্য আচার্য *রহু চণ্ডালের হাড়* উপন্যাসের প্রথম খসড়া পড়ে মনে করেছিলেন এই লেখা সাহিত্যে তরঙ্গ তুলতে পারে। প্রথম শ্রেণির উপন্যাসের উপাদান দেখেছিলেন তিনি এতে এবং লেখককে চিঠিতে বলেছিলেন 'তিতাস ও হাঁসুলী বাঁকের সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে।' *রহু চণ্ডালের হাড়* অভিজিৎ সেনের ব্যাপক আলোচিত উপন্যাস। দেড়শো বছরের পাঁচ পুরুষের যাযাবর গোষ্ঠীর জীবন নিয়ে লেখা এই উপন্যাস শুধু একটি গোষ্ঠীর বোহেমিয়ান জীবনের দুঃখ-দুর্দশা নয়, সার্বিক অভিজ্ঞানকে ধরেছেন এই উপন্যাসে। বাজিকরদের পাঁচ পুরুষের জীবনের প্রাচীন গল্প কীভাবে তাদের বিশ্বাসের সঙ্গে মিশে গিয়ে চলমানতার রসদ জুগিয়েছিল তারই বিস্তার এই উপন্যাসে। এই উপন্যাসের কোনো নায়ক নেই, পুরো একটা গোষ্ঠী নায়ক, এই গোষ্ঠীর কোনো নির্দিষ্ট বাসস্থান নেই, সমগ্র পৃথিবী এদের বাসস্থান। কথাসাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭) বলেছেন 'যেখানে রাত সেখানে কাত।' তিনি এদের ভাষা সম্পর্কেও বলেছিলেন, এদের কোনো ভাষা নেই

বরং বুলি বলা ভালো। যেখানে যায় সেখানের বুলি মুখে তুলে নেয়। এদের পায়ের মতো জিহ্বাও চলমান, কোনো জায়গার বুলি ভাষা হবার আগেই যাযাবর অন্য স্থানে গিয়ে খুঁটি পোঁতে। এদের কোনো ধর্ম ও নির্দিষ্ট দেবতা ছিল না, পথের কোনো শক্তিশালী দেব-দেবীকে গ্রহণ করে নিলেও তাও স্থায়ী হয়নি। কলমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করলেও মুসলমানের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। স্থায়ী ঠিকানা নিয়ে কারো কাছে আত্মসমর্পন করার বালাই নেই, খোলা আকাশের নীচে অবাধ স্বাধীনতা এদের, তবুও গৃহস্থ হতে চেয়েছিল যাযাবর গোষ্ঠী, বৃহত্তর সমাজে মিশে যেতে চেয়েছিল। যাযাবর জাতির চলমানতা, ধর্ম-বিশ্বাস, পারস্পারিক সম্পর্ক, জীবিকা এবং গোষ্ঠীর বাইরের মানুষের দ্বারা শোষণ ও তাদের সঙ্গে সম্পর্ক। কয়েক পুরুষ ধরে ধাক্কা খেতে খেতে যাযাবর দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেউ হিন্দু কেউ মুসলমানের ধর্ম গ্রহণ করে থিতু হয়েছিল। সামাজিক ধর্মীয় পরিচয় পেয়ে, নিজের দেশ পেয়ে তাদের আদিপুরুষ রহুকে ভুলতে শুরু করেছিল। চাষ থেকে শহরের কল কারাখানায় কাজ, শহরে সিনেমা দেখা, দেশের স্থায়ী সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক, রাজনৈতিক অধিকার স্থাপন এই সব কিছু দিয়ে স্থায়ী হলেও তারা অন্তরে উপলব্ধি করেছিল তারা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণি রূপেই রয়ে গিয়েছিল।

যাযাবর বাজিকর গোষ্ঠী বার বার অপরিচিত দেশের ভাষা সংস্কৃতিকে কিছুদিনের জন্য তারা আপন করতে চেয়েছে। দলপতি পীতেম দুনিয়া ঘোরার নেশায় পাঁচকুড়ি মেয়ে-মরদ, চেংড়া, বাচ্ছা আর কিছু জানোয়ার নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। সারি সারি মোষের পিঠে বাচ্ছা, বুড়ো-বুড়ি এবং মাল পত্তর নিয়ে শহরের বাইরে কোনো মাঠে অথবা নদীর তীরে অস্থায়ী তাঁবু ফেলত। বাঁদর খেলা, ভাল্লুক নাচ, বাঁশবাজি, দড়ির খেলা ভানমতির খেল এসব দিয়েই জীবিকা চলত। বহিরাগত সমস্ত সমস্যার সমাধান দলপতিকেই করতে হয়। রহু যেভাবে বহিরাগত দ্বারা খুন হয়েছিল, অন্য প্রতিনিধিরাও বাইরের সমস্ত ঝড়-ঝঞ্ঝা সামলেছে। পীতেম বাজিকর থানাবাবুকে পাঁচ টাকা জল খেতে দিয়ে নতুন জায়গার ছাড়পত্র পেয়েছে। বাজিকর সমাজের মুল ধারার মানুষ নয়, তবু ঘুষ দেবার সাবেক পদ্ধতি জানত, বড়ো কথা টাকার কোনো মূল ধারা নেই। খেলা দেখিয়ে পয়সা রোজগারকে বাজিকর বলে ‘ভিখ্-মাঙা’, বাজিকরের ‘আপন কুনো ধরম নাই’, ভাষা নেই ‘যেথায় ঘুরে সিথাকার বুলি ধর্‌ল্যে লয়’। নানি লুবিনি তার নাতনি শারিবাকে পূর্ব পুরুষের ও নিজের অতীতের এসব গল্প শুনিয়েছিল। জামিরের পিতামহ পীতেম আদি পুরুষের দেখানো পুবের দেশ ভালোবেসেছিল।

কোনো এক শনিবারের ভূমিকম্পের পর ঘর্ঘরার উত্তর তীরে পীতেম যখন তার দলবল নিয়ে তাঁবু ফেলেছিল, গোয়ালারা খেপা ষাঁড় তাড়ানোর মোটা লাঠি নিয়ে এসে সেই জায়গা খালি করতে বলেছে। বাজিকররা বিচলিত হয়নি কারণ তারা জানত 'সারা দুনিয়া বাজিকরের', যেখানে ইচ্ছে চলে যাওয়া যায়। ভূমিকম্পে সব পশু মারা গেলে চিন্তা হয়েছিল পীতেমের, দু-রাত নির্ঘুম শরীর নিয়ে তৃতীয় রাতে গভীর ঘুমে তার বাপ দনু এসে তার দুঃখের কথা শুনে বলেছিল 'পুবের দেশে যাও, বাপ। সিথায় তুমার নসিব।' পরদিন পীতেমের দল জঙ্গলের পথ ধরে দিগন্তের দিকে গিয়েছিল। গোরখপুর থেকে ডেহ্‌রিঘাট, সিওয়ান, দানাপুর, পাটনা, মুঙ্গের তারপর পুবের দেশে। কিন্তু এখানেও স্বস্তি পায়নি বাজিকররা। পীতেম বাবার কথামতো পুবের দেশে গেলেও বিশেষ কিছু পায়নি। বরং বুঝতে পেরেছিল, বাজিকরের খেলা দেখার সময় নেই মানুষের, সাহেবরা নতুন উত্তেজনা দেশে আমদানি করেছে ফলে দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে বাজিকরনীর নাচ দেখার সময় কারো নেই। পীতেম আশ্চর্য হয়েছে, বাজিকরের অস্তিত্ব নির্ভর করে যে সব মানুষের উপর তারা বাজিকর নয়।

বাজিকরের নিজস্ব কয়েকটা জানোয়ার, খেলার সামগ্রী ও স্ত্রী সন্তান ছাড়া কিছুই ছিল না। তবুও তাদের শোষণ করত জমিদার ও পুলিশ। হাটে বাজিকররা খেলা দেখাতে ও সামান্য জিনিস বিক্রি করতে গেলেও দারোগার লোক ভাগ বসিয়েছিল। রাজমহলের গঙ্গার ধারে সারি সারি ছাউনি দেখে দারোগা এসে হাজির হয়েছিল। প্রতিটি ছাউনিতে উঁকি দিয়ে সবথেকে দামাল ঘোড়াটা ছেলের জন্য পছন্দ করেছিল। 'দ্যাখো বাজিকর, জানোয়ারটা আমার চাই। পরে পাঠিয়ে দিও।' ধন্দুর খুব প্রিয় ঘোড়া হলেও পীতেম জানে দিতে হবে, ধন্দুকে সান্ত্বনা দিয়েছে, এছাড়া করার কিছুই থাকত না বাজিকরের। পীতেম নির্দেশ দিয়েছিল 'বাজিকরের বেটারা, চোখ কান খোলা রেখে চল। পয়সা তোমাদের হাতে আসবে'। রাজমহল, তিনপাহাড়, সাহেবগঞ্জের হাটে বাজারে মানুষকে দেখেই পীতেম এই নির্দেশ দিয়েছে। হাটেই পীতেম দেখেছিল সাঁওতালদের, যারা সাদা দাঁত বের করে হাসে, অফুরন্ত তাদের আনন্দ। পীতেম বুঝেছিল—

> এরা বাদিয়া বাজিকরের মতো নয়, আবার এরা সাধারণ গৃহস্থের মতোও নয়। এরা পণ্ডিতও নয়, মূর্খও নয়। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম, খেটে-খাওয়া মানুষ এরা। পাহাড় ভেঙে, জঙ্গল পরিষ্কার করে করে অবিশ্বাস্য নিষ্ঠায় তারা ফসলের জমি তৈরি করে।[১]

বাজিকররা সাঁওতালদের দেখেই চাষের জমির দিকে ঝুঁকেছিল। জমির সঙ্গে পীতেম এবার সঞ্চয়ের দিকে মন দিয়েছে। বাজিকরের সঞ্চয়ের পদ্ধতি ছিল না এতদিন, তাদের সঞ্চয়ের প্রয়োজন হয়নি, কিন্তু গৃহস্থ হতে আদিবাসীদের দেখে বুঝেছিল সঞ্চয় জরুরি। বাজিকরের নিজস্ব গোষ্ঠীর নারী-পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা বাধা কাজ করত। তারা নিঃসংশয় ছিল না যে বিবাহযোগ্য নারী-পুরুষের শরীরে একই রক্ত বইছে কি না। তারা বিশ্বাস করত তাদের কোন প্রাচীন পুরুষ এমন বিবাহ করে দেবতার অভিশাপ পেয়েছে ফলে তাদের গোষ্ঠী ভেঙে গিয়েছিল। যে কারণে আজও বাজিকর পথেপ্রান্তরে ঘুরছে। এই বিশ্বাসে পীতেম ও সালমা বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হতে পারেনি, একে অপরের প্রতি ভীষণ টান থাকা সত্ত্বেও। সামাজিক বন্ধনের বাইরে থাকলেও কিছু নিয়ম বাজিকর সমাজে ছিল।

বোহেমিয়ান জীবনে থাকতে থাকতে স্থায়ী গৃহস্থে সুখ কী দুঃখ আছে তা বাজিকর ভালোভাবে জানতে পারেনি, কিন্তু ভাবত গৃহস্থ হলে সুখ আসবে হয়তো। তাই তারা সহজেই স্থায়ী মানুষের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। ফলে বাজিকরের মেয়েরাও প্রলোভনে পড়েছে। দারোগার ছেলে আনন্দ বাজিকরের ঘোড়া নিয়ে গিয়েছিল এবার বাজিকরের মেয়ে পেমার প্রতি লালসা ঝলসে উঠেছে। কাউকে প্রণয়প্রার্থী করার অহংকার বাজিকররের মেয়েদের মধ্যেও ছিল, সহজেই পেমা আনন্দের লালসার শিকার হয়েছে। পেমা যে অচিরে তলিয়ে যাবে এ সম্পর্কে কোনো সংশয় ছিল না বাজিকরের। পেমা নিজেকে আনন্দের প্রেমিকা মনে করেছিল কিন্তু সে জানত না, 'বাইরের মানুষ বাদিয়ার বেটিকে বেশ্যা হিসাবেই চায়।' পীতেমের মেয়ে পেমা আনন্দের প্রেমে পড়ে রক্ষিতা থেকে গর্ভবতী হবার পর আনন্দ তার ধারে কাছে আসত না। পেমার সুখে নিয়োজিত দাসীরাও পেমাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। রাগে, দুঃখে, অপমানে আনন্দের বাড়ি যাবার হুঁশিয়ারি দিলে আনন্দের আচরণে পেমার নিজের অবস্থান বুঝতে পারে। আনন্দ পেমার গর্ভের সন্তানের ভবিষ্যৎ জানিয়ে দিয়েছে 'বাজিকরের ছাউনিতে অমন অনেক বেজম্মা আছে' আর ঘর ছেড়ে চলে যেতে বলেছে। বচসা থেকে হাতাহাতি তারপর পেমা ছুরি ছুঁড়ে মেরেছে আনন্দকে, যেটা ঘোড়ার পা বিদ্ধ করেছিল, ঘোড়া সজোরে পা ছোঁড়ে, পাশেই ছিল আনন্দ ঘোড়ার পায়ের চাটে আনন্দের মাথার খুলি ভেঙে গিয়েছিল। আনন্দ এভাবে মারা গেলে বাজিকররা জানত এর প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে। ইচ্ছে থাকলেও পীতেম পালিয়ে যেতে পারেনি। পুলিশ এসে

বাজিকর ছাউনি তছনছ করে পীতেম, ধন্দু, পরতাপকে গ্রেপ্তার করেছিল পেমার সঙ্গে। চরম শাস্তি হিসাবে পেমাকে দাগী কয়েদিদের সঙ্গে রাখা হয়েছিল। সেখানে ধর্ষিত হয়ে ছয়দিন পর মৃত সন্তান প্রসব করে পেমাও মারা যায়। তবে এর থেকে ভালো সমাধান পেমা ও বাজিকরদের কাছে কিছুই ছিল না।

পরতাপ, জিল্লু মুর্শিদাবাদে সওদা আনতে গিয়ে নিঁখোজ হয়েছিল, তাদের স্ত্রীরা তাদের ভুলে নতুন করে জীবন শুরু করার মানসিক প্রস্তুতি নিয়েছে। এটা শধু বাজিকরের নিয়ম নয়, সংসারের নিয়ম। তবে বাজিকরের শোক নিয়ে বসে থাকা চলে না। বাজিকরের মনে দুঃখ আনন্দ খুব কম সময় স্থায়ী থাকত। কারণ তাদের জীবনে দ্রুত এই সব ঘটনা ঘটত। জিল্লু, পরতাপ হঠাৎ করে ফিরে এলে আনন্দে বাজিকরদের মধ্যে উৎসব মুখরতা দেখা দিয়েছে। এই উৎসবের প্রধান অতিথি লক্ষ্মণ সোরেন, নেশাগ্রস্ত লক্ষ্মণ ও পীতেম তাদের আনন্দ-বেদনার বাক্যালাপে বাজিকর গোষ্ঠী জমির মহিমা বুঝতে পেরেছে। পীতেমের মনে থিতু গৃহবাসী হবার আকাঙ্ক্ষা আরও জেগে উঠেছে। লক্ষ্মণরা পাহাড় ও জঙ্গল কেটে জমি তৈরি করলে তারপর মালিক এসে জুটত। তবু লক্ষ্মণ জানত জমির মহিমা। সেটাই বুঝিয়েছে পীতেমকে—

> জমি না থাকলে মানুষের জীবনের কোনো অর্থই হয় না। তুমি জানো জমিতে যখন ফসল ধরে তখন মানুষের মনের ভাব কেমন লাগে? ... তোমার বউয়ের পেটে যখন বেটাবেটিরা এসেছে তখন তোমার মনের ভাব নিশ্চই মনে আছে?[২]

লক্ষ্মণ এর আগে অনেককে চাষের জমির ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। কিন্তু পীতেমকে জমির ব্যবস্থা করে দিতে পারবে না কারণ এখন অনেক সমস্যা আছে। জোতদার, গাঁতিদার, পত্তনিদার, খাটোয়াল, জমিদার, সাহেব, পুলিশ, দারোগা, আড়তদার, মহাজন এমন অনেককে ভাগ দিতে হয়। দিনকাল খারাপ হলেও মানুষের জমি থাকাটা বাঞ্ছনীয়, পুরুষ মানুষের যেমন একটা মেয়েমানুষ থাকা চাই তেমনি সব মানুষের জমি থাকা চাই। যাযাবরেরও তো জমি চাই থিতু হবার জন্য, এই আকাঙ্ক্ষাও তো অনেক বাজিকরের নারী পুরুষের মধ্যে ছিল। তেমনই—

> পীতেম জানবে না আজ জৈষ্ঠ্য মাসের এই নক্ষত্রখচিত রাতে খোলা আকাশের নীচে লক্ষ্মন সোরেন যে বীজ তার অভ্যন্তরে প্রোথিত করল, তার অধস্তন তৃতীয় এবং চতুর্থ পুরুষে সে পল্লবিত হয়ে অনেক সমস্যা, আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং দুঃখের জন্ম দেবে।[৩]

সাঁওতালদের থেকে পরতাপ জিল্লু শিখেছে ধান কাটা, বলদ দিয়ে জমি চষা, দেখেছে বীজ কীভাবে অঙ্কুরিত হয়ে মাঠ সবুজ হয়ে যায়, সেই নেশা চোখে লেগেছে। যাযাবর জীবনের একঘেয়েমি থেকে কিছুদিনের জন্য মুক্তি পেয়েছিল এরা। লক্ষ্মণ সোরেন শুধু পীতেমের মধ্যে জমির নেশা ধরিয়ে দেয়নি, তার গর্ব ও আনন্দকে দ্বিগুণ করেছিল শহরায় উৎসবে নিমন্ত্রণ করে। বাজিকরদের সঙ্গে কেউ কুটুম্বিতা করত না, কেউ আমন্ত্রণ করত না, লক্ষ্মণ সেই মর্যাদা দিয়েছে। পীতেমদের রাজকীয় অভ্যর্থনা জানিয়েছিল লক্ষ্মণ। পীতেম, সালমা, জিল্লু, পরতাপের মতো বাজিকররা সাঁওতালদের নাচ গানের সঙ্গে চমৎকার তাল মিলিয়ে সঙ্গ দিয়েছে। বাজিকর অন্যের ভাষাও সহজে রপ্ত করে নেয়, অন্যের সংস্কৃতিকেও।

বাজিকররা দেখেছিল কীভাবে সাঁওতালদের শোষণ করত তহশিলদার, চৌকিদার, গোমস্তা, নায়েবরা। সাঁওতালের পরিশ্রমের ভাত শুধু সাঁওতাল খায়নি, বারোভূতে খেত। দেনার দায়ে সাঁওতালের ফসলের জমিতে পাওনাদারের গরুর গাড়ি নেমেছিল। মহাজনের গাড়ি বোঝাই করে, সাঁওতালের ফসল নিয়ে যেত দয়ারাম ভকত, পতিত সাউ, গোরাচাঁদ সেনের মতো জমিদার। সাঁওতাল কর্জ নিলে তা বংশপরম্পরায় শোধ হয় না, কর্জের সঙ্গে ছিল ওজনের কারচুপি, যেটা ধরার ফলে পতিতের লোকের কাছে রক্তাক্ত হয়েছে বাজিকররা। পতিতের বাটখারা সাঁওতালের দুশমন ছিল। এভাবেই নির্যাতিত হত আদিবাসীরা। সাঁওতালদের ঠকানো মেনে নিতে পারেনি জিল্লু তাই প্রতিবাদ করেছিল। পীতেম তাকে শাসন করে বলেছে 'আমরা হলাম বাজিকর। গেরস্থের হাল-হকিকতের আমরা কী বুঝি।' জিল্লু বুঝেছে কারণ তার মধ্যে একটা চেতনা কাজ করছিল, গৃহস্থের চেতনা। রাজমহল পাহাড়ের গায়ে বাজিকররা পাঁচ বিঘা জমি পত্তনি নিয়েছিল টাকা দিয়ে। এর আগেও চেষ্টা করেও জমি পায়নি, যাযাবরকে কেউ জমি দেয় না, খাজনা পাওয়া যাবে বলে কারণ যাযাবর ঘুরে বেড়ানো জাত। বাজিকরের জীবনে পরিবর্তন এসেছে, গোপনে তার দলের অনেকেই মহাজনি কারবার শুরু করেছিল। এসব দেখে পীতেম বলেছিল 'বাহারে রহু! কী তোর কণ্ঠার হাড়ের কিসমত।' কিন্তু রহুর হাড়ের কিসমত বাজিকরের গৃহস্থ হবার ক্ষেত্রে কাজে আসেনি কারণ পীতেম যে জমি পত্তনি নিয়েছিল পয়সা দিয়ে, সে

সব জমির পাট্টা ছিল ভুয়ো পাট্টা। এভাবে মালিকের দস্তখত ছাড়া পাট্টা বিক্রি করে অনেকেই ভালো টাকা রোজগারের ধান্দা খুলেছিল। রহুর হাড় বাজিকরকে তাদের নিজস্ব পথে টাকা রোজগার করতে সাহায্য করেছে। রাজমহলে শীতের উৎসবে, বাজিকর যুবক-যুবতী শারীরিক কসরত দেখায়, রহুর হাড়ের কেরামতিতে নিমেষে টাকা দ্বিগুণ হচ্ছে, পেতল সোনা হচ্ছে, জাদুদণ্ডের ছোঁয়ায় গাছ থেকে ফল, ফল থেকে গাছ হচ্ছে। প্রতিটি তাবুতে আলাদা আলাদা খেলা চলছে, সালমাও তার বাণিজ্য ভালোই চালায়, জড়িবুটি তুকতাক দিয়ে। দয়ারাম ভকতের কাছে সালমা জেনেছিল ভুয়ো পাট্টার রহস্য। জমি দখল করতে গিয়ে জমিদারের লাঠিয়াল চাষিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। হতভম্ব চাষিরা এসবের কিছুই কারণ জানতে পারেনি তবুও প্রতিরোধের বৃথা চেষ্টা করেছে। পীতেম এসব ঘটনা দেখেছিল দূর থেকে, এসবের মধ্যে যায়নি। চাষিদের নালিশ কেউ শোনে না, বাজিকরদের কথা শোনার প্রশ্নই ওঠে না। চাষিদের কথা শুনে প্রতিবাদ করে মামলা করেছিল মহী কর্মকার। ফলে পাট্টা প্রদানকারী শ্যামলাল মিশ্র গ্রেপ্তার হলেও টাকার জোরে শ্যামলাল রেহাই পেয়েছিল, এরপর মহী খুন হয়েছে। অন্যদিকে বিষাদ নেমে এসেছে বাজিকর ছাউনিতে। বাজিকরদের আত্মীয় বলে ভাবা একমাত্র মানুষ লক্ষ্মণ গ্রেপ্তার হয়েছে।

বাজিকরদের জীবনে বাহ্যিক জটিলতা নেই, এই পৃথিবী তাদের বাসভূমি, যেখানে ইচ্ছে বসে যাও, খেলা দেখাও কিছু পয়সা রোজগার কর তারপর আবার অন্য কোথাও তাঁবু ফেল। বাজিকর যুবক বালি তীর ছোঁড়ার খেলায় ওস্তাদ, তার এই বিদ্যাকে ইউসুফের মতো চোরাকারবারিরা অসৎ কাজে লাগাতে চেয়েছে। ইউসুফ বালির হাত ধরে বলেছিল 'কী হাতই বানিয়েছ ওস্তাদ' আসলে ইউসুফ ভেবেছিল—

> বালির মতো এক-আধজন লোক তার দরকার। এসব ডুগডুগি বাজানো ছেঁচড়া কাজে বালির মতো ওস্তাদের সময় নষ্ট করা অন্যায়। বড়ো কাজ কিছু করতে চায় তো বালি আসুক তার সঙ্গে। যে কাজে সাহস লাগে, উত্তেজনা ও পয়সাও ভালো আছে।[8]

ব্যবসাদারদের হরেক রকম মাল বোঝাই মহাজনি নৌকা থেকে পাঁচ দশ পেটি মাল চুরির মতো অনৈতিক কাজে বালিকে সঙ্গে পেলে ইউসুফ এই কাজে আরও সাহস পেত। বালি ভয় পায়, সে জানে বাজিকর গোষ্ঠীবদ্ধ, কোনো ঝামেলায় জড়ালে গোষ্ঠীর বদনাম হবে। যেমনভাবে পেমা তার গোষ্ঠীতে রোপন করেছিল পুলিশি অত্যাচারের বীজ। কিন্তু অভাবের

দিনে বালি এই প্রস্তাব একেবারে উপেক্ষা করতে পারেনি। বাজিকর চোর হতে চায়নি আবার বাজিকরের কোনো প্রতিপক্ষ ও শত্রু ছিল না তাই তারা কোনো লড়াইয়ে যেতে চায়নি। কিন্তু সাহেবরা সাঁওতালদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বাজিকর যুবকদের নিয়ে গিয়েছিল। বাজিকরের অনিচ্ছাকৃত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ায় ধন্দুর মৃত্যু হয়েছে গুলিবিদ্ধ হয়ে। বাজিকর বেইমান নয়, সাঁওতালদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি। সাহেবদের বিরুদ্ধে লড়েছিল।

হিন্দুর যেমন ভগবান আছে, মুসলমানের আল্লা তেমন যাযাবরের আছে রহু। রহু ক্ষমতাশালী দেবতা নয়, যাযাবরের দলপতি, আদিপুরুষ। রহুর নির্দেশিত পথে যাযাবর পুবের দেশে বারবার এগিয়ে গেছে। পীতেমের বাপ দনু বলেছে, 'রহু তার স্বজাতির জন্য এমন সুন্দর জীবন করে দিয়েছিল কিন্তু সে জীবন তো স্থায়ী হল না।' রহুর সময়েও বাজিকরদের উপর অত্যাচার নেমে এসেছিল। যে ভুখণ্ডে রহু মানুষ নিয়ে থাকত সেখানে তাদের জীবন ছিল পবিত্র নদীর মতো। সেই পবিত্র নদীর অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল রহুর গোষ্ঠীকে। রহুর গোষ্ঠীর উপর অত্যাচার এবং তাদের ফসল নষ্ট করে, নারীদের ধর্ষণ করে বহিরাগতরা। গোষ্ঠীর এই দুর্দশার কারণ হিসাবে রহু বলেছিল—

> সমৃদ্ধি আমাদের বড় বেশি আত্মসন্তুষ্ট রেখেছিল আমরা অসতর্ক হয়ে পড়েছিলাম। প্রাচীনদের অর্জিত জ্ঞানকে আমারা ধারাবাহিক করিনি। তাই আমাদের এ হেন দুর্গতি।[৫]

'মানুষ মাত্রেই তোমাদের ভাই' এই শিক্ষা ভুল ছিল তা রহু স্বীকার করেছে। রহুর পরবর্তী গোষ্ঠীও প্রাচীনদের অর্জিত জ্ঞানকে ধারাবাহিক করতে পারেনি তাই তারাও পথভ্রষ্ট হয়েছে। সালমা, পীতেম দেখেছে তাদের দল কীভাবে বিপদের মধ্যে পড়েছিল, পেমা ও ধন্দুর সেই বহিরাগতদের দ্বারাই খারাপ পরিণতি হয়েছে। যাযাবরের দলভাঙার কাহিনি রহুর সময়েও হয়েছিল। একদল রহুকে উপহাস করেছিল আর একদল রহুর সঙ্গে ছিল। নদীকে পুনরায় অধিকার করতে, বহিরাগতদের আঘাতে রহুর ক্ষত-বিক্ষত দেহ নদীর স্রোতকে যখন রক্তাক্ত করেছে একদল বাজিকর সেই নদীতে ভেসে গিয়েছিল। সেই রক্তস্রোত বহিরাগতদের ভূখন্ড ও দলত্যাগীদের ভূখণ্ড ধ্বংস করেছিল। রহুর অনুগামীরা নদীর স্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের আদি পুরুষ রহুর কয়েকটা হাড় আশ্রয় করে পথ চলতে শুরু করেছিল। পরবর্তীতে পীতেম সালমা বার বার স্থান ত্যাগ করতে চাইলেও পারেনি, কারণ বার বার বিপদ এসেছে বাইরে থেকে। তাই চলমানতা এদের অদৃষ্টে ছিল। সাঁওতালদের সঙ্গে জমিদারের, মহাজনের,

পুলিশের, ইংরেজদের যুদ্ধে বাজিকর জড়িয়ে পড়েছে। বন্দুক কামানের সঙ্গে তীর-ধনুক, বল্লম, তলোয়ারের অসম লড়াই। ডুমকা সোরেনের সঙ্গে সম্পর্কের ফলে পরতাপ জিল্লুরা সাঁওতালদের সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু বুঝতে পেরেছে তারা ক্রমে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল। দল ছাড়া যাযাবর বাঁচতে পারে না, এদের ব্যক্তি ও গোষ্ঠী একাত্ম, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস লিখেছিলেন—

> বাজিকরের ব্যক্তির অভিমান ও গোষ্ঠীর গর্ব বাঁধা থাকে একই তারে, যেখানে যায় সেখান থেকেই উচ্ছেদ হওয়ার গ্লানি এবং ঠিকানা জোগাড় করার সংকল্প প্রত্যেকটি ব্যক্তি ও এই গোষ্ঠীর মধ্যে এমনভাবে প্রবাহিত যে ব্যক্তি ও সমষ্টির আলাদা পরিচয় পাওয়া মুশকিল।[৬]

তাই এবার গঙ্গা পার হয়ে মালদা চলে যাবে এখানকার ছাউনি তুলে নিয়ে, সালমা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পেমা মারা যাবার পর পীতেম বিষাদে আরও বৃদ্ধ হয়েছে। সে পেমার আর্তনাদ শুনতে পেত, তাই আফিমের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকত। সালমার সন্ধানে জিল্লু, পরতাপ, বালি, পিয়ারবক্স গঙ্গার ওপারে সাঁওতালদের থেকে দূরে ঝামেলা মুক্ত হয়ে থাকতে চেয়েছে। তাই গোপনে সাঁওতাল ইংরেজদের থেকে লুকিয়ে পুর্ণিয়া জেলায় প্রবেশ করেছিল। সেখান থেকে চুরি, ভিক্ষা, ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে করতে ক্রমে মালদা এসে তাঁবু ফেলেছে।

বাজিকর শুধু ছোটে, ছুটে ছুটে 'বাজিকরের গেঁহুর পারা অঙ তামার অঙ তামার বন্ন হোই গিল।' স্থায়ী হতে চাইলেও পারেনি, হতে গেলেই একটার পর একটা বিপদ এসে উপস্থিত হয়েছে। রাজমহলে দীর্ঘ স্থিতিতে অনেক কিছু হারাতে হয়েছে, অনেক দাম দিতে হয়েছিল বাজিকরদের। পুবের দেশেও সুখ জোটেনি, লুবিনি তাই নাতনি শারিবাকে বলেছিল—

> শ-বছর পার হই গেল। তাও তো সুখ জুটে না। নাকি, সুখ বলে কিছু নাই, নাকি খালি দুক্কের পাথারে সাঁতার খায় বেবাক মানুষ।[৭]

আপাতত মালদা শহরে মহানন্দার তীরে অস্থায়ী গেরস্থালি শুরু করে, রাজমহলের পর যাযাবর মানুষগুলো অনেক ভগ্ন জীর্ণ হয়েছিল ফলে চুরি, বেশ্যাবৃত্তি লোক ঠকানো এসব করতে হয়েছে তাদের। যুদ্ধের জন্য পাঁচজন যাযাবর যুবক গেলে চারজন ফিরে এসেছে, তবে মুর্শিদাবাদ থেকে পরতাপ, জিল্লুর ফিরে আসার মতো বাজিকরদের এবার তেমন উল্লাস নেই। পীতেম, পরতাপ, বালি, জিল্লু, পিয়ারবক্স ভেবেছে 'এখন বোধহয় গেরস্থ

হওয়ার চেষ্টা করা উচিত' কিন্তু গেরস্থ হওয়া এত সোজা নয়। যাযাবরের কোনো জাত নেই ধর্ম নেই, থিতু হতে গেলে এসব অবশ্যই প্রয়োজন। বাজিকরদের জাত শুনে লক্ষ্মণ সোরেনের 'নিশা' কেটে যায়, লক্ষ্মণ পীতেমের কাছে জানতে চেয়েছিল, 'তোমাদের কী জাত, সরদার?' পীতেম বলেছিল, 'আমরা বাজিকর জাত।' বাজিকর যে কোনো জাত হয় না, সমাজে মূল স্রোতে যেতে হলে জাত, ধর্ম প্রয়োজন হয় তা ভবঘুরে বাজিকররা জানত না। তবু বাজিকর হাল ছাড়েনি, বালির নেতৃত্বে পথে নেমেছিল। সমাজে মিশে যেতে মালদা শহরে টাঙা চালিয়ে মুসলমানদের পাল্লা দিতে চেয়েছিল। বাজিকর যুবকেরা কাজ খুঁজে নিয়েছে, পীতেম আরও বেশি আফিম নিয়ে ঝিমোয়, সালমা বাড়ি বাড়ি ঘুরে আলাপ জমিয়েছিল, তার শরীরের বয়স যেন বাড়েনি, সেই শরীরের জাদুতে সবার কাছেই সে গুরুত্ব পেয়েছে। সালমা শহরের জমিদার বদিউল ইসলামকে প্রেমের জালে বশ করেছিল। সেই সুযোগে বালি কিছু জমি জায়গার সুরাহা করতে চেয়েছে বাজিকরদের জন্য। সালমা বদিউলকে বলেছিল—

> আমার কিছু দরকার নেই, মিঁয়া। আমি যেমন আছি তেমনি থাকতে চাই। দরকার বাজিকরদের। তাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই, সাড়া দুনিয়ায় দাঁড়াবার মতো জায়গা নেই।[৮]

সালমা, বাজিকরদের থেকে নিজেকে একটু আলাদাই রেখেছিল, কিন্তু সালমাই বার বার পীতেমকে বাজিকরদের গৃহস্থ হবার কথা বলেছিল। বাজিকরদের নিজস্ব সম্পদ হল তাদের শরীর। সালমা বাজিকরদের নির্ভরযোগ্য মহিলা দলপতি, দলের প্রতি তার দায়িত্ব আছে তা সে যেভাবেই পালন করুক। বদিউল সালমাকে আশ্বাস দিলেও কিছু করার আগেই অবৈধ লেনদেনের কারণে গ্রেপ্তার হয়েছিল, বাজিকরের কপালে সুখ সত্যি নেই। কোনো না কোনো বিপদে বাজিকরের সুখ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

বাজিকররা জমি পেয়েছিল জামিলাবাদে, সাঁওতাল, ওঁরাওদের সঙ্গে বাজিকর জলা ও জংলা জমি পেয়েছে মাথাপিছু পাঁচ বিঘা করে। কিন্তু বাজিকর জানত না পাঁচ বিঘা কতটা মাটি, চাষের কাজও জানত না। জমি পেয়েও বাজিকরের ষোলো ঘর মানুষের মধ্যে পাঁচ ঘর শহর ছেড়ে যেতে চায়নি। কারণ—

> পীতেম যে স্থিতির রসে দলের মানুষকে নিষিক্ত করতে চেয়েছিল এখন তা আবার কিছু অন্য রকম প্রতিক্রিয়া দেখাতে শুরু করল। মুক্ত পৃথিবীর এবং অজ্ঞাত রাস্তায় ভয়াবহতা কী পরিমাণ বেড়েছে, সেকথা যাযাবরের থেকে ভালো কে বোঝে?[৯]

কিন্তু অনেকেই জমিতে যেতে চেয়েছিল চাষের কাজ শিখে নেবে ভেবে। কিন্তু দলের মধ্যে জীবিকা নিয়ে মতাদর্শগত বিরোধ ছিল অনেক আগে থেকেই। গোরখপুর থেকে অনেক বাজিকর হারিয়ে গেছে। রহুর দল থেকেও অনেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল, তারা এখন কোথায় কীভাবে কী পরিচয়ে আছে পীতেম জানত না। পীতেম সবাইকে নিয়েই থাকতে চেয়েছিল, কিন্তু চারঘর বাজিকর কুটুম হয়েই রয়ে যায় মালদা শহরে। সালমা বদিউলের কাছে থেকে গেল, পীতেম শিশুর মতো নির্ভর করত সালমার উপর তবু সালমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না একথা বলেনি। বরং দলের কথা ভেবেছে, 'তবে তাই হোক, রহুর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক বাজিকর গেরস্থ হোক।' সালমা ক্রমে কর্তৃত্বের অধিকারিণী হয়েছে পয়সার জোরে। বন্ধকি ও সুদের ব্যাবসার নেশা ধরেছিল সালমার, বাজিকররা কেউ এলে কিছু পয়সা দিয়ে বিদায় করত। টাকার অহংকারে সালমা নিজেকে বড়ো গৃহস্থ ভেবেছিল, অন্য বাজিকরদের অপমান করত ফলে একদিন তার দলের লোকের কাছেই খুন হয়েছিল। বালি ঘোষেদের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তুলেছিল পশুপালনের জন্য। আবার পরতাপ কৃষিতে সাঁওতালদের সঙ্গে সমান তালে কাজ করে ফসল উৎপাদনের চেষ্টা করেছে। এভাবে বাজিকর গোষ্ঠী ক্রমে ভাঙতে শুরু করেছিল। অন্য বাজিকররা খাটতে জানত না বা চাইত না কিন্তু পরতাপের নেশা লেগেছিল চাষে। পরতাপ নতুন ধরনের ধান চাষের চেষ্টা করে সফল হয়ে সেরা চাষিদের পথপ্রদর্শক হয়ে উঠেছিল। পীতেম বাজিকরের স্থায়ী হবার স্বপ্নকে যেন হাতের কাছে পেয়েছে—

> শীতের সকালে পরতাপ ও জামির যখন মাথায় করে পাকা ফসলের ভার এনে উঠোনে ফেলে, সে দু-হাত দিয়ে তাদের স্পর্শ নেয়, গন্ধ শোকে এবং নতুন ধান শিষ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে দাঁতে কাটে।[১০]

অক্ষম পীতেম নিজেও মাঠে গিয়ে কাজ করত, তার বাপ দনু, তাদের রহু ভগবানের ইচ্ছা যেন পূর্ণ হতে চলেছে এবার। পাকা ফসলের ছোঁয়ায় যেন সঞ্জীবনী পেয়েছে সে, নতুন চালের ভাত খেয়ে সে রহু ও বাপ দনুর ডাক শুনতে পেত। পীতেমের নাতি জামির

পরতাপকে টপকে আরও বড় গৃহস্থ হতে চেয়েছিল, বাজিকরের রক্তে গৃহস্থ হবার নেশা লেগেছে। জামির তাই পতাকির মতো গৃহস্থ হতে চেয়েছিল—

> গৃহস্থ বটে পতাকি ঘোষ। এই না হলে গৃহস্থ! চারখানা মোষের ও চারখানা বলদের হাল পতাকির। যেমন মোষের চেহারা, তেমনই বলদের চেহারা। ধানের মরাই দশটা। তার পাঁচটা গাই-মোষ এবং ছ-সাত জোড়া গাই দুধ দিত অঢেল।[১১]

এই পতাকির বাড়ি গিয়ে জামির খুঁজেছিল গৃহস্থরা কাকে লক্ষ্মী বলে। রহু, দনু, পীতেম বাজিকরদের পুরোপুরি গৃহস্থ হবার স্বপ্ন দেখেছে, জমি পেয়েছে, ঘর পেয়েছে এখন ঘরের লক্ষ্মী দরকার। সম্পূর্ণ গৃহস্থ হতে হবে বাজিকরদের।

বাজিকররা হাজার চেষ্টা করলেও পীতেম যেভাবে চেয়েছিল সেভাবে বাজিকর থিতু হতে পারেনি। বাজিকর চেষ্টা করলেও কোনোদিন চাষেও মন দিতে পারেনি। কারণ ফসল ফলানোর ধৈর্য তাদের ছিল না ফলে কিছু বাজিকর তাদের পুরনো উপায়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছে, পরতাপ জামির তা করেনি। এছাড়াও বাজিকর একটার পর একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ত। পতাকি ঘোষের বোনের সঙ্গে জামিরের অবৈধ সম্পর্কের জেরে দুর্দান্ত ধর্ষক দেদোন ঘোষ ও জামিরের মধ্যে লড়াই হয়েছিল। ফলে বাজিকর ও সাঁওতালদের উপর ভীষণ অত্যাচার নেমে এসেছে—

> দেদোন দলবল সংগঠিত করে আক্রমণ করেছিল বাজিকর বসতি। সব ক-টা ঘরে আগুন লাগিয়েছিল, ধর্ষণ করেছিল রমণীদের, বিশেষ করে লুবিনিকে, তার তখন চোদ্দ বছর বয়েস। দেদোন আগুনের মধ্যে ছুড়ে দিয়েছিল পরতাপের দুটো সন্তানকে, দাঙ্গাবাজদের ভীষণ আকৃতির হাঁসুয়ায় খুন হয়েছিল আরও দুজন মানুষ।[১২]

বাজিকরদের বাড়ি পুড়েছিল, সাঁওতালদের সঙ্গে খড় ধার নিয়ে নতুন ছাউনি হয়েছিল ঠিকই কিন্তু খাজনা দিতে না পারায় কারো কারো জমিও গেল। বাজিকর যেহেতু জমির সঙ্গে একাত্ম হতে পারেনি তাই তাদের তেমন গায়ে লাগেনি ব্যাপারটা। দলপতি জামির কাজ করার কথা বলে বাজিকরের পুরোনো পেশা ত্যাগ করতে চেয়েছে তবে সালমার মতো বাজিকরের অস্তিত্ব ভুলে নয়, অস্তিত্ব রেখেই। জামির বাইরের জগৎকে দেখেছে, সেখানের মানুষ বিভিন্নরকম দুঃখ, হতাশায়, আক্ষেপে আল্লা বা ভগবানকে ডাকে, দোষ দেয়। বাজিকরের তো দুঃখের শেষ নেই কিন্তু ডাকার মতো তাদের কোনো ভগবান ছিল না।

‘বিগামাই, কালীমাই, কী ওলামাই? সেও তো শুধু পথের সংগ্রহ, তার বেশি কিছু নয়।’ জামির ভেবেছিল এতদিন বাস এদেশে এবার হয়তো মানুষ তাদের গ্রহণ করবে কিন্তু কিছুতেই শেকড় গাড়তে পারেনি। রমজানের সঙ্গে তরমুজ চাষ শিখতে চেয়েছিল জামির, সফলও হয়েছিল কিন্তু বাজিকরদের সফলতার পথে চিরকালীন অনেক বাধা। জমিদারের বাউণ্ডুলে ছেলেদের তরমুজ খেতের উপর অত্যাচারের মুখে জামির নিজেকে পরিচয় দিয়েছিল ‘আমি এক চাষা, দেখবাই পাচ্ছেন।’ একথা বলতে পেরে জামিরের বুক ভরেছিল। এই নতুন চাষার কষ্টের ফসল ছ-সের ওজনের এক একটা তরমুজ গরুর গাড়িতে চাপিয়ে পরতাপকে দেখাতে এনেছিল, পরতাপ নেড়েচেড়ে দেখেছে সেই তরমুজ। কিন্তু নৌকা বোঝাই তরমুজ নিয়ে হাটে যাবার পথে বাবুদের উচ্ছৃঙ্খল ছেলেরা লোক দিয়ে আক্রমণ করে সেই নৌকা ডুবিয়ে দিয়েছে, ফলে জামির মাথায় ঠিক রাখতে না পেরে খুন করেছে। বাজিকরদের দলপতিদের মধ্যে সব থেকে কর্মদক্ষ ছিল জামির। তাই তো জামিরের মৃত্যু যত এগিয়ে আসছিল বাজিকর তত অসহায় হয়ে পড়ছিল। সময়ের সঙ্গে জামির অনেক বেশি নিজেকে বিকশিত করেছে, দলপতি হিসাবে এবং বাজিকরের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে।

বৃদ্ধ বালি নিরাপত্তার জন্য দল নিয়ে শহরের কাছে উঠে এসেছিল, পুলিশের কাছে নিরাপত্তা দাবি করল, এই প্রথম কিছু দাবি করল বাজিকর। তারা পাতালু নদীর তীরে নতুন পত্তনি গড়ে নতুন ভাবে বাঁচতে চেয়েছিল, এবার আর ‘ভিখ্‌মাঙা’ বাদর আর ভাল্লুর নাচ দেখানো নয়, রহু চণ্ডালের হাড়ের ভেলকি দেখিয়ে নয়, কাজ করে বাঁচতে চেয়েছে বাজিকররা। তাই রহুর আসল ও মেকি হাড় পাতালু নদীতে বিসর্জন দিয়ে মাঠে নেমেছিল চাষের কাজ শিখতে। পাটের খেত নষ্ট করে, নাঙল দিতে গিয়ে গরুর পায়ে ফাল লাগিয়ে শাস্তি নিয়েছিল বাজিকররা চাষির থেকে মাথা পেতে। ভুল করে, মার খেয়ে শিখতে চেয়েছিল। বাজিকর জীবনের অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে, বাজিকরদের সংস্কৃতি বদলে গেছে—

> তখন রমণীরা পরত ঘাঘরা আর কামিজ, পুরুষেরা পরত নুগরু আর কুর্তি। এখন দেখ সব মেয়ে শাড়ি পরে, পুরুষেরা পরে ধুতি আর লুঙ্গি। সেসব ছেড়ে দিল, তার নিজের ভাষা, নিজের পোশাক, নিজের আচার-আচরণ, নিজের ক্রিয়াকর্ম সব।[১৩]

এভাবে আরও একটা যুগ শেষ হয়েছে বাজিকরের, কিন্তু নির্দিষ্ট পরিচয় হয়নি। তারা গরু ও শুয়োর দুই খেত অথচ হিন্দুও না মুসলমানও না। তবে এর থেকে কোনো একটা পরিচয় তাদের দরকার ছিল কারণ তখন ইংরেজ যাবার সময়, আর দেশটা ভাগ হয়ে হিন্দুস্থান পাকিস্তান হবার সময়। তেভাগা নিয়ে লড়াই হয়েছে তাতে বাজিকর মরেছে, বাজিকর আবার জমি খালাস করে চাষের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল। সে এক আলাদা অনুভূতি, যেভাবে পীতেম, পরতাপ, জামির স্বপ্ন দেখে এসেছিল—

> জীবনের নতুন স্বাদ, সবরকম রঙের উজ্জ্বলতা তারা খুব ভয়ে ভয়ে অধিকার হিসাবে গ্রহণ করতে শিখল। যাবতীয় অনাস্বাদিত সুখের খোলা দরজার সামনে তারা যেন এসে দাঁড়িয়েছে। এইবারে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি মিলে গেছে। গৃহস্থের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, সামাজিকতার অধিকার যেন আয়ত্তের মধ্যে এসে গেছে। যাযাবরের তাঁবু ছিঁড়ে ফেলে শক্ত খুঁটোর ঘর বাঁধা। তারপর জীবন বয়ে যাবে স্বাভাবিক স্রোতের মতো। অনির্দিষ্টের মধ্যে আর ঘুরতে হবে না। জমি হচ্ছে স্থিতি—দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক।[১৪]

কিন্তু এই স্থিতির সঙ্গে ধর্মীয় পরিচয় দরকার। বাজিকরের নতুন দলপতির কাছে লালমিয়া মহিমবাবু ধর্মীয় পরিচয় চাইতে গিয়ে থতমত খেয়েছিল। তাদের জাত নাকি 'বাজিকর'। ইয়াসিন বাজিকর ওলামাই, বিগামাই কালীমাই এর কথা বলেছে, এরাই নাকি তাদের দেবতা। এর সঙ্গে তারা তাদের ব্যবহৃত শব্দগুলো বদলাতে শুরু করেছে, বলদকে 'বারাদ' বলত না আর, 'ভইস'কে 'হেলো' বলত না, স্থানীয়দের মতোই 'বলদ' 'ভইস' বলত। কিন্তু 'যার ধর্ম নেই তার সঙ্গে আবার ন্যায়নীতির সম্পর্ক কী? যার সমাজ নেই তার সঙ্গে সামাজিক চুক্তিও হয় না' ফলে বাজিকরদের খালাস করা জমি বিক্রি হয়ে গেছে। বাজিকররা ক্রমাগত পালায়, ঘর গেরস্থালির সব পরিকল্পনা পেছনে ফেলে বার বার তাদের পালাতে হয়েছে। এভাবে একসময় পুবে চল্লিশ মাইল সরে গিয়ে মোহর হাটখোলায় খোলা আকাশের নীচে বোঝা নামিয়েছিল। দেশের মানচিত্রে তখন নানারকম পরিবর্তন এলেও মোহর ভারতেই ছিল। বাজিকর গোষ্ঠীর মধ্যে নতুন নতুন বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। যে সম্পর্ক একই রক্তের, বাজিকর অতীত মনে রাখতে চায়নি, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল। এটা জামির বাজিকর তাদের শিখিয়ে গিয়েছিল। মৃত্যু, বিচ্ছেদ, মিলন, কষ্ট অত্যাচার এসব নিয়ে তাদের ভাবার সময় ছিল না। বাজিকরের দল থেকে অনেকে হারিয়ে গিয়েছিল যেমন সোজন পাখমারাদের সঙ্গে চলে গিয়েছিল, রূপা খুন করে পালিয়ে

বেদে শরমীর সঙ্গে নতুন করে ছিল। পলবিকে দিগিন মণ্ডল লুঠ করে নিয়ে গিয়েছিল। পরে পলবি ও রূপা ফিরে এসেছে কারণ বাজিকর দল ছাড়া বাঁচতে পারে না। আবার বাইরে থেকে নতুন কেউ দলেও এসেছে আকালু তার দৃষ্টান্ত।

বাজিকররা বার বার সাঁওতাল, ওঁরাও, মালো, ঝালো এই সম্প্রদায়গুলোর সঙ্গে স্বাভাবিক সখ্য গড়ে তুলেছিল। সমাজে এই সম্প্রদায়গুলো উচ্চবর্ণের সঙ্গে জলচল নয় তবুও এদের নিজস্ব একটা সম্প্রদায়গত অহং ছিল যা সামাজিক নিগড়ে বাঁধা। ঝালোরা যেমন তাদের মেয়ে পাখির সঙ্গে বাজিকর সোজনের সম্পর্ক মেনে নেয়নি, নমঃশূদ্ররাও তাদের মেয়ে মালতীর সঙ্গে ওমর বাজিকরের সম্পর্ক মানল না। এদেরও সেই একই প্রশ্ন তোমরা কী জাত? এই প্রশ্নকে বাজিকররা ভয় পেত। ইয়াসিন নমঃশূদ্র ভায়রোর কাছে আবেদন করেছে 'হামরাদের আপনার জাতে তুল্যে লেন, মালিক।' ইয়াসিন ভেবেছিল এটা খুব সহজ ব্যাপার, ভায়রো চাইলেই পারবে আর সমাজ মেনে নেবে। ভায়রো বলেছিল—

> বাইশ দিগর হামাক্ নমোশুদদুর বানাবার হক্ দেয় নাই বাজিকর। হিন্দুধর্মে এমন হক্ কেরো নাই। তুমু ব্রাহ্মণ, কায়েত, মাহিষ্য, সদ্‌গোপ, নমোশুদদুর কেছুই হবা পারবা না। তুমু ইসব জাতের হওয়া জম্মাবা পারো, হবা পারো না।[১৫]

গ্রহণ করলেই যে সেই ধর্মের মূলস্রোতে মিশে যাওয়া যেত এমন নয়। স্বধর্মেও সম্প্রদায়গত ভেদ ছিল। বাজিকররা যে কোনো ধর্মে মিশে গেলেই সেই ধর্ম তাদের গ্রহণ করবে এমন বাজিকররা ভেবেছিল কিন্তু সামাজিক রীতি অন্য কথা বলে। ইসলাম তাদের আশ্রয় দিতে পারে, দেশভাগের পরে এদেশে মুসলমান দুর্বল হয়ে পড়েছে। শারিবা হাজি সেখের সঙ্গে কথা বলার পর হাজি তাদের ইসলাম গ্রহণ করতে বলেছে। হাজি সেখ বলেছে ইসলামে জাতপাতের বালাই নেই। বাজিকরের মধ্যে জাত ধর্ম পাবার চিন্তাটা প্রবল হয়েছিল তাই রূপার আঙিনায় সবাই একত্রিত হয়েছিল, তরুণেরা ক্ষোভের সঙ্গে বলেছে—

> ক্যান্? বাজিকরের ধরম নাই! এতোবড় দুনিয়ার বেবাক মানষিকে হয় ভগবান, লয় আল্লা, লয়তো যিশু বানাইছে। তো ই বাজিকরগুলো কি এংকা আশমান ফুড়া বারাইছে?... বাজিকরের বিটিক্ পাট খ্যাতে চিত করা চলে, বাজিকরের বিটিক্ লুঠ করা চলে, ঢেমনি বানাবার চলে, আর বাজিকরের ব্যাটাক্ জামাই করা চলে না।[১৬]

রূপা ভেবেছিল ঘরে বিষহরির ঘট থাকলেই বোধহয় হিন্দু হওয়া যায়। তাই সে 'হামি হিঁদু' এমন দাবি করেছে। সে হিন্দুর সঙ্গ করেছে, তার সংস্কারে হিন্দুত্ব আছে তবে সমাজ এভাবে স্বীকার করে না। ইয়াসিন অন্য কথা বলেছে, বাজিকর বেজাত আর শুনতে হবে না, বাজিকর ঘর পাবে সমাজ পাবে, পরিজন পাবে। বাজিকরের মধ্যে সমস্যাগুলো ক্রমে ব্যক্তিগত হয়ে যায়। বাজিকর সমাজের অন্য জাতের মেয়েকে গ্রহণ করলে বা অন্যদের বাজিকরের মেয়েকে ভোগ করতে বাধা এলে একটাই ফল, বাজিকরের উচ্ছেদ হওয়া। অনেক ঘুরে বাজিকরদের নানা অভিজ্ঞতা হয়েছে মুসলমানেও যে ভেদাভেদ আছে সে কথা রূপা জানত। আর জেনেছিল হিন্দুর মতো থাকলেও হিন্দু তাকে গ্রহণ করেনি, বাজিকর মুসলমান হলেও মুসলমানরা তাদের গ্রহণ করবে না। তবুও তিন ভাগ বাজিকর মুসলমান হয়েছিল একভাগ হয়নি। বাজিকর মুসলমান হলে মুসলমানের লাভ আছে কিনা কেউ জানত না, হিন্দু হলে হিন্দুর লাভ হবে কিনা তাও কেউ জানত না কিন্তু বাজিকররা জানত তাদের লাভ হবে, ধর্ম পেলেই তাদের সব পাপ ধুয়ে যাবে, বাজিকর থিতু হবে।

বাজিকরদের ইসলাম গ্রহণ করার খবরে হিন্দুধর্মের নানান স্তরে একটা চিন্তার আবহ তৈরি হয়েছে। ধর্মীয় ক্ষেত্রে বাজিকররা সমাজের মূল স্রোতের মানুষের কাছে গুরুত্ব পেল। সময়টা উল্লেখযোগ্য, 'সাতষট্টির নির্বাচনের ডামাডোল তখন শুরু হয়ে গেছে।' অভিজিৎ সেন তাঁর গল্প উপন্যাসে আখ্যান বর্ণনা করতে গিয়ে কৌশলে সময়টা উল্লেখ করে দেন ফলে পাঠক সহজেই সময়ের সঙ্গে প্লট ও চরিত্রগুলোর মেলবন্ধন করে নিতে পারে। এই সাতষট্টি সালের নির্বাচনের কথা মাথায় রেখেই দল কোনও পক্ষকেই চটাতে সাহস করেনি। ভায়রোর মতো নিম্নবিত্ত হিন্দুও এর প্রতিকারে সাধ্য মতো ব্যবস্থা করেছে। জোর করে লোভ দেখিয়ে ধর্মান্তর সনাতন ধর্মের অপমান এমনই ছিল তার দাবি। বাজিকররা নিজেদের অস্তিত্ব এবার বুঝতে পেরেছে, বাজিকরদের কিশোর নমঃশূদ্র পাড়ায় মুরগি চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে মার খেলে ইয়াসিন, শারিবা এবার প্রথমবার প্রতিবাদ করেছে। যেহেতু যাযাবররা ইসলাম গ্রহণ করবে তাই ভায়রো চাইলেও বাজিকরদের আর বিশেষ কিছু করতে পারেনি। কারণ এবার বাজিকরদের উপর অত্যাচার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্ম দিতে পারে। এবার বাজিকর যে মূল স্রোতের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে তার আরও একটা প্রমাণ, ভায়রো এই অপমান সহজে হজম করেনি, শারিবাকে আক্রমণ করেছিল রাতের অন্ধকারে। শারিবার বাবা রূপা ভায়রোকে সাপে কাটায়, যাযাবরী বা বাদিয়া কৌশলে। শারিবার

চিকিৎসা, রূপার প্রতিশোধ এসব যাযাবরের সমাজে নতুন ব্যাপার। এতদিন যাযাবর শুধু মার খেয়েছে, সহ্য করেছে। এবার জামির, পীতেমের স্বপ্ন সফলের পথে। ক্রমে হাতে দলিল পেয়েছে, সেই দলিলের ক্ষমতা জমিদার আজুরা মণ্ডলের থেকেও বেশি। ছ-ঘর বাজিকরের থেকে চোখের জলে চিরবিদায় নিয়ে বাকিরা মুসলিম হয়েছে, তাদের নতুন নাম, নতুন পদবী, নতুন পোশাকে তাদের কেমন বিহ্বল নির্বোধের মতো দেখায়। শারিবা হানিফের সুপারিশে গ্যারেজে কাজ শেখে, ইঞ্জিন, চেসিস, পেট্রোল, ডিজেল এসব শব্দের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। তবুও এতকিছু নতুনের মাঝে সব কিছুই আগের মতোই থেকে গেছে। রূপা যেমন বলেছিল তেমনই হয়েছে, বাজিকর শারিবার 'কেমন আছেন, মামা? উত্তরে ইয়াসিন বলেছে 'বাপ যেমন ছিলাম তেমনই আছি।' বাজিকর সাচ্চা মুসলমান হতে পারেনি, বেজাত মুসলমান হয়েই থেকেছে, শুধু তাদের গোষ্ঠীর ভাঙন হয়েছে। শারিবা তার নানি লুবিনির কাছে বাজকিরদের পাপের কথা শুনেছিল, এই কি তার ফল। সমাজ তাদের কেন পরিত্যাগ করল কেন গ্রহণ করেনি। ছিন্নভিন্ন বাজিকরদের অনেক পরিবর্তন হয়েছে এখন তারা শহরে যায়, সিনেমায় যায়। ভগ্নপ্রায় বাজিকর সমাজের অস্তিত্ব দেখে শারিবা ভেবেছিল হিন্দুয়ানি ও মুসলমানিতে বিভক্ত বাজিকর রহুকে ভুলে গেছে। তারা আর কেউ রহু চণ্ডালের হাড় খুঁজবে না। যাযাবর গোষ্ঠীর ধারাবাহিকতায় কোথায় সমস্যা ছিল? রহু তো সর্বশক্তিমান দেবতা নয়, শারিবা এর আগেও নানির মুখে বাজিকরদের গল্প শুনে ভেবেছিল—

> সমস্যা ছিল পীতেমের, সমস্যা ছিল জামিরের, সমস্যা লুবিনির, শারিবার, সমস্যা কিছু বাজিকরের। রহু ঈশ্বরের মতো সর্বশক্তিমান নয়। সে এক প্রাচীন দলপতি। সে এক ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর নীতি নির্ধারণ করত তার জীবদ্দশায়।[১৭]

রহুকে ভগবান ও আল্লার সমগোত্রীয় ভাবতে বাজিকরের ভয় আর অনিচ্ছা দুই কাজ করেচ্ছিল। এসব ভেবে শারিবা আজ অভিজ্ঞতায় বৃদ্ধ, রহুর মতো বিষনণ্ন। এই বিষনণ্নতার বশে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। মনে সান্ত্বনা ছিল, রহু তার মনে ও রক্তে প্রবেশ করেছে। রহুর তৃপ্ততার কথা ভেবেছে সে, বাজিকররা স্থিতি হয়েছে, এখন আর গ্রাম ছেড়ে পালাতে হবে না। তাদের ভাবনা শুধু তাদের কুঁড়ে ঘরগুলোতে কেন্দ্রীভূত ছিল। তবুও দলপতি শারিবার চঞ্চলতা কাটেনি, এই অনেক স্বান্তনার মাঝে অনেক বেদনার স্মৃতি তাকে অস্থির করে তুলেছিল। পীতেমের মার খাওয়া, পেমার আর্তনাদ, নমনকুড়ি বন্যায় সর্বনাশ, নৌকায় রক্তাক্ত জামির, ধর্ষিতা লুবিনি, জলকাদায় পলায়মান বাজিকর, ওমরের ছিন্ন মুণ্ডু

এসবের মাঝে শারিবা গোটা পৃথিবীটাকে দেখেছে, তার চারপাশের সমাজটাকে দেখেছে। আর দেখেছে, দনু, পীতেম, পরতাপ, জামির, লুবিনি, রূপার সর্বোপরি বাজিকরদের বহু কাঙ্ক্ষিত পুবের দেশ।

২। *ছায়ার পাখি*

পালা বদলের রাজনীতি নয়, একটি রাজনৈতিক আদর্শ কীভাবে ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে, আদর্শভ্রষ্ট রাজনীতি, পরাজয়ের উপরে আশাভঙ্গের যন্ত্রণা কীভাবে সৎ মানুষকে দগ্ধ করেছে *ছায়ার পাখি* (১৯৯৩) উপন্যাসে অভিজিৎ সেন তাই দেখিয়েছেন। যেভাবে *নিম্নগতির নদী* (২০০৫) উপন্যাসে ত্রিদিব মিশ্র আশাভঙ্গে যন্ত্রণা কাতর হয়েছে। এই উপন্যাস শুধু একটি সময়ের প্রতিনিধিত্ব করেনি, সাড়া ভারতবর্ষের একটি চিত্র যেন। পরিবর্তমান গ্রামজীবনে আধুনিকতার প্রভাব, মানুষের জীবন ও চেতনার পরিবর্তন, বিচার ব্যবস্থা, মূল্যবোধ, সর্বোপরি নারীর অসহায়ত্ব এসবই এই উপন্যাসের প্রাণ। অভিজিৎ সেন সুযোগ পেলেই *ছায়ার পাখি* উপন্যাসের প্রতি তাঁর দরদ ব্যক্ত করে থাকেন এবং এটি তাঁর নিজের প্রিয় উপন্যাস একথাও স্বীকারও করেছেন। লেখকের এই উপন্যাসে প্রধান তৃপ্তির জায়গা অবশ্যই তাঁর দেখা, চেনা, জানা সমগ্র দেশকে ধরতে পেরেছেন বলেই।

উপন্যাসের মূল কাহিনিকে পৃথক করে বলা মুশকিল কারণ অনেকগুলি বিষয়ের ধারাবাহিক প্রবাহ এই উপন্যাস। যেগুলোর প্রত্যেকটি *ছায়ার পাখি* উপন্যাসের মূল আখ্যান। একজন সদ্য বিধবা নারীর বৈধব্যের যন্ত্রণা অনেকটা লাঘব হলেও পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে আরও একাধিক যন্ত্রণায় যখন সে ডুবতে থাকে তখন একটু সুখের হাতছানিকে ঘরকুটোর মতো আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল। রাজেশ্বরী সেই মেয়ে যে বিধবা হবার পর সৎ মায়ের অত্যাচারে জর্জরিত, এই সময়ে তার জীবনে বিমলের মতো সুদর্শন, উঠতি রাজনৈতিক নেতা এসে, প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস করেছে। গর্ভবতী রাজেশ্বরী শুধু বিমলের নাম ও গ্রামের নাম সম্বল করেই নদীতে ভেসে পড়েছিল। তার বিশ্বাস ছিল প্রেমিক বিমল তাকে গ্রহণ করবে। বিমল বলেছিল কুড়িদিন পরেই সে তাকে নিয়ে যাবে, কুড়িদিন অতিক্রান্ত হয়ে তিন মাস হতে চলল, বিমল আসেনি। রাজেশ্বরী বিমলকে অবিশ্বাস করতে গিয়েও চমকে উঠেছে, ভালোবাসায় বিশ্বাস বোধহয় একেই বলে। আলো অন্ধকারে ডুবে থাকা আড়বেঁকির বিলের রাতের নৌকায় পৃথিবীটাকেই রাজেশ্বরীর নির্জন মনে হয়েছে।

নৌকায় অপরিচিত এক পুরুষ, শর ও কাশের ডাঁটায় রাজেশ্বরীর আঁচল খসে পড়েছিল তখন রাজেশ্বরী ভেবেছিল তার মরা মায়ের কথা। শর ও কাশের গুচ্ছ যেন তার মায়ের গলায় বলেছে—

> ''রাজেশ্বরী, ও মাও, গায়ের বসন ঠিক রাখেক বড় হইছেন না তুমি?'' রাজেশ্বরীর ডুকরে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে হয়। মাও রে ওরে মোর মরা মাও, শরীলটা তো যায় না! তুমি জানো না, কোন পাকে তোমাক্ ফেলাবে তোমার শরীল।[১৮]

শরীর বিপাকেই ফেলেছে রাজেশ্বরীকে, তবুও বিমলকে অবিশ্বাস করতে চায়নি তার মন। নৌকায় বসে তার খেয়াল হয়নি কখন নৌকা বন্ধ হয়ে গেছে। মা ও নিজের শরীর আর বিমলের কথা এসব ভাবতে থাকে। শরীর যে আর তার বশে নেই শরীরের বশে সে নিজে ছিল, তার পেটের বাচ্ছা তাকে আরও অসহায় করেছে। এইসময় নৌকার লগি ঠেলা বন্ধ করেছে সাগর, নরেন মালোর খুন হওয়া মৃতদেহ দেখেছে, এই খুন রাজনৈতিক খুন আবার রাজেশ্বরীর বিমলের প্রতি বিশ্বাসের খুন।

রাজেশ্বরীর গন্তব্য নিরাপদ মনে হয়নি সাগরের, কারণ বিমল ও তার বাবা সুরেশ্বর দুশ্চরিত্র, দাম্ভিক। সাগর রাজেশ্বরীর মধ্যে নিষ্পাপ বিদ্যাধরীকে দেখেছে। তাই যুগীর বাড়িতে আশ্রয় হয়েছে রাজেশ্বরীর। যোগান যুগী, সাগর এবং কমিউনিস্ট সৎ আদর্শবাদী নেতা গোপাল যেন চক্রান্তের শিকার হয়েছে রাজেশ্বরীর আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে। যোগান নিজে সন্তানবতী হয়নি, তাই 'নরম তুলতুলে মানুষের সন্তানকে ছুঁয়ে, ছেনে, চেটে, হামলে হাসিয়ে কাঁদিয়ে' তার অপূর্ণ বাসনাকে পূরণ করতে চেয়েছে তাই রাজেশ্বরীর প্রতি স্নেহবশত খুব সাবধানে রেখেছিল। সাগরের বড়ো ভাইয়ের স্ত্রী হাঁপানির প্রকোপে পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছরেই বৃদ্ধা, সাগরের অবিবাহিত জীবনের জন্য এই মেয়েটিকেই দায়ী করে সাগরের আত্মীয়রা। অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের নারীরা কত বিচিত্র স্বভাবের, প্রত্যেকেই নিজের পূর্ণতা অপূর্ণতায় স্বতন্ত্র। যুগী ও যোগানের আশ্রয়ে থাকা রাজেশ্বরীরকে বিমলের হাতে তুলে দেওয়া বা বিমলকে জোর করা সাধ্যের বাইরে। কারণ বিমল ক্রমে দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেছে, তার পার্টি ক্ষমতায় ছিল তাই সে একটা খুন করেও গা ঢাকা দেবার কথা ভাবেনি। সাগর গোপালকে বলেছিল, রাজেশ্বরীকে তার নিজের হালে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। গোপাল, যোগান ও সাগর জানত যে আশায় এই মেয়েটি ঘর ছেড়েছে সে আশা পূরণ হবার নয়। তবে আরও

কিছুদিন অপেক্ষা করেছে যাতে ব্যাপারটা রাজেশ্বরী নিজে বুঝে নিতে পারে। যোগান বিমলের মায়ের কাছে গিয়ে কথা বলেছে, রাজেশ্বরীকে মেনে নেবে কিনা। বিমলের মা কৌশল্যা মেনে নেয়নি আবার রাজেশ্বরীর জন্য আশঙ্কাও ব্যক্ত করেছে। সে যদি দাবি নিয়ে আসে তবে জীবন সংশয় হতে পারে কারণ সে তার ছেলে ও মদ্যপ ইন্দ্রিয়পরায়ণ স্বামী সুরেশ্বরকে ভালোভাবে চিনত।

গ্রামবাংলার নারীদের হৃদয় ভেঙে খান খান হয়ে গেলেও বিশ্বাস যেন কিছুতেই টলতে চায় না, রাজেশ্বরীরও তাই হয়েছিল। বিমল তাকে কথা দিয়েছিল তাই সে বিমলের উদ্দেশ্যেই এসেছে তার কাছে অন্য কোনো বিকল্পও ছিল না। তাই সে অপেক্ষা করেছে এবং পেটে সন্তানের বৃদ্ধিতে আনন্দ পেয়েছে আর ভেবেছে, বিমল নেতা, অনেক ব্যস্ত, দিল্লি থেকে ফিরলেই হয়তো তাকে নিয়ে যাবে। রাজেশ্বরীর ভাবনা, বিশ্বাস, সজীবতা সম্পর্কে লেখক খুব সুন্দর করে লিখেছেন—

> চিরির বদ্ধ জলে খুব কলমিলতা বাড়ে। কলমি, জলসাঁচি আর হেলেঞ্চা। ভারি নরম সবুজ রঙ তাদের। উজ্জ্বলতা না থাক, ভীরু এবং নম্র এক সতেজতা তাদের আছে। তারা চিরির পাড়ের গাছের ছায়ায় থাকে। রাজেশ্বরীর স্নিগ্ধতা এবং সরলতা এইসব লাজুক উদ্ভিদের মতো।[১৯]

যোগান জানত শকুন্তলার মতো কোনো অভিজ্ঞান দেখালেও বিমল তাকে চিনবে না কারণ বিমল দুষ্মন্তের মতো অভিশপ্ত নয় বরং সমাজে মূর্তিমান অভিশাপ। তার মনে রাজেশ্বরীর শুভ্রতা ও সরলতা কোনো সুমতি জাগাবে না। অভাগী এই মেয়েটি বাল্যকাল থেকে কষ্টই পেয়েছে, বিমাতার অত্যাচারে বাবার বুকে শুয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলেছিল 'মঁয় বিষ খায়া মরমো!' রাজেশ্বরীর বাবা গোপীনাথ দাস মেয়ের খোঁজ নিতে এসে চোখের জল ফেলেছে গোপালের কাছে। বিমলকে দেখে তার মনে হয়েছিল 'এ মানুষ ইচ্ছে করলে শুধু চোখের ইঙ্গিতে অতিবড় সতীলক্ষ্মীকেও পথে নামাতে পারে।' কিন্তু সামনাসামনি হয়ে বুঝতে পারে এ লোক তার মেয়েকে ভালোবাসেনি। তারপর কোনো কথাই বলতে পারেনি বিমলকে সে। সঙ্গে মামা জগদীশ এসেছিল বিমলকে চাপ দিয়ে কিছু টাকা আদায় করতে, যেভাবে সে রাজেশ্বরীকে কাটিহারে বিক্রি করতে চেয়েছিল টাকার লোভে।

রাজেশ্বরী যখন তার দয়িতের কথা ও পেটের সন্তানের কথা ভেবে খুশি হয়েছে তখন বিমল তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় রাস্তার সমস্ত আগাছা সরিয়ে ফেলার চক্রান্ত

করছিল। রাজেশ্বরীর এই চলে আসা নিয়ে ব্যাপক রাজনৈতিক তরজা হয়েছে। পক্ষ-প্রতিপক্ষ একে অপরকে চেপে ধরতে চেয়েছে, তবে সেই অর্থে রাজেশ্বরীর কোনো পক্ষ ছিল না। দুটো পক্ষই আসলে নিজেদের সুবিধায় কোমর বেঁধেছিল। তবে মেয়েদের 'পায়ে ঠেলার দিন আর নেই। পায়ে ঠেললে উলটো ঠেলা খেতে হবে' পুরুষদের উদ্দেশ্যে এই কথা সমাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও রাজেশ্বরীর জীবনে কাজে আসেনি। রাজেশ্বরীর অজান্তে তাকে নিয়ে যতদূর জল গড়ায়, তাতে যে বিচার হয়েছে সেই বিচারে রাজেশ্বরীকে ক্ষতিপূরণ দেবার দাবি উঠেছিল। 'অর্থ দিয়ে ক্ষতিপূরণ খুব আদিম ব্যবস্থা এবং এখনো পর্যন্ত তার কোনও বিকল্প হয়নি।' রাজেশ্বরী ক্ষতিপূরণ চায়নি, তার বাবা গোপীনাথও এসব চায়নি। রাজেশ্বরী তার সন্তানের পিতৃত্ব চেয়েছিল সেই আশায় বিমলের সামনে গেলে বিমল তাকে অস্বীকার করেছে। অন্যদিকে সাগর প্রথম দিন থেকেই চেয়েছিল রাজেশ্বরী ও বিমলের একটা নিষ্পত্তি হোক, তার অবিবাহিত জীবনে রাজেশ্বরীকে বিদ্যাধরীর মতোই দেখেছিল সে। দিনে দিনে সাগরের রাজেশ্বরীকে পাবার তীব্রতা বেড়েছে একথা নানাভাবে বোঝালেও কোনো ইঙ্গিত আসেনি অন্য পক্ষ থেকে। বিমলের প্রত্যাখানের বিষাদ নেমে আসেনি রাজেশ্বরীর জীবনে কারণ সাগর সারাজীবন আশ্রয়স্থল হিসাবেই থাকতে চেয়েছিল। সাগর সমস্ত ভয় আতঙ্ক কাটিয়ে ভরসার স্থল হয়ে নৌকা থেকে ফিরে এসেছে রাজেশ্বরীর ছেলের কাছে। লাঞ্ছিত হতভাগী মেয়ের অথই জীবনসমুদ্রে ভেসে যাওয়া, তারপর কূল পাওয়ার কাহিনি উপন্যাসকে অনেকটা চালিত করেছে।

রাজেশ্বরীর সন্তান সাগরের পিতৃত্ব পেল, রাজেশ্বরী নতুন জীবন পেল কিন্তু এই উপন্যাসের আর এক নারী বিমলের মা কৌশল্যা। স্বামী সুরেশ্বর ও সন্তান বিমলের থেকে কৌশল্যা ভিন্ন মানুষ। সুরেশ্বরের মৃত্যুপুরীতে মৃত মানুষের মতো জীবন কাটিয়ে এক প্রকার যেন আত্মহত্যাই করেছে। সুরেশ্বর মাতাল, সংসার উদাসীন ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে যথেচ্ছাচারী ফলে স্বামী সুখ থেকে বঞ্চিত ছিল কৌশল্যা। সংসারে চিরকাল সে অবহেলিত, তাই সংসারে তার মায়াও বিশেষ নেই। এবং সে তার স্বামী সন্তানকে খুব ভালো করেই জানত। রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় নরেন মালোর খুনে বিমলের নাম জড়িয়ে গেলে উদ্বিগ্ন হয়নি মা হিসেবে। কারণ তার উদ্বিগ্নতা দেখার লোক নেই। কৌশল্যা বলেছে 'এদের রক্তে সব গুণ আছে। আমি আছি নিমেত্তর ভাগী-ছোলের মাও গেরস্থের বউ।' এটাই সংসারে কৌশল্যার অবস্থান। 'সারাটা জীবন কেউ মোর ধার ধারল না' এটা আক্ষেপ কৌশল্যার। জঙ্গলের

জানোয়ারের মতো কৌশল্যার মাতৃত্ব, সন্তান বড় হয়ে গেছে ফলে সন্তানের সঙ্গে সম্পর্কটাও বদলে গেছে। বিমল মাকে সংসারের প্রয়োজন মেটাবার যন্ত্র হিসাবে দেখেছে। অসুস্থ মাকে ফেলে কলকাতা চলে গেছে। কৌশল্যা অপমানে হতাশায় অভিশাপ দিত স্বামী সন্তানকে, 'সাপে খাবে তোক', যেভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষ আবেগ ছাড়া বেঁচে থাকে সেভাবেই কৌশল্যা বেঁচেছিল। ঘৃণা আর বিদ্বেষে স্বামী সুরেশ্বরের থেকে অনেক আগেই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল কৌশল্যা। বন্যার সময় সবাই নিরাপদ আশ্রয়ে গেলেও কৌশল্যা তার ডুবন্ত বাড়ি থেকে নড়েনি। প্রকাণ্ড গোক্ষুর তার ঘরে আশ্রয় নিলেও সে ভয় না পেয়ে সেই ঘরেই থেকে গিয়েছিল। মৃত্যুকে যেন ডেকে এনেছে, গোক্ষুররূপ মৃত্যুর কাছে যেন সমর্পন করে দিয়েছে নিজেকে। কৌশল্যার সাপে কাটা মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল ঘর থেকে। জীবন সম্পর্কে কোনো উৎসাহ উত্তেজনা কৌশল্যার ছিল না। অনেক আগেই তার মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল সংসারে, শুধু দৈহিক যন্ত্র থামার অপেক্ষা ছিল, গোক্ষুর দিয়ে কৌশল্যা তা করিয়েছে।

সময়ের সঙ্গে সমাজ ও রাজনীতির রূপ কেমন বদলে যেতে থাকে, আদর্শ সরে প্রতিশোধ স্পৃহা ও দম্ভ প্রকাশের জায়গা হয়ে ওঠে অভিজিৎ সেন তা দেখিয়েছেন। *ছায়ার পাখি* উপন্যাসে রাজনীতি এসেছে অন্যভাবে। সত্তর পরবর্তী সময়ে রাজনীতির সংজ্ঞা কীভাবে বদলে গেল, নীতি আদর্শ মরে গিয়ে জন্ম হয়েছে হিংসা, লোভ, স্বার্থপরতার বাতাবরণ। এগুলো সমাজ এবং সংসারে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এবং মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলছে, এসব দিয়ে এই উপন্যাস সময়ের সঙ্গে সমাজের ভিন্ন অভিঘাত গুলোকেই ব্যক্ত করে। সময় যত এগিয়েছে মানুষের আকাঙ্ক্ষা তত বাড়তে থেকেছে। অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো রাজনীতিতেও। আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তিতে আদর্শ সরিয়ে ফেলা হয়েছে নয়তো আদর্শায়িত ব্যক্তিকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। যেভাবে নরেন মালোকে খুন করা হয়েছিল। *ছায়ার পাখি* উপন্যাসের গোপাল *নিম্নগতির নদী* উপন্যাসের ত্রিদিবের মতো সৎ মানুষ রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়িয়েছে বা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিমল উঠতি কংগ্রেস নেতা, নতুন ক্ষমতার আস্ফালনের গর্ব অনুভব করছে সে। আঞ্চলিক পরিসরে ক্ষমতা প্রদর্শন আরো ভয়ংকর হয়ে উঠেছে যখন তাদের উচ্চ নেতা বশিষ্ঠ বিমলের প্রশংসা করে। 'কাপুরুষদের স্থান নেই আমাদের দলে। আমাদের একজন খুন হলে—' তাইতো নরেনের খুনের অভিযুক্ত বিমল আত্মগোপন করার কথাও ভাবে না। বিমলের কাকা নিখিলেশ্বর মুক্তিযুদ্ধের সময় ভালো টাকা কামিয়েছে, সে সক্রিয় রাজনীতি করেনি, তবে বড়ো নেতাদের বৈঠকখানা তার

বাড়িতেই হত। ফলে তার ব্যাবসা, ছেলে মেয়ের ভবিষ্যৎ, পোষা মাছ ও মুরগির চেহারা সব ঠিকই থাকত। দাদা সুরেশ্বরের সঙ্গে তার রেষারেষি চিরকালের, রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও। সুরেশ্বর কমিউনিস্ট থেকে কংগ্রেস সব দল করেছে কিন্তু কোথাও উল্লেখযোগ্য স্থান পায়নি, তার মধ্যেই বিমল মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ফলে তার অতৃপ্ত দম্ভ সে, ছেলের ক্ষমতা দিয়ে পূরণ করতে চেয়েছিল।

বামপন্থীদের ক্ষমতা বিস্তার, কংগ্রেসের রাজত্ব এসবের মাঝে যুক্তফ্রন্ট সাতষট্টিতে ক্ষমতায় এসেছে তখন অল্পবয়স্করা কোন দিকে যাবে ঠিক করতে পারেনি। বয়স্কদের উপেক্ষা অবহেলা করে তরুণরা পার্টিতে জায়গা করে নিয়েছিল। জ্ঞাতিশত্রুতা ক্রমশ বেড়েছে, এসবের মধ্য দিয়ে পঁচাত্তর ছিয়াত্তর সালে বিমল কংগ্রেসের নেতা হয়ে উঠেছিল। অভিজিৎ সেন পালাবদলের রাজনীতি কম পরিসরে এনে শুধু রাজনীতিতে সম্পৃক্ত মানুষের মনের পরিবর্তনকে স্পষ্ট করেছেন। সুরেশ্বর তার নিজের রাজনৈতিক জীবনে কোনো সম্মান পায়নি কিন্তু ছেলের নেতা হওয়াতে খুশি হয়েছে সে—

> দরিদ্র এবং অকর্মণ্য সুরেশ্বর এক ধরনের আত্মপ্রসাদ লাভ করতে থাকে যা পুত্রগর্ব এবং প্রতিশোধের মিশ্ররূপ।[২০]

ফলে সে কাউকেই ছেড়ে কথা বলে না, বিমল সম্মান পায় কিনা সে জানে না, শুধু এটা জানত তার ছেলে ক্ষমতাবান। স্ত্রী সম্পর্কে বাছ বিচার ছিল না সুরেশ্বরের, তার যোগ্য ছেলে বিমল। নেতা নরেন মালোর বিরুদ্ধে অন্যদের মতো সরকারের কাজের টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ ছিল না। তার বাবা বস্তু মালো সারাজীবনে একটা জাল কিনতে পারেনি, তার ছেলে নরেন থেকে নরেন্দ্রনাথ হয় কীভাবে? নরেনের উন্নতি, পাজামা পাঞ্জাবির সৌখিনতা বড়ো বেমানান। নরেন বিপক্ষ পার্টির লোক হওয়ায় চাকরি পায়নি। তাতেও ক্ষোভ ছিল না, পরে বুঝেছে চাকরি দরকার অসংখ্য মানুষের। এই নরেনের দেহ একদিন গাছে বাঁধা ছিল, ভুঁড়ি বেরিয়ে এসেছিল হেঁসোর টানে। এই খুনের ফলে নরেনের বিধবা চন্দ্রাবলী, সন্তান ও আড়বেঁকি গ্রামের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়েছে। কারণ নরেন সংগঠক ছিল। সততার জোরে রাজনীতিতে তার অবস্থান তার সম্প্রদায়গত শ্রেণির ক্ষেত্রে বেমানান ফলে প্রাণ দিতে হয়েছে নরেনকে।

নরেনের খুনকে কেন্দ্র করে দুটি স্বার্থ একজায়গায় এসে মিলেছিল। নরেনের খুনের প্রত্যক্ষদর্শী নলিন ভয়ে থাকলেও এবার বিমলকে কাজে লাগিয়ে কাজ হাসিল করত। রাজনৈতিক রেষারেষি থেকে খুন আবার সেই খুনকে কাজে লাগিয়ে প্রচার, রাজনীতিতে এই ধারা আজও বর্তমান। নলিনের গোষ্ঠীর ছেলে ছিল নরেন, কিন্তু নরেনের খুন তাকে বিচলিত করেনি বরং লাভবান করেছিল। নলিন বর্তমান পরিস্থিতিটা খুব ভালো বুঝত, হাসপাতাল, কলেজে ভর্তি, মানুষের টাকা উপার্জন সব কিছুতে চালাকি চলে। অফিসার ও পঞ্চায়েত সদস্য আসলে যা নিত সেটা তাদের পারিশ্রমিক, ঘুস নয়। কিন্তু নরেনের নিঃস্বার্থতা নলিনের ভালো লাগেনি। পার্টির কাজ করতে গেলে পারিশ্রমিক নিতে হবে নলিনের এই যুক্তি ফেলনা ছিল না। তবুও নরেন দুর্নীতিপরায়ণ হতে পারেনি, কোথাও তার বিবেক তাকে বাধা দিয়েছে। রাজনীতিতে বিবেকবানদের কপালে দুঃখ চিরকালের। নরেনের মতো গোপালকেও তাই কষ্টভোগ করতে হয়েছে। স্ত্রী-কন্যার অকাল মৃত্যু, ব্যক্তিগত জীবনে তাকে মর্মাহত করেছে। আগাগোড়া কট্টর কমিউনিস্ট গোপাল সামাজিক ক্ষেত্রেও যেন দায়বদ্ধ। রাজেশ্বরীর অসহায়তা তাকে চিন্তিত করেছে, সমস্ত বদনামকে উপেক্ষা করে রাস্তার অন্ধ মহিলার পিতৃহীন সন্তানের দায়িত্ব নিতে পেরেছে। গোপাল সেই সময় থেকে রাজনীতিতে যুক্ত যখন তেলেঙ্গানার কৃষকবিদ্রোহ ঝড় তুলেছিল, কাকদ্বীপ নিয়ে মুক্তিকামী মানুষ স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল—

> গোপাল, শিশির এবং ভবানীশঙ্কর গোপনে তাদের ভবিষ্যতকে উৎসর্গ করেছিল পার্টি ও জনগনের উদ্দ্যেশে। তারা ঠিক করেছিল প্রথমে বিপ্লব এবং তারপরে বিপ্লবই নির্ধারণ করবে তাদের জীবন।[২১]

ষাটের দশকে পার্টি ভেঙে গেলে দ্বিতীয়টিতেই গোপাল ছিল। অন্যদিকে গোপালের সংসার ভাঙে, স্ত্রী-কন্যার মৃত্যু ও জমি হাতছাড়া হয়ে যায়। ‘ধান মানুষকে এক নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ আলস্য দেয়।’ গোপালের তাই হয়েছিল। পার্টি থেকে যে স্বপ্ন সম্ভাবনা লালন করেছিল তার কোনোটাই বাস্তবায়িত হয়নি। তারপর সমাজে আসে একটার পর একটা অভিঘাত, ছেষট্টির খাদ্য আন্দোলন, সাতষট্টিতে নকশাল অভ্যুত্থান, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এসবের ফলে সমাজের স্থিতি বিপর্যস্ত হয়েছে। অন্যদিকে রাজনৈতিক দলের রেষারেষি, মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড লোভ থেকে চোরাচালান, মজুতদারি, কেড়ে নেওয়া ও কামিয়ে নেওয়ার প্রতিযোগিতা মানুষের

মূল্যবোধের অবক্ষয়ের চূড়ান্ত পর্যায়। গোপাল তার স্বপ্ন সম্ভাবনা থেকে অনেক দূরে চলে গিয়ে তার চায়ের দোকানের মধ্যে আবদ্ধ হয়েছিল।

সমাজে গোপাল মজুমদারের মতো মানুষের সংখ্যা খুব কম ছিল। যারা কর্তব্য করতে গিয়ে লাঞ্ছিত অপমানিত হয়েছে তবুও কর্তব্য থেকে পিছিয়ে আসেনি। মনের মধ্যে যুক্তিবোধ দানা বেঁধে আছে তার ফলেই সরাসরি সংঘাতে যেতে পারেনি। আবার কোনো পথকেই আঁকড়ে ধরতে পারেনি, এমনকি সুরেশ্বর তাকে আঘাত করলেও বা যৌন কেলেংকারির হোতা বলে দেগে দিলেও সে প্রত্যাঘাত করেনি। পার্টির বার বার বিভাজনের ফলে বসে গিয়ে এখনো এক দ্বন্দ্বের মধ্যেই বেঁচে আছে। অনেক বছর পর পুরোনো বন্ধু ভবানীশঙ্করের সঙ্গে দেখা হলে বলেছিল—

> সত্তর সালেই আমার ভিতরের দ্বন্দ্ব আমাকে এগোতে বা পেছোতে দেয়নি। তারপরে তো সবই শেষ হয়ে গেল। ফলে, আমি হয়ে রইলাম চাষা কিংবা চা-ওয়ালা এই দশ-বারোবছর ধরে। আফসোস হবে না? আমি কে এখানে এই চিরি-ধল্লা-আড়বেঁকির, অর্জুনপুর-জলছুইয়ের আকাশের নীচে? আমার এই অস্তিত্বের অর্থ কী? কোথায় যাব আমি? কোন রাস্তা ধরে যাব? তুমি কী আমাকে বলে দিতে পারো, ভবানীশঙ্কর?[২২]

গোপালের এই প্রশ্ন পৃথিবীর যাবতীয় সাম্যবাদকাঙ্ক্ষী কমিউনিস্টদের। পৃথিবীর যাবতীয় ব্যর্থতা পৌঢ় গোপালের জলভরা চোখে। এই মানুষগুলো ব্যক্তিগত, সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক সমস্ত বিরোধকে ব্যক্তিগত ভাবত। মানুষের বিপর্যয়ের সময় রাজনীতির যত অভিসন্ধি আছে সব মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। সেভাবেই বন্যার সময় যখন ক্ষমতাশীল ও বিরোধী দল সমস্ত শক্তি নিয়ে রাজনীতি করেছে তখন গোপাল বন্যা কবলিত, রোগে আক্রান্ত মানুষের সেবা করতে করতে হেপাটাইটিসে আক্রান্ত হয়েছে। তার পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে হেলিকপ্টারে শুয়ে তার নিজের প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়েছে। কোথাও পৌঁছানোটা আসল নয়, পৌঁছানোর জন্য চলা ও নির্ভুল রাস্তা খোঁজাটাই আসল। বন্যায় জলছুইয়ের মানুষের কাছে যখন পানীয় জল পৌঁছানো যায়নি তখন হেলিকপ্টারে কলকাতা গিয়ে চিকিৎসা করাতে সংকোচ করেছে গোপাল। যেমন *নিম্নগতির নদী* উপন্যাসের কমিউনিস্ট ত্রিদিব মিশ্র মানিকচক, গোপালপুর, মথুরাপুরের মানুষের সঙ্গেই থাকতে চেয়েছিল। গোপাল, শিশির, ভবানীশঙ্কর ষাট সালের মতো হেলিকপ্টারে আবার এক জায়গায় হয়েছে,

হেলিকপ্টারের সুবিধা গোপালের মাথায় সুবিধাবাদ একনায়কতন্ত্র আমলাতন্ত্রের সুবিধার মতো জাঁকিয়ে বসে ক্রমশ তাকে পীড়া দিয়েছে। তাদের গন্তব্য নিয়ে ভেবেছিল তারা, আকাশপথ থেকে দেখা যাচ্ছিল কাঞ্চনজঙ্ঘা, সেখান থেকে সোনা গলে নামছিল। অভিজিৎ সেন লিখেছেন—

> সে কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার দুই হাত দুই বন্ধুর হাতে। তন্দ্রাচ্ছন্ন যেন সে। ওইখানেই তো তাদের যাওয়ার কথা ছিল? ওই উচ্চতায় এবং হিরণ্ময় সমারোহে। ওইখানে কি যাচ্ছে সে?[২৩]

পঞ্চায়েতি ব্যবস্থায় গ্রাম উন্নয়নের পরিকল্পনায় প্রচার-প্রসারের যে ব্যাপকতা ছিল সেই অনুযায়ী কাজের রূপরেখা নির্মিত হলেও ব্যাপক দুর্নীতি ও টাকার লেনদেন অব্যাহত থাকত। উপরওয়ালাকে সন্তুষ্ট করতে প্রত্যেক দপ্তরে মিথ্যা রিপোর্ট তৈরি করা হত। আমলাতান্ত্রিক রাজনৈতিক মিথ্যাচারে সার্বিক উন্নয়ন একটা অলীক স্তরে পৌঁছেছে ফলে কাগুজে উন্নয়নের জোয়ার দেখা দিয়েছিল। বিমলের মতো সদ্য উদিত নেতারা এই জোয়ারে গুছিয়ে নিয়েছে। একটু ডাকাবুকো হবার ফলে বিমল ভোটে জিতেছে, ভয় ভীতি প্রসার করে নিজেকে উল্লেখযোগ্য জায়গায় এনেছে। এরপরেই তো জেলা পরিষদের পদ, গাড়ি, তোষামোদ, ঘোরানো চেয়ারের অফিস, মন্ত্রী ইত্যাদি। অন্যদিকে নিজস্ব কোনো কারখানা, বড় ব্যাবসার মালিক এমন নানান সম্ভাবনা বিমল দেখেছে চোখের সামনে। তার এই পথে কাউকেই বাধা হিসাবে রাখতে চায়নি সে। সমস্ত আগাছা সে সরিয়ে ফেলবে, নরেন মালো হোক, অবাধ ভোগের শিকার রাজেশ্বরীই হোক। প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষী বিমল, রাজেশ্বরীর বিশ্বাস ও নরেনকে খুন করেছে—

> ক্ষমতার রসায়নে জারিত তার মন বা ধান্দাচেতন কীভাবে একাধিক স্তরে চালু নষ্টামির প্রতিভূ হয়ে উঠেছিল তা গোপন করেন নি লেখক।[২৪]

রাজনৈতিক জয় পরাজয় মানুষের ব্যক্তিজীবনে প্রভাব ফেলবে এটা খুব স্বাভাবিক তবে অভিজিৎ সেন নিখুঁতভাবে দেখিয়েছেন কীভাবে মানুষের প্রতিটা অনুভূতি তার অবস্থান থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। গোপাল, নলিন, বিমল, সুরেশ্বর সবার ক্ষেত্রেই। আড়বেঁকির নরেন মালো খুন হলেও তার সগোত্রীয় নলিন তার ধূর্ততায় ও খুনীর কাছাকাছি থেকে নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছে। অনুন্নত আড়বেঁকির সামান্য মাছ চোর থেকে সে এখন মাছের ব্যাবসদার।

তার শরীর মনে সৌখিনতা উথলে উঠেছে। অন্যদিকে গোপাল মজুমদার পুরোনো সৎ রাজনৈতিক কর্মী থেকে একটি চায়ের দোকানের মালিক। তাতে সাড়া ভারতবর্ষ যেন তার দায়িত্বের মধ্যে ছিল। রাজেশ্বরীর বাবা গোপীনাথ জানত তার মেয়ে গোপালের অধীনে আছে, গোপাল এই হতভাগ্য বাবার এবং আরও অনেকের সমব্যথী। নিজের শ্রেণি পরিবর্তন করে সাধারণ জীবনযাপন পুরোনো রাজনৈতিক কর্মীর গরিমা সব ধরনের আর্ত পীড়িত মানুষের আশ্রয়স্থল করে তুলেছে গোপালকে। জীবনের যুদ্ধে হেরে যাওয়া এই সৈনিক গোপাল এইসব মানুষের মধ্যে শান্তি পেয়েছে। বিমল, নলিন, মথুর সবার থেকে আলাদা গোপাল, কোনো তুলনাই যেন করা যায় না গোপালকে এদের সঙ্গে। নলিনের মাছ চোরের সমস্ত গ্লানি পয়সার জোরে ধুয়ে মুছে যাবে তারপর একটা সম্ভ্রম আদায় করবে অনেক মানুষের থেকে। নরেনের খুন বিমল ও নলিনকে কাছাকাছি এনেছে—

> যে খুনের কারণে বিমলের সঙ্গে তার একটা চরম সম্পর্ক তৈরি হচ্ছিল, যে খুনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত তাকেই পরবর্তী লক্ষ্য হিসাবে নির্দিষ্ট করেছিল, তাই আবার বিমলের সঙ্গে তার হার্দ্য সম্পর্কের কারণ হয়ে দাঁড়াল। জীবন কী বিচিত্র।[২৫]

মানুষের জীবন যেমন বিচিত্র রাজনীতি আরও বিচিত্র। বিমল এতদিন যে মেয়েটিকে স্বপ্ন দেখিয়ে সহবাস করে এসেছে সেই রাজেশ্বরীকে চিনতে এবং তার সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করেছে ‘আমার চেনা নয়। কে বলেছে আমার চেনা। ...এসব চক্রান্ত, এসব আমাকে হেয় করার অপচেষ্টা।’ রাজনৈতিক ভবিষ্যতের জন্য রাজনৈতিক উপায়েই রাজেশ্বরীকে অস্বীকার করেছে বিমল।

অভিজিৎ সেন চাষির মনস্বত্ত্ব ভালো বোঝেন, চাষির মান-অপমান, অহংকার, কষ্ট সব জমি আর ফসলকে ঘিরেই। জমি ও ফসলের প্রতি আবেগ থেকে চাষির ক্রোধ আনন্দ হতাশা নিয়ন্ত্রিত হত। জমি ভেস্ট ও বিলি বন্দোবস্তের নিয়মে যতীন তার দু-একর জমির এক একর হারায়। যতীনের চাষে হাত পাকা, নিজস্ব হাল বলদ আছে, তার ফসল ও নিজের উপর গর্ব ছিল। যতীনের এক একর হারানো জমির মালিকানা শঙ্কর পেয়েছিল। যতীন জমি হারিয়ে আহত হলেও শঙ্করের সঙ্গে বিরোধ হয়নি। পাশাপাশি জমিতে ধান চাষের সময় একে অপরের সঙ্গে গল্পও করেছে, বিড়ি চেয়ে খেয়েছে, যতীনের মতো শঙ্করের হাল মই ছিল না। তবুও খারাপ বীজের কারণে যতীনের জমির ধান তিনভাগ পাতন হয়

অর্থাৎ ধানের খোসার নীচে দানা ছিল না। অন্যদিকে শঙ্করের ধান ভালো হয়েছিল। এরই মধ্যে যতীনের মামা-ভাগনে বলদ জোড়া চুরি হয়েছে। জামাই ধনুষ্টংকারে মারা যাবার পর মেয়ে বাচ্ছা নিয়ে বাপের বাড়ি ফিরে এসেছে। পর পর ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর মধ্যে ফসলের ক্ষতি তাকে বেশি পীড়িত করেছিল। যতীন উদভ্রান্তের মতো জ্যৈষ্ঠের রোদে ধানখেতে গিয়েছিল, তখন 'আড়বেঁকি বিলের পিশাচ গাছের উপর থেকে লাফিয়ে তার ঘাড়ে নেমে এসেছে'। তাই বন্ধুর মেয়ে সতের বছরের কলিকে স্নেহ করলেও সেই মুহূর্তে সব ভুলে ধর্ষণ করেছে। যতীন এরপর বাড়ি গিয়ে খেয়ে মাঠে চলে এসেছিল, সত্যি যেন তাকে ভূতে পেয়েছে, হাতে প্রকাণ্ড হেঁসো নিয়ে শঙ্করের সঙ্গে দেখা হলে শঙ্কর ভাবে যতীন ধান পাহারা দিতে এসেছে তাই বলেছে 'হাঁ-র ধান পাশেৎ থাকতে তোমার পাতান ধান চোরে ছুঁবে?' যতীন নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারেনি, শঙ্করকে খুন করেছে। যতীনের সমস্ত আত্মসম্মান তার ফসলে নিহিত ছিল, শঙ্কর যেন তার জমি নেয়নি শুধু তার সম্মান ছিনিয়ে নিয়েছে যা মেনে নিতে পারেনি যতীন। অভিজিৎ সেন যতীনের উদভ্রান্ততাকে একটার পর একটা বিভ্রান্তকর ঘটনা দিয়ে সাজিয়েছেন, যতীনের অবস্থাকে স্পষ্ট করেছেন। তাতে বোঝা গেছে যতীনের মনের গতি। এই খুনের তিনদিন পর যতীন জেলে ধুতি খুলে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। এই মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি হয়েছে, রাজনীতি মানুষের সমস্ত সত্তায় প্রবেশ করতে চায় প্রভাবিত করতে চায়, নিজের দিকে সব ঘটনার গতিপথ ঘুরিয়ে নিতে চায়। কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট কেউ কি যতীনের মনের খবর জানার ইচ্ছা করেনি, শুধু প্রচারের মাধ্যম ও রাজনীতির সুযোগ পেয়েছিল।

ছায়ার পাখি উপন্যাস অনেকটা সময়ের, অনেক মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেছে। গোপালের রাজনৈতিক আদর্শের অপমৃত্যু, বিমল, সুরেশ্বর, নলিনের মতো পরিবর্তমান সময়ে সুবিধাভোগী মানুষের লোলুপতা ও ভ্রষ্টতা। যুগী, যোগান, সাগরের মতো শুভবোধের মানসিকতা। কৌশল্যা, রাজেশ্বরীর মতো অবহেলিত বঞ্চিত নারীর অন্তরবেদনা, আরও অনেক কিছু। আড়বেঁকি, অর্জুনপুর, জলছুই গ্রামের মানুষের মধ্য থেকে সত্তর পরবর্তী ভারতবর্ষকেই দেখিয়েছেন অভিজিৎ সেন। একই সঙ্গে সামাজিক রাজনৈতিক ও বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে মানুষের মনের প্রতিক্রিয়াগুলোকে দক্ষ শিল্পীর মতো ধরেছেন লেখক।

৩। *ঝড়*

অভিজিৎ সেনের উপন্যাসে ইতিহাস, রাজনীতি, জমিকে কেন্দ্র করে এসেছে বিভিন্ন ধরনের মানুষের সহাবস্থান। গুরুগম্ভীর বিষয়ের অবতারণাকারী লেখক অভিজিৎ সেন যে বালক মনের অভ্যন্তরেও প্রবেশ করতে পারেন তা তিনি ‘বাঁশি’, ‘নবীন কিশোরের গ্লানি’, ‘সুবলের সঙ্গে তৃতীয় সাক্ষাৎ’ প্রভৃতি গল্পে দেখিয়েছিলেন। *ঝড়* (১৯৯৩) উপন্যাসে অভিজিৎ সেন এক বালকের সব প্রাপ্তির মাঝে মাতৃস্নেহের অভাব কচি হৃদয়কে কীভাবে ক্ষত-বিক্ষত করেছে তা দেখিয়েছেন জ্যোতির মধ্যে দিয়ে। সঙ্গে পিতা-মাতা হারা কিশোর জীবন, সুরেন ও মাদারের বেদনা কীভাবে তাদের শৃঙ্খলাহীন বোহেমিয়ান করে তুলেছে তার পরিচয় দিয়েছেন লেখক। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বিধবা মায়েরা দ্বিতীয় মা হতে গিয়ে সন্তানকে কাছে রাখে অথবা রাখতে পারে না। ফলে পরিত্যক্ত সন্তানের বহু সুখের মাঝেও মাতৃস্নেহ পাবার আকাঙ্ক্ষা নানাভাবে শরীর ও মন থেকে ছিটকে বেরোতে থাকে, অভিজিৎ সেন জ্যোতির মধ্যে দিয়ে এই ব্যাপারটাকেই ধরেছেন এই উপন্যাসে।

‘মানুষকে ভালোভাবে বাঁচতে হলে সহ্য করতে হয়।’ সহ্য করতে হয়েছিল কিশোর জ্যোতি ও তার মাকে। দুর্ঘটনায় বাবার মৃত্যু হলে সেই আকস্মিক ঘটনাকে জ্যোতি ভুলতে বসেছিল যেভাবে সব মানুষই ভুলে যায়। তবে মায়ের থেকে বিচ্ছেদটা একটু কঠিন আঘাত হবে যদিও ছ-মাস ধরে তার একটা পূর্ব প্রস্তুতি ছিল। জ্যোতির ছোটো মস্তিস্ক বুঝতে পেরেছিল মা অন্য মানুষের সঙ্গে থাকবে, অন্যদেরও মা হবে, বাবার না থাকার মতো এই বিচ্ছেদটাও হয়তো সয়ে যাবে। মাসি কানে কানে জ্যোতিকে বলেছিল ‘মাকে ভুলিস না জ্যোতি। মাকে ভুল বুঝিস না,...’ না, ভুল বোঝেনি জ্যোতি। কলকাতা ছেড়ে কাকা বিকাশের গ্রামের বাড়ি সরনজায় যাবার পর সে নিজের অবস্থানে জীবন ও মাদারকে দেখেছে। তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের মধ্যে নিজেকে মিলিয়েছে তাই সে মাকে ভুল বোঝেনি। মাকে ছেড়ে নতুন পরিবারে কাকা বিকাশ, কাকিমা শুকতারা, সমবয়স্ক দাদা নীলুকে আর সরনজায় নতুন পরিবেশ পেয়েছিল। নীলু গ্রামের সংস্কৃতিতে বড়ো হয়েছে গ্রামের সংস্কারের বিরুদ্ধতা ও নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া কোনোটাই করতে পারেনি। অন্যদিকে শহরে বড়ো হয়ে ওঠা জ্যোতি সংস্কারের কিছুই দেখেনি তবুও এই দুটি অল্পবয়স্ক কিশোরের সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। শহরের স্কুল ছেড়ে এসে গ্রামের স্কুলের পরিবেশের একটু অস্বস্তি লেগেছে জ্যোতির। তবে যে বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে তাকে শেষ দু-বছর কাটিয়ে আসতে হয়েছে তাতে

তার লেখাপড়ায় ধারাবাহিকতা একটু বিপর্যস্ত হয়েছে। খুব দ্রুত স্কুলে ভর্তি ও পরীক্ষা এসবের মাঝে বিষণ্ন হয়েছে জ্যোতি। অনেক সময়ের মতো মনে হয়েছে 'পৃথিবীর সবাই তাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে নিজেরা দিব্যি ভালো আছে।' কলকাতার উজ্জ্বল দিনের স্কুল, খেলা, বন্ধু, নাটক, সিনেমা যাবতীয় মুগ্ধতা কেমন যেন মুছে গেছে ফলে তার চারপাশের লোকগুলিকে অচেনা মনে হয়েছে। রাতে ঘুম আসত না—

> নিঃশব্দে বালিশ ভিজতে থাকে। একসময় মধ্যরাত্রির নির্জনতা সবকিছু গ্রাস করলে জ্যোতির বুক ভারী হতে হতে নাক মুখ ভেদ করে দীর্ঘশ্বাস ফুঁপিয়ে ওঠে।[২৬]

দাদা নীলু, কাকার মেয়ে মিলি সকলের পরম স্নেহে জ্যোতিকে কাছে টেনে নিয়েছিল। বিকাশের পিসি মুখরা নীহারকণা এসেই জ্যোতিকে অপমান করে 'তুই বুঝি সুহাসের ছেলে। ...তা তোকে এখানে পাঠিয়ে দিয়ে তোর মা-মাগি নিজের রাস্তা দেখে নিয়েছে!' শুকতারা জ্যোতিকে নিহারকণার থেকে আড়াল করেছে। একটা পুরো পরিবার পেয়েও জ্যোতির কোথাও একটা শূন্যতা থেকেই গেছে।

অভিজিৎ সেন খুব কম পরিসরে নীহারকণাকে এঁকেছেন। ভারী বিচিত্র মহিলা সে, তার কুটিল ও মুখর স্বভাবের জন্য স্বামী পরিত্যক্তা, এভাবেই আত্মীয়দের বাড়ি সারাবছর ঘুরে ফিরে কাটিয়ে দিত নীহারকণা। তার ভিতরে যে বিষ আছে তাতে সে নিজে জ্বলত চারপাশের মানুষকে জ্বালাত, সবাইকে আঘাত করত নিজের জ্ঞাতে ও অজ্ঞাতে। আসলে জীবনের ব্যর্থতা তাকে এমন করেছে। তবে এর মাঝেই তার একটা স্বভাব আছে, সেবাপরায়ণতা। নীহারকণার বে-আব্রু কথা থেকে বাঁচাতে নীলু জ্যোতিকে নিয়ে গিয়েছিল ঢেলপিরের হাটে। ব্যস্ত হাটের মানুষের আনাগোনা, গ্রামের রাস্তা হাটে মোরগা লড়াই, হাটের দোকান হাঁস, মুরগি, শুয়োর, জামা কাপড়ের দোকান, মাটির পিতলের জিনিস। এসব দেখে মন খারাপ কিছুটা সেরেছে জ্যোতির। এই হাটেই সে দেখেছে সুরেনকে, যে পড়াশোনা ছেড়ে গান গায়, যাত্রা করে, মেয়ে সেজে বিড়ি বিক্রির প্রচার করে। আদিবাসীদের মুরগি লড়াইয়ের নিয়ম, নেশা করা, মানুষগুলির উচ্ছ্বাস সব কিছুই অবাক করেছে জ্যোতিকে। কলকাতার বাইরে এই আলাদা জগৎটা তার বেশ ভালোই লেগেছে। গ্রামের মানুষের সঙ্গে এবং এই সরনজা গ্রামের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়েছে। জ্যোতি দেখেছিল সতের বছরের বামন মাদার বক্সো মণ্ডলকে যে মাঠে আর খোলা হাটে দিন-রাত কাটিয়ে দিত। শরীর

ছোটো হলেও পেট বড়ো ফলে উঞ্ছবৃত্তিতে তার চলত না। মাদারের এই পরিচয় জ্যোতির রাতের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে, চোখ বুজলেই সে মাদারকে দেখত। মাদারের সঙ্গে তার একটা 'অস্বস্তিকর' মিল সে বুঝতে পেরেছিল। অন্যদিকে সে সুরেনকেও দেখেছে যে গান গেয়ে মাকে টাকা পাঠিয়েছে চাল কেনার জন্য। তার সাংসারিক দুঃখ, মরন্নাপন্ন ঠাকুমার আক্ষেপ, বাবার নিরুদ্দেশ হওয়া সব মিলিয়ে যে পরিস্থিতি তাতেও কষ্ট বুকে চেপে সুরেন খুশি থাকত গান গেয়ে। জ্যোতির ব্যথার স্মৃতি আর একবার জেগে উঠেছে, কারণ—

> সংসারে এমন কিছু বিষয় আছে জ্যোতি সেসবের আলোচনায় কখনোই থাকতে চায় না। কিন্তু এতই বিশিষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ এইসব বিষয় যে হামেশাই কথাবার্তায় উঠে পড়ে এবং জ্যোতিকে পীড়িত করে।[২৭]

সরনজা গ্রামে আসার পর জ্যোতি অনেককিছু দেখেছে, জেনেছে। বর্ষায় কীভাবে দিনে দিনে নদীর ঘাট বদলে যায়, শুকতারা দেখতে কত সুন্দর হয় ইত্যাদি। প্রতিদিন গ্রামকে দেখে অবাক হয়েছে, এর মধ্যেও মাকে বার বার মনে করেছে। সরনজায় ডাকাতির ঘটনা দিয়ে মাকে চিঠি লিখতে বসে সবশেষে লিখেছে 'তোমাকে বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে।' আবার কেটেছে, এই লেখা আবার লিখেছে। তারপর চিঠিটা বইয়ের ভাঁজে রেখে দিয়েছে। শহরের ব্যস্ততম জীবনে মা ছিল একমাত্র কাছের, গ্রামের বিচিত্র মানুষ, বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিবেশে সময় কেটে গেলেও নাড়ির টান উপেক্ষা করতে পারেনি জ্যোতি, কেউই পারে না।

এক ঝড়ের দিনে প্রকৃতি যেভাবে বদলায় জ্যোতির মনে ও শরীরে বাতাসের মতো আকুলতা বাড়ে। মেঘের গর্জনের মধ্যে জ্যোতির মনের মেঘ ঘণীভূত হতে থাকে। শূন্য হৃদয়ে মায়ের কথা মনে হয়েছে, আক্ষেপ, ক্রোধ, ঈর্ষা তাকে অস্থির করেছে। একটা অন্যায় বোধ একটা অনুশোচনা তাকে দগ্ধ করেছে। দিশেহারা ও বেপরোয়া হয়ে সে যেন দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভেঙে ফেলতে চেয়েছে। মায়ের চিঠি আসতে দেরি হলে তার উৎকণ্ঠা বাড়ে, অবশেষে চিঠিতে মায়ের তাকে ঘিরে আকাঙ্ক্ষার কথা জেনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে। মা বলেছে বাবার মতো বড়ো মানুষ হতে হবে। অন্যদিকে মাদারের মাকে দেখে জ্যোতির অন্তরাত্মা আর্তনাদ করে উঠেছিল। মাদার তার অত্যাচারী বাবাকে ভোরবেলা হেঁসো দিয়ে কুপিয়ে খুন করে গাছের ডালে লুকিয়ে ছিল তারপর তীরবিদ্ধ হয়েছে। দূর থেকে এসব দেখতে দেখতে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল জ্যোতি, জ্বরের মধ্যে বার বার মাদারের করুণ পরিণতির কথা মনে

পড়েছে তার। সরনজার মানুষ প্রকৃতির প্রতি ভালোলাগা, নীহারকণার অপরিসীম সেবা, কাকা-কাকিমার অগাধ ভালোবাসা, নীলু মিলির সহৃদয় সাহচর্য সত্ত্বেও জ্যোতি আচ্ছন্নতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। জ্বরের ঘোরের মধ্যে বলেছে 'আমাকে আটকে রেখেছ তোমরা? আমাকে মায়ের কাছে যেতে দাও। আমি মায়ের কাছে যাব।' সবকিছু ছাপিয়ে যেন তার অসহায়তা জেগে উঠেছে। কিশোর জ্যোতির সমস্ত হাহাকার যেন প্রকৃতি আজ বক্ষে ধারণ করেছে, জ্বরের উত্তাপ নেমে জ্যোতির শরীর ঠাণ্ডা হবার সঙ্গে প্রকৃতিও বৃষ্টির মধ্য দিয়ে তার উত্তাপ ঝড়িয়ে ফেলেছিল।

জ্যোতির অসুস্থতা তার অন্তরাত্মাকে যেমন পুরোপুরি প্রকাশ করে তেমনই এই পরিবারের শিকড়শুদ্ধ নাড়িয়ে দিয়েছে। মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে সুস্থ হয়ে উঠেছে সে। জ্যোতির মা সুলেখা চাইলেও সরনজা গ্রামে একবারের জন্য আসতেও পারেনি সমাজের ভয়ে। বিকাশ চায়নি যে সে আসুক, বিকাশ এটা চেয়েছিল সুলেখার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকেই রেহাই পাক জ্যোতি। মানুষের নিজের লড়াইটা তো মানুষ নিজেই করবে এমন কথা জ্যোতির বাবা প্রকাশ বলত। লড়াই করছে জ্যোতি, সুরেন, মাদার। অনেক পূর্ব আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জ্যোতি ও সুলেখা অর্থাৎ ছেলে ও মা কাছাকাছি আসার সুযোগ করে নিয়েছিল। একটি ভাড়া ঘরে একসাথে থাকবে দু-একটা দিন, ভোর হতেই জ্যোতি গিয়েছিল মাকে বাস স্টপেজে খুঁজতে। সেখানে মাকে দেখতে পেয়ে 'মা ও ছেলে এগোতে গিয়েও একবার থমকে দাঁড়িয়ে পরস্পরকে ভালো করে দেখে নেয়।' মা ও ছেলে পরস্পরকে দেখে উভয়ের মধ্যে একটা ঈর্ষা গুমরে উঠেছিল এক বছরের কম সময়ের ব্যবধানে উভয়ের মধ্যে যে শারীরিক পরিবর্তন হয়ে গেছে, সেটা বাহ্য মানসিক পরিবর্তনও অনেকটাই হয়েছে কালের নিয়মে।

অভিজিৎ সেন বালকের অন্তর্দহনের পাশাপাশি সরনজা গ্রামের ফরেস্টের গাছপালা, হাটের বর্ণনা, গরীব মানুষের স্বাভাবিক আনন্দ উচ্ছ্বাস, একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনাচরণ, গ্রামের বিভিন্ন ধরনের, গাছপালা, নদীর বর্ণনা দিয়েছেন। গ্রামের নিরাপত্তাহীন মানুষের অন্ধ বিশ্বাসে কোনো ধারণাকে আঁকড়ে বেঁচে থাকা। যেমন রাখুর মতো দেবাংশী কীভাবে মানুষের কঠিন সমস্যাকে নানান অলৌকিক উপাচারে নিমেষে মিটিয়ে দিতে পারে তা রাখুর স্বামীর মুখেই ব্যক্ত হয়েছে। এতে যে তার সাধারণ এক প্রকার ছল প্রকাশ

পেয়েছে তা বোঝা যায়, কারণ তার দেবাংশী স্ত্রীর মাহাত্ম প্রচার করে এক কাপ চা, কাসুন্দি আর একটু অনুগ্রহ, আলাদা গুরুত্ব এসবই পেতে চেয়েছে। মৎস্য শিকারের দীর্ঘ পদ্ধতি ও উন্মাদনা, গ্রামের সদ্য বেড়ে ওঠা চোরা কারবারি মজুতদারের বাড়িতে একটি ডাকাতির বর্ণনা অভিজিৎ সেন ছোটো ছোটো গল্পের আকারে এই উপন্যাসে এনেছেন ফলে উপন্যাসের বহুমুখী প্রতিবেদন আলাদা মাত্রা এনেছে।

৪। *মেঘের নদী*

দেশভাগ ও দাঙ্গার সময় দেবেন বিশ্বাস পিতৃভূমি থেকে বিচ্যুত মানুষগুলোকে নিয়ে গড়ে তুলেছিল এক নিজস্ব সম্প্রদায়। সেই সম্প্রদায়ের এই মানুষটির প্রচেষ্টায় মানুষ শিক্ষা সংস্কৃতিতে আজ অনেক এগিয়ে গেছে। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত দেবেন বিশ্বাস তার সম্প্রদায়ের উন্নতির কথা ভেবেছে, আর ভেবেছে দেশভাগের সময়ের 'মানুষের মতো মানুষ' শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কথা। দেবেন বিশ্বাসের ব্যক্তিত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা তার ছেলে মহিমের মধ্যেও তৈরি হয়েছিল। মহিম কৃষিবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করেছে। তার বিদ্যা ও পরিশ্রম দিয়ে সে অসময়ের ফসল ফলিয়ে চমক লাগিয়ে দিতে পারত। কিন্তু তার বাবার থেকে পাওয়া সংস্কার নিজের চরিত্রের ঊর্ধ্বে গিয়ে চুরি করতে আসা পোলিয়া সম্প্রদায়ের মেয়েটির সঙ্গে যৌন সংসর্গ করেছে। ফলে মহিমের মনে আইন কানুন ও সমাজ নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। মহিম আত্মদংশনে পুলিশের কাছে ধরা দিয়ে তার প্রাপ্য শাস্তি দাবি করেছিল। যদিও অভিযোগ ধর্ষণের হলেও এই ঘটনায় মেয়েটিরও সম্মতি ছিল। লেখক আইন, মানুষের মন, সমাজ দিয়ে এক জটিল কাহিনি নির্মাণ করেছেন *মেঘের নদী* (২০০৫) উপন্যাসে।

পিতার উপযুক্ত সন্তান হিসাবে মহিম এতদিন যে আদর্শগুলো ধরে রেখেছিল তা সময়ের সঙ্গে খসে পড়েছে। উত্তরা নামের যে মেয়েটিকে ধর্ষণের দায়ে সে জেলে গেছে এই ধর্ষণটা তাত্ত্বিক দিক থেকে নানান প্রশ্নের মুখে। এছাড়াও দেবেন বিশ্বাসের মৃত্যুর পরেও একটা প্রহরা রক্তে উপলব্ধি করত মহিম। তবুও পুরোনো বন্ধু গুইন্দু ও দেহ ব্যাবসায়ী মেয়েদের সঙ্গে অভ্যাস না থাকা সত্ত্বেও মদ খেয়েছে। দেহব্যাবসায়ী প্রথম মেয়েটিকে সক্রোধে উপেক্ষা করলে মেয়েটি গালাগাল দিয়েছে কারণ 'গণিকারাও প্রত্যাখ্যানে কুপিতা হয়' কিন্তু দ্বিতীয় মেয়েটিকে উপেক্ষা করতে পারেনি। দামি মদ আর মিষ্টি কথা মহিমকে সমস্ত সংস্কার ভুলিয়ে দিয়েছিল—

> মহিমের শরীরের মধ্যে বিদ্যুতের শিহরণ ছড়িয়ে পড়ল। মুখের কাছে এগোনো দামি হুইস্কির নরম আলোর মতো রং এবং আশ্চর্য প্রাণবন্ত গন্ধ দেবেন বিশ্বাসের তর্জনীকে আড়াল করে ফেলল।[২৮]

নিজের থেকে এক দশক প্রাচীন মেয়েটির সংস্পর্শ মহিমকে সহজে রেহাই দেয়নি। নিজের গর্ভবতী স্ত্রী মণিমালার স্ফীত শরীর দেখে 'হুলোর মতো' আচরণ করেছিল আর এখন সে 'তরুণ ষাঁড়ের' মতো আচরণ করছে। নেশায় উত্তেজনায় নিজেকে সমর্পন করার শেষ মুহূর্তে 'আয়নার মধ্যে দেবেন বিশ্বাসের ব্যথিত বিষণ্ন মুখখানা দেখতে পেল।' নিজস্ব উপলব্ধিকে অস্বীকার করে দেবেন বিশ্বাসকে মনের মধ্যে জাগিয়ে রাখার মধ্য দিয়েই মহিম সমাজে সংসারে একটা শ্রদ্ধার জায়গা তৈরি করে রেখেছিল। স্ত্রীর কাছে 'বিবেচক, মহৎ-প্রাণ, পরোপকারী', মাছ চাষে সে অন্য চাষিদের পথপ্রদর্শক, মৎস্য উন্নয়ন সমিতির পদাধিকারী। এরই মধ্যে নানান রাজনৈতিক চাপান-উতর বিশেষত কামতাপুরী আন্দোলন এসবের মাঝে তার এই হাজতবাস সমাজের সমস্ত ভারসাম্য নষ্ট করে দিয়েছে। মহিমের নিজস্ব পুকুরের মাছ লুঠ হয়ে গেল 'পুকুরের মাছ আর ঘরের মেয়েলোক যদি লুট হয়, ভদ্রলোকেরাও তাতে খাবলা মারতে চায়।' মহিমের পুকুর লুঠেও তাই হয়েছে। কামতাপুরী দাবিতে মহিমের রাজবংশী মেয়ে ধর্ষণ ব্যাপারটা রাজবংশীদের নির্যাতনের রূপ পেয়েছিল। ফলে সমাজে রাজনীতি ও আন্দোলনের মধ্যেও প্রবেশ করে গেল মহিমের ধর্ষণের ব্যাপারটা।

গ্রীষ্মের দাবদাহে একরাশ হতাশা আর ক্লান্তি নিয়ে খামার বাড়িতে এসে শুয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিল মহিম। সেই আচ্ছন্নতার মধ্যে অর্থহীন নেতিবাচক শৈশব কৈশোর যৌবনের মুহূর্তগুলো ধরা দিয়েছে। তার সঙ্গে কয়েক মাসের যৌন অতৃপ্তি শরীরকে গ্রাস করে ফেলেছে। কাজের মেয়ে উত্তরা ঝাঁটা হাতে ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত মহিমের খোলা বুকের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিল। 'সে সময় সে হয়তো এই ঘরে ঢোকার আসল উদ্দেশ্য কিছু সময়ের জন্য বিস্মৃত হয়েছিল।' কিন্তু সেই কিছু সময় অতিক্রান্ত হলেই উত্তরা তার উদ্দেশ্য সফল করতে মহিমের খুলে রাখা জামার পকেটে হাত দিয়ে কিছু টাকা নিয়েছিল, তারপর মোটা বান্ডিল হাতে নিয়ে তার দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাটার আগেই মহিমের হাতে ধরা পড়েছে। উত্তরা পালাতে চেষ্টা করলে মহিমের হাতে তার পুরোনো ব্লাউজ ছিঁড়ে স্তন বেরিয়ে আসে। মহিমের নারীস্তন নিয়ে মুগ্ধতা চিরকালের, সেই মহিম এই মুহূর্তে পিতা দেবেন বিশ্বাসের সমস্ত খ্যাতি, নমঃশূদ্র সমাজের প্রবাদপুরুষ যোগেন মণ্ডলের নেতৃত্বের অবিসংবাদিতা ভুলে গেল।

যেভাবে একজন মানুষের কাছে টাকা, নারীর প্রলোভন সরিয়ে দেওয়া দুঃসাধ্য হয় মহিমেরও তাই হয়েছিল—

> কাঙাল মহিম পরমুহূর্তে স্তনবিদ্ধ হল যেন। ক্লান্ত শরীর, অপমানিত, বিক্ষুব্ধ হৃদয় এবং প্রগাঢ় হতাশা ক্রোধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তার যাবতীয় পূর্ব সংস্কারকে একেবারেই মুছে দিল। সে সেই অমৃত উদ্ধৃতি কখনও শোনেনি যে দূরে থাকলে দহন, কাছে এলে শীতলতা।[২৯]

বরং উত্তরাকে দেখে তার মনে হয়েছিল এমন আগে কখনও দেখেনি। সমস্ত লালসা, বিস্ময়, ঘৃণা, ক্রোধ, ক্ষুধা, অধৈর্য প্রভৃতির সঙ্গে ধর্ষণ নয়, বলা ভালো উত্তরার সঙ্গে যৌন সংসর্গ করেছে। উত্তরা মহিমের হাতে ধরা পড়ার পর মহিমকে সবরকম সাহায্য করেছে যৌনমিলনে। তাদের চেহারা ও বয়সে অনেকটা পার্থক্য থাকার ফলে ক্ষত-বিক্ষত উত্তরাকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়েছে। উত্তরা যদি এই পরিস্থিতিতে না আসত, তাহলে হয়তো মহিমের এই পরিণতি হত না। বরং দুজনেই উপভোগ করত এই মিলনকে। জেলে মহিমের বন্ধু গুইন্দু তাই মহিমকে বলেছিল—

> 'রেপ মানে বলাৎকার। জোর করে কোনো মেয়েলোককে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইয়ে করা!' ...'তোর এই ব্যাপারটা যদি রেপ হয় তাহলে আমার এর মধ্যে দু-দুবার ফাঁসি হয়ে যেত।'[৩০]

গুইন্দু এসব ব্যাপারে মহিমের থেকে অভিজ্ঞ, সে বলেছিল কেস দাঁড়াবে না। উত্তরারা বাবা টাকা খেয়ে নেবে আর উত্তরা বলবে না এসব কিছু হয়নি। কিন্তু মহিমের অপরাধবোধ তাকে কুরে কুরে খেয়েছে, সে নিজেই জামিন পেতে চায়নি। উত্তরার সঙ্গে মিলনটা সে ধর্ষণ বলেই মনে করেছে। তার সেই মুহূর্তের লালসা তাকে উৎসাহ দিয়েছিল, শৈশব থেকে প্রাপ্ত ঘৃণা, হতাশা, অপমান, ধিক্কার, প্রবঞ্চনা এই সব কিছু থেকে যে লালসা এসেছে তা থেকে উদ্ধার করতে আর দেবেন বিশ্বাস আসেনি। দেবেন বিশ্বাসের গতে বাঁধা জীবন মহিমকে আচ্ছন্ন করেছিল তাই মহিমের এই পরিণতি।

একদিকে আছে চাষে ক্ষতি, মহাজনদের সঙ্গে টাকা নিয়ে মনোমালিন্য, মজুরদের মজুরি না দিতে পারা, ঋণের টাকায় শ্যালো, তার কিস্তি না দিতে পারার চিন্তা। অন্যদিকে গর্ভবতী স্ত্রী মণিমালা কাছে না থাকায় যৌন আকাঙ্ক্ষায় মহিম সংস্কার ও দেবেন বিশ্বাস সব ভুলে গিয়েছিল। ফলে উত্তরাকে ধর্ষণের দায়ে সর্বোচ্চ ক্ষতি ও জীবন জটিল হয়েছিল মহিমের। তার রেহাইয়ের সব চেষ্টাই তার মামাশ্বশুর হেম হালদার করেছে। কিন্তু মহিম

মুক্তি পেতে চায়নি। সে মৃত্যুগন্ধী শকুনকে আকাশে উড়তে বার বার দেখেছে। মহিমের জন্য মৃত্যুগন্ধী শকুন এসেছিল তার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে। তার সেই মুহূর্তটাকে সামাজিক ক্ষেত্রে নানাবিধ ওঠা-পড়া গ্রাস করেছে। কামতাপুরী আন্দোলন, রাজনীতি এসব বিষয় এসে জুড়েছে। ভাগ্য বিপর্যয়ের সমস্তরকম ঘটনাই ঘটেছে মহিমের জীবনে। পুলিশকে উপেক্ষা করে রাজবংশীদের কামতাপুরী আন্দোলন ক্রমশ মাথা চাড়া দিয়েছে। মহিমের ধর্ষণের ঘটনাও তার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—

> আজ নিপীড়িত, নিগৃহীত, ধর্ষিত, সম্পুর্ণ সহায় সম্বলহীন রাজবংশী জাতির এই অধোগতির জন্য কে দায়ী?... মালদা জেলার বরিন্দ অঞ্চল থিকা আসামের কামরূপ পর্যন্ত হবে নয়া কামতাপুর রাজ্য। সেখানে সমস্ত রাজবংশী মানুষের, যারা এই ভূ-খণ্ডের প্রকৃত অধিবাসী, আদিবাসী এসং ভূমিপুত্র, তাদের যাবতীয় অধিকার সুরক্ষিত করাই হবে আমাদের লড়াইয়ের শেষ লক্ষ্য।[৩১]

রাজবংশীদের একাধিক দাবি ও প্রশ্নের মধ্যে মহিমের ঘটনা জড়িয়ে ছিল। এছাড়াও মহিমের রাজনৈতিক ও ব্যাবসায়ী প্রতিদ্বন্দ্বীরা তার এই অবস্থার সুযোগ নিয়েছে। যদিও মহিম কোনো রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আবার মহিমের পরাধীনতাও মহিমকে আজ প্রতিকূলতায় জড়িয়ে ফেলেছে। দেবেন বিশ্বাস আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছিল না, তার গোষ্ঠীই ছিল তার সমাজ। মহিম কতকটা দেবেন বিশ্বাসের মতোই একটা গণ্ডির মধ্যেই থাকতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত। মহিমের জীবনের অঘটনটা ঘটার পিছনে সবথেকে মূল কারণ তাপ, মহিমের শরীরের আর প্রকৃতির। প্রচণ্ড দাবদাহে পঞ্চাশ বিঘা তরকারির খেত জ্বলে গিয়েছে, নলকূপ জল তুলতে ব্যর্থ হয়েছে, পাওনাদার ও মজুররা ন্যায্যভাবেই তাদের টাকা দাবি করেছে, পুকুরের মাছও খাবি খেতে শুরু করেছিল। স্ত্রী কাছে নেই, এসব দাবদাহের অবস্থায় মহার্ঘ ছিল পকেটের পাঁচ হাজার টাকার বান্ডিলটা, যেটা উত্তরা হাতাবার চেষ্টা করেছিল। এই খামার বাড়ির আকাশ দিয়ে মৃত্যুগন্ধী শকুন উড়ে গিয়েছিল এই শকুন সব দেখে ও বোঝে, মহিমের জীবনের জটিল সংকটের ইঙ্গিত দিয়ে গেছে। মহিমের এই ব্যক্তিগত সংকট তো আর ব্যক্তিগত থাকেনি, গোষ্ঠীগত হয়ে উঠেছে। মহিমের বিপক্ষে রাজবংশীরা, নমঃশূদ্রদের পক্ষে হেম হালদার সমস্ত সাংগঠনিক ও আইন, বেনিয়মের সুবিধা নেবার চেষ্টায় লেগে পড়েছে। অনেকসময় আদালতের বিচারে কোনো নিয়ম থাকে না, নিয়মের বাইরে অনিয়ম চলে, অর্থমূল্যে বিচারের মানদণ্ড নির্ধারিত হত।

কামতাপুরী সংগঠন সংহতি পেয়েছে, ভাদ্রের মেঘে খাপছাড়া বৃষ্টি হয়েছে, মানুষের মনে অর্থনীতিতে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। পরিবর্তন এসেছে মহিমের স্ত্রী মনিমালার মনেও—

> মহিমের হাজতবাসের তখন একমাস পূর্ণ হয়েছে। অনেক কিছুই থিতু হয়েছে। অনেক ঢেউ তটে মিলে গিয়ে পুকুরের জল শান্ত হয়েছে।[৩২]

মণিমালা চাকরি পেয়েছে কিন্তু সে কাছে নয় বরং দূরে চাকরি করতে চেয়েছে। দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় মহিমের সঙ্গে সে দেখা করতে পেরেছে। মহিম ধর্ষণ করেছে কিনা মণিমালা জানতে চাইলে উত্তরে মহিম জানিয়েছিল—

> জেলখানায় এসে ধর্ষণের আইনি ব্যাখ্যা আমি শুনেছি। ...তাতে একথা এখন আমি বলতে পারি, ওই মেয়েটিকে আমি ধর্ষণ করিনি।[৩৩]

পরিবর্তন তো মহিমেরও হয়েছে, সে দেবেন বিশ্বাসের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসেছে। মণিমালা বিবাহ বিচ্ছেদ চাইলে মহিম আর একটা সুযোগ চেয়েছিল। আধুনিক মানুষের জীবন অনেক জটিল, অনেক বোঝাপড়া করতে হয়, অনেক কিছুই মানিয়ে নিতেও হয়। কিন্তু মণিমালা এসব কিছুই করেনি, মহিমকে সুযোগ দেয়নি। মহিম দেবেন বিশ্বাসের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসার ফলে একটা মুহূর্তের জন্য হলেও তাই সে নিজেকে ধর্ষক ভাবতে চায়নি। কিন্তু মণিমালা তার মায়ের বাইশ বছর বয়স থেকে বৈধব্য জীবনের স্বচ্ছতার বড়াই করে বিচ্ছেদ চেয়েছে। কাছাকাছি থাকলে অন্তত রাতে মণিমালার মনে হবে এই মানুষটা আর আগের মতো নেই তাতেই নানা বিপত্তি হতে পারে তাদের, তাই সে আলাদা থাকতে চেয়েছে। মণিমালার এই সিদ্ধান্তও সেই তো গণ্ডিবদ্ধতার মধ্য থেকেই।

মহিমের সামাজিক দৃঢ় পরিচয় থাকা সত্ত্বেও বাস্তব বোধের সামান্য অভাবে তাকে জীবনে অনেকটা বেগ পেতে হয়েছে। ভাগ্য বিপর্যয় শুধু নয়, একটা গণ্ডিবদ্ধতার মধ্যে বেঁচে থাকার মাশুল দিয়েছে মহিম। পিতার প্রহরা ও অঙ্গুলি নির্দেশকে জীবনের মূলমন্ত্র করে সময়ের কাছে হেরে গেছে মহিম। উপন্যাসে মহিম এক অদ্ভুত চরিত্র, সমাজ পরিবারে তার ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তার পরিণতি অভাবনীয়। মহিমের এই পরিণতির কারণ তার অপ্রাসঙ্গিক আদর্শবাদিতা ও বাস্তববোধের অভাব। এছাড়াও পিতৃভক্তির অতিমাত্রিকতাও দায়ী এবং নির্দিষ্ট ছাঁচে জীবনাচরণ দায়ী।

৫। *নিম্নগতির নদী*

গঙ্গা নদী ও মালদা জেলার বন্যা এবং বন্যা কবলিত মানুষদের নিয়ে লেখা *নিম্নগতির নদী* (২০০৫) উপন্যাস। নদী মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে থাকে, নদী মানবিক রূপে মানুষকে তার বক্ষে ধারণ করে আবার দানবী রূপেও অনেকসময় ধ্বংস করে মানুষের বাড়ি ও চাষের জমি। তেমনভাবেই গঙ্গার নিম্নগতির মালদা জেলার কিছু অঞ্চল বন্যা কবলিত হয়ে ধ্বংস হয়েছিল। মুহূর্তেই নদী তার তীরবর্তী অঞ্চলের মানুষের বাড়িঘর, পশু, গাছপালা গ্রাস করে নিয়েছিল। মানুষ পথে নেমে এসেছে তবুও নদীকে এই মানুষগুলো চিরকাল তাদের আপনজন হিসেবে মেনেছে। নদীর কোনো নিন্দা তারা শুনতে পছন্দ করেনি এবং নিজেরাও কোনোদিন নদীর নিন্দা করেনি। বন্যা কবলিত মানুষের দুরবস্থার সঙ্গে অভিজিৎ সেন এই উপন্যাসে প্রেম ও রাজনীতিকে সামান্য পরিসরে এনেছেন।

ত্রিদিব মিশ্র অন্য মানুষ, মাতামহের বিশাল ব্যাবসার উত্তরাধিকার 'বিলিয়ে দিন' বলে উপেক্ষা করে চলে এসেছে। দক্ষ সংগঠক মানুষ এই ত্রিদিব, মানিকচক ঘাটে যখন জাহাজ এসেছে তখন সে দেখেছে নদীর জল অনেকটা বেড়েছে। গঙ্গার আদিম বিস্তার দেখে ত্রিদিবের কপালে ভাঁজ পড়েছিল। ত্রিদিব মন্ত্রী ছিল, জননেতার রেশ তার মনে এখনো আছে। গঙ্গার জল বাড়লে মানুষের জন্য তার চিন্তা বাড়ে, অসৎ মানুষের প্রতি সে যেমন কঠিন, সৎ মানুষের প্রতি তেমন সদয় ত্রিদিব। শরীরে কার্ডিয়াক অ্যাজমা থাকলেও চেহারায় তার ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেত। কথায় আছে 'নদীর ধারে বাস ভাবনা বারোমাস' মালদা জেলার মহানন্দটোলা, ভূতনী, কালিয়াচক, মানিকচক এমন বেশ কিছু এলাকার মানুষ স্বাভাবিক বৃষ্টিকেও ভয় পেত। বর্ষায় নদীর গতি ধীর হলেই মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ফুটে উঠত। নদীর জল মানুষের মনকে নিয়ন্ত্রণ করে। অভিজিৎ সেন লিখেছেন—

> গঙ্গাপাড়ের মানুষের যাবতীয় কাজকর্ম, এমনকি ভাবনাচিন্তাও গঙ্গার প্রবাহ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। তিনশো বছরে গঙ্গা যেভাবে উত্তর থেকে দক্ষিণে সরে এসেছে বা এখন যেমন আবার উত্তরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে বলা যায় মানুষের নিয়তি এই নদীই নির্ধারণ করছে।[৩৪]

তাইতো আবদুল মতিন বিশ্বাস তার চৌষট্টি বছরের জীবনে পাঁচবার তার ভদ্রাসন ছেড়ে নতুন আশ্রয় খুঁজেছে। তার বাপ-দাদাদের আমলে আরও কতবার এমন হয়েছে সে জানত

না। মেহেন্দিটোলা গ্রাম যখন গঙ্গা দখল করতে উদ্যত আবদুল মতিন অন্য বারের মতো মনের ও শরীরের জোরে টিকতে পারেনি, এবারে তার আত্মবিশ্বাস আর নেই। কারণ গঙ্গা মেহেন্দিটোলাকে আগেই গিলেছে এরপর তার নিজস্ব নিয়মে ব্যাপক ভাঙন ধরাবে জল সরাবার সময়, তারপর পুরো গ্রামের দখল নেবে। পাঁচ দশ বছর পর মেহেন্দিটোলা অন্য কোথাও জেগে উঠবে নতুন করে।

মানুষের বাড়িঘর, মন্দির, মসজিদ যা তৈরি করতে দশবছর বিশ বছর লেগেছে, বন্যা এক মুহূর্তে এই সময়ের অর্জিত সম্পদ ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। মেহেন্দিটোলার মানুষ রেডিয়োতে জল নেমে যাবার খবরে খুশি হয়েছিল কিন্তু সেই খুশি বেশিক্ষণ থাকেনি। মানুষ, গরু-বাছুর, হাঁস-মুরগি, এমনকি বাড়িঘর ভেঙে টালি, টিন, দরজা-জানালা এবং পুরোনো মসজিদ ভেঙে ইট, কাঠ নৌকায় তুলে একটা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজেছিল। আবদুল মতিন বিশ্বাস তার বিরাট পরিবার নিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে। জিনিসপত্র বোঝাই করে মানুষ মেহেন্দিটোলা থেকে পঞ্চানন্দপুরের আমবাগানে নতুন আশ্রয়ে চলেছিল। মানুষের সংসার গড়তে কত জিনিস যে লাগে তার ইয়ত্তা নেই। একটি গ্রাম কয়েকদিনেই এক অন্ধকার ঘুপচিতে পরিণত হয়েছিল, গ্রামটি অতীত হয়ে গেল অনেক মানুষের জীবনে। গঙ্গাপাড়ের অনেক মানুষ গঙ্গাকে নদী ভাবত না, ‘গঙ্গা মাইয়া’, ‘গঙ্গামাঈ’, কিংবা ‘গঙ্গা মা’ ভাবত। আবদুল মতিন মুসলমান হবার ফলে এসব ভাবতে পারেনি তবে গঙ্গা তার কাছে এক জীবন্ত সত্তা। সে ভেবেছিল—

> গেরুয়া জমিন শ্যাওলাসবুজে ডুরে শাড়িতে অঙ্গ ঢাকা একজন চওড়া যুবতী স্ত্রীলোকের মতো। সে জননী হতে পারে, ...সে মতিনের স্ত্রী কিংবা বোনও হতে পারে, ...এই সব সম্পর্কের ক্ষেত্রেই আবদুল মতিন বিশ্বাস এই নদীর সঙ্গে দ্বন্দ্বে দ্বৈরথে চির প্রতিযোগী।[৩৫]

মতিনের সঙ্গে গঙ্গার প্রতিযোগিতা আজকের নয়, বারো বছর বয়স থেকে যখন সে তার মা রহিমার শরীরের মধ্যে গঙ্গাকে দেখেছিল। মায়ের সঙ্গে গঙ্গার জলে ধরাধরি খেলায় হেরে গিয়ে মাকে বলেছিল ‘তুই গঙ্গা হইয়ে গেছিস।’ ঢেউয়ে মিলেমিশে থাকা ডুরে শাড়ির একপ্রান্তের মতো গঙ্গায় মায়ের মুখ দেখত মতিন। জামাইয়ের দাওয়ায় শুয়ে আজকেও মাকে মনে করেছে মতিন, আর মনে মনে বলেছে ‘ইবার তু হেরেয়েছিস!’ দাঙ্গায় বাবার মৃত্যু, মায়ের দ্বিতীয় বিবাহের পর বিচ্ছেদ আর বার বার বন্যার ফলে সব কিছু হারিয়ে ফেলা

আবদুল মতিন বদলে গেছে। তবে গঙ্গাপাড়ের মুসলমানদের রুক্ষতার যে দুর্নাম আছে তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা আবদুল মতিন।

মানুষের সংসার স্বপ্ন সবকিছুই ভেঙে দিয়ে যায় নদী। তবুও বন্যা পীড়িত মানুষের কাছে গঙ্গা মা। অভিজিৎ সেন লিখেছেন—

> জল সরতে শুরু করলে গঙ্গা সংলগ্ন জমির ভাঙন শুরু হবে দ্বিগুণ হারে। পাড় ভাঙবে, জমি খাবে, বাড়ি ঘর মানুষ পশু, সবাইকে খাবে রাক্ষসী গঙ্গা, হাসবে খলখল করে, নাচবে। তবুও সে হয়ে থাকবে মা গঙ্গা, দুর্গতিনাশিনী।[৩৬]

আর এসবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ত্রিদিব মিশ্রের প্রচেষ্টা বাড়ত। ত্রিদিব সেই লোক যে অগাধ সম্পত্তি ছেড়ে সামন্ততন্ত্র অবশেষের অভিজ্ঞান। বন্যায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে দুর্দশার ভুক্তভোগী হয়েছে ত্রিদিব, কয়েকদিন বাড়িতেও ফেরেনি, শরীরে মারণ রোগ নিয়েও জনসেবায় নিয়োজিত সে। এসব ত্রিদিবের পরবর্তী নির্বাচনের প্রস্তুতি নয় এ তার অভ্যাস, যেভাবে কিছু মানুষের অভ্যাস থাকে আর্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর। এই উপন্যাসে একটি বন্যার দৃশ্যে মানুষের দুর্দশার মাঝে অভিজিৎ সেন কমিউনিস্ট আদর্শ এবং একজন সৎ নীতিবাদী মানুষকে দেখিয়েছেন ত্রিদিবের মধ্য দিয়ে। যে শুধু কমিউনিজমকে অন্ধ আবেগে আঁকড়ে ধরে থাকেনি, হিটলারের সঙ্গে স্ট্যালিনের সৌহার্দ্য, মৃত স্পেন ও ম্রিয়মান চিন ও ফরাসি দেশের কবন্ধ দেখতে পেয়েছে। নবীন চৌধুরী ক্ষমতার বলে মিড ডে মিলের টাকার তছরুপ, জমি ভরাট ও নদীর বাঁধ বাঁধার সরকারি টাকা আত্মসাৎ করেছে। এবং স্কুলের নিয়োগে টাকার লেনদেনে সবরকম বেআইনি ব্যবস্থায় তার কোনো অনুশোচনা ছিল না, কিন্তু ত্রিদিবের ছিল, শরীরে মনে তাই সে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। ত্রিদিবের তাই আশাহত উচ্চারণ—

> আমাদের সময়ের মানুষের জীবনে আর প্রভাত নেই, আছে শুধু রাত। রাত যেমন অসহায়ত্বের প্রতীক তেমনই ভোগেরও। পৃথিবী এখন অনন্ত রাত্রির আঁধার। মানুষের যেন আর কিছু করবারই নেই।[৩৭]

তবুও সে সূর্যের উজ্জ্বল আলো, সবুজ মকাইয়ের খেত দেখে তৃপ্তি পেয়েছে। পৃথিবীর হতাশা কেটে সূর্যোদয় হবে হয়তো এই তার আশা ছিল। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের উচ্চবিত্ত সামন্তপ্রভুরা ভোগের নেশায় মত্ত, ইংরেজ কবে গেল, দেশটা কবে স্বাধীন হল সে খেয়াল

তাদের ছিল না। ত্রিদিব তো সেই সামন্তপ্রভু পরিবারের সন্তান কিন্তু সেই ভোগের কোনো আঁচ লাগতে দেয়নি নিজের মধ্যে। সংসারত্যাগী পিতার অবর্তমানে মায়ের জীবনযাপন রীতি ত্রিদিবকে নিম্নবর্গের মানুষের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক করতে সাহায্য করেছে। নিম্নবর্গের মানুষের সংস্পর্শে ত্রিদিব সত্যিকার মুক্তি পেয়েছিল। মালদা জেলার ভয়াবহ বন্যায় এই ত্রিদিব ত্রাতার ভূমিকায় শরীর ও সংসার উপেক্ষা করেছে। গোপালপুরের নদীর বাঁধ ভাঙনের মুখে, সেই ভাঙন রোধে সেচ দপ্তর, বালির বস্তা, বোল্ডার, লোকজন নিয়ে ত্রিদিব ব্যস্ত। ঘর্ঘরা, কোশি, মহানন্দার জল ধারণ করে ফুলে ফেঁপে ওঠা গঙ্গাকে আটকে রাখার চেষ্টা করেছে।

মানুষ জলের গতিকে বাঁধতে চেয়েছে নিজেদের প্রয়োজনে। নদীকে আঘাত দিয়েছে, কষ্ট দিয়েছে, নদী সেসব বেশিরভাগ সময় সহ্য করেছে। কিন্তু বন্যার সময় মানুষের বাধা আর মানেনি। গোপালপুরের বাঁধ ভাঙার পর দিয়ারা, ভূতনী, মানিকচক, কালিয়াচক প্লাবিত। ত্রিদিব নেতৃত্ব দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণের সমস্ত ব্যবস্থা নিয়ে বাঁধ বাঁধতে চাইলেও গঙ্গা ত্রিদিবকে আর চিনতে চায়নি। গঙ্গা তার শাখা-সঙ্গীদের সঙ্গে কিছুদিন কাটাতে এসেছে, তবেই তো সে মা গঙ্গা। মানুষকে জলের প্লাবনে দুর্দশায় পতিত করে আবার এক সময় জল টেনে নেবে। তেমনই এই প্লাবনের মতো মানুষের জীবনে কষ্ট আসে আবার চলেও যায়। একথা ত্রিদিবকে বলেছিল দেয়াশিন। যখন ত্রিদিবের মহাজনি পরিবারের অন্দরমহলের সবকিছুই অসহ্য হয়ে গিয়েছিল আর মামাতো বোনের নিখোঁজ হওয়ার শোক নিয়ে ত্রিদিব ভেঙে পড়েছিল। সেই শোক ও কষ্ট ভোলার জন্য ত্রিদিবের বন্ধু আবদুল মতিনের পরামর্শে দেয়াশিনের কাছে আনা হয়েছিল ত্রিদিবকে। দেয়াশিন নিমের ছড়ির আঘাতে কষ্ট ভুলিয়ে দিয়েছিল। ত্রিদিব সেই শোক ভুলে গেলেও দেয়াশিনের মেয়ে পরবর্তী দেয়াশিন লক্ষ্মীতারাকে ভুলতে পারেনি। তাই বন্যার মধ্যেও লক্ষ্মীতারার স্মৃতি তাকে তাড়া করেছে। ত্রিদিবের লক্ষ্মীতারার প্রতি আসক্তির স্মৃতি উসকে দিয়েছে বন্যা। লক্ষ্মীতারার শাঁখামুটি সাপের মতো বিনুনি বার বার মুগ্ধ করেছিল ত্রিদিবকে, কারণ মুগ্ধ হবার কোনো বয়স সত্যিই ছিল না। অন্যদিকে মালদার কয়েকটি ব্লকের দু-লক্ষ মানুষ জলমগ্ন। মানুষ একসময় নদীকে নানা ভাবে নিজেদের কাজে লাগিয়েছে আজ নদীকে বাগে আনতে ব্যর্থ। রাজ্যপাল তাই বলেছিল—

> নদীকে বেশি বিরক্ত না করাই ভালো, আর গঙ্গার মতো নদী। নদীর বারতি জলের জন্য পরিত্যক্ত ভূমি থাকা দরকার। মানুষ তো তা রাখে না। মানুষ নানা ভাবে নদীকে বাঁধে, কষ্ট দেয়, প্রবাহকে বিপথগামী করে।[৩৮]

মানুষ এসব মানেনি তাই আজ নিজেদের বাড়িঘর ফেলে কুকুর, ঘোড়া, বাঁদর, হাঁস, মুরগি নিয়ে বাঁধের উপর আশ্রয় নিয়েছে।

'নদীতে নদীতে যদি বা দেখা হয় বোনে বোনে হয় না' এই প্রগতির যুগে এই প্রবাদের যথার্থতা বিচার্যের বিষয়। মানুষ নানাভাবে নদীকে আটকে রেখে তাদের আলাদা করেই রেখেছে। কিন্তু গঙ্গা তার প্রবল শক্তি দিয়ে ফুলহার, কালিন্দ্রী, মহানন্দা, বেহুলা, পাগলা, ছোটো ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে এবং গ্রাম হয়ে ইংলিশবাজার শহরকেও ডুবিয়েছে। বাঁধ ভেঙে গ্রাম ভাসিয়ে একে অন্যের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। জলবন্দি মানুষকে কেউ আশার কথা শোনাতে পারেনি, সকাল হলেই জল কমবে এমনটা সবাই দেখতে চেয়েছিল কিন্তু তা হয়নি, এই সর্বগ্রাসী বন্যার মধ্যেও মানুষ গঙ্গা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি অটুট রেখেছিল, যা তাদের আগেও ছিল। লক্ষ্মীতারা বলেছে—

> গঙ্গামাই জল নিয়ে আসবে না? জল আসবে গ্রাম শহর কখনো কখনো ডুববে। না ডুবলে মাটি শুদ্ধ হবে কি করে? মাটি শুদ্ধ না হলে গাছপালাফসল সবজি বাড়বে কীভাবে? মানুষের প্রয়োজনেই মাই এসব করে।[৩৯]

এসব বিশ্বাসের ফলে নদীর প্রতি মানুষের আচরণে একটা সীমা থাকবে হয়তো, গঙ্গা মায়ের শাসন এটা। মায়ের শাসনে সন্তান চেঁচাবে, ছুটবে, ক্ষমা চাইবে যেভাবে মালদা জেলার চার ভাগের তিন ভাগ মানুষ এই বন্যায় করেছিল। আবার মায়ের রাগ কমলে সব শান্ত হবে। গঙ্গা মায়ের রাগ কমাতে পাঁচ-দশ লিটার দুধ ভেট দিয়েছে রোজ, মোষ বলি দেওয়া হয়েছে কিন্তু নদী এখন নিয়মের বাইরে তাই কোনোভাবে তাকে সন্তুষ্ট করা যায়নি। নদীকে যত বাঁধতে চেষ্টা হয়েছে ততই সে ভয়ংকর হয়েছে। ফারাক্কার মতো মানুষের দম্ভের কীর্তিকেও সে ভেঙে ফেলায় শক্তি রাখে। মালদার বন্যায় বিশেষজ্ঞরাও গঙ্গার রোষ কবে কমবে তার হিসাব দিতে পারেনি। ফলে আর যা করার ত্রিদিব তার লোকজন নিয়ে করেছে। খাবার, জল, ত্রিপল, নৌকা, ব্লিচিং, ওষুধ, ডাক্তার, লঙ্গরখানা, হ্যাজাক, পাম্প, পশু রাখার ব্যবস্থা

ইত্যাদি। ত্রিদিবের স্ত্রী অনিমার নদীর চেহারা দেখে বুকের রক্তে হিম ছোঁয়া লেগেছিল, তার ত্রিদিবের কথাগুলো মনে পড়েছে—

> আজন্ম গঙ্গার ধারের মানুষ গঙ্গার বদনাম, নদীর বদনাম সহ্য করতে পারে না। উত্তেজিত হয়ে বলবে, 'নদী কখনো দুর্বৃত্ত হয় না, লোভী মানুষই দুর্বৃত্ত। নদী প্রকৃতির আইন মেনে চলে, মানুষ তাকে পদে পদে লঙ্ঘন করে।...[৪০]

মনুও তো তাই বলেছে যে ব্যক্তি নদীর স্বাভাবিকতায় প্রতিবন্ধক হয় তাকে সমাজ থেকে বহিষ্কার করা উচিত।

বন্যা ও যে কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরের সক্রিয়তা দেখা যায়। মালদার এই বন্যার ফলে রাজনৈতিক দলগুলির উৎসাহ, সংবাদ মাধ্যমের খবরে মশলা, চিকিৎসা ব্যবস্থার ব্যর্থতা, লোভী মানুষের দুর্গতির সুযোগ নিয়ে টাকা রোজগারের পদ্ধতি সর্বোপরি সমাজ ব্যবস্থার সার্বিক রূপ ফুটে উঠেছিল। সালাউদ্দিনের মতো গুণ্ডা তার নৌকা ভাড়ার রেট দিনে দিনে বাড়িয়েছে, বিরোধী রাজনৈতিক দল মানুষের দুর্দশাতে সরকার পক্ষকে ঘিরে ধরার সুযোগ নিয়েছে, হাসপাতালের কর্মচারী ডাক্তার অজ্ঞাতবাসে। মানুষ যখন লৌকিক বিশ্বাসে গঙ্গাকে তুষ্ট করার চেষ্টা করেছে অন্যদিকে তখন প্রশাসন, রাজনৈতিক নেতা, ঠিকাদার ব্যাবসায়ী মিলে কোটি টাকার নতুন পরিকল্পনা নিয়ে ভেবেছে। মানুষের চিকিৎসা একটা জরুরি পরিষেবা সবসময়ই আর বন্যার সময় তো অবশ্যই, বিষাক্ত পোকামাকড়, সাপ, জলে দূষণ এসব নিত্যসঙ্গী ফলে চিকিৎসা বিশেষ প্রয়োজন। বন্যাকে প্রতিরোধ করতে মানুষ অগ্রিম চেষ্টা যে করেনি তা নয়, কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থপূরণ ও অসততার কারণে বেশিরভাগ সময় কাজের কাজ হয়ে ওঠেনি। তবে ফারাক্কার মতো মহান কীর্তির ফলে ছোটো বড়ো ব্যাবসাদার কৃষক সাধারণ মানুষের অনেক সুবিধা হয়েছে। নদীর বুক চিরে দৈত্যকার নির্মাণ হয়েছে, 'শুধু মন্দির নয়, ঈশ্বরের মূর্তিও। কিন্তু মনু যে কথা বলেছিলেন নদী সম্পর্কে, তেমনই *মুক্তধারা* (১৯২২) নাটকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যন্ত্রদানবের তাণ্ডবের কথা বলেছেন, মেঘনাদ সাহার (১৮৯৩-১৯৫৬) জলপথ অবরোধের নিন্দা, এসব মানুষ উপেক্ষা করেছিল। তাই তো দেখা গেছে 'নদীর বিদ্রোহ', 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'। গঙ্গার রোষ কমলে জল নামতে শুরু করেছিল। ত্রিদিবের কাজ বেড়েছে, জল নামলে আন্ত্রিক, টাইফয়েড, জন্ডিস ছড়াবে ফলে ত্রিদিব ব্লিচিং, গ্যামাক্সিন, ওষুধ স্যালাইন সংগ্রহ করে

রেখেছে। মানুষ আবার নতুন করে ঘর বাঁধার চেষ্টা করবে। বন্যা ত্রাণে ত্রিদিবের চেহারার অবনতি হয়েছে, অনিমা তাকে দেখে কেঁদে ফেললে ত্রিদিব তাকে আশ্বস্ত করেছিল। এইসব কাজের মধ্যেই ত্রিদিব বাঁচার রসদ খুঁজে পেতে চেয়েছিল। এই মানুষটা শুধু অনিমার ও লক্ষ্মীতারা দেয়াশিনের নয় ভূতনী, মানিকচক, মথুরাপুরের। অসুস্থ হয়ে হাসপাতালের বেডে শুয়ে ত্রিদিব ভাবত তার বেঁচে থাকার উত্তেজনা, আত্মার শান্তি, ভালোলাগা, ভালোবাসা সব গঙ্গাপাড়ের মাটি ও মানুষকে নিয়ে। তাই এই মানুষদের ছেড়ে সে কোনোদিন যেতে চাইত না। আবার বন্যা আসবে তারপর ত্রিদিব তার দলবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে এই মানুষগুলোর ত্রাণের কাজে। সে মন্ত্রী হতে চায়নি, তবে পার্টি চাইলে সে বিধানসভার সদস্য হতে পারে কারণ কাজ করতে গেলে হাতে কিছু ক্ষমতা দরকার। কলকাতায় নয়, ভূতনী, রাজমহল, মানিকচক, মথুরাপুরের পথে পথে ঘুরতে চেয়েছে ত্রিদিব।

মালদার প্রায় আড়াই হাজার গ্রাম বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল, যাতে বাইশ-তেইশ লক্ষ মানুষের বাস ছিল। শতাধিক মানুষ ও তিন চারশো গবাদি পশু মারা গেছে, দেড় লক্ষ হেক্টর আবাদ জমি নষ্ট হয়েছে, মানুষের দুর্দশার সঙ্গে অসামাজিক কাজ বেড়েছে। মানুষের মৃত্যু মিছিল চলতেই থেকেছে আন্ত্রিকে, জেলার অনেক জায়গাই জলের তলায় কিন্তু খবরের কাগজ থেকে বন্যার খবর উধাও হয়েছিল। তেমনই উধাও হবে যারা বহু বছর ধরে বন্যা কবলিত গ্রামগুলোয় বাস করছিল তাদের অস্তিত্ব। বন্যায় জল ওঠে আবার নেমে যায় কিন্তু এই দুঃসময়ে অনেক মানুষের পরিচয় বেরিয়ে আসে, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা রাজনীতিরও। অনেকের লাভ হয়েছে অনেকের ক্ষতি, নবীন ত্রিদিবের পার্টির একজন শক্তিশালী নেতা, পার্টির কাজে না গিয়ে ত্রিদিব মানুষের ত্রাণে ছিল। ফলে নবীন ত্রিদিবকে ছেঁটে ফেলতে চেয়েছে পার্টি। তাই আবেগের অভিঘাত, অসুস্থতা, বন্যা ত্রাণে খাটুনি, লক্ষ্মীতারার আন্ত্রিকে মৃত্যু সব মিলে ত্রিদিবের শরীর আরও ভেঙে পড়েছিল। এর মধ্যেই সে গ্রামের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো মনে মনে স্মরণ করেছে। যে মানুষগুলোর সঙ্গে সে থাকতে চেয়েছিল তাদের বর্তমান অবস্থা এখন কেমন, লক্ষ্মীতারার মেয়ে দেয়াশিন হয়েছে কিনা কারণ মানুষের একজন দেয়াশিনের খুব প্রয়োজন না হলে এত দুঃখী মানুষ কার কাছে গিয়ে দুঃখ ভুলবে। একদিকে বন্যায় নিঃস্ব মানুষের নতুন নেতাদের অধীনে জমি দখলের লড়াই শুরু হয়েছে অন্যদিকে ত্রিদিবের বাঁচার উদ্দ্যেশে কলকাতা যাত্রা শুরু হয়েছে। গৌড় এক্সপ্রেসে উঠে বিষণ্ণতা হতাশা পেয়ে বসেছে এই আজন্ম সংগ্রামী মানুষটাকে। সুস্থ হয়ে ফিরলে নতুন সংগঠন করবে ভোটের

জন্য নয়, কাজ করার জন্য এমন আশা ছিল ত্রিদিবের। কিন্তু ত্রিদিব ফিরে আসেনি ট্রেনেই তার মৃত্যু হয়েছিল এবং তার সঙ্গে একটি আদর্শের মৃত্যু। অভিজিৎ সেন এমন চরিত্র দিয়ে বামপন্থার প্রকৃত স্বরূপকে ধরতে চেয়েছেন যেভাবে *ছায়ার পাখি* উপন্যাসে গোপালকে ধরেছেন, একই মাপের চরিত্র এরা। একটি আদর্শকে চেপে রেখে কীভাবে পার্টিতে স্বার্থসর্বস্ব মানুষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। ফলে প্রগতি ও অনেক সম্ভাবনার অপমৃত্যু হয়েছে।

নিম্নগতির নদী উপন্যাসে গঙ্গা একটি প্রধান চরিত্র হয়ে উঠেছে, গঙ্গার দ্বারাই মানুষের সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। মূল কাহিনির পাশে অভিজিৎ সেন দেখালেন আনোয়ার চৌধুরীর ও প্রহ্লাদ ঘোষের মালদার আম চাষের সওদাকে কীভাবে গঙ্গার বন্যা নিয়ন্ত্রণ করেছে। তালাকপ্রাপ্ত মুসলমান মহিলার পরাধীনতা। রসিদাকে যেভাবে তালাক দিয়েছে তার নেশাগ্রস্থ স্বামী বাহার তারপর রসিদা হালালের মাধ্যম হিসাবে দ্বিতীয়বার বৃদ্ধ সাদিককে বিয়ে করলে আর ফিরে আসেনি। বন্যার সময় বাহার চরম একাকীত্ব বোধ করেছে এবং তার প্রিয় ঘোড়াসহ গঙ্গাবক্ষে হারিয়ে গেছে। আবার আনোয়ার চৌধুরীর তালাকপ্রাপ্ত মেয়ে জুলি ও অবিবাহিত কাঠ ব্যাবসায়ী অরুণ মজুমদারের প্রেমের অনুঘটক গঙ্গা। বন্যার কারণে অরুণ আনোয়ারের বাড়িতে ঠাঁই পেলে এই সম্পর্ক লতিয়ে উঠেছিল। অরুণ ধর্ম, নাম পরিবর্তন করে ইসলাম গ্রহণ করে জুলিকে বিবাহ করেছে। ত্রিদিবের লক্ষ্মীতারার প্রতি প্রবল আকর্ষণ ত্রিদিবের মৃত্যু পর্যন্ত বজায় ছিল। অব্যক্ত এই প্রেম, মিলনের প্রচেষ্টা, মৈথিলী ও সুবীরের ঘর ভর্তি জলে যৌন মিলন দৃশ্য, সালাউদ্দিনের দৌরাত্ম এই সব কিছুর মধ্যে গঙ্গার ভূমিকা ছিল। বন্যাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সর্বোচ্চ নেতাদের বৈঠকে উঠে আসে নেতাদের অসততা। কীভাবে পার্টির আদর্শ নিয়ম নীতি ক্রমে বদলাতে থেকছে, অসৎ মানুষের ক্ষমতায়ন, আদর্শের হত্যা। স্বেচ্ছায় পার্টি সব কিছু মেনে নিয়ে ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করতে চেয়েছে। লেখক গঙ্গার গতিকে শুধু মানুষের নয়, পুরো সমাজের গতির সঙ্গে মিলিয়েছেন এই উপন্যাসে। নদী নিয়ে লেখা ও অভিজিৎ সেনের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির মধ্যে *নিম্নগতির নদী* বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৬। *পাশ*

অভিজিৎ সেন ব্যাংকে কাজ করার সুবাদে তাঁর ব্যাংক সম্পর্কিত নানা অভিজ্ঞতাকে গল্প ও উপন্যাসে ব্যক্ত করেছেন। *পাশ* (২০০৯) নামের ছোট উপন্যাসে একটি ব্যাংক লুটের কাহিনি বর্ণিত। ক্যাশিয়ারের এক দেড় মিনিট ক্যাশ ছেড়ে ফোন ধরতে যাওয়ার মধ্যেই ঘটনাটা ঘটেছে, দশ লক্ষ টাকার একটা 'পেটমোটা' ব্যাগ হাওয়া হয়েছিল। ডাকাতি হলে তার নিশ্চয়ই কোনো অভিজ্ঞান থাকত তাতে ব্যাংক কর্মীদের স্বস্তি পেত কিন্তু এই ধরনের হাত সাফাইয়ে সব দায় বর্তাবে ব্যাংক কর্মীদের উপর। আমজনতার কাছে বার্তা যাবে ব্যাংকের কর্মীদের পকেটেই টাকাটা গেছে, এক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। এর সঙ্গে ব্যাংকের ছোটো ছোটো কিছু তথ্য উঠে এসেছে। অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণির কোনো কর্মচারী বিপদে পড়লে তার সাহায্যহীনতা, বদলী সংক্রান্ত অসন্তোষ, ব্যাংকের ঋণ অনাদায় সংক্রান্ত মামলা ও তার ফল, কোনো কর্মচারীর পারদর্শিতা, অসহায়তা, ব্যক্তিজীবন এমন নানা বিষয়।

ক্যাশিয়ার অসীম বৈরাগীর নামে একটি ফোন এসেছিল, যে ফোনের অপর প্রান্তে নাকি তার স্ত্রী ছিল। অসীম ক্যাশ ছেড়ে ফোন ধরতে গেলে তাকে অযথা এক দেড় মিনিট অপেক্ষা করতে হয়েছে তাতেই ঘটনাটা ঘটেছিল। দশ লক্ষ টাকার ভর্তুকি তাদের কর্মচারীদের উপর এসে বর্তাবে এটাই স্বাভাবিক। একদিন জোসেফ টুডু এক শিক্ষককে কুড়ি হাজার টাকার পরিবর্তে এক লক্ষ টাকা ভুল করে দিয়ে ফেলেছে, পরে বুঝতে পেরে সেই শিক্ষকের বাড়িতে গেলে সে সরাসরি অস্বীকার করেছিল। যার হাত দিয়ে টাকা যেত তাকে অর্ধেক আর অন্যান্য কর্মচারীর দ্বারা বাকিটা দিয়ে সেই টাকা পূরণ করতে হত। কিন্তু দশ লক্ষ টাকা কম নয়। এ টাকার সংস্থান কীভাবে হবে তা ভেবে পায়নি কর্মচারীরা। কোনো কর্মচারীর মূল ভূমিকা আছে কিনা এই ব্যাপারটায় অথবা কোনো কেপমারি দলকে কেউ সাহায্য করেছে কিনা এমন নানা সম্ভাবনা থাকতে পারে।

ব্যাংকের কর্মচারীরা যখন হন্যে হয়ে অর্ধেকের বেশি টাকা তুলে ফেলেছিল তখন এক রাতে ব্যাংক কর্মী শোভনলালের বাড়ি দুজন লোক প্রবেশ করেছিল ক্যামেরা ও মাউথপিস নিয়ে। দুজনের একজন বাপি নামের যুবক। বাপি ব্যাংক থেকে ঋণ লেনদেনে অনিয়ম করে পুনরায় ঋণ পেতে ব্যর্থ হয়েছিল। ফলে প্রতিশোধ নিতে এই সুযোগ সে হাতছাড়া করেনি। শোভনলাল নিজের বাড়িতে বসে মদ্যপান করছিল ফলে এই সুযোগটা

বাপি কাজে লাগায়। ঋণ আদায় নিয়ে নোটিস, হুঁশিয়ারি দিয়েও বাপিকে কায়দা করতে পারেনি, শোভনলালকেই অপমানিত হতে হয়েছে। বাপিরা জানে ব্যাংকের ক্ষমতা কতখানি। এর আগে বাপি ব্যাংক কর্মী সমীরণকে অপমান করে, প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছিল ফলে চাকরি ছেড়ে টিউশন করিয়ে সংসার প্রতিপালন করতে চেয়েছে সমীরণ। কিন্তু শোভনলাল জানত—

> দুর্ব্যবহার শুধু মস্তান আর রাজনীতির নেতাদের একচেটিয়া নয়, আমাদের ব্যাংকের কর্মচারীরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে কী পরিমাণ দুর্ব্যবহার করে তা তো তোমার অজানা নয়।... বিডিওদের অবস্থা দেখ না? অস্থির সময়ের অস্থিরতার ভাগ সবাইকেই পেতে হয়।[৪১]

তবুও সমীরণের মনের ক্ষত অনেক গভীর ছিল, পরিবর্তে রক্তপাত দেখতেই চেয়েছিল। প্রাণনাশের হুমকির কথা জানিয়ে থানায় ও ডি.এমের কাছে অভিযোগ করেছিল। বিশেষ কোনো সাক্ষী না থাকার কারণে সেই অভিযোগ জোরালো হয়নি। তবে বাপি জামিনের আগে চোদ্দদিন জেল খেটেছে। তারপরেই বাপি পাল গণতন্ত্রের আশ্রয়দাতা সংবাদমাধ্যম হিসাবে ধর্মযোদ্ধা হয়ে ক্যামেরা কাঁধে নিয়েছিল। আজ ধর্মকে রক্ষা করার সুযোগ পেয়েছে।

শোভনলালের চোখে তীব্র ফ্ল্যাসের আলো ফেলে বাপি তার বাইট নিতে চেয়েছে। জানতে চেয়েছে বহরমপুর ব্রাঞ্চ থেকে কীভাবে দশ লক্ষ টাকা উধাও হল। এই তদারক আসলে শোভনলালকে হেনস্থা করা আর প্রতিশোধ নেওয়ার নামান্তর। এমন অপ্রীতিকর পরিস্থিতি ও নেশাগ্রস্থতার মধ্যে শোভনলালের বাপিকে মনে হয়েছে যেন বন্ধ ঘরে ঘুরে বেড়ানো বিষাক্ত সাপ। বাপি তাকে নানাবিধ জালিয়াতির সঙ্গে কয়েক মুহূর্তেই যুক্ত করে নিয়েছিল। সত্যের চাহিদা বাজারে সবসময়ের, সংবাদ মাধ্যম যখন ক্রমশ বাজারে জায়গা করে নিয়েছে তখন সত্যের সঙ্গে তার চুক্তি স্থাপিত হয়েছে, তাই সংবাদমাধ্যম সত্য বলত, সত্য ব্যাখ্যা করত, আর সত্য তৈরিও করত। আবার ভয়ানক অর্ধ্যসত্যকে সত্য বলে প্রচারও করত। শোভনলালের মদ্যপান, বমির ছবি, দশ লক্ষ টাকা কেপমারির ঘটনা এসবের প্রচার তার জীবনে যে কী ঝঞ্ঝা আনতে পারে তা যে কেউ বোঝেনি। বাপি পাল সমীরণকেও ঝামেলা করতে পারত তাই শোভনলাল সমীরণকে সাবধান থাকতে বলেছে বাপির হাত থেকে। ব্যাংকের সঙ্গে স্থানীয় মস্তানদের বিরোধের মূল সূত্রটাই ছিল ঋণ সংক্রান্ত। দুজন ব্যাবসায়ীকে ধরে ব্যাংকের এই ঘাটতি কোনোরকমে মিটিয়ে নেওয়া হয়েছিল। এই ধরনের

ব্যাবসায়ীদের সঙ্গেই ব্যাংকের বড়ো বড়ো লেনদেন, ব্যাংক তাদের সাহায্য করে ফলে তারাও ব্যাংককে সাহায্য করেছে। টাকার ঘাটতি মিটে গেলেও পরের দিন বাপি এসে একটা গোলমাল বাঁধিয়েছিল। সে একজন পোক্ত সাংবাদিকের মতো প্রশ্ন করেছে। ব্যাংকের হাজার সুরক্ষা ব্যবস্থায় অনেক ফাঁক ছিল, সমস্ত নিয়ম মানতে গেলেও নতুন বিপত্তি হত। বাপি সেই সব অনিয়ম ও সদ্য ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন করেছে। যতীন স্থানীয় লোক, সে দিন মজুরিতেই ব্যাংকের কাজ করত। এখন ব্যাংকের কর্মচারীদের সাহায্যে চাকরি পাকা করেছে। সে বাপি পালকে শায়েস্তা করতে ক্যামেরা আছাড় মেরে ফেলে, বাপিকে ভাগিয়ে দিয়েছে।

খবর টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হতেই উচ্চপদস্থ অফিসাররা ব্যাংক পরিদর্শন করে সেই দুজন ব্যাবসায়ীর চার লক্ষ টাকা তোলা ও কয়েকজন স্টাফের ফিক্সড ডিপোজিট ভাঙার প্রমাণ পেয়েছিল। এইটুকু প্রমাণেই ম্যানেজার ক্যাশিয়ারকে কাঠগোড়ায় উঠতে হয়েছে। সমীরন সাসপেন্ড হয়েছে, শোভনলালের মদ্যপ পরিস্থিতির জন্য জবাব চাওয়া হলে সে পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নিজেকে অসহায় বোধ করেছিল। অন্যান্য ব্যাংক অফিসারের কীর্তিও প্রকাশ হয়েছে। শেষে ঝাড়খণ্ডের মাফিয়া কবলিত এলাকায় বদলি হয়ে নিত্য মদ্যপান আর সমস্ত বে-আইনি পথে চালিত হয়েছে শোভনলাল। ফলে শোভনলালের এতদিনের সততা সবই খসে পড়েছিল। বরখাস্তের ফলে সমীরণের আর্থিক কষ্টের সঙ্গে সমাজের কাছে চোর রূপেই দর্শিত হয়েছিল। যাদের শাস্তি হয়েছে তাদের আর্থিক কষ্টের নানারকম প্রতিক্রিয়া ব্যক্তিজীবনে সংসারে প্রকাশ পেয়েছে। স্ত্রীর গহনা বিক্রি, সুদে টাকা নেওয়া, ছেলেমেয়ের পড়াশোনা বন্ধ, দেনায় ডুবে থাকা এসবই। দীর্ঘ চলমান মামলার আওতায় সমীরণ সহকর্মীদের সহানুভূতি নিয়েই বহরমপুর ছেড়েছিল। একতরফা একটা বিচারের দায় তো ব্যাংককর্মীদেরই, কারণ তারা পুলিশে জানালে টাকা হয়তো ফেরত আসত না কিন্তু এভাবে চুরির দায়ে এতগুলো মানুষের সম্মান নাশ, আর্থিক বিপর্যয় হত না। অভিজিৎ সেন কয়েকজন ব্যাংক কর্মীর দুর্দশা ও হতাশার সঙ্গে মানুষের অসততা ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের দিকটাও দেখিয়েছেন এই ছোটো উপন্যাসটিতে।

৭। *নাগমঙ্গল*

অভিজিৎ সেন তাঁর 'মিথ ও লোককথার সম্ভাবনা' প্রবন্ধে জানিয়েছিলেন সত্তর দশকের 'গ্রামে চলো'র ডাকে যারা গ্রামে গিয়েছিল ও যায়নি তাদের অনেকেই লোকসাহিত্য ও লোকশিল্পের অনেক অজানা দিকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। ভারতের মিথ, পুরাণ, মঙ্গলকাব্য, লোককথা, রূপকথা লেখকেরা ব্যবহার করেন। মিথ ও লোককথার মধ্যে একটা গোটা সমাজের সংস্কৃতি এবং ইতিহাসকে খুঁজলে পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস করতেন অভিজিৎ সেন। এই বিশ্বাসেই তিনি 'দেবাংশী', *ছায়ার পাখি*, *বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর* (১৯৯৫), *নাগমঙ্গল* (২০১৯) প্রভৃতি গল্প উপন্যাস লিখেছেন। এক্ষেত্রে লৌকিক সংস্কার ও বিশ্বাস, লোককথার অলৌকিকতা ও মঙ্গলকাব্যের উপাদান আখ্যান নির্মাণে এনেছেন। *নাগমঙ্গল* উপন্যাসেও মালদা জেলার একটি অঞ্চলের লৌকিক বিশ্বাস এবং লোককথা, মহাভারত, মঙ্গলকাব্য ও উপনিষদের উপাদান দিয়ে লেখক চমৎকার একটি আখ্যানকে রূপ দিয়েছেন।

বাংলা বিহারের সীমান্তবর্তী করন্ডির মানুষ সাপ মারে না, এখানে কাউকে কোনোদিন সাপেও কামড়ায়নি। বিনয় ও অরুণাংশু আধুনিক যুক্তিবাদী দুই অধ্যাপক করন্ডির সেই গ্রামে তাদের ছাত্র বিমলের বাড়ি গিয়েছিল, মনসাপুজো উপলক্ষ্যে মেলা দেখতে। মনসাপুজোর উৎসবে সাপ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বিমলকে গোখরো দংশন করে, যে বিমল গ্রামে বালা ও লখাই নামে পরিচিত ছিল। বিমলের মৃত্যু হলে করন্ডির মানুষ নৌকায় বিমলের মৃতদেহ ভাসিয়ে ফুলহার নদী দিয়ে গঙ্গা হয়ে ফারাক্কা পর্যন্ত শবযাত্রা করে। মৃত লখিন্দরকে নিয়ে বেহুলা যেভাবে ইন্দ্রের সভা পর্যন্ত গিয়েছিল, বিমলকে নিয়ে চার পাঁচজনের একটি দল জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলের গান মঞ্জুসের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে গেয়েছে এবং বালার জীবন ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছে। এই দুই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, যুক্তিবাদী, নাস্তিক, কুসংস্কার বিরোধী অধ্যাপক বিমলকে হাসপাতাল পর্যন্ত নিয়ে যাবার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয়ে তারপর সেই যাত্রায় অংশ নিয়েছিল। একত্রিশ বছর পর বিনয় বুঝতে চেষ্টা করেছে তখন কেন তারা এমন করেছিল। করন্ডির মানুষ কাগজ আর কাপড়ের উপর ছবি এঁকে, বিভিন্ন ধরনের নকসা করা কলার মঞ্জুষে শায়িত করেছিল বিমলের মৃতদেহ। সেই মঞ্জুষের চারিদিকে সোলা দিয়ে তৈরি সাপ আটকানো এবং এই পুরো নির্মাণকে বেষ্টন করে এক বিশাল ভয়ংকর পা ও ডানাওয়ালা নাগরাজ। লেখক কথকের জবানীতে লিখেছেন—

> বিস্মিত হয়ে ভেবেছিলাম কলকাতার চিনাপাড়ার উৎসবের ড্রাগন কী করে এত দূরে করন্ডিতে এল! পরে ভালো করে দেখে ড্রাগনের সঙ্গে তফাতও চোখে পড়ল।[৪২]

সাপ সম্পর্কে অভিজিৎ সেনের আগ্রহ শৈশব থেকে একথা এই উপন্যাসের ভূমিকায় তিনি জানিয়েছেন এছাড়া তাঁর প্রায় সব উপন্যাসে সাপের প্রসঙ্গ এসেছে বার বার। এখানে বিমলের মঞ্জুষের সেই নাগরাজ প্রসঙ্গে মহাভারতের আদিপর্বের নাগজাতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। নাগরাজ তক্ষকের সঙ্গে পৃথিবীর বহুদেশের পুরাণে ড্রাগনের তফাৎ দেখা যায়, তক্ষক শক্তিশালী, কৌশলী বুদ্ধিমান ও মায়াবী। তক্ষকের মহাভারতে উতঙ্ক বৃত্তান্তে কুণ্ডল চুরি, পরীক্ষিৎকে দংশন করে হত্যার মধ্য দিয়ে তক্ষকের মায়াবি রূপের পরিচয় পাওয়া গেছে।

করন্ডি গ্রামে কাউকে সাপে কাটেনি, বিমলের ক্ষেত্রে প্রথম এই ঘটনা ঘটেছে। এই বিশ্বাসকে লালন করে চলেছে করন্ডির মানুষ। কিন্তু 'মনুষ্যজাতির সঙ্গে নাগজাতির বিরোধের মূলোচ্ছেদ একে অপরের ধংসসাধন ছাড়া যেন সম্ভব নয়'। মহাভারতেও এই তত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে উতঙ্ক বৃত্তান্তে। সাপের সঙ্গে মানুষের শুধু বিরোধের সম্পর্ক, সাপকে মানুষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। সাপ অভিশাপের থেকেও ভয়ংকর, সাপের কামড় বিধি নির্দিষ্ট এমন বিশ্বাস মানুষের চিরকালীন। মহাভারতের রুরু, মঙ্গলকাব্যের বেহুলাকে স্বামীর প্রাণ ফেরাতে অনেক পথ অতিক্রম করতে হয়েছিল। করন্ডির মানুষগুলো মহাভারত মঙ্গলকাব্যের যুগ পেরিয়েও বিশ শতকের শেষ পাদে সে যুগের বিশ্বাসকে লালন করেছে, তাদের বালার প্রাণ ফেরাতে চেয়ে যা করেছে তাতে যুক্তির থেকে বিশ্বাস বেশি। মানুষ বিশ্বাস দিয়ে যে জগৎ তৈরি করে সেটাকে এত সহজে অস্বীকার করা যায়নি। সেই বিশ্বাসের জগতে মানুষ দৈন্দন্দিন জীবন কাটায়, দুর্ঘটনায় থেঁতলে যাওয়া পা নিয়ে যে লোকটি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল তার পা কেটে বাদ দেবার পরেও সে সেই পায়ের ব্যথায় ছটফট করেছে কারণ তার বিশ্বাসে সেই পায়ের অস্বিত্ব ও মায়ার ব্যথা রয়ে গেছে। আবার গোঁসাইয়ের মন্ত্রপূত জলে মুহূর্তে শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে গেছে।

বিমলের প্রেমিকা মৈথিলী বিমলের মৃত্যুর কয়েক বছর পর মনসামঙ্গলের বিবর্তন নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বিমল ও তার পুরোনো স্মৃতি, বিমলের পরিণতি, ছোটো থেকে শোনা লোককথার গল্প এসব দিয়ে তার থিসিসকে প্রশসংসনীয় করেছে। মৃত্যুর দুয়ার থেকে

মানুষের প্রাণ ফিরিয়ে আনার প্রতিজ্ঞা, যেমন রুরু তার আয়ুর অর্ধেক দিয়ে প্রমদ্বরার প্রাণ ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিল, বেহুলার লড়াই ও অপেক্ষা এসবের মধ্য দিয়ে প্রিয়জনকে ফিরিয়ে আনার লড়াই প্রাধান্য পেয়েছে। এসবে লৌকিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মকে প্রাধান্য দিয়ে, তার প্রাণের পুরুষ বিমলের প্রাণ ফেরাতে যেভাবে করন্ডির লোক চেষ্টা করেছে, তাদের বিশ্বাস দিয়ে। নচিকেতার যমের বাড়ি যাওয়ার কাহিনির সঙ্গে মিল রেখে যেসব লৌকিক কাহিনি প্রচলিত এসবই মৈথিলির গবেষণার বিষয়। তার প্রথম যৌবনে যে বিচ্ছেদজনিত আঘাত আসে করন্ডির মাটি থেকে, গবেষণায় তার প্রকাশ অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে—

> তার দেখা মৃত্যু, মৃত্যুর কাছ থেকে মৃতকে ফিরিয়ে আনার জন্য স্ত্রী-পুরুষের সমবেত প্রয়াস, সমবেত আকাঙ্ক্ষা, লড়াই, যার মাধ্যম লোকসংগীত, লোকনৃত্য, লৌকিক অভিনয়। এসবের মাধ্যমে তাদের আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি।[৪৩]

মৈথিলী মনসাকে প্রাগার্য মানুষী দেবতা বলেছে। করন্ডির জীবন্ত সাপ ও সিজ গাছ পুজোর কথা বলেছে। আসলে মহভারত ও মঙ্গলকাব্যের সর্পদংশনে মৃত্যু আর তার প্রেমিকের একইভাবে বেদনাময় মৃত্যু তার জিজ্ঞাসু মনের অনুসন্ধিৎসা সব মিলে জ্ঞানের জগতে বিচরণ করেছে মৈথিলী। অভিজিৎ সেন আধুনিক সময়ের বাংলা বিহার সীমান্তের যুবক-যুবতীর ট্র্যাজেডির সঙ্গে মহাভারত ও মঙ্গলকাব্যের কাহিনি এবং শিক্ষায়তনিক গবেষণাকে মিলিয়ে এই উপন্যাসের এক অপূর্ব আখ্যান নির্মাণ করেছেন।

সৃষ্টির শুরু থেকে সাপ ও মানুষের বিরোধের সম্পর্ক করন্ডির মানুষ হয়তো মানত না। বিমল ও তার বাবা সুগ্রীব অধ্যাপকদের গ্রামের মনসাপুজোর মেলা ও সাপ খেলা দেখতে আসার অনুরোধ করার সময় বলেছে মা বিষহরির নিষেধে এই গ্রামের মানুষকে সাপেও কাটে না, সাপ মারেও না করন্ডির মানুষ। অধ্যাপক অরুণাংশু দেখেছিল সাপ সম্পর্কে বিমলের প্রবল আগ্রহ। ট্রেনে বিমলের সাপ নাচানো দেখেছিল এবং শুনেছিল মেলায় সর্পবেদেদের সঙ্গে বিমলের ঘুরে বেড়ানোর কথা। গ্রামে শুধু বিমলের নাম লখাই নয়, ত্রিশ পঁয়ত্রিশ ঘরের অর্ধেক ঘরে এমন লখাই ছিল। শ্রাবণ মাসে প্রায় প্রতি ঘরে মনসার গান গাওয়া হত। তার যে একটা বিরাট পূর্ব প্রস্তুতি আছে তা অরুণাংশু ট্রেনে দেখেছে। মনসামঙ্গলের কাহিনির খণ্ডচিত্র, মানুষ শহর থেকে মনসাপুজোর বাজার করে

ফিরছে তাদের হাতে ছিল পুজোর উপকরণ মনসামঙ্গল কাব্যের উপকরণের আদলে। উপন্যাসের কথক বিমলের সর্পমুগ্ধতা দেখে তার নিজের বাল্যকাল থেকে সাপ সম্পর্কে ঔৎসুক্যের কথা মনে করেছে। শঙ্খচূড়ের সঙ্গী লাভের লড়াই, ঢোঁড়া সাপের কামড় ইত্যাদি। সাপ এক ভয় ভক্তি উদ্রেককারী সম্মোহনী জীব। করন্ডির মেলায় সাপুরে ও তাদের স্ত্রীরা একযোগে বেহুলা-লখিন্দর বিষয়ে করুণ বৃত্তান্ত গেয়েছে, বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র, এবং বিভিন্ন ধরনের সাপ। অগ্নি, বরুণ, চন্দ্রের মতো বিষহরি প্রত্যক্ষ দেবতা নয় কিন্তু তার সহচররা এত প্রত্যক্ষ ফলে বিষহরিকেও প্রত্যক্ষ মানতে হয়েছে, যেভাবে লোককথার দেবতা অপদেবতা প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। এমনকি এই উৎসবে বিভিন্ন সাজে সাজা মেয়েদের স্বয়ং বিষহরি বা বেহুলাও মনে হয়। পাঁঠা বলি, হাঁস ও পায়রা বলি এমনকি হাঁসের দিম বলির মতো দৃশ্য দেখা যেত এই মেলায়। হাঁসের ডিম জ্যান্ত মনসা অর্থাৎ সাপকে গাল চিরে খাওয়ানো হয়েছে, সেই ডিম সাপ গিলেও নিয়েছে। সব মিলিয়ে মানুষের সঙ্গে সাপের সম্পর্কের একটা ভূমিকা, করন্ডির মানুষের জীবনযাত্রা, লৌকিক ধর্মচেতনা, অলৌকিক বোধ বিশ্বাস উঠে এসেছে এই উপন্যাসে। যেভাবে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) তাঁর *নাগিনী কন্যার কাহিনী* উপন্যাসে ব্যক্ত করেছেন, অভিজিৎ সেন তাঁর স্বার্থক উত্তরসূরী হিসাবে এই উপন্যাসেও পরিচয় দিয়েছেন। নিটোল কাহিনি শুধু নয়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *নাগিনী কন্যার কাহিনী*-কে ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের (১৮২০-১৮৯৫) *ডায়ালেকটিক্স অব নেচার* দিয়ে এবং কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল, করন্ডি গ্রামের মনসাপুজোর মেলা ও নানা উপচারকে কেন্দ্র করে লেখক সাপ ও মানুষের সম্পর্কের সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের কবিদের সর্পপ্রেমের কথা, মহাভারতের সর্প কাহিনি নিয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনাও করেছেন।

অভিজিৎ সেন এই উপন্যাসে শুধু একজন কথাকার নন সমালোচকের ভূমিকাও পালন করেছেন। দুই অধ্যাপক বন্ধুর দু-দিন করন্ডিবাসে সাহিত্য, তত্ত্ব ও লোককথা নিয়ে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা লেখককে একজন প্রাবন্ধিকের পরিচয় দিয়েছে। কবি কেতকাদাস ঘাস কাটছিলেন তখন তাঁর কাছে একটি সুন্দরী মেয়ে এসে কাপড় বিক্রি করতে চেয়েছে। কেতকাদাস মেয়েটিকে বায়েনদের মেয়ে ভেবেছিল, এরই মধ্যে মেয়েটি অদৃশ্য হয়ে গেল। অভিজিৎ সেন লিখেছেন—

> যাই হোক, এ-পর্যন্ত সবই রিয়েলিটি, ক্লাসিক্যাল রিয়েলিটি। ধ্রুপদি বাস্তবতা। অনেক কাল ধরে চর্চিত আধুনিক সাহিত্যের আখ্যান কথনের পদ্ধতি। কিন্তু মানুষের মেয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতেই আখ্যান যেন আর চেনা বাস্তবতায় সীমাবদ্ধ থাকল না।[৪৪]

এরপর কবি কেতকাদাস প্রত্যক্ষ দেবতাদের অস্তিত্ব টের পেয়েছেন। মুঠো করে ঘাস ধরে মনে হয়েছে এক গুচ্ছ নাগশিশু, এই প্রত্যক্ষ দেবতা হল সাপ। সাপের কামড়ানোর কারণ, সাপ কেন নিজের বাচ্ছা খেয়ে নেয়, সাপ কেন মানুষের থেকে উৎকৃষ্ট এসব ক্ষেমানন্দ ও তাঁর ভাই শিক্ষিত মায়ের কাছে শুনে আশ্চর্য হয়েছিলেন। মায়ের মুখে ঋষি সহস্রপাদের ডুন্ডুভের নির্বিষ সাপে পরিণত হওয়া, খগম ও রুরু প্রমদ্বরার কাহিনি শুনেছিলেন ক্ষেমানন্দ ও অভিরাম। অভিজিৎ সেন করন্ডির সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের ও মহাভারতের কাহিনির যোগসূত্র স্থাপন করেছেন এভাবেই। বিমল কোনো বেদের ছেলে ছিল না, বিমল সাপ খেলা দেখাত না তবে সাপ নাচাতে ভালোবাসত সাপুরেদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে। নতুন নতুন সাপে বিমলের প্রবল আগ্রহ, সেই আগ্রহে সাদা ও হালকা গোলাপী দুধনাগ গোখরো দেখতে সাপুরে ছবিলালকে জোড়া লুঙ্গি দিতেও রাজি হয়েছিল। নেশাগ্রস্থ ছবিলাল বুনো গোখরোটা বিমলের সামনে খুলে দিয়েছে, তাকে বাগে আনতে ব্যর্থ বিমল ছোবল খেয়েছিল। এই ঘটনার আগে করন্ডির মায়েরা নিশ্চিন্ত থাকত। সর্প দংশিত বিমলের পাশে মৈথিলী বসে কাঁদছিল, বিমলের মা রোল তুলে কেঁদে ‘মাগো বিষহরি, আমার লখাইকে রক্ষা করো মা—’ বলে রক্তমাখা থানে গিয়ে আছড়ে পড়েছিল। অরুণাংশুরা স্থানে পৌঁছে গেলে বিমল জিজ্ঞাসা করেছিল ‘স্যার, গোখরোর বিষে মানুষ কতক্ষণ পর্যন্ত বেঁচে থাকে?’ সাপ নিয়ে অনেকদিন ঘেঁটেছে বিমল কিন্তু একথা কোনোদিন জানার প্রয়োজন হয়নি, জানলেও বেশি গুরুত্ব দিয়ে জানেনি। কিন্তু সময়টা বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ, বিষহরির থানে কেউ বিমলকে আটকে রাখেনি হাসাপাতালেই নিয়ে গিয়েছিল। নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্র বারদুয়ারি থেকে চাঁচল হাসপাতাল কোথাও অ্যান্টিভেনিন পাওয়া যায়নি, শহরে যাওয়ার জন্য ট্রেনের অপেক্ষা করতে করতে বিমল স্টেশনেই মারা গিয়েছিল। স্টেশন মাস্টারের কাছ থেকে ফোন করে গ্রামে খবর জানাতে গেলে জানা যায় স্টেশন মাস্টার বিমলের পরিচিত, সেও জানত করন্ডিতে কেউ সাপের কামড়ে মরে না। এই আশ্চর্য বিশ্বাসের শেকড় মাটির অনেক গভীরে প্রবেশ করেছিল। এমনকি সেই বিশ্বাস মহিরুহ আকার ধারণ করেছিল কিন্তু বিমলের মৃত্যুতে এক নিমেষে শুকিয়ে গেছে।

বিমল মারা যাবার পর তার শবদেহ কলার মঞ্জুষে মহা সমারোহে নৌকায় ভাসিয়ে করন্ডির মানুষ ফুলহার নদী দিয়ে গঙ্গা হয়ে ফারাক্কা পর্যন্ত যাত্রা করেছিল সাহেবগঞ্জের পঞ্চশিমুলিতে ধন্বন্তরি ওঝার কাছে। করন্ডির মানুষের বিশ্বাস ছিল—

> করন্ডি গ্রামের আমরা অজ্ঞাতসারে কিংবা জ্ঞাতসারেই অপেক্ষা করতাম বিমল যেকোনো দিন ফিরে আসবে অথবা সকালে উঠে নদীর ঘাটে গিয়ে কেউ দেখবে যে, ঘাটের কোনো অস্থায়ী পইঠায় লখাই বসে আছে। অনিশ্চিত, উদ্‌ভ্রান্ত তার দৃষ্টি, কিন্তু সে-যে আমাদের বালা তাতে কারো কোনো সন্দেহ থাকবে না।[৪৫]

বিমল আজ যেন সত্যিকারের বালা, লখাই গাঙুরের জলে ভেসে চলেছে। 'অপূর্ব বিছানা করে মান্দাস উপর—/কত দূর পড়ি রইল চাঁপালি নগর, ওই না হরিবোল!' নৌকায় গায়কেরা গেয়ে চলেছে। সাঁতালি পাহাড়ের শালি বিশালি গাছড়া থেকে ধন্বন্তরি ওঝা গাছের পাতা ছেঁচে মরার ঠোঁটের নীচে দিলে বাসি মরাও বেঁচে উঠে জল চাইবে, এই বিশ্বাসও লালন করে রেখেছে করন্ডির মানুষ। মঙ্গলকাব্যের ধন্বন্তরি, আবার গন্ধমাদনের বিশল্যকরণীর অনুষঙ্গ অভিজিৎ সেন এনেছেন এখানে। নৌকায় গুণমান গেয়ে উঠেছে 'চান্দোর পুত্ররে ডংক চিয়াও চিয়াও—/বিবাদা চান্দোর পুত্রক্ চিয়াও চিয়াও—' সাঁতালি পাহাড়ে ধন্বন্তরিকে মারার জন্য তক্ষক জঙ্গলে লুকিয়ে ছিল। ছলনা করে ধন্বন্তরির শিষ্যদের কাছে থেকে শালি বিশালি নিয়ে নিয়েছে, অট্টহাস্য করে পদ্মা সেদিন চাঁদকে ক্ষমতা বুঝিয়ে দিয়েছিল। এবার কি করে বাঁচাবে লখাইকে। তবুও বিমলের মঞ্জুস ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে নৌকা থেকে তুলে, 'যারে লখাই প্রাণ নিয়ে আবার ফিরে আসিস' স্রোতে মঞ্জুস বেগে চলতে থাকে। লখাইয়ের জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে সবাই।

মৈথিলী ছিন্ন খঞ্জনার মতো নাচেনি, আশাহত বেদনাকাতর হয়েছে, তার প্রিয় মানুষের বিচ্ছেদে। মনসার ভাসানের মধ্যে নদী পাড়ের এক নৈসর্গিক পরিমণ্ডলে বন্দি হয়ে গিয়ে 'জলে ভাসিল রে ও মোর নয়নের তারা' শুনতে শুনতে মনে হয়েছে জগতের সব হতাশা, দুঃখ, কষ্ট, কান্না, ব্যথা থেকে মুক্তি পেতেই এই প্রার্থনাসভার আয়োজন। তাই সেও বলে উঠেছিল 'জিয়াও জিয়াও, সাধু তুমি ওকে জিয়াও!' সাধু মঞ্জুসে ঝুঁকে পড়ে জিয়ানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে, এসব দেখেছিল মৈথিলী। ধর্ম ও আধিপত্যের লড়াই ছিল থাকবেও। অভিজিৎ সেনের সাপে মুগ্ধতা অন্য উপন্যাসে বিন্দু বিন্দু প্রকাশ হয়েছে কিন্তু এই উপন্যাসে তাকে পূর্ণতা দিয়েছেন আর লৌকিক কাহিনি, মঙ্গলকাব্য দিয়ে করন্ডির কাহিনিতে ধর্ম ও সংস্কৃতির স্বরূপ বুঝতে চেয়েছেন।

৮। *দিদারগঞ্জের যক্ষী*

ঐতিহাসিক ঐতিহ্যপূর্ণ সম্পদকে আশ্রয় করে লেখা উপন্যাস অভিজিৎ সেনের *দিদারগঞ্জের যক্ষী* (২০১৫)। দেশের প্রাচীন অমূল্য সম্পদ চোরাকারবারিদের হাত থেকে উদ্ধারের অভিযান। স্মৃতি, মুদ্রা, মূর্তি, প্রাচীন পুথি দেশের যা কিছু মূল্যবান ঐতিহ্যপূর্ণ সম্পদ, যা গবেষক ও জ্ঞান পিপাসুদের কাজে আসত। সংগ্রহশালায় থাকার বদলে সেসব চুরি হয়ে বিদেশে পাচার হয়ে যেত। এসব চুরি হবার নানাবিধ কারণ ছিল, এসবের মূল্য বুঝে অথবা দাম বুঝে চুরি হত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল ফেরানো যায়নি কিন্তু নোবেল চুরির হদিশ করতে গিয়ে গোয়েন্দাদের নজরে এসেছে অনেক মূল্যবান জিনিস, যা দেশ থেকে উধাও হয়েছিল। এই উপন্যাস মহা মূল্যবান সম্পদ চোরাকারবারিদের হাত থেকে উদ্ধারের দুঃসাহসিক সফল অভিযানের কাহিনি।

অধ্যাপক বিকাশ দাশগুপ্ত কলকাতা জাতীয় সংগ্রহশালায় চাকরির পর অবসর নিয়েছে। এই জাতীয় সংগ্রহশালাটি মূল্যবান পুরাতাত্ত্বিক দ্রব্যসমূহে ঋদ্ধ। বিকাশও এই পুরাতাত্ত্বিক দ্রব্য সম্পর্কে জ্ঞানে ঋদ্ধ। তার পাণ্ডিত্য দিয়ে সে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কোনো নিদর্শন দেখেই বলে দিতে পারত সেটি আসল না নকল। অবসর যাপনে সে ওয়ার্কসপ, সেমিনারে লেকচার এবং বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াত এসবের মধ্য দিয়ে দিব্য ছিল। কিন্তু এর মধ্যেই একটি গুরুদায়িত্ব এসে উপস্থিত হয়েছে, সি.বি.আই অফিসার প্রকাশ শ্রীবাস্তব ও অরবিন্দ তাদের পুলিশি তদন্তে বিকাশকে সংযুক্ত করতে চেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল চুরির কোনো কিনারা সি.বি.আই ও রাজ্য পুলিশ করতে পারেনি, সন্দেহের বশে যে লোকটিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল জামিনের পর সেও খুন হয়েছে। এমন চুরির ঘটনা পৃথিবীতে ঘটেই থাকে, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড খ্যাত গোয়েন্দারাও এমন চুরির কিনারা করতে পারেনি অনেক সময়। তবে তদন্তের ফলে অন্যান্য কিছু চুরি যাওয়া মূল্যবান জিনিসের হালহদিশ কোনো কোনো সময় উঠে এসেছে। যেভাবে নোবেল চুরির তদন্তের ক্ষেত্রে গোয়ান্দাদের কাছে এসেছিল। তাই গোয়েন্দারা বিকাশের সাহায্য নিতে চেয়েছে। গোয়ান্দারা জানিয়েছে—

> বারো-চোদ্দখানা ছবি। বেশিরভাগই ভারতীয় আধুনিক চিত্রকলার শিল্পীদের আঁকা। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পাঁচ-ছ'খানা, গগনেন্দ্রনাথের দু'খানা, গণেশ পাইনের তিনখানা...[৪৬]

এমন আরও কিছু মূল্যবান ছবি ও পাল সেন যুগের কয়েকখানা মূর্তির সন্ধান কেন্দ্রীয় গোয়ান্দারা পেয়েছে। এছাড়াও একখানা প্রাচীন বৌদ্ধ পুথি, যার দাম কুড়ি কোটি টাকা। এই পুথি লাদাখের কোনো এক তিব্বতী লামার কাছে ছিল। সেই লামা এত টাকা কী করবে এটাই সি.বি.আই-এর কাছে সন্দেহের। সেই পুথি সনাক্তকরণের জন্য এবং নাটকীয়ভাবে পাচারকারীদের ধরতে বিকাশের সাহায্য দরকার ছিল। এছাড়াও আরো একটা প্রাচীন বোদ্ধ ভাস্কর্য ছিল, দু-হাজার বছরের পুরোনো যক্ষিণী মূর্তি। যেটি অফিসার অরবিন্দ দেখে এসেছে দালাল সেজে। অধ্যাপক ও তার বিদুষী মেয়েকে নিয়ে গোয়ান্দা বিভাগের অফিসাররা প্রত্নতত্ত্বের স্বর্গরাজ্য বিহারের উদ্দেশ্যে বেড়িয়েছিল।

অরবিন্দের দেখে আসা যক্ষিণী সম্পর্কে আলোচনায় মূর্তিটি কোন যুগের হতে পারে, কী জাতীয় মূর্তি, হিউয়েন সাং, হর্ষবর্ধন, পাল যুগ ইত্যাদি বিষয় উঠে এসেছে। যেমন যক্ষ-যক্ষিণী সম্পর্কে অধ্যাপক কন্যা সুজাতা বলেছে—

> যক্ষ-যক্ষিণী সম্ভবত অনার্যদের হাত ধরেই আর্যধর্মীয় বৃত্তে স্থান পেয়েছিল। এবং পরবর্তীকালে হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ, এই তিন ধর্মমতের সঙ্গেই নানাভাবে যক্ষ ও যক্ষিণীরা জড়িয়ে যায়।[৪৭]

অধ্যাপক যক্ষ-যক্ষিণীর উৎপত্তি, তন্ত্র মতে যক্ষিণীদের নাম, কীভাবে তারা দেবীত্বে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের যক্ষিণীদের তফাৎ, তাদের সম্পর্কে মানুষের ধারণা যক্ষিণীর সঙ্গে তার প্রেম ও তার রূপ ইত্যাদি সম্পর্কে বলেছে। নকল জিনিস আসল বলে ব্যাবসা যেমন হত তার সঙ্গে অনেক চোরা কারবারি এই জাতীয় জিনিস সংগ্রহ করে বিদেশেও পাচার করত বে-আইনিভাবে। এমনই পাচারকারীর সন্ধানে বিহার যাত্রাকালে নাটকীয় ভাবেই সুজাতা ও অরবিন্দের মধ্যে একটা প্রেমের অনুভূতি জাগ্রত হয়েছে।

পাটনা মিউজিয়ামের এক যক্ষিণীর প্রেমে পড়েছিল বিকাশ, চল্লিশ বছর বয়সে একটি সেমিনারে এসে দেখেছিল সেই যক্ষিণীকে, তারপর বার বার ছুটে এসেছে। যক্ষিণীর রূপ, পোশাক, অলংকার মুগ্ধ করেছিল বিকাশকে। ভারতীয় ভাস্কর্যের দু-আড়াই হাজার বছর আগের শিল্পীরা অসম্ভব দক্ষতায় তৈরি করেছিলেন সেই যক্ষিণী। পাটনা থাকাকালে প্রতিদিন ঘন্টার পর ঘন্টা যক্ষিণীর কাছে এসে বসেছে অধ্যাপক। পাটনার সেই দিনগুলির স্মৃতি তার স্বপ্নের মধ্যে ভেসে উঠেছে আর ভেসে উঠেছে গিরিশ পাণ্ডে নামের এক যুবকের মুখছবি, একটু আগেই যাকে সে ট্রেনের টয়লেটে দেখেছে। সেই গিরিশ পাণ্ডে ও তার সাগরেদ ছবিলাল কুর্কিহার থেকে রাজগীরের গ্রামে-গঞ্জে, বিক্রমশীলা থেকে নালন্দা পর্যন্ত মাটির

উপরের ও নীচের মৌর্য, গুপ্ত ও পাল রাজাদের অমূল্য নিদর্শনের বেসাতি করে নিজেদের শ্রীবৃদ্ধি করেছে। এমনকি নকল জিনিস বিক্রি করে উপার্জনও করত। পাটনার সেমিনারে গিরিশ অনেকগুলো অমূল্য মূর্তি বিদেশিদের কাছে বিক্রির জন্য অধ্যাপককে ঘুস দিতে চেয়েছিল যাতে শুধু ক্রেতাদের কাছে সে বলে দেয় জিনিসগুলো আসল। গিরিশ বলেছিল 'গয়া, পাটনা এমনকি আপনাদের কলকাতাতেও এসব কারবার চলে।' অধ্যাপক রাজি না হলে গিরিশ তাকে বন্দুক তাক করেছিল যাতে অধ্যাপক পুলিশে খবর না দেয়। বিদেশ থেকে আসা অধ্যাপকরা এইসব জিনিস গিরিশের কাছ থেকে কিনতে চেয়েছিল। দেশ থেকে এভাবেও পাচার হত মূল্যবান সম্পদ। কুখ্যাত গিরিশ পাণ্ডেকে ধরতেই এই অভিযান। বহুমূল্যবান পুথিটি লাদাখে নয় নেপালেই ছিল গিরিশের হাভেলিতে। অধ্যাপক এই পরিকল্পনায় সামিল হয়েছিল কারণ টাকার যেমন দরকার ছিল আর—

> দেশ থেকে এই সব অমূল্য জিনিস বিদেশে পাচার হওয়া রুখতে আমি সারাজীবনে অনেকবার সাহসের সঙ্গে এগিয়ে গিয়েছি। এ অন্যায়, এ কাজ পাপের।[৪৮]

পুলিশের অপারেশনের স্বার্থে সাজানো দৃশ্যে ক্রেতা ও দালাল শনাক্তকারীর ভূমিকায় গিরিশ পাণ্ডেকে ধরতে চলেছে, একটা গভীর দায়িত্ববোধ থেকেই অধ্যাপক বিকাশ ও তার কন্যা সুজাতা এই অভিযানে সামিল হয়েছে।

গিরিশ পাণ্ডে মূল্যবান ঐতিহ্যবাহী সম্পদ নিয়ে ব্যাবসা বেশ সাজিয়ে নিয়েছিল। তার গোপন হাভেলির সুসজ্জিত ঘরে পঞ্চাশ-ষাট খানা ব্রোঞ্জের নানা মাপের বৌদ্ধ, হিন্দু, জৈন মূর্তি। অধ্যাপকের প্রেমিকা যক্ষিণীকে গিরিশ বিক্রি করে দিয়েছে। আজ সে প্রজ্ঞাপারমিতা পুথি বিক্রি করতে চেষ্টা করেছে ক্রেতারূপী পুলিশদের। অধ্যাপক সেই মহামূল্যবান পুথি নিখুঁতভাবে দেখে ভাবস্থ হয়েছিল, আবেগে পুথিতে মাথা ঠেকিয়ে রেখেছিল কিছুক্ষণ। তারপর নিজের পরিচয় দিয়ে গিরিশকে জানিয়েছে—

> দেশের এই অমূল্য জিনিস দেশেই থাকা উচিত। তুমি সারাজীবন ধরে এই পাচারের কাজ করছ, আর নয়। এবার বিশ্রাম নাও।[৪৯]

নাটকীয় ভাবে সিনেমার দৃশ্যের মতো এই দলটি ধরা পড়েছে। সাড়া পৃথিবী জুড়ে এমন অনেক গিরিশ পাণ্ডে আছে যারা দেশের সম্পদ এভাবে পাচার করে চলেছে তাদের কাছে মূল্যের থেকে দাম জরুরি। অভিজিৎ সেন নোবেল উদ্ধারের ব্যর্থতা দিয়ে এই উপন্যাসের শুরু করে আর এক মূল্যবান জিনিস উদ্ধারের সফল অভিযান চিত্রিত করেছেন।

৯। *কার পদধ্বনি আসে? কার?*

অভিজিৎ সেন তাঁর গল্প উপন্যাসে নারীকে যেমন প্রেমে, বিদ্রোহে, জীবনসংগ্রামে, অসহায়ত্বে আলাদা স্থান দিয়েছেন তেমনই সমগ্র ব্যক্তিত্বে নারী যে আলাদা মর্যাদা পেতে পারে সেটাও তিনি দেখিয়েছেন। যেমনভাবে অলকানন্দা, মায়নোমতি, বিদ্যাধরী, কাঞ্চনমালা, শিরিন এইসব নারীকে চিহ্নিত করেছেন ঠিক তেমনভাবেই *কার পদধ্বনি আসে? কার?* (২০১৫) উপন্যাসের অলকাকে অভিজিৎ সেন নির্মাণ করেছেন স্বতন্ত্ররূপে। *এই সময়* পুজো সংখ্যায় প্রকাশিত এই ছোটো উপন্যাসের একমাত্র কেন্দ্রীয় চরিত্র বি.ডি.ও অফিসের কর্মী অলকা এবং ওই অফিসের অফিসের কিছু নীতি ও দুর্নীতিপরায়ণ মানুষ। সরকারি অফিসের দুর্নীতি আজকের নয়, তবে তারও নব নব পদ্ধতি রপ্ত করেছে মানুষ। মানুষের দ্রুত উন্নতির যেসব পদ্ধতি তৈরি হয়েছে তাতে এসে মিশেছে রাজনীতি, স্বজন-পোষণ ক্ষমতা প্রদর্শন। যার যত ক্ষমতা সে তত লুটে নিতে পেরেছে। সরকারি অফিসাররা যদি ক্ষমতার সঙ্গে মিশে যেতে পারে তো তার অর্থ ও পদোন্নতি আটকায়নি কিন্তু সৎ থাকতে গেলেই বিপদে পড়তে হত। অলকা অর্থ ও পদন্নোতির জন্য ক্ষমতার সঙ্গে মিশে যেতে পারেনি, যতদিন কর্মস্থলে ছিল নিজের সততাকে বজায় রেখেছে। কালি মাখেনি সে, তাকে কালি মাখাতেও কেউ সাহস পায়নি। কিন্তু পরিবেশ দেখে যখনই বুঝতে পেরেছে এভাবে বেশিদিন থাকা সম্ভব নয় তখন সে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে চাকরি থেকে স্বেচ্ছা অবসর নিয়ে। অলকা সেইরকম মহিলা যার কাছে ঠকবার সম্ভাবনা নেই আবার তাকে ঠকাতেও সাহস হয় না। যার ব্যক্তিত্বের আভায় তার প্রতি শ্রদ্ধা এমনিই বেরিয়ে আসে। লেখকের কথায় 'চেহারায় একটা সম্ভ্রম জাগানো তর্জনীও যেন সদা জাগ্রত' যার উপর নির্ভর করা যায়। কিন্তু এভাবেও নির্ঝঞ্ঝাট থাকতে পারেনি সে, ক্ষমতা তাকে দেখিয়ে দিয়েছে বিপক্ষ এবং নিরপেক্ষকে কীভাবে শাসন করতে হয়। অভিজিৎ সেন যেভাবে অলকার জীবনের অনেকটা অংশকে উপন্যাসে এনেছেন তাতে মনে হয়েছে, যেন খুব কাছ থেকে এই মহিলার প্রতিটা উপলব্ধি, সফলতা ও হতাশার প্রতি ক্ষণ দেখেছেন।

সংসার ও কর্মক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতা রেখে চলতে থাকা অলকা সম্মান থাকতে থাকতে কাজ থেকে অবসর নিয়েছিল। কর্মক্ষেত্রে নৈতিকতার সঙ্গে আব্রু ধরে রাখাটাও একটা চ্যালেঞ্জ অলকার মতো সুন্দরী নারীদের ক্ষেত্রে। অলকা খুব সচেতনভাবেই নিজেকে এসব থেকে অনেক দূরে রেখেছিল। কিন্তু সৎ মানুষের দুর্দশার পর্ব অনেকটাই বড়ো,

অলকাকেও দুর্দশা অব্যাহতি দেয়নি। চাকরি ছাড়ার পরেও তাকে আইনের জালে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। অবসরের কারণ হিসাবে অলকা শারীরিক অসুস্থতা ও বাড়িতে প্রতিবন্ধী সন্তানের দেখাশোনার কথা বলেছিল। কিন্তু অফিসের অন্দরে কাজকর্মে যেভাবে ঘুণ ধরতে শুরু করেছে তাতে অলকা নিজেকে নিরাপদ দেখেনি তাই সরে পড়েছিল। অভিজিৎ সেন তাঁর *অন্ধকারের নদী* উপন্যাসেও দেখিয়েছেন কীভাবে ব্লকের অফিসের নোনা আর ঘুণ দেওয়ালে আটকানো মহাত্মা গান্ধির ছবিকে নষ্ট করেছিল, এ চিত্র আসলে ন্যায় নীতিতে ঘুণ ধরার ইঙ্গিত। *কার পদধ্বনি আসে? কার?* উপন্যাসেও দেখিয়েছেন আই.পি.এস ও আই.এ.এস অফিসাররা অন্যায় সুবিধায় লোন নিয়ে গরু ও মোষ কেনে। অনৈতিকতার এই চিত্র চলমান, অলকা এসব নিজে চোখে দেখেছিল। ঠিকাদাররা অফিসের কোনো নিয়ম মানত না, এদের চেক রেডি করতে অসৎ অফিসার সাহায্য করত। যেসব যন্ত্রপাতি কেনা বা কাজের টাকা বরাদ্দ হত সরকারিভাবে, সেসব যন্ত্রপাতি এবং কাজ কিছুই দেখা না গেলেও বরাদ্দ টাকা ঠিকাদাররা পেয়ে যেত। অলকা প্রতিবাদ করেছে, ঊর্ধ্বতনের চাপ সত্ত্বেও অন্যায়ভাবে চেক রেডি করে দেয়নি। চাকরি ছাড়ার পর অলকা পেনশনের চেক আনতে এসে দেখেছে কিছু ঊর্দ্ধতন অফিসার ও ঠিকাদারদের দৌরাত্ম আজও অফিসে অব্যাহত। অলকা এটাও দেখেছে এই ক্ষমতার আবহে যারা আসত তারা খুব সহজেই নিজেকে সেই ছাঁচে তৈরি করে নিত। পেনশনের চেক নিতে এসে ঘুস দিতে হয়েছে কমলকে, ‘অলকাদির টাকার অভাব নেই’ এমন একটা খোঁচাও দিয়েছে কমল। আসলে অলকা নাকি বড়ো অঙ্কের টাকা ঘুস নিয়ে চাকরি ছেড়েছে, এমন একটা দুর্নাম রটেছিল। ছোটোবেলায় অলকা বাবা-মাকে হারিয়ে নানান অব্যবস্থার মধ্যে মানুষ হতে গিয়ে একরকম দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠেছিল। যা তার কম বয়সে চাকরিতে নানান অসভ্য পুরুষ মানুষকে ঠেকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছে। অলকা সম্পর্কে তার সহকর্মীরা ভাবত—

> অলকা রায়ের গুণ ছিল অত্যন্ত সজাগ পঞ্চেন্দ্রিয়, অত্যন্ত সজাগ উচিত-অনুচিত বোধ, অত্যন্ত স্বাভাবিক সততা, তা যেন তার জিনগত ত্রুটিই, ...[৫০]

দোষের মধ্যে ছিল খরজিভ এবং চোর ঘুসখোরসহ সকল সহকর্মীদের প্রতি প্রীতি। তার এই দোষ গুণ দিয়ে কর্মক্ষেত্রে সে গুরুত্ব বাড়িয়েছিল। বাইশ বছরের আজন্ম অসুস্থ সন্তানের কষ্টভোগের ভাগীদার তার স্বামী ভাস্কর ও সে নিজে। তাদের মৃত্যুর পর সন্তানের পরিণতি

নিয়ে সদা চিন্তিত অলকা। তারপরেও জীবনকে নির্দিষ্ট নিয়ম নীতির সীমায় বেঁধে রাখা সহজ ছিল না একজন নারীর পক্ষে।

অলকাকে অভিজিৎ সেন তৈরি করেছেন আদর্শরূপে, কর্মক্ষেত্রে বিচারবোধ, সাধারণ কর্তব্যবোধ, ন্যায়নীতির পরাকাষ্ঠা রূপে। তারপরেও তার নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন। অলকা সংসার করতে ভালোবাসত, অল্প বয়সে চাকরি পেয়ে সংসার করা হয়ে ওঠেনি তার, সে চেয়েছিল—

> চাকরি ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি সংসারী হব। নিজের বাড়ি বানাব, বাগান করব, গাছ লাগাব, সাজিয়ে গুছিয়ে সংসার করব... [৫১]

আর আজন্ম রুগ্ন ছেলেটির সেবা করতে চেয়েছে। সাধারণ এমন কয়েকটি স্বপ্ন নিয়ে বাঁচতে চেয়েছে। এসব সে করেছিল, তিল তিল করে একটি বাড়িও বানিয়েছিল। মানুষের বাড়ির যে অনেক প্রয়োজন তা অলকার সঙ্গে তার স্বামীও বুঝেছিল। দেশভাগের পর তারা দুজনেই পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে এদেশে চলে এসেছিল, তখন বাড়ি নয়, মাথা গোঁজার মতো একটা আশ্রয়ের প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। সেই সময়ে এক জায়গা থেকে শেকড় সমেত উপড়ে আর এক জায়গায় প্রোথিত করে স্বাধীনভাবে আকাশে মাথা তোলা কত কঠিন তা উপলব্ধি করেছে এই দম্পতি। এমনকি কর্মসূত্রে অলকা পিঠের বোঝা নামিয়ে নামিয়ে প্রায় সাত আটটি বাড়ি বদলে মালদা শহরে ভাড়া থাকার পর স্বামীকে বলেছিল ‘ভাস্কর, এক টুকরো জমি কিনব।’ জীবনের অনেকগুলো বছর কলকাতার এঁদো গলি, গোবরা, বেলেঘাটা, ঢাকুরিয়ার বস্তি, খোলার ঘরে কেটে গেলেও আধুনিক জীবনযাপনে শখ ছিল। ফলে তার জমি কেনার সংকল্পকে দমিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি, ভাস্কর তাকে খুব জোর দিয়ে বাধা দিতেও চায়নি কারণ সে জানত অলকা ‘মহিলা কর্মবীর।’ একক পরিকল্পনা মতো গয়না, পোষ্ট অফিসের সঞ্চয় ও ঋণসহ সব মিলিয়ে বাড়ি তৈরি করেছিল অলকা। বাড়ির পিছন দিকে বেগুন, ঢেঁড়স, লঙ্কা, কলা ও পেপের চারা লাগিয়েছে তাতে শীতে ফল ধরেছে। ফলের রঙ যত সবুজ হয়েছে অলকার কৃতজ্ঞতা তত বেড়েছিল এই মাটির প্রতি। এই উৎফুল্লতা থেকে বাড়িতে এল ফুল ও পাতাবাহারের গাছ। তার ঝোপে বুলবুলি পাখি বাসা বেঁধে সংসার বাড়িয়েছে, অলকা ও বুলবুলির সংসারে মাধুর্য উপচে পড়েছিল। বাড়িকে একতলা থেকে ক্রমে দোতলা করলেও কিন্তু কোনো অসৎ রোজগার করার সুযোগ রাখেনি অলকা। ঘরে চির রুগ্ন সন্তান এবং নিজের বুকের মারণ রোগ হাইপারট্রেফিক মায়োপ্যাথি যা থেকে সেরে

ওঠার উপায় নেই, এসব নিয়ে অলকা কলকাতা ফিরে যেতে চেয়েছে, মূলত তার চিকিৎসার কারণে। তিল তিল করে গড়ে তোলা বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে এখান থেকে মুক্তি চেয়েছিল কিন্তু মুক্তি সে সহজে পায়নি। অলকা চাকরি ছাড়ার আগে থেকে ডেভলপমেন্ট অফিসে টাকা তছরুপের ব্যাপার গুলিয়ে উঠেছিল। আই.এ.এস যশোদানন্দনের তত্ত্বাবধানে বিল পেমেন্ট হলেও টেন্ডার ওয়ার্ক অর্ডার ছিল না, মেশিন কেনা হলেও তার হদিশ ছিল না, বিরাট অঙ্কের টাকা ক্যাশে পেমেন্ট হয়েছে, লোকে বলত যশোদানন্দন নিজে চার কোটি কামাই করেছে। ইংরেজ আমলের আই.পি.এস, আই.সি.এস-এর মতো সুবিধা ভোগ করে ক্ষমতার বলে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছিল যশোদানন্দন, এসব নিউজ চ্যানেলে প্রচার হয়েছে। অ্যাসেম্বলিতে বিরোধীরা প্রমাণসহ এসব নিয়ে প্রশ্ন তুললে বিরাট গোলযোগ হয়ে আইনি তদন্তের আওতায় এসে পড়েছিল। সেই অফিসের পুরোনো কর্মী হবার সুবাদে অলকাও জিজ্ঞাসাবাদের তালিকায় ছিল। অলকার নিজে হাতে তৈরি বাড়ি ছাড়ার বেদনা, সন্তানের জন্য পুরোনো দুশ্চিন্তা, শারিরীক অসুস্থতা তার সঙ্গে জীবনে প্রথমবার পুলিশি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়া সব মিলিয়ে তাকে ভীত ও বিষণ্ন করে ফেলেছে। অলকার শিক্ষা কম হলেও জীবনের শুরু থেকে স্বনির্ভরতা তাকে বুদ্ধিমান ও সচেতন করে তুলেছিল, তাই কর্মজীবনে উঁচুতলার অফিসাররা যে ভগবানের সমান এই বোধ তার ছিল। দুর্নীতিতে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা না থাকলেও অফিসের স্টাফ হবার কারণে একটা দায় থেকেই যায়। অলকা অফিসের পেমেন্টের রেকর্ড প্রমাণ হিসাবে জেরক্স ও নিজের ডায়েরিতে লিখেও রাখত। এমনকি নিজের বাড়ির ঋণের সমস্ত রসিদ গুছিয়ে রেখেছিল। অলকার বাড়ি তৈরিতে অফিসের মাল ব্যবহার করা হয়েছে এই অভিযোগে অলকা পুলিশকে সেসব দেখাতে চেয়েছিল, কিন্তু পুলিশ শুধু অফিসের কাগজ নিয়েছে বেছে বেছে।

তছরুপ ও জালিয়াতির অভিযোগে আই.এ.এস যশোদানন্দন গ্রেফতার হয়েছিল। ফলে রাজনীতি তার দাঁত নখ বের করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, শুরু হয়েছিল ক্ষমতা প্রদর্শন। যশোদানন্দনকে ছেড়ে দেবার আদেশ হয়েছে, অলকার বাড়ির পাশে বোমা পড়েছে, তিল তিল করে গড়ে তোলা অলকার বাড়ি ভাঙচুর হয়েছে। ন্যায়-নীতি, আইন, পুলিশ তাকে রক্ষা করতে পারেনি। এমনকি অলকাকেও পুলিশের হাতে গ্রেফতার হতে হয়েছে। অভিজিৎ সেন বারে বারে দেখিয়েছেন ন্যায়-নীতির আধার আদর্শবান মানুষের কপালে একটু বেশিই দুর্ভোগ থাকে।

১০। *পাপীতাপী ও যোগিনী*

দুনিয়াতে চিরকাল কিছু মানুষ নিজেদের পাপী তাপী মনে করেছে আর সেই পাপ তাপ থেকে মুক্তি পেতে যোগী যোগিনীদের কাছে ছুটে গেছে। পাপবোধে জর্জরিত হয়ে মুক্তির জন্য কোনো গ্রামীণ দেবাংশী, দেয়াশিনীর দ্বারে হত্যা দিয়েছে। অনেক সময় অবাক হতে হয়েছে, দেবাংশী দেয়াশিনীর কাছ থেকে সুফল পেয়ে অনেক মানুষ তাদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করেছে। অভিজিৎ সেন *জনপদপ্রয়াস* পত্রিকার নেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন 'নিষ্ঠুর পৃথিবীর হাত থেকে সাময়িক রেহাই পাওয়ার চেষ্টায় লাঞ্ছিত নিপীড়িত মানুষের কাঁদার জায়গা হিসাবে এসব থাকবে।' অভিজিৎ সেনের গল্প উপন্যাসের পটভূমি গ্রাম, ফলে সেই গ্রামীণ মানুষের সংস্কৃতিকে ধরতে গিয়ে লোকবিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে কিভাবে মানুষ মুক্তি খোঁজে তাও দেখিয়েছেন। তবে শুধু গ্রামীণ মানুষ নয়, শহরের শিক্ষিত মানুষও যে মুক্তি, প্রাপ্তি, শান্তি ইত্যাদির জন্য দেবাংশী, দেয়াশিনী বা এমন অলৌকিক ক্ষমতাধারী মানুষের কাছে ছুটেছে। কোমরে, বাজুতে, তাবিজ-মাদুলি ঝুলিয়েছে, মন্ত্রপূত জল ও তেলে বিশ্বাস রেখেছে। অভিজিৎ সেন *পাপীতাপী ও যোগিনী* (২০২০) উপন্যাসে তেমনই শিক্ষিত কিছু মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের কৃতকর্মে পাপবোধ ও তা থেকে মুক্তির কাহিনি বিবৃত করেছেন।

পাপীতাপী ও যোগিনী উপন্যাসের আখ্যান কয়েকজন ব্যাংককর্মী ও দেয়াশিনী লক্ষ্মীতারাকে নিয়ে রচিত হয়েছে। এই লক্ষ্মীতারার পরিচয় অভিজিৎ সেন আগে একবার দিয়েছিলেন *নিম্নগতির নদী* উপন্যাসে। গঙ্গা নদীর নিম্ন অববাহিকায় অনেকগুলি দ্বীপের মধ্যে মোহনপুরা দ্বীপে লক্ষ্মীতারা থাকত, বংশপরম্পরায় তারা দেয়াশিনী হত। মানুষ এদের কাছে যেত বিচ্ছেদ ও মৃত্যুজনিত দুঃখ কষ্ট শোক ভুলতে, অনুশোচনা ও কৃতকর্মের স্মৃতি ভুলতে। লক্ষ্মীতারা নিমের ছড়ি দিয়ে উদলা পিঠে তিনবার আঘাত করে বলত 'ভুল যাও', 'ভুল যাও' ব্যাস মানুষ পুরোনো দুঃখ কষ্ট ভুলে যেত। মা ভোলেয়া নামে পরিচিত লক্ষ্মীতারা হতভাগ্য মানুষের স্মৃতির উপর পর্দার আচ্ছাদন ফেলে দিত। *পাপীতাপী ও যোগিনী* উপন্যাসের ভবতোষ মনের মধ্যে এক অজানা ভয় অথবা পাপবোধে দীর্ঘকালীন অবসাদে বিপন্ন হয়ে ছিল, সেই অবসাদ থেকে মুক্তি পেতে ভবতোষ 'সতেরোতলার ওপরের ছাদ থেকে নীচে লাফিয়ে পড়তে চায়। চলন্ত ট্রাকের চাকা, ফ্যানের ব্লেড, নাইলনের দড়ি তাকে 'আয় আয়' বলে ডাকে।' ভবতোষের মধ্যে অনেকে শয়তানকে দেখতে পেয়েছিল, তার স্ত্রী রেণুকারও

মনে হয়েছিল কোনোদিন তাকেই খুন না করে ফেলে ভবতোষ। ব্যাংক অফিসার ভবতোষ ছিল নেশাগ্রস্থ খামখেয়ালি, মাঝে মাঝে উধাও হয়ে যেত, পরে তাকে নেশার আসর থেকে উদ্ধার করা হত। এমনকি ব্যাংকের লকারের চাবি নিয়েও তিন চারদিন বেপাত্তা থাকত। অথচ পড়াশোনায় অত্যন্ত ভালো ছিল, স্কুলে ভালো রেজাল্ট করে কলকাতার কলেজে পড়তে এসেছিল, কবিতা লিখতে পারত, ফলে বন্ধু, প্রেমিকা, প্রশংসা সবই জুটেছিল। আর সমস্ত বদ অভ্যাসের চর্চা এখান থেকেই রপ্ত করেছে, যা কর্মজীবনে তীব্রতা পেয়েছিল। যদিও ভবতোষের এই অবস্থা সম্পর্কে সায়েন্স বলেছে সে স্কিৎজোফ্রেনিয়া রোগে আক্রান্ত। ভবতোষের এই পরিস্থিতি সবথেকে বেশি বিব্রত করেছে তার স্ত্রী রেণুকাকে, ফলে রেণুকা লক্ষ্মীতারার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে। কারণ 'লক্ষ্মীতারা দেবীর মহিমা ব্যাংকের কলকাতা প্রধান অফিস পর্যন্ত' ছড়িয়ে পড়েছিল। মোহনপুরা শাখার ক্যাশিয়ার কাম ক্লার্ক বিনয় বলেছে—

> সাক্ষাৎ মা ভগবতী, তাই না নাম ভোলেয়া! একবার যদি আপনার মাথার ওপর হাতখানা রাখেন, দুখ-কষ্ট সব ভুলে যাবেন। এই যে দ্যাখেন আমি ল্যাংড়া— খোঁড়া মানুষ, সারাজীবন আক্ষেপ নিয়ে বেঁচে ছিলাম, মা ভোলেয়ার কৃপাতেই না বেঁচে থাকার একটা মানে খুঁজে পেলাম।[৫২]

মানুষ শারীরিক মানসিক প্রতিবন্ধকতা থেকে নিস্তার পেতে ভোলেয়া মায়ের কৃপা চেয়েছে। অভিজিৎ সেন লিখেছেন 'অলৌকিকের গন্ধ পেলে অধিকাংশ মানুষই উত্তেজিত হয়। যার যত অভাব, অপ্রাপ্তি সবই যেন পূরণ হবার একটা উপায় হাতের সামনে এসে উপস্থিত।' ফলে বিনয়, বিনায়ক এদের মতো শিক্ষিত আর্থিকভাবে স্বচ্ছল মানুষ শহর থেকে ভোলেয়া মায়ের কাছে ছুটে এসেছে। ভোলেয়া মা লক্ষ্মীতারার ব্যক্তিত্বে ছিল অদ্ভুত এক মোহিনীশক্তি, আলো-আঁধারি ঘরে লাল কাপড়ে আর সিঁদুরে জড়ানো বিগ্রহ, সেটা দেবী না দেবতা বোঝার উপায় ছিল না। মূর্তির পাশে লক্ষ্মীতারা বসে থাকে, তার ঘন মোটা দীর্ঘ চোখে কাজলের প্রলেপ, টান করে কেশবিন্যাস, লম্বা খোঁপা, উজ্জ্বল মুখের রঙ, মুখমণ্ডল বাহু কণ্ঠ তেল চকচকে মসৃণ, চওড়া কপালে মেটে সিঁদুরের বড়ো গোল ফোটা 'যেন গঙ্গার চরে সদ্য উঠে চাঁদ খানিক বিশ্রাম নিচ্ছে।' সবমিলিয়ে প্রাচীন যক্ষীমূর্তির মতো লক্ষ্মীতারা। তাকে দেখে প্রার্থীদের একটা ভয়ভক্তি বোধ জাগে বিনায়কেরও তাই হয়েছে। বিনয়ও বিশ্বাস করত লক্ষ্মীতারা তাকে সন্তান দিয়েছে, আশ্রয় দিয়েছে এর মধ্যে কোনো দ্বিধা নেই। তাইতো বিনয় বলেছে 'তুঁ ইচ্ছা ক্যারলেসে সব পারবি মায়ি। তোর অপারগ কুচ্ছু নাই!' মানুষ এই

বিশ্বাসেই বেঁচে আছে আর বাঁচিয়ে রেখেছে লক্ষ্মীতারাদের। বিনায়ক তো সেই কথায় বলেছে ‘কিছু না পেলে সারাজীবন ধরে মানুষ কেন আসবে?’ এর উত্তর প্রতিটি মানুষ পেতে চেয়েছে, আর তার ফলেই মানুষের মধ্যে বিশ্বাস জন্মেছে, লক্ষ্মীতারার মতো দেয়াশিনীর কাছে ছুটে গেছে।

অভিজিৎ সেনের ‘দেবাংশী’ গল্পে সারবান লোহারকে সবাই বিশ্বাস করতে এবং তাকে দেবতার অংশ ভেবে তার প্রতি নির্ভর করতে শুরু করেছিল, যখন পীড়িত ব্যক্তি ফল পেয়েছিল। মানুষ সেই ঘটনায় দেবাংশীর ক্ষমতার প্রভাব দেখতে পেয়েছে, দৈত্যারি দেবাংশীর সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ার কিছুদিন পরে সাপের কামড়ে মারা যায়। এই ঘটনায় কোনো যুক্তিবোধ মানুষ খুঁজতে চায়নি, দেবাংশীর দৈবী মাহাত্ম কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছিল। এভাবেই লক্ষ্মীতারাকে মানুষ চিনত, তার ক্ষমতা সম্পর্কে সকলেই ওয়াকিবহাল, কারণ সে জীবন-মৃত্যুর খবর দিতে পারত। লক্ষ্মীতারা জানত ভবতোষ আর বাঁচবে না, তাকে আত্মহত্যা করা থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। জমিদার চৌধুরীদের যে ছেলেটি জমিদারি দাঙ্গার প্রত্যক্ষ ভিক্‌টিম এবং মানসিক রোগের শিকার, লক্ষ্মীতারা জানত সেই ছেলেটির গায়ের রঙ একদিন সবুজ-কালো শ্যাওলার মতো হবে, গাছের মতো সে একদিন স্থির হবে। চৌধুরীদের ছেলে আনন্দ ও ভবতোষ সম্পর্কে লক্ষ্মীতারার ভবিষ্যৎবাণী একেবারেই ফলে গিয়েছিল। ভবতোষ মদের সঙ্গে কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যা করেছিল।

মানুষের পাপবোধ আসার উপযুক্ত কারণ থাকবে এমনটা হয়তো সবসময় হয়নি। রেণুকা ভবতোষের একজন স্তাবক ছিল কিন্তু সংসার করতে গিয়ে ভবতোষের উদ্ভট আচরণে রেণুকা অতিষ্ট হয়ে একসময় চেয়েছিল ভবতোষ মরেও তাকে শান্তি দিক। আবার লক্ষ্মীতারার কাছেও গিয়েছিল চিকিৎসা করাতে। ভবতোষের মৃত্যুর পর সুহাসকে দ্বিতীয় বিবাহ করেও কোনো সন্তান দিতে পারেনি ফলে তার ভিতরে জমেছে অভিশাপ আর পাপের ভয়। কারণ ভবতোষের অক্ষমতার সুযোগ সে বিনায়ককে দিয়ে, বিনায়কের সন্তান পেটে নিয়ে নষ্ট করেছে সন্তানধারণের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও। এসবের পরে আবার সন্তান প্রাপ্তির জন্য লক্ষ্মীতারার শরণাপন্ন হতে চেয়েছে রেণুকা, সঙ্গে যাবে বিনায়ক এবং সে তার কৃতকর্মের জন্য লক্ষ্মীতারার কাছে ক্ষমা চাইতে চেয়েছে। দেবাংশী, দেয়াশিনীরা নিজেদের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন তাই লক্ষ্মীতারা রেণুকার দ্বিতীয় সাক্ষাতে বলেছিল, সে কাউকে সন্তান

দিতে পারে না, ডাক্তারের চিকিৎসাতেই সন্তান হবে। রেণুকার বিনায়কের সঙ্গে যৌন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া থেকেই এসেছে পাপবোধ, আর বিনায়ক সারাজীবনে জালিয়াতি করে সম্পত্তি করেছে। ব্যাংক জালিয়াতির দায়ে তার জন্য দুজন ক্লার্কের একজন আত্মহত্যা করেছিল। রেণুকার মতো রূপবতী নারীর লোভ সামলাতে পারেনি বিনায়ক, তাই লক্ষ্মীতারা তার সম্পর্কে লম্পট লুটেরা খুনির মতো বিশেষণ যথার্থভাবে প্রয়োগ করেছে। এরপর একদিন বিনায়ক বোঝে পিঠ উদলা করে ভোলেয়া মায়ের কাছে বসবার সময় এসে গেছে তারও।

উপন্যাসে লক্ষ্মীতারার মতো যোগীনির সঙ্গে কিছু মানুষের পাপ ও কৃতকর্ম বোধ মিশে গিয়ে তৈরি হয়েছে এক অন্য কোলাজ। মালদা জেলার প্রেক্ষাপটে লেখা এই উপন্যাসের আখ্যান, মালদার গঙ্গা, ফুলহার নদীর প্রসঙ্গ এবং গঙ্গার নিম্ন অববাহিকায় বন্যার চিত্র অভিজিৎ সেন দেখিয়েছেন সংক্ষেপে যার অনেকটাই *নিম্নগতির নদী* উপন্যাসে বলেছিলেন এমনকি লক্ষ্মীতারার কাহিনিও। তবুও লক্ষ্মীতারার আখ্যান এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য। আমাদের সমাজে লক্ষ্মীতারাদের প্রয়োজন আছে নাহলে এই পাপীতাপী মানুষগুলো তাদের পাপবোধ থেকে আগামী জীবনটা এগিয়ে নিয়ে যাবে কীভাবে। কারণ—

> অসংখ্য হেরে যাওয়া, পিছলে পড়া, খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষকে সে আজন্ম দেখে আসছে। হারকে মেনে নিতে শিখিয়েছে। যার পা পিছলে গেছে তাকে ধরে পাশের গাছের ডালটা হাতে ধরিয়ে দিয়েছে সে। খাদের কিনার থেকে তুলে এনে অন্যপাশের উত্তুঙ্গ পাহাড়ের দেওয়ালের পাশে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।[৫৩]

ভবতোষের স্কিৎজোফ্রেনিয়্র ফলে আত্মহত্যা, বিনয়ের শারীরিক প্রতিবন্ধকতা তার সঙ্গে মনের দুর্বলতা ফলে সে মনে করেছে তার জীবনের উন্নতির জন্য লক্ষ্মীতারার অবদান অনেক, বাস্তবে তা ছিল আন। জমিদার পুত্র ভরতের মানসিক বিপর্যয় তার বংশরোগ এসব লক্ষ্মীতারার মহিমার সঙ্গে জুড়েছে, মানুষ ছুটে এসেছে এদের মতো দেবাংশীর কাছে, সন্তুষ্টি পেতে, মনের বিশ্বাস ও লক্ষ্মীতারাদের বাঁচিয়ে রাখতে।

দ্বিতীয় পর্ব

অভিজিৎ সেনের উপন্যাসে আখ্যান নির্মাণের অন্যান্য দিক নিয়ে আলোচনা করা হল এই পর্বে। তার আগে লেখকের উপর পূর্বসূরীরপ্রভাব কতটা তা জানা জরুরি। বিভিন্ন প্রকার চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ধরন ব্যবহার করেছেন। অধিকাংশ উপন্যাসে নানা আঙ্গিকে সাপের প্রসঙ্গ এনেছেন এবং নদীর বর্ণনার একটা বিশেষ প্রবণতাও দেখা গেছে অভিজিৎ সেনের মধ্যে। গ্রাম জীবনের পটভূমিতে লেখালেখি করার ফলে আঞ্চলিকতা যেমন এসেছে, লোকবিশ্বাস ও মিথের ব্যবহার তাঁর উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য অঙ্গ। ফলে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে পৃথক দৃষ্টিপাত করা হল।

১। পূর্বসূরীর প্রভাব

বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশক থেকে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের হাতে গোনা দু-এক জন লেখক ছাড়া অভিজিৎ সেন সেভাবে কারো দ্বারা প্রভাবিত হননি। তাঁর গল্প উপন্যাসের এমন কোনো উপাদান নেই যা দিয়ে তাঁকে কারো দ্বারা ব্যাপক প্রভাবিত বলে মনে হয়েছে। তবুও ব্যাপকভাবে না হলেও পূর্বসূরীর প্রভাব পরবর্তীদের মধ্যে সামান্য হলেও থেকে যায়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামান্য প্রভাব ছিল অভিজিৎ সেনের লেখায়। বিশ্বসাহিত্য পাঠের সুফলে বিশ্বাস করতেন অভিজিৎ সেন। নিজেও খুব ছোটোবেলাতেই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ভালোভাবে পড়ে ফেলেছিলেন। এ বিষয়ে তিনি জানিয়েছেন—

> স্কুলের পড়া শেষ করার আগেই আমি তারাশঙ্করের প্রধান উপন্যাসগুলি শেষ করে ফেলেছিলাম। সদ্য কৈশোর অতিক্রান্ত বয়সে তারাশঙ্কর আমাকে অভিভূত করেছিলেন। আমার প্রথম দিকের গল্প উপন্যাসের মধ্যে তারাশঙ্কর কোথাও কোথাও হয়তো উঁকি মারেন।[৫৪]

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় নয়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারাই আকৃষ্ট হয়েছিলেন অভিজিৎ সেন। তিনি বলেছেন—

> তারাশঙ্করের উপন্যাসের বিশাল ক্যানভাস এবং আশ্চর্য চরিত্রগুলো আমাকে ওই বয়সে একেবারে স্তম্ভিত করে ফেলেছিল। সে সময়ের মুগ্ধতা আমি এখনো ভুলি নি। তারাশঙ্করের গল্পও উপন্যাসের সাপ আমাকে এখনো ছাড়ে নি। তবে এও ঠিক পরবর্তীকালে তারাশঙ্করের প্রতি আমার এই পক্ষপাত তেমন জোরালো ছিল বলে মনে হয় না।[৫৫]

বাংলা সাহিত্য ছাড়াও তিনি বিদেশি সাহিত্য প্রচুর পড়েছেন, একথা নিজেই জানিয়েছেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাব স্বীকার করলেও সবথেকে বেশি প্রভাবিত হয়েছেন মহাশ্বেতা দেবীর (১৯২৬-২০১৬) দ্বারা। এমনিতেই অভিজিৎ সেন মহাশ্বেতা দেবীর স্নেহধন্য ছিলেন আবার লেখার ধরনেও অনেকটাই প্রভাবিত তিনি। তিনি মহাশ্বেতা দেবীর দ্বিতীয় পর্যায়ের লেখা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি সেকথা স্পষ্ট করেই জানিয়েছেন—

> সত্তরের (গত শতকের) মাঝামাঝি যখন নতুন করে এবং যথেষ্ট গুরুত্ব নিয়ে লেখালেখি আবার শুরু করেছিলাম, মহাশ্বেতা দেবী তখন তাঁর নব পর্যায়ের লেখাগুলিতে ক্রমশ আসন দৃঢ় করছিলেন। অসম্ভব আকৃষ্ট হয়েছিলাম 'জল', 'অপারেশন বসাই টুডু', 'চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর', 'শ্রী শ্রী গণেশ মহিমা', 'বিছন', 'দ্রৌপদী' ইত্যাদি গল্প ও উপন্যাসগুলিতে। আমার 'বর্গক্ষেত্র', 'আইনশৃঙ্খলা'— এক কথায় বলতে গেলে 'দেবাংশী' সংকলনের গল্পগুলিতে মহাশ্বেতা দেবীর ছাপ স্পষ্ট।[৫৬]

অভিজিৎ সেন মহাশ্বেতা দেবীর নিম্নবর্গীয় চেতনা শুধু নয় ভূমিকেন্দ্রিক লেখাগুলির দ্বারা ব্যাপক প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। মহাশ্বেতা দেবীর উদ্যোগে *বর্তিকা* পত্রিকা বেরোতে থাকে, ক্ষেত মজুর, রিকশা চালক, উচ্ছেদ হওয়া বর্গাদারের কাহিনি নিয়ে। অভিজিৎ সেনের কথাসাহিত্যের একটা বৃহৎ অংশ জমি, কৃষি, বর্গাদার, জোতদারকে নিয়ে লেখা। কর্মক্ষেত্রে এইসব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি আর সঙ্গে মহাশ্বেতা দেবীর এই জাতীয় লেখা ও ব্যক্তিগত প্রশ্রয়ের ফসল অভিজিৎ সেনের জমিকেন্দ্রিক লেখাগুলি। অভিজিৎ সেন মগ হার্মাদের মতো বিদেশি শত্রুর দ্বারা বাংলা আক্রমণ এবং সেই সময়ের অর্থাৎ ষোড়শ-অষ্টাদশ শতকের বীভৎস সামাজিক কাঠামো *মৌসুমি সমুদ্রের উপকূল* উপন্যাসে বলেছেন। এর প্রায় কয়েক দশক আগেই মহাশ্বেতা দেবী বর্গি আক্রমণের সেই সময়টা ধরেছিলেন *আঁধার মানিক* উপন্যাসে। উত্তরবঙ্গে বসে যখন কলকাতায় মহাশ্বেতা দেবীর কাছে লেখা পাঠাতেন অভিজিৎ সেন তখন মহাশ্বেতা দেবী মজা করে বলতেন 'আমি অভিজিতের কলকাতার এজেন্ট।' *বর্গক্ষেত্র* পড়ে মহাশ্বেতা দেবী মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং পরামর্শ দিয়েছিলেন লেখা না থামাতে। আসলে সত্তরের অনেক কথাসাহিত্যিকই মহাশ্বেতা দেবীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে প্রভাবিত। এ প্রসঙ্গে সাধন চট্টোপাধ্যায় যথার্থ বলেছেন—

আজ সত্তরের লেখক বলে বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত যে একঝাঁক লেখক-সকলকেই মহাশ্বেতাদি নানা ভাবে উদ্বুদ্ধ করে গল্প-উপন্যাসে নতুন চেতনার সঞ্চার করেছিলেন।[৫৭]

আর মহাশ্বেতা দেবীসহ সত্তরের সেই 'একঝাঁক' লেখক বাণিজ্যিক সাহিত্যের বাইরে গিয়ে নতুন দিশা খুঁজে দিলেন যা পাঠক গ্রহণ করেছে। মহাশ্বেতা দেবীর দ্বিতীয় পর্যায়ের লেখাগুলো দ্বারা সত্তরের অনেক লেখক অনুপ্রাণিত, এই লেখাগুলি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রূপ বদলে নিয়েছে। তাঁর দ্বিতীয় পর্যায়ের লেখা সম্পর্কে পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

সমাজের উচ্চবর্গীয়, মধ্যস্তরের জগৎ থেকে তিনি আদিবাসী-নিম্নবর্গীয় জগতে চলে আসেন; ষাটের দশকের শেষের দিক থেকে এ বঙ্গে যে এক স্বপ্নময় রাজনৈতিক উচ্চারণ মধ্যবিত্তকে সত্তাকে নাড়া দেয়, সমাজের নিম্নবর্গীয়-প্রান্তিক-তৃণমূল মানুষদের সম্পর্কে বিশেষ চেতনা নিয়ে আসে, মহাশ্বেতা সেই চেতনাকে নিজের "সত্য" ভাবনায় আন্বিত করেন। একথা ভাবলে ভুল হবে, ঐ সময় মহাশ্বেতার বীক্ষাকে পাল্টে দেয়—আসলে লোকজীবনের প্রথম পর্যায়েই মহাশ্বেতা প্রচলিত উচ্চবর্গীয়, ডমিন্যান্ট সত্যর প্রতিবাদের সত্যকে বীক্ষাভুক্ত করেছিলেন, নতুন সময় তাঁর ঐ সত্যকে আরও ব্যাপক ক্ষেত্রে নিয়ে যায়। আর সাধন-স্বপ্নময়-ভগীরথ-কিন্নরের লিখিত ও মৌলিক সাক্ষ্য থেকে এটাও বুঝি, ঐ চৈতন্যকে সাহিত্যিক রূপ দেবার ক্ষেত্রে, যাকে ফর্মালিস্টরা বলবেন লিটারারিনেস—তার দিক থেকে মহাশ্বেতা এ পর্যায়েই বাংলা গল্প-উপন্যাসে অঘোষিত নেতৃত্ব দেন, যাতে সত্তরের দশক একঝাঁক লেখকের ক্ষমতা প্রকাশের পথ ও বিশ্বাস খুঁজে পায়।[৫৮]

বাংলা কথাসাহিত্যের অভিমুখ যখন যখন বদলেছে পঞ্চাশ, ষাটে বা সত্তর আশির দশকে মহাশ্বেতা দেবীর মতো এক একজন পথিকৃৎ এভাবেই একঝাঁক লেখকের পথ প্রশস্ত করেছেন।

অভিজিৎ সেন মানতেন প্রত্যেক সাহিত্যিকের লেখার আগে ভালো পাঠক হয়ে ওঠা জরুরি। তিনি নিজেও বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেয়েছেন। নিকোলাই গোগোল (১৮০৯-১৮৫৪), ইভান তুর্গেনিভ (১৮১৮-১৮৮৩), লিও টলস্টয় (১৮২৮-১৯১০), ফিওদর ডস্টয়েভস্কি (১৮২১-১৮৮১), ম্যাক্সিম গোর্কি (১৮৬৮-১৯৩৬), আর্নেট হেমিংওয়ের (১৮৯৯-১৯৬১) মতো বড়ো মাপের সাহিত্যিকদের লেখা পড়ে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন তিনি। কারণ তিনি জানতেন পূর্ববর্তী বড়ো মাপের কথাসাহিত্যিকরা পরবর্তী প্রজন্মের উপর প্রভাব ফেলে তা প্রাচ্যের হোক বা পাশ্চাত্যের হোক। তবে অভিজিৎ সেনের উপর গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের (১৯২৭-২০১৪) প্রভাবের প্রতিফলন সহজেই চোখে পড়েছে। *রহু চণ্ডালের হাড়*

উপন্যাসের পীতেম *One Hundred Years of Solitude* এর হোসে আর্কাদিও, উরসুলা যেন অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের সালমা। *One Hundred Years of Solitude* পড়ে অভিভূত হয়েছিলেন অভিজিৎ সেন। তিনি মনে করতেন এই বই বা অনুরূপ বই পড়ে মানুষ আর আগের মানুষ থাকে না। লাতিন আমেরিকার বিখ্যাত সাহিত্যিক গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ তাঁর এ বইতে জাদু বাস্তবতাকে অন্য মাত্রা দিয়েছেন, উপন্যাসে মিথের ব্যবহারেও নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। আমাদের দেশীয় সাহিত্যে লোককথা ও মিথ সচেতনভাবে প্রবেশ করানো সম্ভব-অসম্ভব নিয়ে দ্বিধা ছিল। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার সাহিত্যে ঠিক 'রূপকথার গল্প নয়, লোককথাও নয়, কিন্তু লোককথার বাস্তবতার শক্তিশালী মাধ্যম' নয়া আধুনিকতা এনেছে। অভিজিৎ সেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিথ ব্যবহারের সঙ্গে গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের মিথ ব্যবহারের একটা তুলনা এনেছেন, *আরোগ্য নিকেতন* উপন্যাসের জীবনমশাই দেখেন জলার ধারে ভূত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাছ খাচ্ছে। আর মার্কেজের প্রেত জল গিলতে পারছে না কাটা গলা দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে, এটা কয়েকদিন দেখার পর জোস বলেছে ঢের হয়েছে তুমি থাকো আমি যাচ্ছি। অভিজিৎ সেন লিখেছেন—

> তারাশঙ্করের ভূত প্রত্যক্ষ ভূত, আর মার্কুয়েজের ভূত লোককথার ভূত। প্রত্যক্ষ ভূতের চেয়ে লোককথার ভূতের প্রভাব অনেক বেশি প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব।[৫৯]

তিনি আরও বলেছেন আমাদের অগ্রজ সতীনাথ ভাদুড়ি, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কমলকুমার মজুমদার, অমিয়ভূষণ মজুমদার, মহাশ্বেতা দেবী এঁদের সঙ্গে আমরাও এতদিন মিথ, লোককথা, পুরাণ, রূপকথার ব্যবহার ল্যাবোরেটরির বুদ্ধি ও যুক্তির আলোকে করে এসেছি। তিনি আক্ষেপ করেছেন মার্কেসের মতো দুঃসাহসের অভিজ্ঞান পেলে 'দেবাংশী' লেখাটার আরও উন্নতি হত। তবে *রহু চণ্ডালের হাড়* উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে সেই দুঃসাহস কাজে লাগিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের অগ্রজদের এক্ষেত্রে অনুসরণ করেছেন একথা তিনি স্বীকার করেছেন তবে এক্ষেত্রে গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ যে মূল আদর্শ সেটা বেশ স্পষ্ট, তাঁর মতো অভিজিৎ সেন মিথ ব্যবহারের আশ মিটিয়ে নিয়েছেন *রহু চণ্ডালের হাড়, নাগমঙ্গল* প্রভৃতি উপন্যাসে।

২। চরিত্রের ধরন:

ক। নারী চরিত্র

মহাশ্বেতা দেবীর পর সত্তর দশকে বাংলা কথাসাহিত্যে নারী চরিত্র নির্মাণে অভিজিৎ সেন বিশিষ্ট একথা বললে অত্যুক্তি হবে না। তাঁর গল্পের মতো উপন্যাসের নারীরাও আপন ভাগ্য জয় করে পুরুষের সঙ্গে একসারিতে দাঁড়িয়েছে। যদিও সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে ধর্মীয়, রাজনৈতিক, পারিবারিক সবক্ষেত্রে নারী তার ভূমিকা পালন করেছে। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিজিৎ সেনের সাহিত্যে নারী চরিত্র রূপায়ণ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন—

> পরিস্থিতির বৈচিত্র্য উদ্ভাবনে, চরিত্র পরিকল্পনায়—বিশেষ করে নারী চরিত্রের একেবারে স্বতন্ত্র সংকট উদঘাটনে লেখকের সিদ্ধি প্রথম শ্রেণীর...।[৬০]

অভিজিৎ সেনের সাহিত্যে 'মানুষের মেলা'। আর এই মানুষের মধ্যে সিংহভাগ 'মেয়েমানুষ'। মধ্যবিত্ত শিক্ষিতা নারী থেকে ভিখারি, পতিতা, পরিচারিকা, শিক্ষক, ডাক্তার, দালাল এমনকি ব্যক্তিত্বময়ী সব ধরনের নারী চরিত্র তাঁর উপন্যাসে উপস্থিত। অবস্থান ও ক্ষেত্র বিশেষে চরিত্রকে একেবারে বাস্তবোচিত রূপ দিয়েছেন লেখক, কোথাও একটুও রঙ চড়াননি। মহাশ্বেতা দেবীর মতো মানুষের জীবনের সমীক্ষা করেছেন তিনি। তাঁর গল্পের নারী সম্পর্কে ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—

> নারী স্বতন্ত্র হতে পারে, স্বাধীন, শিক্ষিতা, প্রেমিকা নারী হতে পারে, আবার নিম্নবর্গীয় সমাজের প্রখরা নারী হতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকটি নারীর ভাগ্য নির্ধারিত হয় প্রবলভাবে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের পুরুষের হাতে; জড়িয়ে থাকে পুরুষের ভাগ্যের সঙ্গে। অভিজিৎ সেনের কাহিনীতে নারী বেশ বেশি মাত্রায়ই উপস্থিত, নানা পরিস্থিতিতে, নানা সরূপে। কিন্তু, ধর্ম, জাত, কুল, আলাদা-আলাদা হয়েও তারা সবাই কোথাও এক হয়ে যায়, একই অসহায়ত্বে একই বেদনার বিন্দুতে।[৬১]

অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের নারী চরিত্রদের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। আরও বৃহৎ প্রেক্ষাপটে তিনি তাঁর উপন্যাসের নারী চরিত্রদের ধরেছেন। ত্যাগে, সেবায়, ব্যক্তিত্বে, খলতায়, স্বার্থে, প্রেমে, স্নেহে, মাতৃত্বে তাঁর নারী চরিত্রেরা সাবলীল ও স্পষ্ট, কোথাও এতটুকু জড়তা নেই, কোথাও ফাঁকি নেই এতটকু।

পরিবর্তমান সময়ের ও সমাজের নারী অভিজিৎ সেনের উপন্যাসে হাজির হয়েছে। বর্তমান সময় থেকে যত পিছিয়ে গেছেন তাঁর নারীরা ঠিক সেই যুগের বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে কোথাও সময়ের সঙ্গে অসামঞ্জস্য দেখা যায়নি। যদি লক্ষ্য করা যায় *মৌসুমি*

সমুদ্রের উপকূল উপন্যাসের সত্যভামা কিংবা শর্মিষ্ঠা, *আঁধার মহিষ* উপন্যাসের অলকানন্দা এই দুটি চরিত্রের কথা, সম্পূর্ণ আলাদা দুটি চরিত্র। একজন ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের নারী অন্যজন বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের নারী। মগের অত্যাচারের সামনে নতজানু হয়েছে সত্যভামা ও শর্মিষ্ঠা। শিক্ষায়, সমাজের চাপে পিছিয়ে থাকার ফলে এদের তেজ, বিচারবোধ, যুক্তি, প্রতিরোধ ও স্বতঃস্ফূর্ততা নেই কারণ এরা সেই সমাজ পায়নি। কিন্তু বিশ শতকের শিক্ষিতা আধুনিক নারী অলকানন্দা পরিবর্তিত সময়ের নারী, সাম্প্রদায়িকতাকে উপেক্ষা করে ভিন্ন ধর্মে বিয়ে করে, গুণ্ডাদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়ে প্রতিবাদ করেছে। যদিও এদের সমস্যার তফাৎ ছিল কিন্তু স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য আলাদা হয়ে গেছে যুগের কারণে। সমাজের দুর্নীতির মধ্যে শিক্ষিত নারীর কর্মপরিচালনার দক্ষতা, হেনস্থা হলেও এগিয়ে চলার দৃষ্টান্ত হিসাবে ইরাবতীর মতো নারী এসেছে *অন্ধকারের নদী* উপন্যাসে। ডাক্তারি দিয়ে মানুষের সেবা করতে গিয়ে যে মানুষগুলির সুখে দুঃখে একাত্ম হতে চেয়ে পরিবর্তে পেয়েছে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ফলে লাঞ্ছনা ও অপমান। তবুও থেমে যায়নি ইরাবতীর সেবাপরায়ণতার আকাঙ্ক্ষা। বাস্তববোধের সমন্বয়ে তৈরি এইসব নারীরা। *ছায়ার পাখি* উপন্যাসের দুজন নারী যারা তাদের জীবন যেন ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজেদের পরিণতিকে দুচোখ দিয়ে দেখেছে আর হা-হুতাশ করেছে। স্বামী সন্তান কারো এতটুকু গুরুত্ব না পেয়ে কৌশল্যা মৃত্যুকে একপ্রকার ডেকেই এনেছে। কামুক মাতাল স্বামীর অবজ্ঞা, রাজনীতিবিদ বিশ্বাসঘাতক সন্তানের অবহেলা কৌশল্যাকে জীবনবিমুখ হতে প্ররোচনা যুগিয়েছে। অন্যদিকে বিধবা রাজেশ্বরী বিমলের লালসার শিকার হয়েছে। রাজেশ্বরী পেটে সন্তান নিয়ে একটা মানুষের নাম ও গ্রামের নাম সম্বল করে চলেছে সরল বিশ্বাসে। বিমল তাকে কোনোদিনই স্বীকার করেনি, ভাগ্য বিপর্যয়ে সেও কৌশল্যার সঙ্গে এক সারিতে এসে দাঁড়িয়েছে।

অভিজিৎ সেনের উপন্যাসে মাতৃ চরিত্র অনেক আছে তবে উপন্যাসে প্রবলভাবে মাতৃত্বের দাবি নিয়ে যারা আসছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শুকতারা, মায়নোমতি। এছাড়াও আছে কৌশল্যা, সত্যভামার মতো অভাগিনী মা। *ঝড়* উপন্যাসে আছে, বালক জ্যোতিকে তার কাকিমা শুকতারা যেভাবে তার নিজের দুই সন্তানের সঙ্গে আগলে রেখেছে তাতে তার মাতৃত্ব প্রকাশ পেয়েছে। *বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর* উপন্যাসের পুরোটাই মায়নোমতির সন্তান ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। সন্তানপ্রাপ্তির সমস্ত লোকবিশ্বাস অক্ষরে অক্ষরে মেনেছে

সে, বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেনি। দুদিন উপোস দিয়ে দু-ক্রোশ দন্ডি দিয়ে বুক চিরে বিষহরির থানে রক্ত দিয়ে সন্তান পেয়েছে মায়নোমতি। কিন্তু সেই সন্তান বালা যখন প্রেম ও যৌবনের টানে অন্য নারীর আয়ত্বে চলে গেছে তখন 'মায়ের ঈর্ষা' উথলে উঠেছে, সে ছেলের ভাগ কাউকেই দিতে চায়নি। পুত্রের জন্য ব্যাকুল হয়েছে, কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়েছে। অভিজিৎ সেন মায়নোমতিকে উপস্থাপন করেছেন একেবারে স্বতন্ত্রভাবে, যে বয়সের ধর্ম বোঝে না, সন্তানের পরিবর্তনকে মেনে নিতে পারে না, শুধু মাতৃত্বকে শক্ত ভাবে স্থাপন করতে চায় সমাজে এবং বালার জীবনে।

শান্ত সমাহিত মাতৃত্বের প্রতিমূর্তি ছাড়াও অভিজিৎ সেন তাঁর উপন্যাসে এমন অনেক নারীর কথা বলেছেন যারা বৈধব্য, পুরুষ দ্বারা প্রতারণা আর অত্যাচারের গ্লানি নিয়েও লড়াই করেছে। অভিজিৎ সেনের 'মানবদেহের গৌরব' গল্পে দেখেছি মা-মেয়ে মিলন ও সুলেখার অভিশপ্ত জীবন একাধিক পুরুষ সঙ্গীর পালা শেষে আত্মহত্যার দিকে এগিয়েছে। অর্থের বদলে যৌনতা দিয়ে কাজ গুছিয়ে নিয়েছে, যা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। *নক্ষত্র নদী ও নারী* উপন্যাসের কাঞ্চনমালা সেই মেয়ে যার স্বামী নিরুদ্দেশ, এর মাঝেও এক বিচিত্র জীবনযাপন করছে সে। তাতে শরীরের আগুন ছাই চাপা থাকেনি, অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে। আবার কাঞ্চনমালা মিলনের মতো চেয়েছে নিজের সন্তানকে একটা লাঞ্ছনাহীন জীবন দিতে। *বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর* উপন্যাসেও আকর্ষণীয় বিদ্যার শরীরকে তার মা নিরাপত্তা দিতে পারেনি। ধর্ষিতা হবার পর তার জীবন অন্য খাতে বয়ে গেছে। বৃদ্ধ গুণমান কবিরাজকে বিয়ে, আশা পূরণের আগেই গুণমানের মৃত্যু, বিদ্যার চোখে দেখা মায়ের কষ্ট, এরপর বালা জীবনে আসার পর সমাজের বিরুদ্ধে নতুন লড়াই শুরু হয়েছে। কাঞ্চনমালা ও বিদ্যার সঙ্গে জীবন কাহিনির দিক থেকে কিছুটা মিল ছিল। অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের এই জাতীয় মেয়েরা অনেকটা একইরকম, পরিণতি ভিন্ন হলেও জীবনযুদ্ধে এরা একই সারিতে এসে দাঁড়িয়েছে।

মুসলমান সমাজের ঘরোয়া নারী থেকে শিক্ষিত নারীর পরিবর্তন অভিজিৎ সেন লক্ষ্য করেছেন খুব একাগ্রতার সঙ্গে, তাইতো নিপুণভাবে উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন তাদের। কীভাবে সামাজিক পরিবর্তনের ফলে রক্ষণশীল মুসলমান সমাজের নারীরা পরিবর্তমান সমাজের সঙ্গে মিশেছে, বিভিন্ন ধরনের মানুষের সংস্পর্শে নিজেদের মেলে ধরেছে তা

দেখিয়েছেন। *শিরিন এবং তার পরিজন* উপন্যাসে অভিজিৎ সেন নারী পাচারের মতো একটি আধুনিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে শিক্ষিত মুসলিম সমাজের নারীর সচেতনতাকেও দেখিয়েছেন। *সবুজ শ্যাওলা ঢাকা জল* উপন্যাসেও এই বিষয় উঠে এসেছে। এই দুটি উপন্যাসের দুজন অধ্যাপক শিরিন ও অদিতি। এই দুই নারীর অভিজ্ঞতায় এসেছে নারী পাচারের চক্রগুলো কীভাবে চলে। টাকা, সোনা, ভালো খাওয়া, ভালো পরার লোভে অভাবী মেয়েরা চক্রবূহ্যে আটকে পড়ত। লেখক এইসব নারীর ত্রাতা রূপে এনেছেন দুজন শিক্ষিত নারীকে। গৃহকর্মে নিপুন, অভাবে অভিযোগে জীবনযাপন এসবের বাইরে নারী স্বাবলম্বী দায়িত্বশীল হয়ে উঠতে পারে সমাজের বৃহৎ সমস্যা নিবারণে তাদেরও ভূমিকা থাকতে পারে, শিরিন, অদিতি, ইরাবতী তারই দৃষ্টান্ত।

খ। পুরুষ চরিত্র

অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের পুরুষরা বেশিরভাগই কৃষিজীবী, মাটির সঙ্গে সম্পর্কিত। ভূমি নিয়েই তাদের জীবন আবর্তিত। বাকিরা রাজনৈতিক ব্যাভিচার, জমি ও নারীর শোষণ, বিবাদ-সংঘাত নিয়ে ব্যস্ত। *রহু চণ্ডালের হাড়* উপন্যাসের পীতেম, জামির, পরতাপ, জিল্লুর মতো বাজিকর পুরুষরা বারে বারেই একখণ্ড স্থায়ী জমির সংস্থানে ঘুরেছে। আস্তিক মাল ও তার ছেলে পরশুরাম মাল সরল চাষি, সরকারি আইনে জমি বর্গা রেকর্ড করার সুযোগ পেলেও করেনি কারণ এটা করলে জোতদারের সঙ্গে বেইমানি করা হবে। কিন্তু জোতদার শচীকান্ত এই সরলতার সুযোগ নিয়ে তাদের জমি থেকে উৎখাত করতে চেয়েছে। *বর্গক্ষেত্র* উপন্যাসের এই সংঘাতে শোষক ও শোষিত দু-ধরনের পুরুষ চরিত্র উঠে এসেছে। *হলুদ রঙের সূর্য* উপন্যাসের সহদেব বিশ্বাসের পুরো জীবনের লড়াইটা জমিকে কেন্দ্র করে। প্রথমে সে বাসযোগ্য জমি পেতে চেয়েছিল তারপর গোষ্ঠী নিয়ে বাস, চাষের জমি তৈরি করে নিয়েছিল। সহদেব বিশ্বাস প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে একটা গোষ্ঠীর। অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের পুরুষ চরিত্র সম্পর্কে বলতে গেলে কয়েকজন পিতাকে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যে চিনে নেওয়া যায়। *ছায়ার পাখি* উপন্যাসে বিমলের পিতা সুরেশ্বর, সংসার উদাসীন, না একজন ভালো পিতা না একজন ভালো স্বামী। নারী ও সুরাসক্ত এই মানুষটি তার পুত্রকে দিয়েছে লাম্পট্যের গুণ, স্ত্রীকে দিয়েছে একাকীত্বের যন্ত্রণা ও একপ্রকার ইচ্ছামৃত্যু। *বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর* উপন্যাসের বালার পিতা রাজকিশোর স্ত্রীর পাশে থেকে সংসার সামলেছে, যৌবনের টানে ভেসে যাওয়া পুত্রকে ঘরে ফিরিয়ে আনতে না পেরে স্ত্রীর সঙ্গে আক্ষেপ

করেছে, স্ত্রীকে আশ্বস্ত করেছে, এক্ষেত্রে সাধারণ পিতাকেই এঁকেছেন লেখক। *মৌসুমি সমুদ্রের উপকূল* উপন্যাসে হতভাগ্য এক পিতার করুণ জীবনবেদ রচিত হয়েছে। দুই কন্যা ও স্ত্রীকে মগেরা যখন লুঠ করে নিয়ে যায় পাগলপ্রায় পিতা বিষ্ণুপ্রিয় নির্বাক হয়ে গেছে। *লাশকাটা ঘরের সামনে অপেক্ষা* উপন্যাসের পিতা নকশাল বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মী, তার পুত্র তেমনই এক বিপ্লবী আন্দোলনে জড়িয়ে প্রাণ দিয়েছে। সন্তানের দেহ সনাক্ত করতে গিয়ে পিতা শুভব্রত তার বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি রোমন্থন করেছে। আবার *ধর্মাযুধ* উপন্যাসের যদুর পিতা রাজা গণেশ প্রবল ব্যক্তিত্বপূর্ণ, বীর, বিচক্ষণ, তার ইতিহাস খ্যাতির পাশে লেখক তাকে কর্তৃত্ব পরায়ণ পিতা রূপেই এঁকেছেন। পিতা-পুত্রের মধ্যে স্নেহ, ভালোবাসা, আবেগ, আদেশ এসব গণেশের রাজা সত্তার পাশে পিতা সত্তাকেও প্রকট করেছে।

অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের অধিকাংশ আদর্শ পুরুষ চরিত্রে ট্র্যাজেডি এসেছে, সাংসারিক ও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে বা সামাজিক পরিবৃত্তে। সমাজ এদের অনেক লাঞ্ছনা দিয়েছে সুবিচার করেনি। যেমন *অন্ধকারের নদী* উপন্যাসের বি.ডি.ও অশোককে আদর্শ ধরে রেখে কাজ করতে গিয়ে সমাজ ব্যবস্থা থেকে নিপীড়ন সহ্য করতে হয়েছে। *ছায়ার পাখি* উপন্যাসের গোপাল ও *নিম্নগতির নদী* উপন্যাসের ত্রিদিব প্রকৃত কমিউনিস্ট ভাবধারাকে আঁকড়ে গোটা জীবন কাটিয়ে দিল, রাজনীতিতে দুর্নীতির ভিড়ে হতাশা, গ্লানি আর স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা ভোগ করেছে। অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের এক-দুজন পুরুষই রোমান্টিক নায়ক হয়ে উঠেছে। আশির নব্বই দশক তো দূর তাঁর একবিংশ শতকের উপন্যাসেও প্রেমিকরা বা উপন্যাসে প্রধান পুরুষ চরিত্রটি সিনেমার নায়কদের মতো সুদর্শন, সুশীল হতে পারেনি। পোশাকে চলা-বলায় চাকচিক্যময় অর্থাৎ রূপে গুণে আদর্শ নায়ক হয়ে ওঠেনি। অসাধ্য সাধনও করতে পারেনি বরং গ্রাম্য সংস্কৃতির মধ্যে তাদের সম্পর্কের জটিলতা, নিন্দা, লোকলজ্জার মধ্যে তাদের প্রেমকে লালন করেছে। তা সে *ছায়ার পাখি* উপন্যাসের গোপাল, *মৌসুমি সমুদ্রের উপকূল* উপন্যাসের ক্ষেমংকর, *বিদ্যাধরী বিবাগী লখিন্দর* উপন্যাসের বালা, *নক্ষত্র নদী ও নারী* উপন্যাসের অমৃত, *অন্ধকারের নদী* উপন্যাসের অশোক, *আঁধার মহিষ* উপন্যাসের কামাল, *নগ্ন নির্জন হাত* উপন্যাসের সুশান্ত, *স্বপ্ন এবং অন্যান্য নীলিমা* উপন্যাসের সরোজ, *শিরিন এবং তার পরিজন* উপন্যাসের অরিন্দম মল্লিক এমন অনেকে। অভিজিৎ সেন চরিত্র নির্মাণে গ্রামের মানুষকেই বেশি এনেছেন, গ্রাম জীবনের অলিগলি নিখুঁতভাবে চিনতেন তিনি।

গ। খল চরিত্র

চলচিত্রে হোক কিংবা সাহিত্যে খল বা ভিলেন প্রধানত দু-ধরনের দেখা যায়। নৃশংস অর্থাৎ যারা প্রাণহানির দ্বারা দাপট দেখায় অর্থাৎ হাতে মারতে পটু। আর এক প্রকার যারা প্রভাব খাটিয়ে অর্থনৈতিক শোষণ, দুর্নীতি, ছল, বিশ্বাসঘাতকতা দিয়ে শত্রুপক্ষকে হয়রানি করে, শাস্তি দেয় অর্থাৎ ভাতে মারতে পটু। এই দুই প্রকারের মধ্যে অভিজিৎ সেনের কথাসাহিত্যে দ্বিতীয় প্রকারের খল চরিত্রের আধিক্য দেখা গেছে। তাঁর বেশিরভাগ এই জাতীয় চরিত্র একটা বিশেষ শ্রেণি থেকেই উঠে এসেছে। আর্থিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিকভাবে সমাজের উচ্চ স্থানে যারা আছে সেখান থেকে। অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের খল চরিত্ররা তাদের খলতা দেখিয়েছে একেবারে প্রথাগত দুটি যায়গায়, জমি ও নারী। জমিকেন্দ্রিক শোষণ অনেক প্রাচীন কাল থেকে চলে এসেছে। বামফ্রন্ট সরকার অপারেশন বর্গা আইন প্রণয়ন করার ফলে বহু ভাগচাষি জমির অধিকার পেয়েছে। সরকারি প্রকল্পে উন্নত সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে বোবা জমিও যখন কথা বলে উঠেছে তখন জোতদার-জমিদার জমির মায়ায় কাতর হয়ে বর্গাচাষির হাত থেকে জমি ছিনিয়ে নিতে ষড়যন্ত্র করেছে। ফলে তাদের আসল চেহারাটা উন্মুক্ত হয়েছে। বর্গাদারের বিরুদ্ধে জোতদার, পুলিশ-প্রশাসন, গুণ্ডা লড়াই করেছে। এই ধরনের ভিলেন অভিজিৎ সেনের অনেক গল্প উপন্যাসেই আছে।

বর্গক্ষেত্র উপন্যাসে রাখাল, গোকুল, শচীকান্তের মতো মানুষেরা আস্তিক ও পরশুরামের মতো গরিব কৃষকের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে তাদের সর্বগ্রাসী মানসিকতাকে চিনিয়েছে। *ক্রান্তিবলয়* উপন্যাসের হারা চৌধুরীও তাই। প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে পুলিশ ক্ষমতাশালীর পক্ষে কাজ করে নিজের লোভ ও লালসাকে প্রকাশ করেছে। একইভাবে *হলুদ রঙের সূর্য* উপন্যাসের দয়া, বনমালী, ভবেশরা পুরো পরিবার মিলে সহদেব বিশ্বাস ও তার গোষ্ঠী এবং আদিবাসী সাঁওতালদের শোষণ করতে ছাড়েনি। অভিজিৎ সেনের গল্পে এই জোতদার শ্রেণির মানুষগুলোকে তাদের প্রবল ক্ষমতা নিয়ে জমির শাসন ও শোষণ করতে দেখা যায় উপন্যাসেও তাই। তিনি সঙ্গে এটাও দেখিয়েছেন জোতদারের ক্ষমতা ক্রমে কীভাবে ম্লান হয়েছে, কৃষক, আদিবাসী, ভাগচাষিদের সচেতনতায়।

রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে অসৎ স্বার্থান্বেষী মানুষগুলো শুধু ব্যক্তির নয় পুরো সমাজের ক্ষতিসাধন করেছে। যেমন *ছায়ার পাখি* উপন্যাসের বিমল দলবল নিয়ে নরেন মালোকে খুন করেছিল। *নিম্নগতির নদী* তে নবীন, সালাউদ্দিন অন্যদিকে খলতা দেখিয়েছে। *অন্ধকারের*

নদী এই গোটা উপন্যাসটি জুড়ে অসৎ মানুষ উঠে এসেছে যারা রাজনীতিতে থেকে মানুষের জন্য কাজ করেনি এবং সরকারি কর্মচারীদেরও কাজ করতে দেয়নি। অমরনাথের মতো ধূর্ত লোক কিংবা বড়ো নেতার ভাইপো বলে পরিচিত বিপ্লব রাজনৈতিক ক্ষমতায় সহজেই হুমকি দিতে পারে বি.ডি.ও অশোককে। এছাড়াও *আঁধার মহিষ* উপন্যাসের সেই লম্পট ইসকান্দার ও তার দলবল, যদিও এদের সঙ্গে রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতা মিশে আছে। এই জাতীয় চরিত্রগুলো অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের খল চরিত্রের মধ্যে পড়ে। কোনো নাটকীয়তা ছাড়াই তিনি এদের কথা বলেছেন উপন্যাসে।

অন্য আর একটি দিক থেকেও অভিজিৎ সেন খল চরিত্র তুলে এনেছেন। নারী সমাজের চিরপরিচিত ভোগ্যপণ্য বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে। নারীকে ভোগ করার মানসিকতা সম্পন্ন এক প্রকার মানুষ তাঁর উপন্যাসের খল চরিত্রের তালিকায় ঠাঁই পেয়েছে। অভিজিৎ সেন *মৌসুমি সমুদ্রের উপকূল* উপন্যাসে মগ ও পোর্তুগিজ দস্যুদের গ্রামে গ্রামে হানা দিয়ে লুটপাঠ, অত্যাচারের কথা বলেছেন তাতে বোঝা গেছে মগরা মূর্তিমান বিপদ। আবার এদের নৃশংসতার পাশাপাশি যুগল সাধুর মতো কিছু দেশীয় দালাল মগদের অত্যাচারে সাহায্য করত, নিজেদের স্বার্থে। *শিরিন এবং তার পরিজন* উপন্যাসেও এমন কিছু দালালের কথা আছে, যারা টাকার বিনিময়ে নারীদের গ্রাম থেকে ফুসলিয়ে এনে বেশ্যাবাজারে বিক্রি করে দিত। অর্থাৎ অভিজিৎ সেন এই জাতীয় চরিত্রকে ভয়ংকর রূপে রূপায়ণ করেননি, দৈন্দদিন জীবনে মানুষ যাদের সঙ্গে থাকে তাদের মধ্য থেকেই উঠে এসেছে অভিজিৎ সেনের খল চরিত্র। সামাজিক জীবনে যে সব ক্ষেত্রগুলোয় মানুষ আজীবন ধরে লোভ-লালসা, হিংসা-স্বার্থপরতা ও সর্বগ্রাসী মনোভব দেখিয়ে এসেছে তারাই তাঁর উপন্যাসের খল চরিত্র। একেবারেই প্রাকৃতিক, কৃত্রিমতার কোনো ছোঁয়া নেই এই জাতীয় চরিত্রে।

ঘ। অপ্রধান চরিত্র

উপন্যাসে অপ্রধান চরিত্রের ভূমিকা প্রধান চরিত্রের থেকে কিছু কম নয়। গল্পের ক্ষেত্রে গৌণ চরিত্র নির্মাণের একটা প্রতিবন্ধকতা থাকে কিন্তু উপন্যাসে সেই প্রতিবন্ধকতা নেই। ঔপন্যাসিক তাই ইচ্ছেমতো গৌণ চরিত্র দিয়ে তাঁর উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলোকে আলোকিত করতে পারেন এবং প্লটকে সুসংবদ্ধ করতে পারেন। অভিজিৎ সেনের

উপন্যাসগুলিতে 'মানুষের মেলা' এই মেলায় যে সব চরিত্ররা এসেছে তাদের প্রধান-অপ্রধান বলে দেগে দেওয়াটা খুব কঠিন কাজ হবে। কারণ তাঁর উপন্যাসে চরিত্রের তালিকা দীর্ঘ। বিশেষভাবে প্রধান চরিত্র তৈরি করেননি, কাহিনির দাবিতে একজন বা দুজন চরিত্র প্রধান হয়ে উঠেছে। সেই প্রেক্ষিতে যদি প্রতি উপন্যসে দু-একজনকে প্রধান চরিত্র ধরেই নেওয়া যায় তবে সেই প্রধান চরিত্রের পাশে অসংখ্য চরিত্রের গুরুত্ব ওই দু-একটি প্রধান চরিত্রের থেকে কিছু কম নয়। *রহু চণ্ডালের হাড়* উপন্যাসে পীতেমকে প্রধান চরিত্র বলা যাবে নাকি সালমাকে নাকি এদের সঙ্গে বাজিকর গোষ্ঠীকে। আবার *মৌসুমি সমুদ্রের উপকূল* উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ক্ষেমংকর নাকি বিষ্ণুপ্রিয় নাকি মগ দস্যুরা। আসলে অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের অসংখ্য চরিত্র শুধু উপন্যাসের কলেবর বাড়ায়নি বা চরিত্রের তালিকা বাড়ায়নি উপন্যাসের আখ্যানকে সুসংবদ্ধ বিন্যাস দিয়েছে। অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের মূল কাহিনিও কোনো সুসংবদ্ধ কল্পিত বা কৃত্রিম কাহিনি নয়, মানুষের জীবনের ওঠা-পড়া, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ, বিশ্বাস, সংস্কার, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিষ্ঠা, হিংসা, লোভ লালসা, প্রেম-অপ্রেম, সামাজিক দায়-দায়িত্ব, ইতিহাসের তথ্যকে বাস্তবতার আলোয় দেখা। এসবই একটি সুসংবদ্ধ কাহিনিতে রূপ পেয়েছে। সেভাবে চরিত্রগুলো সকলেই প্রধান হয়ে উঠেছে বিষয়ের দাবিতে।

৩। সাপ প্রসঙ্গ

অভিজিৎ সেনের সমগ্র কথাসাহিত্যে সাপ একটি বিশেষ চরিত্র বলা চলে। উপন্যাসেও সরাসরি সাপের কথা এসেছে আবার কখনো বা সাপকে সংকেতরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। সাপের প্রতি তাঁর আশৈশব আগ্রহ তিনি *নাগমঙ্গল* উপন্যাসের ভূমিকায় বলেছেন। সাপ বিষয়ে যেখানে যা পেয়েছেন তা পড়েছেন, পুরাণ, মহাভারত, বিজ্ঞান বিষয়ক পত্র-পত্রিকা, কম্পিউটার ইন্টারনেট সাপ নিয়ে তাঁর বিস্ময়কে বাড়িয়েছে। *নাগমঙ্গল* উপন্যাসে সাপ নিয়ে অভিজিৎ সেন যেন তার অতৃপ্ততাকে পূর্ণ তৃপ্তি দিয়েছেন। এই উত্তরাধিকার তিনি পেয়েছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে। এপ্রসঙ্গে অভিজিৎ সেন বলেছেন 'তারাশঙ্করের গল্প উপন্যাসের সাপ আমাকে এখনো ছাড়েনি।' তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *নাগিনী কন্যার কাহিনী* (১৯৫২) উপন্যাসে প্রবৃত্তিতাড়িত নরনারীর ক্রোধ, যাযাবর জাতির বিবরণের সঙ্গে আছে নাগজাতির বিবরণ আছে। অভিজিৎ সেন তাঁর প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন এই জায়গাতেই। *নাগমঙ্গল* উপন্যাসে পুরাণ ও মহাভারতে সাপের অবস্থান সম্পর্কে বিবরণ

দিয়েছেন তবে এখানে সাপকে যে আঙ্গিকে উপস্থিত করেছেন তা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে অনেক আলাদা হয়ে গেছে ঠিকই কিন্তু বিবরণে পৌরাণিক ধারায় সাদৃশ্য আছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সর্পদেবী মনসাকে যেভাবে উপস্থিত করছেন তাতে যেভাবে সাপের বর্নণা এসেছে পরবর্তীতে অভিজিৎ সেনের বর্ণনাতে অনেকটা সাদৃশ্য এসেছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

> মা-মনসা বিষহরির ভয়ংকরী মূর্তিতে দক্ষিণ দিকে মৃত্যুপুরীর অন্ধকার তোরণের সামনে অজগরের কুন্ডলীর পদ্মাসনে বসেছেন—পরনে তাঁর রক্তাম্বর, মাথায় পিঙ্গল জটাজূট, পিঙ্গল নাগেরা মাথায় জটা হয়ে দুলছে, সর্বাঙ্গে সাপের অলঙ্কার, মাথায় গোখুরা ধরেছে ফণার ছাতা, মণিবন্ধে চিত্রিতা অর্থাৎ চিতি সাপের বলয়, শঙ্খিনী সাপের শঙ্খ, বাহুতে মণিনাগের বাজুবন্ধ, গলায় সবুজ পান্নার কণ্ঠির মত হরিদ্রক অর্থাৎ লাউডগা সাপের বেষ্টনী, বুকে দুলছে কালনাগিনীর নীল অপরাজিতার মালা, কানে দুলছে তক্ষকের কর্ণভূষা, কোমরে জড়িয়ে আছে চন্দ্রচিত্র অর্থাৎ চন্দ্রবোড়ার চন্দ্রহার, পায়ে জড়িয়ে আছে সোনালী রঙ্গের লম্বা সরু কাঁড় সাপ পাকে পাকে বাঁকের মতো; সাপেরা হয়েছে চামর, সেই চামরে বাতাস দিচ্ছে নাগকন্যারা—বিষের বাতাস।[৬২]

অভিজিৎ সেন *বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর* উপন্যাসে মালাকারের কন্যা বকুলবালার হাতে বিষহরির চিত্র, নকশা বর্ণনা করেছেন। বকুলবালার মঞ্জুষপট সম্পর্কে তাঁর বর্ণনা এমন—

> বকুলবালার মঞ্জুষপটের একেবারে মাথায় অষ্টনাগ ভূষিতা বিষহরি। সাপের বসন, সাপের ভূষণ, সাপের ওপরে দেবীর আসন। মাথায় ছত্র সাপের ফণা। আসনের দুই পাশে দুই হংস।[৬৩]

এই উপন্যাসে লেখকের কেন্দ্র সাপ নয় তাই নিখুঁত বর্ণনা নেই প্রতিটি সাপের নাম ধরে তবে আদলটা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতোই এটা বোঝাই যাচ্ছে।

সাপ যৌনতার প্রতীক, কিন্তু অভিজিৎ সেন শুধু যৌনদৃশ্য দেখাতে উপন্যাসে সাপের প্রসঙ্গ আনেননি, তিনি বিষধর সাপকে যে কোনো বিপদের সংকেতরূপে ব্যবহার করেছেন। চার পাঁচটি উপন্যাস বাদ দিয়ে প্রায় সব উপন্যাসেই এক-দুবার বা বহুবার সাপের কথা বলেছেন। *বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর* উপন্যাসে নানান প্রতীকে সাপ এসেছে। সাপের প্রসঙ্গে যৌনতাকে বহুস্বরিক মাত্রা দিয়েছেন আবার যৌন পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছে ঘন ঘন। উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র বালা লখিন্দরের জন্ম হয়েছে সর্পদেবীর কাছে মানতের ফলে। বালা বাবার সঙ্গে তাঁতের কাজ করে, যে তাঁতখানায় বালা বসে তার পাড়ডোবার ভিতরে একটা সাপ ঢুকে গিয়েছিল আসলে এই সাপ বালার মনে ঢুকেছিল। এই সাপের তাড়নায়

বালার পরবর্তী জীবন পরিচালিত হয়েছে। আবার সেই সাপকে মারতে গিয়ে রাজকিশোরের ভাগ্নে মহেন্দ্র যখন 'সাপ, মামা, সাপ' বলে চিৎকার করে তখন রাজকিশোর বলেছে 'সাপ এই সময়ে! কোঠে রে সাপ?' সময়টা অসময় বটে, কারণ তার আগেই রাজকিশোর তিন মাসের সন্তানবতী বাড়ির কাজের মেয়েটির ঝাঁট দিতে ঝুঁকে পড়া ঢিলেঢালা শরীর দেখতে উদাসীন ছিল ফলে মনের মধ্যে একটা আকাঙ্ক্ষা ক্রমশ উজ্জীবিত হয়েছিল। ঠিক তখনই মহেন্দ্র চমকে দিয়েছে রাজকিশোরকে।

বিদ্যাধরীর সঙ্গে বৃদ্ধ গুণমান কবিরাজের বিয়ে হয়েছিল। বার্ধ্যকজনিত কারণে কবিরাজ বিছানায় প্রতিদিন ব্যর্থ চেষ্টা করে ক্লান্ত হয়ে যেত এবং যৌন মিলনের এই ব্যর্থতায় বিদ্যা হতাশ হত। কবিরাজের এক শিষ্য শংক বিদ্যার এই হতাশাকে সুযোগ করতে রোজ দরজায় চোখ লাগিয়ে থাকত। একদিন বর্ষণমুখর এমনই এক রাতে কবিরাজ ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তারপর—

> এই সময় হঠাৎ সে চমকে উঠেছিল। তীব্র নিঃশ্বাস ফেলল কেউ ঘরের মধ্যে! সে ভয় পেয়ে প্রথমেই ভাবল, শংক কি কোনওভাবে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে? ...শব্দের উৎস লক্ষ করে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতে বিদ্যা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো স্থির হয়ে গেল। মাটির মেঝেতে একটা সাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে। দীর্ঘ বলিষ্ঠ একটা গোক্ষুর, আবছা আলোয় বাস্তবের থেকেও ভয়ংকর দেখাচ্ছে।[৬৪]

ঘরের সাপটা আসলে ইঁদুর খেতে এসেছিল, কবিরাজের ওষুধ তৈরির কাজে চেয়ে আনা বা কিনে আনা সাপ ছিল না। এটা বিষাক্ত গোখরো, কবিরাজের ঝাঁপিতে রাখা সাপিনীটার গন্ধ পেয়েছে তাই ঝাঁপিটাকে জড়িয়ে পাক খেতে থাকে কারণ ঝাঁপির আগল খোলার সাধ্য তার ছিল না, তাই ক্রমশ অধৈর্য হয়েছিল সে। অন্যদিকে দরজার বাইরে বিদ্যার শরীর পাবার আকাঙ্ক্ষায় সাপটার মতোই অধৈর্য হচ্ছিল শংক। বিদ্যা দরজাটা খুলে দেয় যাতে সাপটা বেরিয়ে যায় কিন্তু শংক দরজা খোলা পেয়ে বিদ্যার আহ্বান ভেবেছিল, তখন—

> বিদ্যা মূর্তির মতো বসেছিল। তারপরে শংক সক্রিয় হল এবং যেভাবে আলোর টানে পতঙ্গ এগিয়ে আসে, শংক আরও দুপা তেমনই এগিয়ে এল। ...সে তারপরে সাপের ক্রুদ্ধ নিশ্বাস শুনল এবং তার অথবা সেই অশরীরীর আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী শংকর গলার চাপা আর্তনাদ শুনল। শংক যেন নিজের অজান্তেই ছিটকে বাইরে বেড়িয়ে গিয়েছিল।[৬৫]

এরপর শংক মারা গেলে দুর্যোগের রাতে বাইরে তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। এই ঘটনার আগেই বিদ্যা কবিরাজকে ঘরের ইঁদুরের গর্তটার কথা বলেছিল এবং সাপ আসার সম্ভাবনার কথাও বলেছিল। বিদ্যা জানত তাকে নিয়ে নানান মানুষের আকাঙ্ক্ষার কথা, আসলে বার বার তার সমাজ থেকে এই অভিজ্ঞতা অর্জনের দুর্ভাগ্য হয়েছে। আর কবিরাজের ঘরে যুবতী স্ত্রী ফলে তার বাড়ির পাশে এমনকি ঘরে শংকর মতো সাপ তো আসবেই। যৌনদৃশ্য ও সাপের আগমণ, বিচরণ একটির সঙ্গে অন্যটি সম্পর্কিত, এই মেলবন্ধনের একটা রেশ যথেষ্ট ইঙ্গিতবাহী। বিদ্যার অতৃপ্ত যৌনতা, শংকের লালসা, কবিরাজের নিস্ফল চেষ্টা এই ব্যাপারগুলোকে সাপের বর্ণনা দিয়ে বোঝানো হয়েছে এই অংশে।

বিদ্যা তার দুই বাহুকে একটির সঙ্গে অন্যটি জড়িয়ে সাপের ফণার মতো করে শুন্যে তুলে, মুখোমুখি দুটি ফণা দেখে বিদ্যা কেঁপে উঠেছে। অন্য একটি ঘর থেকে বালার নীল আহ্বান পেয়েছে সে। বিদ্যার বুক অনর্গল হয়েছে, বালা বিদ্যার চোখে নেশাতুর আহ্বান দেখেছে। এখানে অভিজিৎ সেন লিখেছেন—

> বিদ্যা তার ডান-পা চৌকাঠের ভিতরে ঢুকিয়ে বাঁ-পাও টেনে নেবার আগে অন্তত আরেকবার পিছন ফিরে বালার চোখে তাকাল। বালা সেই চোখের ভিতরে আবহমান কালের আহ্বান দেখল। নোনা মদির গন্ধ ঘরের ভেতর থেকে ভেসে এল তার নাকে, যেমন সেই সাপের কাছে এসেছিল শংক খুন হওয়ার প্রলয়ের রাতে।[৬৬]

কাজের মেয়েকে দেখে যেভাবে রাজকিশোরের যৌনতৃষ্ণা জেগেছে, কবিরাজের বিদ্যার সঙ্গে মিলনের নিস্ফল প্রচেষ্টা, শংকর বিদ্যাকে নিয়ে আকাঙ্ক্ষা, বালা ও বিদ্যার প্রেম, মিলনের মুহূর্ত সবক্ষেত্রে সাপকে প্রতীক করে লেখক যৌনতাকে অন্য মাত্রা দিয়েছেন। বিদ্যা-বালার প্রেমেও যৌনতার আবেদন তীক্ষ্ণ ছিল। বালা বিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হবার মূল কারণ ছিল বিদ্যার শরীর। বিদ্যার বিবেকের তাড়না থাকলেও বালা প্রবলভাবে বিদ্যার শরীর চেয়েছিল। অভিজিৎ সেন সুদক্ষ কথাকার, বালার ও বিদ্যার মনের সাপকে মেপে, সেভাবভেই ব্যাপ্তি দিয়েছেন উপন্যাসে।

ছায়ার পাখি উপন্যাসের একটা অংশ জুড়ে বন্যা পরিস্থিতির চিত্র আছে। সেই সুবাদে সাপের প্রসঙ্গ এসেছে অনেকবার। উপন্যাসে বর্ণিত জলছুই, আড়বেঁকি, অর্জুনপুর, যুগীপাড়া বন্যাকবলিত। বন্যার জলে ডিঙি নৌকো নিয়ে রব্বা যখন বেরোয় তখন কয়েকটা বিষধর

সাপকে সাঁতরে যেতে দেখে আশ্রয়ের খোঁজে। তার মধ্যে একটাকে সে চিনতে পারে সেটা ছিল বিন্নাথুপী, যেটা তার নৌকার দিকে আসছিল। ডিঙি টাল খাওয়াতে সাপটা ভয় পেয়ে ডুব দেয় আর বিশ পঁচিশ হাত দূরে গিয়ে ওঠে। প্রায় পাঁচ হাত লম্বা এত বড়ো সাপ সচরাচর দেখা যায় না বলেই মনে করেছে রব্বা। বন্যায় সাপ দেখা যাবে এটা খুব স্বাভাবিক কিন্তু এই উপন্যাসে সাপ অন্য আঙ্গিকেও এসেছে। কৌশল্যা সারাজীবনে স্বামী ও সন্তানের উপেক্ষা আর অবহেলায় দিনের পর দিন কষ্ট পেতে পেতে অপমান আর হতাশায় অভিশাপ দিয়েছে ছেলে ও স্বামীকে—

> তোক্ সাপে খাবে—সাপে খাবে তোক্! আমার মন—আমার শরীর—আমি মানুষটা কিছু নই তোদের? সাপে খাবে— [৬৭]

কৌশল্যা হয়তো রাগে, দুঃখে, অপমানে মূর্তিমান সাপে খাবার কথা বলেছে কিন্তু সে এটাও জানত তার স্বামী ও সন্তানকে আগেই কামনারূপী সাপ খেয়েছিল। কারণ বিমল বিধবা রাজেশ্বরীর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাকে ভোগ করেছিল। সাপ তার পিছু ছাড়েনি তাই অসুস্থ মায়ের অভিশাপের পর বর্ষার রাতে, অন্ধকারে, বিছানায় অনেকবার সাপের আতঙ্কে নীল হয়ে গেছে। অন্যদিকে বিমলের বাবা সুরেশ্বর নেশাগ্রস্ত, কামুক, সংসার উদাসীন ব্যক্তি। সারাজীবনে স্ত্রীলোক ও মদ্যপান ছাড়া কোনোকিছুতেই উত্তেজিত হয়নি। কিন্তু নিজের স্ত্রী কৌশল্যাকে সে অনেকদিন ভালো করে দেখেইনি। মধ্যবয়স্কা কৌশল্যা একদিন জলের আয়নায় নিজেকে দেখে শরীর মনে একটা পুলক অনুভব করেছিল, পুকুরে আবগাহন করে জলের শীতলতা শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ দিয়ে উপলব্ধি করেছে। কিন্তু হঠাৎ জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কেটে আসতে দেখে একটা সরীসৃপকে। কৌশলা ভেবেছিল সাপ কিন্তু না সেটা গোসাপ ছিল। কৌশল্যা অনেকদিন স্বামীর সোহাগ পায়নি, সুরেশ্বর ছুঁয়েই দেখেনি অনেকদিন তাকে, তাই শরীরের চিন্তায় ডুবে থেকে সাপ ভেবেছিল।

বন্যা পরিস্থিতির মধ্যে সবাই গ্রাম ছাড়লেও, কৌশল্যার স্বামী সন্তান নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেলেও কৌশল্যা ঘর ছাড়েনি। মানসিক মৃত্যু আগেই হয়েছে তার তাই শারীরিক মৃত্যুকে ভয় পায়নি সে। বন্যায় ধ্বংসস্তূপের মধ্যে একটা পুরোনো গোক্ষুর সাপকে দেখেছিল কৌশল্যা। অভিজিৎ সেন লিখেছেন—

> মাথা উঁচু করে, চক্র প্রসারিত করে সে একবার পুবের দিকে তাকায়। কৌশল্যা তাকে দেখতে থাকে। সে তার এত চেনা এবং এতবার তারা পরস্পরকে দেখেছে যে, কৌশল্যা মোটেই আতঙ্কিত হয় না। সাপ ভেঙে পড়া একটা বাঁশের আড়াকে জড়িয়ে উঠোনের জলে ভেসে পড়ে। জলের উপরে মাথা তুলে সাঁতার কাটা গোক্ষুরকে পুরোপুরি দৃষ্টিগোচর হয় কৌশ্যলার। চারহাত লম্বা সাপ। লেজের দিকটা মোটা এবং ভোতা। তাতেও কিছু যায় আসে না কৌশল্যার। সে স্থির দাঁড়িয়ে সাপকে উঠে আসতে দেখে দাওয়ার উপর।[৬৮]

এরপর সাপটাও খোলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকেছে। এখানেও বর্ণনায় একটা আলাদা মাত্রা এনেছেন লেখক। যার ঘরে মূর্তিমান কামনার দুজন দৈত্য আছে তার বিষাক্ত গোক্ষুরে ভয় থাকবে কীভাবে। সাপ ও কৌশল্যার সখ্যতা তৈরি হয়েছে এখানে। সাপ ও কৌশল্যার সম্পর্ক নিত্য পরিচিতের মতো, যেমন তার স্বামী সন্তান তার কাছে। তাই নির্দ্ধিধায় মৃত্যুকে আহ্বান করেছে সে। কৌশল্যাকে খুঁজতে আসা মানুষগুলো ঘরে কৌশল্যার মৃতদেহ ও প্রাণঘাতী সেই বিশাল গোক্ষুরকে উদ্ধার করেছিল, এরা সাপটাকে মারলেও এই গোক্ষুরের মৃত্যু আর কৌশল্যার মৃত্যুতে কী সুরেশ্বর ও বিমলের কামনার মৃত্যু হবে একথা জানা হয়নি কৌশল্যার।

নিম্নগতির নদী উপন্যাসের এক দম্পতির যৌন মিলনের সময় সাপের প্রসঙ্গ এসেছে। চল্লিশ বছর বয়সী মৈথিলী বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে দেওয়া বারমুডা পরা যুবকদের চোখ দিয়ে মাপছিল, কাকে কোন পোশাকে আকর্ষণীয় লাগে, কার বয়স কত, কে মৈথিলীর দিকে চোখে চোখ রেখে কথা বলতে চেয়েছে ইত্যাদি। এসব ভাবতে ভাবতে চোদ্দ বছর আগে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেমিক সুবীরের সঙ্গে জ্বলে ওঠার অনুভূতি, দহন, দাবানলের স্মৃতি মনে করেছে। বন্যার মধ্যে হঠাৎ একাকীত্ব অনুভব করেছে, সুবীর বাড়ি ফিরলে দরজা খুলতে গিয়ে মনে হয়েছে 'এক্ষুনি দুটো হাইটেনশন কেবলের সংস্পর্শে সেই ষোলো বছর আগের মতোই আগুন জ্বলে যাবে।' হয়ও তাই, সুবীরের সঙ্গে কেউ আছে কিনা নিঃসন্দেহ হয়ে দরজা খুলেছে মৈথিলী, গায়ে ব্লাউজ নেই, শুধু শাড়ি জড়িয়ে ডানহাত দিয়ে চেপে ধরে ছিল, সুবীরকে দেখে হাতখানা ছেড়ে দিয়েছে। দুই হাত দিয়ে সুবীর মৈথিলীকে আকর্ষণ করতে গিয়ে বুঝেছে, মৈথিলী কাতর। সিঁড়ি দিয়ে একে অপরকে জড়িয়ে নীচের তলায় বন্যার জলে নেমে, সুবীর গাঢ় চুম্বন করেছে। জলের নীচে অনাবৃৎ হয়ে মৈথিলী দুই হাতে

সুবীরের গলা জড়িয়ে দুই পা দিয়ে কোমর জড়িয়ে ধরেছে। সুবীর মৈথিলীর ঠোঁট নিজের মুখে নিয়ে চুম্বন করতে গিয়ে দেখেছে—

> একটা মাঝারি দৈঘের ঢোঁড়াসাপ ঘরের দেয়াল ঘেঁষে পাক খেতে শুরু করেছে। সে মুখ উঠিয়ে নিল না কিন্তু সাপটার দিকে লক্ষ রাখল। সাপ দেওয়াল ছেড়ে কাছাকাছি এল এবং তিন চার হাত ব্যাসার্ধে তাদের দুজনকে বেষ্টন করে ঘুরতে থাকল।[৬৯]

মৈথিলী এই ঢোঁড়া সাপকে শয়তান মনে করেছে কারণ এই সাপ মিলনে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। অনেক কষ্টে এই রোমান্টিক পরিবেশ নির্মাণ করেছিল মৈথিলী। নির্বিষ ঢোঁড়া সাপ সেই পরিবেশকে নষ্ট করেছে।

নিম্নগতির নদী উপন্যাসটির মূল চরিত্র ত্রিদিব একবার বন্ধু যতীনকে সঙ্গে নিয়ে তিনপাহাড় গিয়েছিল। সেখানের অসংখ্য পাখির সমবেত মৈথুন দেখেছে ত্রিদিব। আর দেখেছে মাটি থেকে প্রায় সাড়ে চার হাত লম্বা হয়ে দুটি বিশাল আকৃতির সাপ ভয়ংকর লড়াই করছে। ত্রিদিব ভেবেছিল এটাই বোধহয় সাপের শঙ্খলাগা। কিন্তু যতীনের কথায় বিস্মিত হয়েছে আরও, কিছুটা দূরে তৃতীয় আর একটি সাপ পাঁচ ফুট খাড়া হয়ে লড়াইরত দুই সাপকে দেখছে আবার মাথা নামিয়ে নিচ্ছে। তৃতীয় সাপকে যৌনসঙ্গী করার লড়াই চলছিল দুটি সাপে। এই লড়াইয়ে বিজয়ী সাপ লাভ করবে তৃতীয় সাপকে। লড়াই শেষ হলে, পরাজিত সাপটিকে অনেকদুর তাড়িয়ে দিয়ে বিজিত সাপটি ফিরে এসেছে। এবার—

> প্রায় পাঁচফুট উচ্চতায় ফণা তুলে দাঁড়িয়ে গর্জন করে উঠল। গভীর, মুহুর্মুহু, দীর্ঘ শঙ্খধ্বনি। যেন বিজয়তূর্য। তার প্রেমাস্পদা এবারে ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। শুরু হল তাদের আকাঙ্ক্ষিত মিলন।[৭০]

মাথার উপর হরিয়াল পাখির প্রেম ক্রেংকার আর নীচে নাগ ও নাগমতীর মিলন, যতীন বলে এসব দেখা নাকি সৌভাগ্যের, এসব নাকি দৈবদৃশ্য। মানুষের সব কামনা-বাসনা পূর্ণ হত এসব দৃশ্য দেখে। ত্রিদিব ভেবেছে তার সমস্ত কামনা-বাসনা যাকে ঘিরে সে হল লক্ষ্মীতারা। ত্রিদিবের সঙ্গে দেয়াশিনী লক্ষ্মীতারার একটা সম্পর্ক ছিল। এই সম্পর্কে প্রেম থাকলেও কামনা বাসনাও কম ছিল না। সাপের শঙ্খলাগা প্রসঙ্গে ত্রিদিবের মনে পড়েছে লক্ষ্মীতারার সঙ্গে মিলনের একটি দৃশ্য। লক্ষ্মীতারার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে যে ঘটনা ঘটিয়েছিল তার

ব্যাখ্যা ত্রিদিব এখনো পায়নি। সেদিন ত্রিদিবকে শঙ্খলাগা শঙ্খচূড় সাপের মতো প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে লড়াই করতে হয়নি তবু ত্রিদিব অনভিজ্ঞ, অধৈর্য, আনাড়ির মতো—

> চুম্বন করতে গিয়ে দাঁতের আঘাতে লক্ষ্মীতারার ঠোঁটে রক্তাক্ত ক্ষত সৃষ্টি করেছিল সে। স্তন খুঁজতে গিয়ে জামা ছিঁড়ে দিয়েছিল লক্ষ্মীতারার এবং কান্ডজ্ঞানহীন হয়ে নিজের হাতেই সেফটিপিন ফুটিয়ে রক্তাক্ত হয়েছিল সে।[৭১]

অভিজিৎ সেন সাপ ও পাখির মিলনের প্রসঙ্গে ত্রিদিবের মিলন বৃত্তান্ত বলেছেন। লেখকের অপূর্ব বর্ণনায় একটির সঙ্গে অন্যটি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। ত্রিদিবের অন্তরের সুপ্ত সাপ এই সাপের লড়াই দেখে জেগে উঠেছিল। এই দৃশ্য আসলে ত্রিদিবের ব্যর্থ যৌন আকাঙ্ক্ষাকেই ইঙ্গিত করেছে।

হলুদ রঙের সূর্য উপন্যাসের সহদেব বিশ্বাস পূর্ববঙ্গের মানুষ ছিল। এদেশে স্থায়ীভাবে বাসের জন্য দয়া ঘোষের পতিত জমিগুলো পছন্দ করেছে, যেগুলো গিঁট নামে পরিচিত। একদিন সকালে সহদেব দেখতে দেখতে পঞ্চম গিঁটের কাছে এসে এক আশ্চর্য জিনিস দেখেছে, তখন সবে সূর্য উঠেছে, কয়েকটা নিঃসঙ্গ তালগাছের মাথায় সেই আলো ঝলসে উঠেছে। সহদেব দেখেছিল—

> সেই সব গাছের মাথায় বড় আলোড়ন। না, পাখি নয়। গাছের মাথায় সাপ অনেকগুলো। দূর থেকেও সহদেব দেখে বুঝল তারা বিষধর সাপ। সাপগুলো যেন একদল শিশুর মতো হুটোপুটি খেলায় মত্ত। আর তাদের গর্জন। মানুষ এমন দৃশ্য কদাচিৎ দেখে।[৭২]

এরপর দ্বিতীয় এক ব্যক্তি সাপগুলো সম্পর্কে সহদেবকে বলে 'চারধারে জল। কুনঠি আর যাবেন। ওঁয়াদের এখন বড় কষ্ট। জল টানলে নাইমে যাবে।' দুটি ফিঙে এসে সাপগুলোকে ঝাপটা মারতে চেষ্টা করেছে, ছাতার পাখি কর্কশ চিৎকারে বিরক্ত করেছে সাপগুলিকে। ছাতার পাখি আর ফিঙের অত্যাচারে সাপগুলো পাতার নীচে, গাছের কোটরে ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে গেল। লক্ষণীয়, এখানে সাপ কোনো ভয়ের, যৌন দৃশ্যের, বিপদের সংকেত নয় যেভাবে অন্য উপন্যাসে অভিজিৎ সেন সাপের চিত্র এঁকেছেন। এই উপন্যাসের সাপগুলো অনেক নিরীহ, শান্ত। সহদেবের মতোই নিরীহ, সহদেবের মতোই সহায় সম্বলহীন, সহদেবের মতোই তারাও নির্দিষ্ট বাসের জায়গা পায়নি। আজ সহদেব আর এই গাছের মাথার সাপেরা একই রকম অসহায়। এরপরেই বেণীর গিঁটের দাম দর করতে গিয়ে

সহদেব নিজেকে সাপের সঙ্গে তুলনা করে দয়া ঘোষকে বলেছে 'সাপ মাইরে ল্যাজে বিষ রাখলেন বড়বাবু'। হয়তো প্রবাদ ব্যবহার করেছে সহদেব কিন্তু একথা সহদেবের অবস্থার ইঙ্গিতবাহী। আর ফিঙে, ছাতারের মতো সহদেবের গোষ্ঠীকে বিরক্ত করতে দয়া ঘোষের ভাই বনমালি, দয়ার ছেলে ও অন্যান্য জোতদাররা এসে জুটেছিল। লেখক শুধুই যৌনদৃশ্য বর্ণনায় নয় মানুষের অসহায়ত্ব বোঝাতেও সাপকে ব্যবহার করেছেন তাঁর উপন্যাসে। বস্তুত সাপ অভিজিৎ সেনের উপন্যাসে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন ইঙ্গিত নিয়ে এসেছে, স্পষ্টভাবে সেই ইঙ্গিত বোঝাও গেছে।

৪। নদী প্রসঙ্গ

নদী জীবনের বহমানতাকে ইঙ্গিত করে। নদীকে কেন্দ্র করে মানুষের জীবন আবর্তিত হয়েছে। নদী জীবিকার সংস্থান করে, মানুষকে আশ্রয় দেয়। আবার 'নদীর বিদ্রোহ' কালে মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কারণ হয়েছে নদী। তখন নদী হয়েছে সর্বনাশী, ধ্বংসকারী, মানুষের শত্রু তবুও মানুষের জীবনে সার্বিকভাবে নদীর অবদান ব্যাপক। জীবনের মতো সাহিত্যেও নদীর একটা বিশেষ ভূমিকা আছে, বিশেষ করে কথাসাহিত্যে। মধ্যযুগের সাহিত্যেও নদীর কথা এসেছে টুকরো টুকরো ভাবে। বাংলার শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির কয়েকটি নদীকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *ইছামতী* (১৯৫০), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝি* (১৯৩৬), অদ্বৈত মল্লবর্মণের *তিতাস একটি নদীর নাম* (১৯৫৬), সমরেশ বসুর *গঙ্গা* (১৯৫৭), প্রফুল্ল রায়ের *কেয়াপাতার নৌকো* (১৯৬৯) এছাড়াও আরও বেশ কিছু উপন্যাসে নদী বিভিন্ন ভূমিকায় এসেছে। নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলি আঞ্চলিকতাকে ধরে রেখেছে। অভিজিৎ সেনের উপন্যাসেও নদী এসেছে বিভিন্ন ভূমিকায়, ত্রাতা রূপে ও ধ্বংসকারী রূপে। উপন্যাসের আখ্যানে নদী এসেছে আবার মানুষের জীবনের চলমানতার প্রতীকরূপেও অভিজিৎ সেন নদীকে ব্যবহার করেছেন। *রহু চণ্ডালের হাড়*, *অন্ধকারের নদী*, *ছায়ার পাখি*, *বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর*, *নিম্নগতির নদী*, *আঁধার মহিষ* অভিজিৎ সেনের এই উপন্যাসগুলির আখ্যানে নদী এসেছে বিভিন্ন ভূমিকায়।

রহু চণ্ডালের হাড় উপন্যাসে বাজিকরদের অপরিচিত দেশে 'ঘর্ঘরা নামে এক পবিত্র নদী বয়ে যায়।' ভূমিকম্পে সব ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল, ঘর্ঘরার বিশাল তীর গোরখপুরের বাজিকরদের বাড়িঘর ও একমাত্র অবলম্বন অসংখ্য জানোয়ার নিয়ে নদীগর্ভের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। পীতেম তার দলবল নিয়ে ঘর্ঘরার উত্তর তীরে ডেরা তুলেছিল। তারপর

বাজিকররা দানাপুর, পাটনা, মুঙ্গের, মালদা, নমনকুরি, পাঁচবিবি ঘুরে রাজমহলে গঙ্গার ধারে সারি সারি ছাউনি ফেলেছে। বাজিকরের ছেলে ধন্দুর প্রিয় ঘোড়াটা দারোগা নিয়ে গেছে ফলে ধন্দু গঙ্গার তীরে বসে বিষনণ্নতা যাপন করেছে। বাজিকরের পৌঢ় রমনী সালমাও হস্তরেখা গণনা করতে গিয়ে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে থাকত। বাজিকরদের গোষ্ঠীর হাজার বছর আগের কাহিনিতেও আছে নদীর কথা। বাজিকরের মতো যাযাবর গোষ্ঠীগুলো তাদের অস্থায়ী বসবাসের জন্য নদীর তীর বেছে নিত, ফলে তাদের অনেকসময় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। যেমন বাজিকরদের ক্ষেত্রে—

> গঙ্গার পাড়ের বালি হালকা হাওয়ায় দিগ্‌বিদিকে উড়তে থাকে। তারপর ক্রমশ গঙ্গার ওপরে হঠাৎ হঠাৎ টুকরো মেঘের আবির্ভাব হয় এবং অচিরে তা ঝঞ্ঝার আকারে ফেটে পড়ে, তাঁবুগুলোকে ছিঁড়ে উড়িয়ে নিয়ে যায়।[৭৩]

বাজিকররা এই সময়গুলোতে গঙ্গাপাড়ে থাকা নিরাপদ মনে করেনি, অন্য কোথাও তাঁবু ফেলেছে। বাজিকরদের আদিপুরুষ ও দলপতি রহু তার দলবল নিয়ে যেখানে থাকত সেখানের নদীতে ছিল প্রচণ্ড স্রোত। রহু বহিরাগতদের হাত থেকে তার দলবল ও নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি। নদীর স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল বাজিকররা। বহিরাগতদের আক্রমণে রহুর দেহ নদীতেই ভেসে গিয়েছিল। রহুর রক্ত নদীর জলে মিশে প্রবল বন্যার সৃষ্টি হয়েছিল, যে বন্যায় বহিরাগতদের গড়ে তোলা নগর ধ্বংস হয়েছে। রহুর অনুগামীরা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে রহুর হাড় খুঁজে পেয়েছিল, সেই হাড় তাদের আগামীর পথ চলার জিয়নকাঠি। যাযাবরের আদি পুরুষের জীবন জুড়ে নদীর ভূমিকা ব্যাপক। এদের জীবন নদীর স্রোতের মতোই বহমান ছিল। বাজিকররা নমনকুড়িতে আশ্রয় কালে ভাল চাষের আশায় বসতি স্থাপন করলেও সেখানের জমিদারের সংগঠিত অত্যাচারে নমনকুড়ি ছেড়ে রাজশাহি শহরের বাইরে পদ্মা নদীর ধারে আশ্রয় নিয়েছে। এখানেও বিপত্তি হলে রাজশাহি শহরের উত্তরে পাঁচবিবি গ্রামে পাতালু নদীর তীরে নতুন বসতি গড়ে তুলেছিল বাজিকররা। জামির ও তার স্ত্রী লুবিনির মৃত্যু পর্যন্ত তারা নদীর তীর আঁকড়ে পড়ে থেকে সেখানে চাষ শিখতে চেয়েছিল।

অন্ধকারের নদী উপন্যাসের নামে নদী শব্দের উল্লেখ থাকলেও নদী এখানে প্রতীক মাত্র। সমাজের ও জীবনের গতি অন্ধকার পথে ধাবিত এমনটাই লেখক বুঝিয়েছেন। তবে

উপন্যাসের পানজোড়া ব্লকের দক্ষিণ দিকে একটি নদী ছিল। যে নদীটা উত্তরের নদীগুলির মতো বর্ষায় বেগবান হত, এই নদীতীরে ভ্রমণের জন্য বিশেষ কেউ আসত না। কিন্তু উপন্যাসের মূল চরিত্র অশোক তার কর্মজীবনের হতাশা নিয়ে এক সন্ধ্যায় এই নদীর তীর ধরে হাঁটতে গিয়ে মানুষের করুণ ঘরকন্নার চিত্র দেখেছে। আর এই অন্ধকার নদীটির মতো সত্য ছিল সমাজের ধারাবাহিক দুর্নীতি এটাও উপলব্ধি করেছে। তাই নদীর কাছে গিয়ে জল ছুঁতে তার ভয় হয়েছিল। আর এই অন্ধকার নদীর পাশেই আছে বেশ্যা বেঁকির অন্ধকার জগৎ, অশোক সেখানেও যেতে পারেনি। পানজোড়া ব্লকের বি.ডি.ও অশোক রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে হাসপাতালে আচ্ছন্নতার মধ্যে অন্ধকারের নদীতে নেমে যাবার সংশয় উপস্থিত হয়েছে কিন্তু যেতে পারেনি তার বিবেক ও মনুষ্যত্ব জাগ্রত ছিল বলে।

'চিরি নদী পৃথিবীর এক প্রত্যন্তে।' *ছায়ার পাখি* উপন্যাস শুরু হয়েছে এই বাক্যটি দিয়ে। চিরিকে এই উপন্যাসে প্রতীকে ব্যবহার করেছেন অভিজিৎ সেন। নদীটি মানুষের জীবনে গুরুত্ব হারিয়েছে, এক সময় তার গতি ছিল, যৌবন ছিল এখন সে মানুষের কাছে অবান্তর। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে নানান আধুনিক ব্যবস্থায় অভ্যস্থ মানুষ নদীকে মনে রেখেই কী করবে, তবুও চিরি আছে। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমায় চিরির রূপ মোহময় হয়ে উঠত। রাস্তার দুইধারে দুই বিল ধল্লা ও আড়বেঁকির সঙ্গে চিরি একাকার হয়ে উঠেছে। এই দুটি বিলের কথা উপন্যাসে বার বার এসেছে। 'চিরি নদীর অববাহিকায় নিয়তি-নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটে' মানুষের জীবনের ও সমাজের যাবতীয় ঘটনার দীর্ঘদিনের সাক্ষী এই নদী। চিরি, আরবেঁকি, ধল্লা জলে থই থই করলে পার্শবর্তী গ্রামগুলো বন্যাকবলিত হলে তখন মানুষ নদীর দিকে মন দিত, নদীকে বাগে আনার চেষ্টা করত। অভিজিৎ সেন চিরির মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করেছেন, মানবীর রূপ দিয়েছেন। চিরির মধ্যে যেভাবে কলমি হিঞ্চে তর তর করে বেড়ে ওঠে উপন্যাসের বিধবা গর্ভবতী রাজেশ্বরীর স্নিগ্ধতা ও সরলতা সেই লাকুক উদ্ভিদের মতোই।

আঁধার মহিষ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উত্তেজনার লেখচিত্র। এই জাতীয় উপন্যাসেও অভিজিৎ সেন গুরুত্ব দিয়েছেন নদীকে। আসলে জল ছাড়া মানুষ বাঁচে নাকি? একথা লেখক শুধু বলেননি, তাঁর উপন্যাসে দেখিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—

> ঘাটের নাম পিরগঞ্জ। ওপাড়ের গ্রামটির নামও তাই। নদীর নাম যমুনা। এই যমুনাই সেই যমুনা, সাড়া উত্তরভারত জুড়ে যার বিস্তৃতি। পথে-ঘাটে কত যমুনা![৭৪]

'নদী যমুনার নামের আড়ালে আত্রাই নদীটি আছে' একথা অভিজিৎ সেন বলেছেন। আত্রাই বা যমুনার উত্তর পাড়ে ঘাটের ইজারাদার মাচান করে বসে ঘাটের ভাড়া নিত। শ্রাবণে ভরে ওঠে নদী, এই নদীর মাঝে নৌকাতেই উপন্যাসের প্রথম দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে। উপন্যাসের শেষ দৃশ্য চাঁদের আলো ও ভরা যমুনার বুকেই চিত্রিত হয়েছে। দুজন বালক যমুনার বুকে নৌকা ঠেলছে সেই নৌকায় ধর্ষিত অলকানন্দার দেহটা পড়ে আছে। চিরির মতো এই যমুনাও অনেক কিছুর সাক্ষী হয়েই থেকে গেছে। আনন্দ-বেদনায় এমনকি অত্যাচারে যমুনা নির্বিচারে সবাইকে আশ্রয় দিয়েছে।

বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর উপন্যাসের বালা নদীতে জাল নিয়ে গিয়েছিল। তার মায়ের দুশ্চিন্তা, মানতের ফলে বালার জন্ম হয়েছে, নাম দেওয়া হয়েছে বালা, লখিন্দরের মতো কলার ভেলায় যদি ভেসে যায়। এই ভয়ে কোনোদিন বালাকে ভেলা চাপতে দেয়নি তার মা, তাই নদীতে গেলেও ভয় হত। বালা নদীর স্বপ্ন দেখলে এতেও মায়ের আশঙ্কা হয়েছে। ভাদ্র মাসের ভরা নদীতে বালা এলুয়ার বাঁকে পড়লে মায়ের দুশ্চিন্তা আরও বেড়েছে। বালার মা মায়নোমতি স্বপ্ন দেখে বালাকে নদী থেকে তুলে আনা হয়েছে, কারা যেন তাকে কোঁচ দিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছে। এই উপন্যাসে নদী বিপদের সংকেত হিসাবে এসেছে তাই হয়তো নির্দিষ্ট কোনো নদীর নাম নেই। মাছ ধরতে গিয়ে এলুয়ার দহে বিপদে পড়লে গুণমানের কাছে সিধে দিতে গিয়ে বালা গুণমানের যুবতী স্ত্রী বিদ্যার প্রেমে পড়েছিল। আর মায়ের সমস্ত হতাশা দুশ্চিন্তা জাগিয়ে রেখেই সেই এলুয়ার দহ এলুয়ার শ্মশান পার করে নদীপথেই বালা বিদ্যাকে নিয়ে ভেসে গেছে।

শুধু নদী কেন্দ্রিক উপন্যাস বা আঞ্চলিক উপন্যাস লেখার জন্য নদীর বর্ণনা করেননি অভিজিৎ সেন, স্বাভাবিক ভাবেই নদী, সাপ তাঁর উপন্যাসে নানা ধরনের প্রতীকে উঠে এসেছে। উপন্যাসের শুরুতে ও শেষে এবং অন্য স্থানেও নদীর কথা বলে প্রতিকায়িত বিষয়ের ব্যাখ্যা নিজেই বুঝিয়ে দেন, এটা অভিজিৎ সেনের স্বতন্ত্র কৌশল। *হলুদ রঙের সূর্য* উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের ফলে বাংলাদেশ থেকে চলে আসা সহদেব বিশ্বাস সরলা নদীর মধ্যে জেগে থাকা দ্বীপগুলো একটার পর একটা দখল করতে চেয়েছে। কোনো এক সময় সরলা

নদীর সঙ্গে সামন্তরালে ব্রাহ্মণী নদী বইত। দুটি নদী বহমান ছিল, কালক্রমে ব্রাহ্মণী মৃত, সরলা সহদেবকে মুগ্ধতায় বেঁধে রেখেছে। এছাড়াও টাঙ্গন নদীর নাম এসেছে। *মেঘের নদী* উপন্যাসের নামে নদী শব্দটি থাকলেও এটা নদী কেন্দ্রিক বা নদী প্রধান উপন্যাস নয়, নদীর প্রসঙ্গ একেবারে শেষে এসেছে বিশেষ ইঙ্গিতে। মহিমকে তার স্ত্রী মণিমালা পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কোনো আপসে আসতে পারেনি। এই কঠিন সিদ্ধান্তের পর মণিমালা দেখেছে ব্রাহ্মণী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত সবুজ ধানখেত, এই সবুজের সঙ্গে যুক্ত সাদা বেগুনি আভাযুক্ত মেঘের নদী সারা মাঠ জুড়ে এঁকেবেঁকে গেছে, নদীকে তার খুব ভালো লেগেছে। তার আঞ্চলিক গানের কলি মনে পড়েছে 'আলুয়া কাশিয়ার ফুল,/নদী হইল দেওরা হুলাস্থুল রে।' মণিমালার মন আজ নদীর মতো হুলুস্থুল হয়েছে, মাঠের মতো নদীর বিস্তৃত পথে একাকী সেও এগিয়ে যেতে পারবে নদীর মতো।

গঙ্গা নদীর নিম্নগতি সংলগ্ন মালদা জেলার গ্রামগুলি বন্যা কবলিত হয়ে পড়লে সেখানকার মানুষের দুর্দশা দেখানো হয়েছে *নিম্নগতির নদী* উপন্যাসে। গঙ্গা নদীর গতি সম্পর্কে অবহিত করেছেন লেখক। মালদার মানিকচক, কালিয়াচক, পঞ্চানন্দপুর এলাকার মানুষ বন্যায় সর্বস্ব হারিয়ে ফেলেছে। গঙ্গা বিধ্বংসী হয়ে ফুলে ফেঁপে উঠলে মানুষ ছুটোছুটি করেছে প্রাণ বাঁচাতে। 'নদীর ধারে বাস ভাবনা বারোমাস' তাই তীরবর্তী মানুষগুলোর সমস্ত কিছু নদীর গতির কথা ভেবেই ভাবতে হত। ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট দিয়ে সাজানো জনপদ গঙ্গা নিমেষে গ্রাস করতে পারে, এখানকার মানুষরা জানত। গঙ্গা মানুষের ঘর ভেঙে জমি নিয়ে যেত আর দিয়ে যেত কলেরা আন্ত্রিকের মতো ব্যাধি। গঙ্গা ভয়ংকরী হলেও ঐ অঞ্চলের মানুষের কাছে আশা, বিশ্বাস, ভরসা, প্রবাদ, জীবন্ত সত্তা। বন্যাকে এখানকার মানুষ গঙ্গা মায়ের রোষ মনে করেই পুজো দিয়েছে। বলি দিয়ে, দুধ ঢেলে নদীর রোষ কমিয়ে সন্তুষ্ট করে রাখতে চেয়েছে। নদী তীরবর্তী অঞ্চলের মানুষ নদীর বদনাম শুনতে চায়নি। গঙ্গা তীরের মানুষ তাই বলেছে—

> নদী কখনো দুর্বৃত্ত হয় না, লোভী মানুষই দুর্বৃত্ত। নদী প্রকৃতির আইন মেনে চলে। মানুষ তাকে পদে পদে লঙ্ঘন করে।[৭৫]

গঙ্গার গতিকে রুদ্ধ করতে মানুষ বাঁধার চেষ্টা করেছে। গঙ্গাকে তারা যেমন মনে করে রাক্ষসী গঙ্গা, সে যেমন জমি খাবে, বাড়িঘর, পশু খাবে, হাসবে খলখল করে, নাচবে তবুও

হয়ে থাকবে মা গঙ্গা দুর্গতিনাশিনী। গঙ্গা শহরকে ডুবিয়ে মাটি শুদ্ধ করে গাছপালা বাড়াতে সাহায্য করে, মানুষের প্রয়োজনেই মা গঙ্গা বন্যা আনে তাই নদীকে বেশি বিরক্ত না করাই ভালো। বাধা দিয়ে তাকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়, এমন বিশ্বাস বন্যাপীড়িত মানুষদের মধ্যেও। বন্যাদৃশ্য দেখাতে ভাগীরথী, মহানন্দা, কালিন্দ্রির মজে যাওয়া লেখক এইসব এনেছেন এই উপন্যাসে, সর্বোপরি গঙ্গা একটি বিশেষ চরিত্র হয়ে উঠেছে।

রাজপাট ধর্মপাট উপন্যাসে চৈতন্যদেবের গঙ্গাপথে নবদ্বীপের কাছে কুলিয়া গ্রামে আসার প্রসঙ্গ এসেছে। এছাড়াও দু-একবার গঙ্গা নদীর উল্লেখ আছে। তমসার প্রসঙ্গে আছে, পদ্মাপাড়ের মানুষ যেভাবে হাহাকার করে, ঘর-বাড়ি ভিটে-মাটি পদ্মায় বিসর্জন দিয়ে সেভাবেই হাহাকার করেছে তমসা। মেঘনার নিম্নতম গতিপথের অস্থিরতা, আকাশের মেঘ দেখলে মেঘনা নেচে উঠে পাড় ভাঙত, প্রবল সমুদ্রের মতো ঢেউ তুলত। *মৌসুমি সমুদ্রের উপকূল* উপন্যাসে আছে মগরা, বিঘাই নদী, হরিনঘাটা, লালদিয়া, ইলসা দিয়ে সুন্দরবনে প্রবেশ করত। মোগলরা কর্ণফুলি নদীর রাস্তা বন্ধ করে মগদের তাড়া করেছিল। সুন্দরবনসহ অবিভক্ত বাংলার অসংখ্য নদীর প্রসঙ্গ এসেছে এখানে। *নাগমঙ্গল* উপন্যাসে মৃত মানুষের শরীর নৌকায় ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ফুলহার ও গঙ্গা নদীর কথা এসেছে। এই উপন্যাসে ফুলাহারের সঙ্গে কালিন্দ্রি নদীর চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন অভিজিৎ সেন—

> এ বছর প্রথম থেকেই ভালো বৃষ্টি হচ্ছে। ফলে, জলে ভরা ছোটো নদীটিকে এই মুহুর্তে ভারি সুন্দর দেখায়। ঠিক গেরস্থ ঘরের গ্রামের মেয়েটির মতো; ছুটোছুটি করে, ছটফট করে কিন্তু কখনো তেড়েফুঁড়ে ভেঙেচুরে ভাসিয়ে নিয়ে যায় না।[৭৬]

অভিজিৎ সেনের অধিকাংশ উপন্যাসেই কম বেশি নদীর প্রসঙ্গ এসেছে বিভিন্ন আঙ্গিকে। বেশিরভাগ উত্তরবঙ্গের জেলাগুলো দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীগুলো, বাস্তবে নদীগুলিকে দেখে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তিনি, তাই বলেছেন—

> রহু চণ্ডাল, দেবাংশী, ছায়ার পাখি, বিদ্যাধরী, অন্ধকারের নদী, নিম্নগতির নদীর পৃথিবী আত্রাই, পুনর্ভবা, টাঙ্গন, নাগর, যমুনা, ব্রাহ্মণী, মহানন্দা, কালিন্দ্রী, ফুলহারের জলে ধুয়ে যাওয়া বরিন্দের জনপদ—[৭৭]

মানব সভ্যতার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে নদীর একটা আলাদা ভূমিকা আছে একথা অনস্বীকার্য। তবে অভিজিৎ সেনের ভালোলাগা-ভালোবাসা ও আবেগের জায়গা নদী। তাই

নদীর রূপকেই মানুষের ও সমাজের কথা বলতে ভালোবাসেন তিনি। *নিম্নগতির নদী* ছাড়া অন্যান্য উপন্যাসে নদীকে নিয়ে বিস্তৃত বর্ণনা না দিলেও বিভিন্ন প্রসঙ্গে নদীকে এনেছেন তিনি।

৫। আঞ্চলিকতা

অভিজিৎ সেনকে যদি উত্তরবঙ্গের লেখক বলি অত্যুক্তি হবে না। তাঁর গল্প উপন্যাসের আখ্যান জুড়ে সমগ্র উত্তরবঙ্গের নর-নারীর জীবন-জীবিকা, আনন্দ-বেদনা, প্রেম-হিংসা, সংস্কার বিশ্বাস থেকে শুরু করে ভূমি, জলবায়ু, নদী, কৃষি সমস্তটাই এসেছে। মালদা, দিনাজপুর, শিলিগুড়ি, কোচবিহার, মুর্শিদাবাদ তাঁর লেখার ক্ষেত্র। কর্মসূত্রে উত্তরবঙ্গে থেকে তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন বিভিন্ন স্তরের মানুষকে। গ্রামীণ ব্যাংকে চাকরি করার সুবাদে পশ্চিমবঙ্গের জেলার অনেকগুলোতেই থাকার সুযোগ হয়েছে তাঁর। উপন্যাস রচনার প্রারম্ভে অভিজিৎ সেন উত্তরবঙ্গেই ছিলেন ফলে প্রথম থেকে উত্তরবঙ্গের মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষকে দেখেছেন। বোহেমিয়ান জীবনের অনেকটা সময় কেটেছে উত্তরবঙ্গে, সমগ্র উত্তরবঙ্গ হাতের তালুর মতো তাঁর চেনা।

প্রথম সফল উপন্যাস *বর্গক্ষেত্র* এর ভৌগলিক পটভূমি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন থানা। *ক্রান্তিবলয়* ও *অন্ধকারের নদী* উপন্যাস হিলি ব্লকের ভূগোল, সমাজ ও রাজনীতি নিয়ে, *ছায়ার পাখি* হিলির পটভূমিতে লেখা। এখানকার উর্বর জমি, বৃষ্টিপাত চাষের পক্ষে উপযোগী, ফলে এই অঞ্চল ও সেখানের মানুষ নিয়ে অভিজিৎ সেন লেখার অনেক উপাদান পেয়েছেন, অনেকগুলি গল্পও লিখেছেন এই অঞ্চল নিয়ে। ঋণ আদায়ের জন্য গ্রামে ঘোরাঘুরি করতে হত সেই সূত্রেই এখানকার প্রায় সব গ্রামেই ঘুরেছেন তিনি। তপন ব্লকের দক্ষিণ দিকে বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার সীমান্ত, এই অঞ্চল নিয়ে তাঁর অনেকগুলি উপন্যাস আছে। *হলুদ রঙের সূর্য* উপন্যাসের ব্রাহ্মণী নদী তো এখানকারই। পরবর্তীকালে কলকাতায় চলে এলে এইসব জায়গার মায়া তাঁকে বার বার আকর্ষণ করেছে তাই তিনি লেখার মধ্য দিয়ে পুনরায় ঘুরেছেন দিনাজপুরের গ্রামে, পথে, নদীতে। তপন ব্লকের বালুরঘাটে থাকতেন তিনি, এই ব্লকেই দু-তিনটি গ্রামে তিনি বাজিকরদের দেখেছিলেন, যা *রহু চণ্ডালের হাড়* উপন্যাসে এসেছে। বাজিকররা যেহেতু যাযাবর, স্থায়ী বাসস্থানের লক্ষ্যে বারে বারে স্থান পরিবর্তন করেছে তাই অভিজিৎ সেনের এই উপন্যাসের পটভূমি বদলে গিয়ে মালদা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। *আঁধার মহিষ* উপন্যাসের নদী ও গ্রামের

নামগুলি ছদ্ম। আসলে বালুরঘাট মহকুমার কুমারগঞ্জ থানার একটি অঞ্চলকে নিয়ে লেখা। নলিনী বেরা যেমন মেদিনীপুরকে নতুন নতুন রূপে দেখেছিলেন তেমন অভিজিৎ সেনেরও উত্তরবঙ্গকে দেখার প্রবণতা অনেক নিবিড় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। যা তাঁর কাছে আশ্চর্য এক জগৎ ছিল। তিনি বলেছেন—

> দুই দিনাজপুর ও মালদা পুরোপুরি, কখনো কখনো দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার বিক্ষিপ্তভাবে দেখা হয়েছে আমার। দিনাজপুর এবং মালদা এমন এ ফোঁড়-ও ফোঁড় করে দেখেছি, যে কোনো গল্প কথকের কাছে তা ঈর্ষনীয় হতে বাধ্য। দেখেছি মুর্শিদাবাদকেও।[৭৮]

এই অঞ্চলগুলোর মানুষের দুঃখ, বেদনা আশা আকাঙ্ক্ষা তিনি যেমন দেখেছেন তেমন ভাবেই এনেছেন তাঁর কথাসাহিত্যে।

মুর্শিদাবাদ জেলা এবং মুর্শিদাবাদ-নদীয়া সীমান্ত দুটি উপন্যাসের আখ্যানে উঠে এসেছে। *সবুজ শ্যাওলা ঢাকা জল* ও *শিরিন এবং তার পরিজন*। এছাড়াও মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমের পটভূমিতে লেখা *নগ্ন নির্জন হাত* উপন্যাস। অবিভক্ত বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, সুন্দরবন এবং সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে মগ আক্রমণের কাহিনি নিয়ে *মৌসুমি সমুদ্রের উপকূল* উপন্যাস লিখেছেন। রাজধানী গৌড়কে কেন্দ্র করে গৌড়সহ মালদার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিয়ে *রাজপাট ধর্মপাট, ধর্মাযুধ* দুটি উপন্যাস লিখেছেন। এছাড়াও মালদার পটভূমিতে *মেঘের নদী, নাগমঙ্গল* উপন্যাস রচনা করেছেন। কলকাতার প্রেক্ষাপটে অভিজিৎ সেন খুব কম উপন্যাস লিখেছেন। *মৃত মানুষের সঙ্গে বসবাস* কলকাতার একটি ইন্সিওরেন্স কোম্পানির অফিসকে সমগ্র ভারতের কল্পনায় লিখেছেন এই উপন্যাস। অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের আঞ্চলিক পরিসর মূলত এই জেলাগুলো।

সব উপন্যাসেরই একটা আঞ্চলিক পরিধি থাকে এবং সেই অঞ্চলের মানুষ ও প্রকৃতি দিয়ে একটা বাস্তবসম্মত পরিসর তৈরি করার চেষ্টা করেন কথাকার। তবে অনেক ক্ষেত্রে অঞ্চল একটি কাঠামো হিসাবে উঠে আসে আবার অনেক সময় অঞ্চলের কাঠামোকে আশ্রয় করে উপন্যাসের চরিত্রগুলি পরিপুষ্ট হয়। অভিজিৎ সেনের কলম উপন্যাসের চরিত্রের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের অনেক অঞ্চলকে প্রাণের স্পন্দন দিয়েছে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে আঞ্চলিক উপন্যাসের লক্ষণ বলতে গিয়ে 'বিশিষ্ট জনপ্রকৃতি' সামাজিক রীতিনীতি ধর্মবিশ্বাস,

সংস্কাররের চিত্রাঙ্কন ও জীবনবোধের কথা বলেছেন। অভিজিৎ সেনও তাঁর উপন্যাসে আঞ্চলিকতা ধরতে গিয়ে এসবই অনুসরণ করেছেন।

অভিজিৎ সেনের উপন্যাসগুলিতে সব উপন্যাসের মতো একটা অঞ্চলকে ধরা হয়েছে কিন্তু সবগুলিতেই যে অঞ্চল স্বতন্ত্রভাবে প্রাধান্য পেয়েছে তা নয়। কোনোটাতে পটভূমি রূপেই থেকেছে আবার কোনো উপন্যাসে পৃথক সত্তা রূপে চিত্রিত হয়েছে। কুন্তল চট্টোপাধ্যায় আঞ্চলিক উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—

> আঞ্চলিক উপন্যাসের জন্ম কোনো দূরবর্তী জনপদ তথা প্রত্যন্তস্থিত কোনো জনগোষ্ঠীর ধর্মীয়-সামাজিক সংস্কার, লৌকিক-অলৌকিক বিশ্বাস, বিশেষ জীবনযাপনরীতি, পরিবেশ ও চরিত্রের নিবিড় সাযুজ্যে। একটি বিশেষ স্থান-কাল-পরিবেশের ছোঁয়া, যাকে বলা হয় 'local colour' তা কিন্তু 'আঞ্চলিকতা'র এই ধারণা থেকে আলাদা।[৭৯]

অভিজিৎ সেন 'local colour' কে যেমন ধরেছেন আবার কোনো কোনো উপন্যাসে আঞ্চলিকতা অবিচ্ছেদ্য ভাবেও এসেছে। নিবিড় পর্যবেক্ষণ থেকে উঠে আসা আঞ্চলিকতার বোধ তাঁকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সার্থক উত্তরসূরি করে তুলেছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন রাঢ় বাংলার লাল মাটির মানুষের জীবনবেদ রচনা করেছেন *ধাত্রীদেবতা* (১৯৩৯), *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* (১৯৫১) প্রভৃতি উপন্যাসে, অভিজিৎ সেন তেমন উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলার কিছু অঞ্চল এবং সেই অঞ্চলের মানুষের সমগ্র জীবনযাপন রীতি দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন তাঁর বেশিরভাগ উপন্যাসে। তবে শুধু 'local colour' নয়, একেবারে স্বতন্ত্র সত্তায় অভিজিৎ সেন তুলে এনেছেন অঞ্চল বিশেষকে। *ছায়ার পাখি* উপন্যাসের একাধিক চরিত্রের প্রেম, সম্পর্ক, টানা-পোড়েন, হিংসা, বিদ্বেষ, ব্যক্তিগত ভাগ্যবিপর্যয়ের সাক্ষী দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি ব্লকের দুটি গ্রাম অর্জুনপুর ও জলছুঁই। উপন্যাসে গোপালের মতো আদর্শ কমিউনিস্ট কর্মীর সঙ্গে বিমলের মতো ভ্রষ্ট রাজনৈতিক নেতা ও তার অহংকারী বাবা সুরেশ্বরের আদর্শগত লড়াই, সৎ নরেন মালোর সঙ্গে অসৎ বিমলের দ্বন্দ্বে নরেনের খুন হয়ে যাওয়া, বিধবা রাজেশ্বরীর বিমলের দ্বারা প্রতারণা, যোগান-যুগীর নিষ্কলুষ সংসার এসবের সাক্ষী হিলি ব্লকের এই গ্রামদুটি। আঞ্চলিক উপন্যাসের অঞ্চলকে যেভাবে লেখকরা ধরেন যেমন *পদ্মানদীর মাঝি* (১৯৩৬), *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* ঠিক তেমন না হলেও *ছায়ার পাখি* উপন্যাসের আঞ্চলিকতা লঘু নয়। অভিজিৎ সেন স্বভাবসিদ্ধভাবে চিরি নদীর বর্ণনা দিয়ে উপন্যাসের শুরু করেন এবং এই চিরি নদী সংলগ্ন

অর্জুনপুর ও জলছুই গ্রাম দুটির প্রতিযোগিতা দিয়ে। গ্রামজীবনের উন্নতির যে বহমানতা তাকেই তিনি ধরেছেন এই দুই গ্রামের তুলনায়। অর্জুনপুরের গ্রামের বাড়িগুলোয় নোনা ধরেছে, সেখানে দালান বাড়ি আর কেউ তুলছে না, পাকা রাস্তা উন্নয়ন নিয়ে আসে এই ভরসায় অর্জুনপুরের লোক যাদের ক্ষমতা আছে তারা রাস্তার ধারে বাড়ি করেছে। তবে এই গ্রাম একেবারে অবহেলার না হলেও জলছুইয়ের সঙ্গে তুলনা চলে না। জলছুইতে উন্নয়নের আলোয় প্রাথমিক বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বড় বড় দোকান আধুনিক জীবনযাত্রার নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী সবই মেলে। অভিজিৎ সত্তর পরবর্তী আঞ্চলিকতাকে ধরেছেন যখন গ্রামের কৃষিব্যবস্থা এবং গ্রামের সার্বিক উন্নতির জোয়ার চলছে। সত্তর পরবর্তী গ্রামের এই পরিবর্তন মানুষের জীবন জীবীকার দিক নির্ণয় করে দেয়। নিখিলেশ্বর যখন জলছুইয়ের শ্রীবৃদ্ধিতে হাতুড়ে ডাক্তারির পসার জমিয়েছে, অন্যদিকে তার ভাই সুরেশ্বর গ্রামে চাষের কাজে যুক্ত ছিল। জলছুইয়ের চোখ ধাঁধানো উন্নতি যেন বিমলের মতো নবাগত রাজনৈতিক কর্মীর উত্থান। আবার অর্জুনপুরের বাড়ির নোনা ধরা যেন গোপালের মতো ঐতিহ্যের অবসান।

উন্নতির পাশাপাশি অর্জুনপুর ও জলছুইয়ের রাজনৈতিক রেষারেষি, উঁচুতলার অনুগ্রহ পেতে এবং আঞ্চলিক রাজনীতিতে ক্ষমতা ধরে রাখতে এই রেষারেষি খুনোখুনিতে পৌঁছেছে। অন্যদিকে কার্তিক মাসের পরিষ্কার চাঁদের আলোয় ভারি ধানের জমির আলের পথে সাগরের দোতারা বিষহরির গানের সুর তুলেছে। আনচালার দিঘি আর চিরি নদী সংলগ্ন নির্জন গ্রাম যেন নির্জন পৃথীবির রূপ নিয়েছে। গ্রাম্য নারী পুরুষের অসামাজিক সম্পর্কের ইতিবৃত্ত রচনাও করেছে, যেমন গোপালের মেয়ে অন্য লোকের সন্তান পেটে ধরে আত্মহত্যা করেছে, বিমল বিধবা রাজেশ্বরীর সম্পর্ক ইত্যাদি। আড়বেঁকির জলের পিশাচ যতীনকে যখন ভর করেছে তখন যতীন কলির পিসা হওয়া সত্ত্বেও তাকে লালসার শিকার করেছে। সাগরের অসহায় রাজেশ্বরীর প্রতি দুর্বলতা এসেছে, এসব তো প্রত্যন্ত গ্রামের আঞ্চলিক পরিস্থিতির কথাই বলে। অর্জুনপুর, জলছুইয়ের সব নাটকীয় ঘটনাই মানুষগুলোকে চিনিয়ে দিয়েছে।

অভিজিৎ সেন শুধু চিরি নদীর রূপ যৌবন ও তার তীববর্তী গ্রাম দুটির পরিবেশ মানুষ তাদের সম্পর্ক তুলে আনেননি, সেখানের আঞ্চলিক ভাষাকেও ব্যবহার করেছেন এই মানুষদের মুখে—

> অর্জুনপুর-জলছুইয়ের ঘরে ঘরে যামো, জলছুইয়ের হাটখোলায় দোকান দোকান ঘুরে ভিক্ষা করমো আর কমো যি, মথুর মোর ভাস্তা, মোক্ দেখে না।[৮০]

আবার গাম্য পরিসরে দুজন নারী যোগান ও বিমলের মা কৌশল্যার কথোপকথনে আঞ্চলিকতা ফুটে উঠেছে—

> —দুরো ম্যাগী, আমার ফের এখন চেহারাৎ কাম কী? চিতৎ ওঠার সোমায় আসল না? তোর কথা শুনি। কত্‌দিন বাদ দেখনো তোক্![৮১]

অভিজিৎ সেনের *হলুদ রঙের সূর্য* উপন্যাসের পটভূমিতে আছে বাস্তুহারা মানুষের বসবাসের ভূমি অন্বেষণ এবং সেই ভূমিকে টিকিয়ে রাখার লড়াই। সেই অঞ্চলকে গড়ে তোলা, সৌন্দর্য দেওয়া এবং তার প্রতি মানুষগুলোর ভালোবাসা অঞ্চলটিকে বিশিষ্ট করেছে। বসবাসের অযোগ্য জংলা জায়গাকে সহদেব তার দলবল নিয়ে চাষ ও বসবাস যোগ্য করে নাম দিয়েছিল বেণী। দয়া ঘোষ তার বাড়ির ছাদ থেকে দেখেছে সরলা বাক্ষণীর দুটি গিঁটে অনেকগুলো মানুষ কোদাল, কুড়ুল, দা, শাবল নিয়ে অমানুষিক লড়াই করছে। দয়া ঘোষ আরও দেখেছে—

> কতগুলো অসমসাহসী মানুষ যেন ময়দানবের কারখানা বসিয়েছে ওই দ্বীপ দুটিতে। এইসব মানুষ মেখলা কিংবা তার আশপাশের অলস জীবনে অভ্যস্ত মানুষের মধ্যে খুব বেমানান।[৮২]

এভাবে তিল তিল করে গড়ে তোলা সহদেব বিশ্বাসের বেণীর অধিকার ও ফসল বাঁচিয়ে রাখা লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। বেণী নকশালদের বিপ্লবের অঙ্গ হতে পারে এমনটাও ভেবেছে নকশালপন্থী যুবকেরা। সবমিলিয়ে এই উপন্যাসে বেণী হয়ে উঠেছে সেই ময়দান যা উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্রের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু।

সহদেব বিশ্বাসের নতুন পত্তনি বেণীতে সবাই রোজগারের জন্য নানারকম কাজ করতে থাকে, প্রতি বাড়িতে ঢেঁকি বসেছে। এখানের মানুষ ধান কুটে চিড়ে, মুড়ি, খই বানিয়ে বাজারজাত করত, সরলা, বাক্ষণী নদীতে মাছ ধরত, এসবের মধ্য দিয়ে বেণীর

লোক স্থিতি হয়েছিল। বেণীর বন্ধ্যা জমি ক্রমে দো-ফসলি হয়ে উঠেছে, বেণীও যেন এই মানুষগুলিকে মায়ের মতোই আগলে রেখেছে। নদীর জলে আর পলি জমিতে ধান, গম, সরষে, আলু, পটল ফলাতে শুরু করেছে সহদেবের গোষ্ঠী। এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করে তাদের সঙ্গে সম্ভ্রান্ত ঘোষেদের সংঘাত বেঁধেছে, গ্রামের সম্ভ্রান্ত ঘোষেদের সঙ্গে এই বিরোধে সহদেব বিশ্বাস দৃঢ়তা একাগ্রতা দেখিয়েছে। অন্য ঘোষেরা বনমালীকে বলেছিল 'খেতি করি দেও।' বনমালী সেই 'খেতি' করতেই বেণীর মানুষের প্রতিদিনের পরিশ্রম ও প্রতীক্ষার ফসলে নজর দিয়েছিল—

> একদিন সকালে উঠে বেণীর মানুষ দেখল ফসলের খেতে একদঙ্গল গোরু-মোষ চরছে। এরকম হবার কথা নয়। ...ছেড়ে দিয়ে গোরু পোষার দিন অনেক আগেই উঠে গেছে। তবুও হইচই করে গোরু তাড়িয়ে দিল বেণীর মানুষ। পরদিন আবার, আবার তার পরের দিনও।[৮৩]

ফলে সংঘাত আরও চরমে উঠেছিল এবং আঞ্চলিক ক্ষেত্রে এই ধরনের বিবাদ দাঙ্গার মাত্রা পেয়েছে। ঘোষেরাও চেয়েছিল দাঙ্গা হোক কারণ তারা তৈরি ছিল। আঞ্চলিক পরিসরে দাঙ্গায় ব্যবহৃত অস্ত্র লাঠি বল্লম-সড়কি, তীর এমনকি আধুনিক অস্ত্র হিসাবে বন্দুক ব্যবহৃত হয়েছে।

অভিজিৎ সেন বেণীর আঞ্চলিক পরিসরকে এবং তার মানুষদের জীবন, লড়াই, জীবিকা ইত্যাদি ক্ষেত্রের প্রতিকূলতাকে দেখিয়েছেন। বেণীকে কেন্দ্র করে যেভাবে মালিক শ্রেণির লোভ উথলে উঠেছে পাশাপাশি রাজনৈতিক আবহে টেনে আনার প্রচেষ্টাও শুরু হয়েছে। বেণী শুধু যুদ্ধক্ষেত্র নয়, সমবায়ের উন্নয়ন কর্মী সুদেব ও হাসপাতালের নার্স মালবিকার প্রেমের সাক্ষী থেকেছে। লেখক বেণী ও তার সংলগ্ন অঞ্চলের মানুষের পারস্পারিক সম্পর্কে লোভ, হিংসা, প্রতিযোগিতা, প্রীতি, সহমর্মিতা লড়াই এবং তাতে রাজনীতি ও প্রশাসনের প্রভাব এসবের পাশাপাশি আঞ্চলিক পটভূমিকে ব্যবহার করতে গিয়ে আঞ্চলিক ভাষাকেও তুলে এনেছেন। সুদেব মালবিকার বিয়ের কথা শুনে মালতী বলেছে—

> বড়ো আনন্দের খবর। সে আবাগী আইজ থাকলে বড়ো অহংকার হইত তার। তার এংকা হাউশ ছিল।[৮৪]

সহদেবের গোষ্ঠীর উপর দিয়ে যুদ্ধ, দাঙ্গা, অত্যাচারের ঝড় বয়ে গেছে তাদের হা-হুতাশ আক্ষেপ ধরতে আঞ্চলিক ভাষাই বেশি উপযুক্ত মনে করেছেন অভিজিৎ সেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝি*, অদ্বৈত মল্লবর্মণের *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাসে নদী ও মানুষ যেমন একাকার হয়ে গেছে অভিজিৎ সেনের *নিম্নগতির নদী* উপন্যাসেও তাই হয়েছে। মালদা জেলার গঙ্গা নদীর নিম্ন অববাহিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল কালিয়াচক, মানিকচক, ভূতনী, দিয়ারা, সাহেবগঞ্জের সঙ্গে মানুষ একাকার হয়ে গেছে এই উপন্যাসে। গঙ্গা যেন মানবীর রূপ নিয়ে এখানকার মানুষের হাসি-কান্না, দুঃখ-যন্ত্রণা, জীবন-জীবিকার সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে এবং নিয়ন্ত্রণও করেছে। কারণ গঙ্গাকে আশ্রয় করেই চলে সালাউদ্দিনের মত দুর্বৃত্ত মানুষের জীবিকা। বিন সম্প্রদায়ের মানুষরা গঙ্গার বুক থেকে মাছ ধরে উপার্জন করে, চাঁই সম্প্রদায়ের মানুষ গঙ্গা অববাহিকার দীর্ঘ প্রবাহ ধরে চাষ আবাদ করত। বেকার যুবকেরা এমনকি কিশোররা পানকৌড়ির মতো গঙ্গার তলদেশে গিয়ে দুঃসাহসের সঙ্গে বোলডার সংগ্রহ করে উপার্জন করেছে। আম বাগানের মালিক আনোয়ার চৌধুরীর বাগান লিজ দিয়ে প্রতি বছর লিজ প্রাপকদের কাছে শোনে গঙ্গার ভাঙনে পঞ্চানন্দপুরের মাটি খেয়ে নিচ্ছে, মালদার আম চাষ ও ব্যাবসাকেও গঙ্গা প্রভাবিত করেছে। নিবিড় সম্পর্ক গঙ্গা তীরবর্তী অঞ্চলের মানুষ ও নদীর। মানুষ গঙ্গার দুর্গতিনাশিনী আবার সর্বনাশী রূপকে তাদের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী করে নিয়েছে। তারা মনে করেছে নদী দুর্বৃত্ত হয় না, মানুষ দুর্বৃত্ত হয়।

অভিজিৎ সেন সম্পূর্ণ উপন্যাস জুড়ে বন্যার আবহের সঙ্গে বন্যা কবলিত মানুষের জীবন দেখাতে গঙ্গা তীরবর্তী গ্রামগুলোকে প্রাধান্য দিয়েছেন। উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র ত্রিদিব মিশ্র শরীরে মারণ রোগ নিয়ে মানুষের সেবার কাজে ব্রতী হয়েছিল। কিন্তু বড়ো নেতা ও ধনী হতে চায়নি। মৃত্যুকালেও সে ছেড়ে যেতে চায়নি মালদা জেলার গঙ্গাপাড়—

> সে মালদা জেলার গঙ্গাপাড় এবং তার মানুষদের ছেড়ে আর কোথাও যাবে না। বেঁচে থাকার যাবতীয় উত্তেজনা, তার আত্মার শান্তি, ভালোলাগা, ভালোবাসা যে এই গঙ্গাপাড়ের মৃত্তিকা আর মানুষজনকে নিয়ে, সে বিষয়ে সে এখন একেবারে নিঃসন্দেহ।[৮৫]

এ যেন তার মৃত্যুর আগে শেষ ইচ্ছার মতো। গঙ্গা ও গঙ্গার তীরবর্তী মানুষের প্রতি ভালোবাসা অথবা গঙ্গার সঙ্গে ত্রিদিবের সম্পর্কের এমন রসায়ন নির্মিত হয়েছিল। তাইতো বন্ধু অরুণ মজুমদার বিস্মিত হয়েছিল ত্রিদিবের মুখে 'মাগঙ্গা' শব্দ শুনে। শুধু ত্রিদিব নয় আরও অনেকেই এভাবে গঙ্গাকে তাদের আশ্রয়স্থল ভেবেছে। আবদুল মতিন বিশ্বাস মুসলমান, ধর্মীয় অনুশাসনের ফলে গঙ্গাকে ঈশ্বর না ভাবলেও সে জীবন্ত সত্তা বলেই মনে করেছে। 'এই সব সম্পর্কের ক্ষেত্রেই আবদুল মতিন বিশ্বাস এই নদীর সঙ্গে দ্বন্দ্বে দ্বৈরথে চির প্রতিযোগী।' শৈশব কৈশরোরের স্মৃতিতে তার মনে পড়েছে সে তো গঙ্গাকে তার মায়ের রূপেই দেখেছিল।

গঙ্গা তীরবর্তী এই অঞ্চলের শুধু দুঃখ নয়, মিলনের মুহূর্তও রচনা হয়েছে। অভিজিৎ সেন এই অঞ্চলের সঙ্গে মানুষের নিবিড় যোগের সূত্রকে বার বার চিহ্নিত করেছেন। বন্যা ত্রানে গিয়ে ত্রিদিব দেয়াশিনী লক্ষ্মীতারাকে দেখে তার প্রথম যৌবনে তাঁর প্রতি আসক্তির কথা মনে করে লজ্জা পেয়েছে। আবার সুবীর ও মৈথিলীর বাড়ির জলে ভরা নীচের তলাতেই তাদের যৌন মিলন তাদের ষোল বছর আগের স্মৃতিকে মনে করিয়েছে। আঞ্চলিকতাকে আরও নিখুঁত করেছে এই উপন্যাসে ব্যবহৃত আঞ্চলিক প্রবাদ যেমন 'নদীতে নদীতে যদি বা দেখা হয়, বোনে বোনে হয় না।' আবার 'এক চিজ এইসা ছুলেসে পইসা' প্রভৃতি ধাঁধার ব্যবহারে। অভিজিৎ সেন এভাবেই দেখিয়েছেন মালদার বিশেষ অঞ্চল সেখানকার মানুষের জীবনচক্রের সঙ্গে কীভাবে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে, একটি নদী কীভাবে মানুষের জীবনচক্রের নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছে ধর্মের ঊর্ধ্বে গিয়ে মানুষ নদীকে একই ভাবনায় জারিত করেছে, এসবের মধ্য দিয়ে *নিম্নগতির নদী* উপন্যাসের আঞ্চলিক পরিধিকে চিত্রিত করেছেন। আঞ্চলিকতার অপরিহার্য একটি উপাদান লোকবিশ্বাস, অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের আঞ্চলিক পরিসরে যা ব্যাপকভাবে এসেছে। পরবর্তীতে লোকবিশ্বাস নিয়ে পৃথক আলোচনা করা হল।

৬। লোকবিশ্বাস

উত্তরবঙ্গের মানুষ, প্রকৃতি, জীবনদর্শন, লোকবিশ্বাস, ভাষা সম্পর্কে অভিজিৎ সেনের গভীর জীবনবোধ তাঁর অনেকগুলি উপন্যাসে আছে, যাতে আঞ্চলিক উপাদান ব্যাপকভাবে এসেছে, সেই সুবাদে প্রচুর লোকবিশ্বাস ব্যবহৃত হয়েছে। অঞ্চল ভেদে ভিন্ন ভিন্ন লোকবিশ্বাস মানুষ ধারণ ও প্রতিপালন করে এসেছে, এই লোকবিশ্বাসের মূলে থাকে ঐহিক শুভাশুভ বোধ। অভিজিৎ সেন তাঁর 'মিথ ও লোককথার সম্ভাবনা' প্রবন্ধে বলেছেন লৌকিক অস্তিত্ব বা লোকায়ত সংস্কৃতির প্রভাবের শিকড় মাটির গভীরে প্রোথিত তাই আড়াইশো বছরের ইউরোপীয় শিক্ষাতেও নির্মূল হয়নি। আঞ্চলিক ক্ষেত্রে লোকবিশ্বাসগুলি মানুষের কোন গোপন অলিন্দে বাস করে তা মানুষ অনেকসময় নিজেই জানে না। বরুণকুমার চক্রবর্তী তাঁর *লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার* গ্রন্থে দেখিয়েছেন কীভাবে লোকবিশ্বাস পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদের সময় থেকেই চলে এসেছে। চর্চিত লোকবিশ্বাসগুলো মানুষের মানসিক গঠনের মূলে ছিল। লোকবিশ্বাস কোনো একক মানুষের বিশ্বাস নয়। লোকবিশ্বাস শুধু নিরক্ষর মানুষের মধ্যে থাকবে এমনও নয়, শিক্ষিত বা অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন মানুষের মধ্যেও থাকে। লোকবিশ্বাসে যুক্তির বন্ধনকে অস্বীকার করা হয়ে থাকে।

মানুষ দৈনিক জীবনাচরণে, আনন্দে-বেদনায়, লড়াইয়ে-উৎসবে কিছু বিশ্বাস আঁকড়ে থেকেছে। অভিজিৎ সেনের উপন্যাসে ব্যবহৃত লোকবিশ্বাস উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক পরিসরে নিহিত। *ক্রান্তিবলয়* উপন্যাসে তেভাগার লড়াইয়ে সৈনিক রাতনী ওরাইনের মেয়ে কৌশল্যা। তাকে বলা হয় 'তেভাগার বিটি', তার নাড়ি পোঁতা হয়েছিল জোতদারের জমিতে। তেভাগা আন্দোলনের সৈনিকরা বিশ্বাস করত এর ফলে পরের বছর এই জমিতে ভালো ফসল হবে আর এই মাঠেই ঝাণ্ডা পুঁতে তেভাগার প্রথম লড়াইয়ে জয় আসবে। *রহু চণ্ডালের হাড়* উপন্যাসের যাযাবর ও সাঁওতাল এই দুই জনগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে একাধিক লোকবিশ্বাস ছিল। সাঁওতালরা শহরা উৎসব পালন করত কার্তিক মাসের অমাবস্যায়, এই উৎসবে মোষ, শুয়োর, মোরগ বলি হয়। সাঁওতালদের বিশ্বাস, এই উৎসবে যে 'ঠাকুর–ঠাকরানের পুজো হয় তাঁরা শস্য ও পালিত পশুর শ্রীবৃদ্ধি করেন, নিরাপদে রাখেন।' বাজিকররা রহুর দেখানো পথ অর্থাৎ পুবের দেশে তাদের নিশ্চিত ভবিষ্যৎ একথা বিশ্বাস করে। বাজিকরদের কোনো দেবতা নেই পথের দেবতাকেই আপন করে নিয়েছে, ওলামাই, বিগামাইতে আবার কখনো বিষহরিতে বিশ্বাস করে। বাজিকর অসুস্থ হলে বলে 'হাতপাক' হয়েছে, বিগামাই বিরাগ হলে

এমন হয়, গলা থেকে 'লোই' ওঠে তাই এই রোগের নাম লোইরোগ। মৃত্যু বাজিকরের কাছে নিয়তি নির্ধারিত, তবুও বাজিকর নানান ভোজবাজির সঙ্গে 'সাপকাটি' থেকে বাঁচতে তাবিজ মাদুলির উপর নির্ভর করত। লেখক দেখিয়েছেন এই যাযাবর জাতি তাদের বোহেমিয়ান জীবনে যেখানে যেখানে একটু স্থিতি পেয়েছে সেখানের লোকবিশ্বাসকে ধারণ করেছে। *ছায়ার পাখি* উপন্যাসের চাষি যতীনের বলদজোড়া চুরি হয়ে যায়, চাষের সময় বলদ চুরির যে দুঃখ তার থেকে বেশি দুঃখ এমন বলদ আর পাওয়া যাবে না। কারন—

> বলদজোড়া ছিল মামা-ভাগনা জোড়, বাড়ির বলদ। কোন চাষা না জানে যে মামা-ভাগনার মতো বলদের ভালো জোড় আর হয় না।[৮৬]

যতীনের মতো অনেক চাষিই জানত বলদের মামা-ভাগনে জোড় দুর্লভ, এই জোড় অনুগত এবং কষ্টসহিষ্ণু হয়, চাষিদের মধ্যে এমনটাই বিশ্বাস। মানুষের ধারণার উৎপত্তি থেকেই বিশ্বাস গড়ে উঠেছে। একবিংশ শতকেও মানুষ তাবিজ, মাদুলি, ওঝা, গুণমানে বিশ্বাস করে। অলৌকিকভাবে সমস্যার সমাধান না হলে মানুষ এতকাল ধরে কেনই বা বিশ্বাস করে আসছে এমন মনে হয়েছিল *হলুদ রঙের সূর্য* উপন্যাসের সুদেবের। মানুষের দুঃখ, কষ্ট লাঞ্ছনার শেষে, সারাদিনের পরে মাথা কোটার একটা জায়গা লাগে, নয়ন গুণমাণের সাতপুরুষের গুনমাণি যেন সেই জায়গা। যেখানে মানুষ তাদের অসাধ্য সাধনের পথ খুঁজেছে। নয়ন গুণমান সম্পর্কে আছে—

> কামেশ্বরীর সিঁদুর, কামাখ্যার ঋতুবড়ি, শিবলিঙ্গ সদৃশ্য ফল, নানাধরনের শিকড় এবং গাছড়া বিক্রি করে। হাটে হাটে ঘুরে পাথর, ধাতু এবং নানা ধরনের রোগের ওষুধও সে বিক্রি করে। এ ছাড়া গুণমানি, ওঝালি, নানাধরনের আভিচারিক ক্রিয়াকর্মও সে করে।[৮৭]

এমনই অসাধ্য সাধন হয়েছে আদিবাসী আধিয়ার গোচের স্ত্রী দালির ক্ষেত্রে। দালি মনে করেছে 'পর পর কয়েকটি নষ্ট হয়ে যাবার পর গুণমানের দয়ায় পাওয়া তার এই শিশু।' গুণমান দালির গর্ভের বাঁধন কাটিয়েছিল মন্ত্রপূত জল আর শিকড় বাঁটা দিয়ে। জল ও শিকড় খেয়ে দালির মাসিকের ব্যথা বন্ধ হয় এবং দালির সন্তান প্রাপ্তিকে যে অশুভ শক্তি বেঁধে রেখেছিল সেই বাঁধন কেটে যায়। দালি এবং দালির মতো হাজার হাজার নারী গুণমানের এই শক্তিকে অস্বীকার করতে পারনি। গুণমানের প্রাপ্য একশো টাকা দিতে যত দেরি হয়েছে ততই সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কা দালিকে ভীত করেছে।

আদিবাসী সমাজে ডাইন প্রথার কুসংস্কার আজও মুছে যায়নি। অভিজিৎ সেন তাঁর ‘জেহাঙ্গী’, ‘পাথরে জলের বিন্দু’ প্রভৃতি গল্পে এই বিষয়টা খুব স্পষ্ট করে বলেছেন। উপন্যাসেও কোথাও কোথাও বিশেষ আঞ্চলিক ক্ষেত্রের লোকবিশ্বাসকে দেখাতে ডাইনের প্রসঙ্গ এনেছেন। *হলুদ রঙের সূর্য* উপন্যাসের দালি তার সন্তান নষ্ট হবার কারণ হিসাবে নিজের শাশুড়িকে দায়ী করেছে। দালি ভেবেছিল তার ডাইন শাশুড়ি ভাশুর সহার স্ত্রী ও মেয়েকে খেয়েছে। গোচ এসব কথা বিশ্বাস করেনি বরং সংস্কারমুক্ত যুক্তি দেখিয়েছিল দালিকে। কিন্তু দালির বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছিল যখন নয়ন গুণমান দালিকে দেখিয়েছিল গোচের দাদা সহাও ডান। ফলে দালি ভয় পেয়েছে ডানের নজরে তার বুকভর্তি দুধ কোনদিন শুকিয়ে যাবে। গোচ স্ত্রীকে আশ্বস্ত করেছে, বড়ো জানগুরুকে দিয়ে জাহের থানে পুজো দিয়ে দেবে, কিন্তু দালি নয়ণ গুণমানের কালীবোঙ্গার থানে পুজো দিতে চেয়েছিল। গোচের সন্তান ‘গোচের অশান্ত হৃদয় সততই দ্বন্দ্বদীর্ণ’, পিসি বাহামণির চৈতন্যে যত না মানুষ থাকে তার থেকে বেশি ডান, বোঙ্গা, ফোক্‌সিন থাকে। সে খবর সংগ্রহ করেছিল—

> কোথায় খোঁয়ারসুদ্ধ শুয়োর উজার হয়ে গেছে, কোথায় সদ্যজাত শিশু মায়ের বুকের বোঁটা কামড়ে দুধের বদলে রক্ত খেয়েছে, কোথায় ঘরের বউ ডান হয়ে ঘরের সব মানুষের কলিজা সবার অজান্তে খেয়ে ফেলেছে,... [৮৮]

জোতদারের কোপে জমিহারা সহার বিধ্বস্ত ছন্নছাড়া অবস্থা হয়েছে এবং নয়ন গুণমানের গণনায় সবাই বিশ্বাস করে নিয়েছে সহা ডান হয়ে গেছে। নয়ন পানপাতায় তেল ঢেলে মন্ত্র পড়ে আরও নানা উপচারে সদ্য সন্তানহারা দালিকে দেখতে বলেছিল ডান হিসাবে কার মুখ দেখা যাচ্ছে। সাঁওতাল পাড়ার বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ সকলেই আশ্বস্ত হয়েছিল ‘হুঁ হুঁ বাবা, এ হল নয়ন গুণমান, ধরা ঠিকই পড়বে।’ এই মানুষগুলি বিশ্বাস করেই নিয়েছিল নয়নের কেরামতিতে দালির সন্তানলাভ হয়েছে। ডাইন ফোক্‌সিনের নজর না থাকলে কি আবার সেই সন্তান মারা যায়। সেই নয়নের গুণমানিতে দালি দেখেছিল সহার মুখ। শিক্ষিত কানু মাস্টার নয়নকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করেছিল গণনা ঠিক আছে কিনা। কানু সহাকে ডান ভাবতে পারেনি কিন্তু বিশ্বাস করত ডাইনের অস্তিত্ব। ফুলমণি নামে এক রমনী ও বাহামণি আরও দৃঢ় করেছে উপস্থিত মানুষের বিশ্বাসকে, দালির ছেলে যেদিন মারা যায় সেদিনের ঘটনা বলে—

> বাচ্চাটা যেদিন রাতে মারা যায় সেদিন কি হয়েছিল জান, ...গহিন রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে কাদা, দালির ভাসুর ঘরের ভিতরে বাচ্চার শিয়রে এসে দাঁড়ায়... আর তখনই দালির শিশু হিক্কা তুলে অসার হয়ে গিয়েছিল।[৮৯]

মানুষের দুঃখের শেষ নেই আর সেই দুঃখের কারণ অশুভ শক্তির মধ্যেই। শুধু গোচের ছেলেকে নয়, যে দুগ্ধবতী গাভী দুধের বোঁটা কলার মতো, দু-চার সের করে দুধ দিত কিন্তু একদিন পর থেকেই বাঁট টানলে রক্ত বেরোচ্ছে। কন্দর্প জোর দিয়েই বলেছে 'এসব ঘটনা তো সবারই দেখা। এর মধ্যে অসম্ভব কিছুই নেই। বাণ মারলে গাইয়ের বাঁট শুকিয়ে যায়, বাঁট থেকে রক্ত পড়ে।' এতগুলো মানুষের সন্দেহের তীর সহার দিকে। আবার হরিণার বিলাতি বুড়ির চোখের দৃষ্টিতে খইয়ের ধান মুড়ির চাল পুড়ে ছাই হয়। এসব বিশ্বাসের বিপক্ষে যারা তারাও তাদের যুক্তিবোধ নিয়ে দাঁড়াতে পারে না সবসময়। তাই গোচেরও বিশ্বাস টলে গিয়েছিল, এতগুলো আকাট্য প্রমাণের কাছে গোচ হয়তো স্বীকার করেই নিয়েছে তার দাদা সহা ডান, ফলে পিতৃসম দাদাকে একদিন হাঁসুয়ার কোপে মেরে ফেলেছে।

লোকবিশ্বাস কীভাবে মানুষের নিত্যদিনের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায় এবং জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করতে পারে অভিজিৎ সেন এমন মানুষদের সামনে থেকে দেখেছেন হয়তো। তাইতো এমন নিখুঁতভাবে ধরতে পারেন সেইসব চরিত্রকে যেভাবে *বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর* উপন্যাসে মায়নোমতিকে ধরেছেন। মায়নোমতি সন্তান প্রাপ্তির জন্য ভায়রোর কালীর কাছে হত্যা দিয়েছিল। সেখানে ব্যর্থ হয়ে দুদিন উপোস করে, জল কাদায় দু-ক্রোশ দণ্ডি দিয়ে, বুক চিরে বিষহরির থানে রক্ত দিয়ে সন্তান পেয়েছিল। মায়নোমতির দৃঢ় বিশ্বাস বিষহরি তাকে সন্তান দিয়েছে তাই ছেলের নাম দিয়েছিল বালা লখিন্দর। এমনকি সন্তান জন্মের আগে যতরকম লোকাচার আছে সব নিখুঁতভাবে পালন করেছে মায়নোমতি। কোথাও এতটুকু ত্রুটি রাখেনি—

> কোনওদিন পুকুরঘাটে দাঁড়িয়ে চুল ঝাড়েনি। সে কোনওদিন ফুঁ দিয়ে দিয়ে বা বাঁ হাতের ঝাপটায় কুপি নেভায়নি। সে ভুল করেও কখনও বস্তার ওপরে বসেনি। গাছের ফুল কিংবা ফল নিঃশেষ করে কখনও পেড়ে নেয়নি মায়নোমতি। আরও কত কিছু করেনি সে যাতে ছেলের জন্ম ও মঙ্গল যুক্ত।[৯০]

যতদিন বালা তার বুকের দুধ খেয়েছে ততদিন বাইরে গেলে চুলে ও কাপড়ের আঁচলে গিঁট বাঁধত, ফিরে এসে শরীরে ঝাঁটা বুলিয়ে নিত সে, আঁচল সরিয়ে স্তনের উপর থুতু ছিটিয়ে

নিত। এসব তো মায়নোমতির একার নয়, মায়নোমতির মতো অসংখ্য নারীর বিশ্বাস, তাইতো বিষহরির থানে মানত করে 'অন্ধজনে চক্ষু পায়, মায়নোমতির মতো হা-পুত্রি পুত পায়।' রাজকিশোর এক্ষেত্রে মায়নোমতির যথার্থ জীবনসঙ্গী সেও 'কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী, ত্রয়োদশী এবং শুক্লপক্ষের তৃতীয়া' এসব বাছবিচার করেছে। সিল্কের তন্তু বিকশিত হবে মালিকের সংস্পর্শে, স্ত্রীসঙ্গ, সন্তান, বৃদ্ধি, উৎপাদন যাবতীয় ব্যাপারে তিথি নক্ষত্রের বিচার মেনে চলত রাজকিশোর। ভাদ্র মাসের নদী রাক্ষসীর রূপ ধারণ করে থাকে তাই বালা নদীর স্বপ্ন দেখলে মায়নোমতি অশুভ ইঙ্গিতে আঁতকে উঠেছে। তার আতঙ্কের ন্যায্য কারণ ছিল বটে, ছেলের নাম বালা, বিষহরির দান বালা, ফলে নৌকাকে কলার মান্দাস ভেবে চিন্তিত মায়নোমতি। তাইতো ছোটবেলায় বালাকে কোনোদিন কলার মান্দাসে চাপতে দেয়নি মায়নোমতি।

কার্তিক মাসে নতুন করে ঘর বাঁধতে প্রচুর বাঁশের প্রয়োজন, বালা প্রায় তিনশো বাঁশের ভড় ভাদ্রের ভরা নদীতে ভাসিয়ে নিয়ে আসার সময় এলুয়ার দহে ঘুর্ণিতে পড়েছিল। বালার সাথী যোগেন বলেছিল 'এলুয়ার দহের তিসিলা কাল-মাশনার কোপ যার ঘারেৎ পড়ে, তাঁক্ আর বাঁচাবার সাধ্য কার?' এসব শুনে মায়নোমতি ভয়ার্ত চিৎকার করে উঠেছে, 'হায় মাও মাশনা কালী—' মায়নোমতি এক মুহূর্ত সময় নেয়নি, এইসব বিপদের প্রতিকার মায়নোমতিরর কাছে স্পষ্ট ছিল, কবিরাজ গুণমানের কাছে সিধা পাঠিয়েছে বালাকে। 'জয় মাও মাশ্‌নাকালী, জয় বাবা কবিরাজ গুণমান—' বলতে বলতে কৃতজ্ঞতায় কেঁদে ফেলেছে মায়নোমতি। এলুয়ার দহে বালার দুর্ভোগের জন্য শুধু কবিরাজের কাছে সিধা পাঠিয়ে ক্ষান্ত হয়নি সে। ঘরোয়া উপচার করতেও শুরু করেছে—

> মায়নো তার মাথার চুল থেকে পায়ের আঙুল অবধি চোখ বুলাল বিড় বিড় করতে করতে। তারপর থুথু করে থুক্কুরি দিল মাথায় আর গায়ে। খ্যাংরা বারুণের একটা কাঠি ভেঙে তার আগায় থুতু ছিটিয়ে দু-পায়ের ফাঁকা গলিয়ে বালার পিছনে ছুড়ে দিল সে।[৯১]

চাল, শাল, তেল, সিঁদুর, নগদ টাকার সিধা নিয়ে বালা হাজির হয়েছিল গুণমানের বাড়ি। গুণমান পূজা ও গোপন ক্রিয়াকর্ম, শেকড়-বাকড়, ওষুধ, তাবিজ, মাদুলি দিয়ে নানান অসাধ্য সাধন করতে পারে এমন বিশ্বাসে মানুষ কবিরাজের কাছে গোপনে ও প্রকাশ্যে আসত। প্রতি শনিবার পুজোর আগে ধ্যানে বসত গুণমান, অনেক মানুষ আসত রোগ-শোক, বিপদ-

আপদে নিদান চাইতে। বৃদ্ধ কবিরাজ বিদ্যাকে বিয়ে করেছিল নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে এবং গর্ভবতী বিদ্যাকে চুল ছাড়া রাখতে, অশুচি কাপড়ে ঘরবার করতে নিষেধ করেছিল। চুল আঁচড়িয়ে থুতু দিয়ে ফেলা, বাইরে থেকে এলে বারন দিয়ে গা ঝাড়া, হাত থেকে পড়ে যাওয়া থালায় না খাওয়া, রাতে দই, টক, চিড়া, কচু না খাওয়া, খেতে বসে হাঁচি হলে পাতের নিচে জল ফেলে খাওয়া এমন অসংখ্য গ্রাম্য বিশ্বাস মানতে শিখিয়েছিল। তবুও বিদ্যার সন্তানকে বাঁচাতে পারেনি কবিরাজ। বিদ্যাধরীকেও গোপনে কবিরাজের কাছে নিয়ে আসত বকুলবালা। বিদ্যার পরিবারের সবাই খুব সুন্দর কিন্তু বকুলবালা নিজের রোগে ভোগা স্বাস্থ্য ও মেয়ের রূপ যৌবন নিয়ে সদা চিন্তিত। বকুলবালার শরীরের রোগে মাসিকের রক্ত থামত না, বকুলবালা কবিরাজের কাছে যেত শিকড়-বাকড়, তাবিজ, মাদুলি নিতে। কালীর থানে গিয়ে কেঁদে মানত করত এই রোগ থেকে মুক্তি পেতে। মেয়ে বিদ্যার রূপ ধরে রাখতে বিদ্যার প্রথম মাসিকের রক্ত, মধু, পিপড়ের মাটি গুলে নিয়ম করে স্তনে মাখিয়ে দিয়েছিল তাতে নাকি বিদ্যার স্তন হেলে পড়বে না। নিয়মিত খাইয়েছে দুর্বার রস, কালী, বিষহরি, শীতলা নাককাটির থানে নিয়মিত মানত রক্ষা করেছে। মেয়ের হাতে কোমরে বেঁধে দিয়েছিল তাবিজ, কবজ, মাদুলি, গাছের শিকড়। কবিরাজের উপর মানুষের এমন বিশ্বাস ছিল যে কবিরাজের দেওয়া শেকড় এক রাতে সমস্ত পাপ খালাস করার ক্ষমতা রাখে। কবিরাজের শিষ্যরা বলত কবিরাজ মারা যাবার সময় আকাশে আগুনের গোলা উড়বে, বাড়ির তেঁতুল গাছটা আকাশপথে উড়বে, গাছে অতিপ্রাকৃত শক্তিকে বেঁধে রেখেছে কবিরাজ। এছাড়াও মুসিধাপের বাণব্রত ও পাতা খেলার বৃত্তান্ত যাতে বান মারা ও নররাক্ষসের জ্যান্ত হাঁস, মুরগি খাওয়ার ঘটনা, আদিবাসী পাড়ায় ডানের উৎপাত ইত্যাদি। এসব বিশ্বাসের কোনো ভিত্তি না থাকলেও মানুষের মনে এই বিশ্বাস, এই নিয়েই তারা বেঁচে থাকতে চেয়েছে।

বাস্তুসাপের বিশ্বাস এখনো মানুষের মধ্যে আছে, বাড়িতে বসবাস করা বিষাক্ত সাপ মঙ্গলের সূচক, তাকে মেরে ফেলা বা তার বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়াটা অমঙ্গলের। বালার তাঁত ঘরে ঢুকে যাওয়া সাপকে মহেন্দ্র কোঁচে গেঁথে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে মায়নোমতি অর্ধস্থলিত কাপড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে, 'মারিস না মারিস না' বলে চিৎকার করে উঠেছে। মায়নোমতির এই নিষেধের মধ্যে আতঙ্ক, বিস্ময়, হতাশা ছিল, তবুও রক্ষা পায়নি গোখরো সাপটি। 'নির্বাক নিস্তব্ধ এবং বিষণ্ন এই বাড়িতে মহেন্দ্রর সাপ মারাটা যে কী

পরিমাণ বিপর্যয় নিয়ে আসবে, মহেন্দ্র তা জানত না।' জানত মায়নোমতি ও রাজকিশোর। তাই—

> রাজকিশোর মহেন্দ্রকে চিৎকার করে গাল দিয়েছিল। বলেছিল, আকাম করলু, হারামজাদা! এ বাড়িত সাপ মারা নিষেধ জানা নাই তোর আহাম্মক! কী সব্বোনাশ করলু! অ্যাঁ![৯২]

নিম্নগতির নদী উপন্যাসটি উত্তরবঙ্গের মালদা জেলার গঙ্গার নিম্ন প্রবাহের বেশ কয়েকটি অঞ্চলের মানুষের লোকবিশ্বাস তুলে এনেছেন অভিজিৎ সেন, যাতে ওই অঞ্চলের মানুষকে বোঝা গেছে। গঙ্গা নদীকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলের লোকবিশ্বাস গঙ্গার মধ্যে প্রাণের সঞ্চার ঘটিয়েছে। নদী নয়, গঙ্গা এখানকার মানুষের মা বা গঙ্গামাঈ। ত্রিদিব মিশ্র কমিউনিস্ট হলেও মৃত্যুর আগে তার মনের অন্দরে জমে থাকা বিশ্বাস বেরিয়ে এসেছে গঙ্গাকে 'গঙ্গা মা' সম্বোধন করেছে। আবার আব্দুল মতিন বিশ্বাস মুসলমান ফলে তার ধর্মীয় অনুশাসনে সে গঙ্গার মধ্যে দেবত্ব আরোপ না করলেও সেও গঙ্গাকে তার মা, বোন এমন কিছুই ভেবেছে। প্রাকৃতিকভাবে গঙ্গার পাড় ভেঙেছে, মানুষ, পশু, বাড়ি-ঘর, জমি সব খেয়েছে তবুও মানুষ গঙ্গাকে 'মা গঙ্গা, দুর্গতিনাশিনী' ভেবেছে। প্রকৃতি মানুষের প্রকৃতিতে কীভাবে মিশে গেছে, অভিজিৎ সেন লিখেছেন—

> প্রকৃতিকে, আশীর্বাদ এবং রোষসহ, মেনে নেবার অভ্যাস যেন এক প্রাচীন শিক্ষা, যা মানুষের প্রকৃতিতেও মিলেমিশে শেষপর্যন্ত ধর্মাচারণের বিশ্বাস।[৯৩]

গঙ্গা তার ভয়ংকর রূপ দেখিয়েছে, মানুষকে দুর্ভোগ দিয়েছে কিন্তু মানুষ বিশ্বাস করত গঙ্গা মানুষের উপর দয়া করে বন্যা এনেছে। এসবের মধ্যে বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে বটে কিন্তু এখানকার মানুষ যুক্তির উপড়ে তাদের বিশ্বাসকে প্রাধান্য দিয়েছে। জলমগ্ন মানুষ তাদের গৃহপালিত পশুকে ভেসে যেতে দেখেছে, পরিজনদের মরতে দেখেছে তার পরেও ভেবেছে গঙ্গা রুষ্ট হয়েছে তাই সে সর্বনাশী হয়ে উঠেছে। গঙ্গার রোষ কমিয়ে সন্তুষ্ট করতে বিস্তীর্ণ গঙ্গায় দুধ ঢেলেছে। খয়রাতলায় গঙ্গা মায়ের পুজো হয়েছে ধুমধাম করে, একজোড়া মোষ বলি হয়েছে, গঙ্গামায়ের রোষ কমাতে এসব আড়ম্বর।

নদীদ্বীপবাসিনী লক্ষ্মীতারা 'বংশানুক্রমে আচরিত এক বিশ্বাস—আরোগ্যের বিধির ক্রীতদাসী সে।' সপ্তাহে একদিন একটা প্রায়ান্ধকার ঘরে পাথরের বিগ্রহকে তেল, সিঁদুর,

কাজল দিয়ে সাজিয়ে, বিশেষ ছাঁদে চুল বেঁধে পাথরের সামনে বসতে হত তাকে। সবাই তাকে দেয়াশিন বলেই জানত—

> যদি কোনো স্মৃতি তোমাকে দগ্ধ করতে থাকে, যদি কোনো পাপ বা পাপবোধ তোমাকে শত অনুতাপেও রেহাই না দেয়, যদি তোমার বুকের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলতেই থাকে, তাহলে মানিকচক, সাহেবগঞ্জ, রাজমহল, কাটিহারের মানুষ তুমি দেয়াশিন লক্ষ্মীতারার শরণাপন্ন হবে।[৯৪]

লক্ষ্মীতারার সামনে নগ্নগায়ে নতজানু হয়ে সেই অন্ধকার ঘরে বসে হৃদয়ের অর্গল খুলে স্বীকারোক্তি দিতে হবে, লক্ষ্মীতারা নিমগাছের ছিপ্‌টি দিয়ে পিঠে আড়াআড়ি তিনবার আঘাত করে বলত 'ভুলো-ভুলো ভুল যাও!' মানুষ তখন যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতি থেকে মুক্তি পাবে। ত্রিদিব মিশ্র শিক্ষিত হলেও তাকে অনেকবার পিঠ উন্মুক্ত করতে হয়েছিল দেয়াশিন মহামায়ার কাছে, যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতি ভুলতে। প্রতিবার ত্রিদিবের মনে হয়েছিল দেয়াশিন যথার্থই দেবাংশিনী। অনিমাকেও নিয়ে গিয়েছিল ত্রিদিব, ত্রিদিবের স্ত্রী অনিমা এসব বিশ্বাস করত না কিন্তু পাঁচটা গ্রামের অসংখ্য মানুষ বিশ্বাস করত। ত্রিদিব ও যতীন সাপের শঙ্খলাগা দেখেছিল, যতীন আক্ষেপ করেছিল কাছে নতুন গামছা না থাকায়। সেই মুহূর্তে যদি যতীনের কাছে নতুন গামছা থাকত তাহলে সেই গামছা শঙ্খলাগা সাপের গায়ে ছুঁড়ে দিতে পারত এবং সেই গামছা নাকি কপাল ফিরিয়ে দেয় মানুষের। মা বিষহরির কৃপায় সব আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা পূর্ণ হয়।

অভিজিৎ সেনের অনেক গল্প উপন্যাসেই এই দেয়াশিন ও গুণমান জাতীয় চরিত্র আছে। *নগ্ন নির্জন হাত* উপন্যাসে তিনি বলেছেন কীভাবে কবজ, তাবিজ, মাদুলি, গুরুদেব, আংটি প্রথমে মানুষের মগজে ক্রমে সমাজের সর্বত্র জাঁকিয়ে বসেছে। এই উপন্যাসে সুশান্তর বন্ধুর মামা সন্তোষ হঠাৎ সুশান্তর কাছ থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছিল। কোনো এক ভৈরবী নাকি তাকে বাণ মেরে নিয়ে গেছে। সুশান্ত সেই ভৈরবীর সন্ধান পেয়ে দেখেছিল ভৈরবীর চেহারা যথার্থ ভৈরবীর মতোই। সন্তোষ মরে যাওয়ার ভয়ে বার বার ছুটে এসেছে ভৈরবীর কাছে, তাবিজ, কবচের আশায়। সুশান্তর যেদিন প্রেম ও যৌনতার টানে নাগরিক যুক্তিবাদী মনটা মরে গেল সেদিন সে ছুটে গিয়েছিল ভৈরবীর চাতালে ও বাহুলাশিনী দেবীর মন্দিরে। তার বিশ্বাস জন্মেছিল ভৈরবীর আশ্চর্য ক্ষমতায় মন্ত্র দ্বারা সে অসাধ্য সাধন করতে পারত। তার সাহায্যে ভুলতে না পারা প্রেমিকাকে লাভ করতে চেয়েছে সুশান্ত। ভারতীয় প্রাচীন বিদ্যায়

গ্রহ-নক্ষত্র, তাবিজ-মাদুলির স্থান উল্লেখযোগ্য। *ঝড়* উপন্যাসেও দেখা যায়, রাখুদির বাড়ির উঠোনের একপাশে কালীমূর্তি, প্রতি শনি মঙ্গলবারে রাখুদির ভর হলে খিঁচুনি আরম্ভ হত, বাড়িতে ধুপ-ধুনো ধোয়া ফুল-বেলপাতায় এক রহস্যময় পরিবেশ তৈরি হত। রাখুর স্বামী গণেশ স্ত্রীর দেবী মাহাত্ম প্রচার করে তাবিজ মাদুলি দিয়ে পয়সা উপার্জন করেছে। মানুষের এমন বিশ্বাস, অনেকেই এসব টোটকায় ভালো হয়। হাবার মুখে বোল ফুটতে পারে, রাতে যে লোকটা ঘুমাতে পারে না চোখের নীচে কালি পড়েছে, সে ভাবে তাকে ভূতে ধরেছে রাখুর ওষুধে তার ভূত ছেড়ে পালাবে। যে লোকটাকে কুকুরে কামড়েছিল ফলে তার পেচ্ছাপের মধ্য দিয়ে কুকুরের বাচ্ছা বেরিয়েছিল সেও হয়তো ভালো হয়ে যাবে। আসলে মানুষের বিশ্বাস-অবিশ্বাসেও রোগ নিরাময়ের একটা ক্ষমতা আছে তাই রাখুর মতো দেবাংশীদের তাবিজে কাজ হয়েছে। যদি মানুষ সেরে না উঠত তাতে রোগীর কোনো ত্রুটি বেরোত। আসলে শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে মানুষের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বিরোধ তেমন নেই। শহরের ছেলে জ্যোতি গ্রামে কাকার বাড়িতে লেখাপড়া শিখছে তাকেও মঙ্গলবার শুভদিন দেখে তাবিজ ধারণ করাবার কথা হয়েছে। রাখুর স্বামী গণেশ গল্প বলেছে, জোতদার দ্বারিক ঘোষ তার বউমাকে অত্যাচার করে মেরে ফেলেছিল। সেই বউয়ের অশরীরী আত্মা আরও অনেক আত্মাকে ডেকে নিয়ে দ্বারিকের পুরো বাড়িতে দাপিয়ে বেড়িয়েছে। দ্বারিকের ছোটো মেয়ের তিনদিনের বাচ্ছা তার মায়ের বুকের দুধের বদলে রক্ত চুষে খেয়েছে। ওঝার দেওয়া জলপড়াতে তিনদিন পর বাচ্ছা মরে যেতে বাড়ির লোক হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। গণেশ এসব বলার মাঝে মাঝে মাদুলি তাবিজের বিশ্বস্ততার কথা বলে গেছে। এবং এও বলেছে—

> ধলুকাকা এসব বিশ্বাস করবে না, জানি। দু-অক্ষর ইংরাজি পড়লে—তবে এও বিজ্ঞান, এসব কথা বইতেও লেখা থাকে।[৯৫]

বিশ্বাসের ভিত কতটা শক্ত হলে এমন আকাট্য প্রমাণ এনে হাজির করে কাহিনিকে যথার্থতা দেওয়া যায় তা কেবল দৃঢ় বিশ্বাসীরা জানত। দ্বারিকের বউ তো রাখুর কেরামতিকে সেভাবেই বিশ্বাস করে রাখুর কাছে ক্ষমা চেয়েছে, ভেট হিসাবে রাখুকে সোনার বালা, ঠাকুরের জন্য সোনার জিভ দিতেও চেয়েছে। *নিম্নগতির নদী* উপন্যাসের লক্ষীতারাকে আরও একবার পাওয়া যায় *পাপীতাপী ও যোগিনী* উপন্যাসে, এখানেও সে 'ভোলেয়া' মা। গঙ্গা তীরবর্তী গ্রামে সে বসে ছড়ির আঘাতে মানুষের দুঃখ কষ্ট ভুলিয়েছে। তার যক্ষীমূর্তির মতো চেহারা সম্ভ্রম জাগায়, শহরের বাবু বিনায়কের দিকে তাকালে বিনায়ক ভেবেছিল অনেক

গভীর পর্যন্ত দেখে ফেলেছে লক্ষ্মীতারা, তাই মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কার জানিয়েছে। বিনায়কের শহরের শিক্ষা উপেক্ষিত হয়েছে লক্ষ্মীতারার কাছে। একটা সময় বিনায়কও মানতে শুরু করেছিল লক্ষ্মীতারা মানুষ নয়, জীবন মৃত্যুর সবটাই তার জানা। দুঃখ, কষ্ট পাপভয়, আতঙ্ক, কৃতকর্মের ক্ষত, অনুশোচনা, আত্মপীড়ন সব দূর করে মানুষকে মুক্তি দেবে লক্ষ্মীতারা। চৌধুরীর দাঙ্গাবাজ বংশ, তাদের নাতি ভরত মানসিক রোগগ্রস্ত, চৌধুরীরা মনে করেছিল দেয়াশিন তাদের নাতিকে সারিয়ে তুলবে। মনের চিকিৎসায় দেয়াশিনের জুড়ি নেই, লক্ষ্মীতারা ভরতের মনের মাঝে পর্দা টাঙিয়ে দিয়েছে। শহুরে বাবু বিনায়ক লক্ষ্মীতারার কাছে একদিন পিঠ উদলা করে বসেছিল। সমস্ত পাপীতাপীরা তাদের পাপমোচন করে শান্তি পেতে চেয়েছিল, ভোলেয়া মা ছাড়া তাদের গতি নেই, নিষ্ঠুর পাপ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা যতদিন থাকবে ততদিন মানুষের জন্য ভোয়েলা মায়ের দরকার।

বাংলা-বিহার সীমান্ত সংলগ্ন গ্রাম কড়ন্ডির মনসাপুজো সর্পবেদের মেলা, সাপ নিয়ে এখানের মানুষের ভাবনা ও নানান লোকবিশ্বাস নিয়ে অভিজিৎ সেন গড়ে তুলেছেন *নাগমঙ্গল* উপন্যাসের আখ্যান। করন্ডি গ্রামের লোকবিশ্বাস ছিল, তাদের গ্রামে কাউকে সাপে কাটেনি কখনো, এবং কাটেও না মা বিষহরির নিষেধ আছে, তাই সেই গ্রামে সাপ কেউ মারেও না। এই বিশ্বাস ভেঙে গেছে যখন গ্রামের ছেলে বিমল যাকে গ্রামে সবাই লখাই বা বালা বলে ডাকে সেই বালাকে গোখরো দংশন করেছে। শুধু বিমল এই গ্রামের লখাই বা বালা নয় তার বয়সী প্রায় সব ছেলেই বালা। এই গ্রামে অসংখ্য বালা আছে, বিমল মারা গেলে তার পরিণতি লখাই বা লখিন্দরের মতো হয়েছে। বিমলের শবকে কলার মান্দাসে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বিমলের দুই শিক্ষক বিনয় ও অরুণাংশু তাদের ছাত্রের আমন্ত্রণে করন্ডিতে সর্পবেদের মেলা দেখতে গিয়েছিল এবং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুক্তিবাদী কুসংস্কারের ক্ষমাহীন বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও বিমলের শবযাত্রায় অংশ নিয়েছিল তারা। ত্রিশ বছর পরেও এই দুজন যুক্তিবাদী অধ্যাপক ভেবে পায়নি সেদিন কেন তারা সেই শবযাত্রায় অংশ নিয়েছিল। অরুণাংশু বলেছে—

> আমি দেখতে চেয়েছিলাম করন্ডির গ্রামসমাজ সে-সিদ্ধান্তটা নিয়েছে তার পিছনে তাদের ধর্মীয় নিষ্ঠা কতটা, যুক্তির থেকে বিশ্বাস কত বেশি সক্রিয়।... বিশ শতকের শেষপাদে এসে গ্রামীণ মানুষের এই অন্ধবিশ্বাসের মূলে কী আছে, এইসবই আমাকে সেসময় ভাবিয়েছিল।[৯৬]

অভিজিৎ সেন বিশ্বাসের জগৎকে এখানে ব্যাখ্যা করেছেন সুন্দরভাবে, 'বিশ্বাস ব্যক্তির সত্তার গভীরে সৃষ্টিসংক্রান্ত নিয়মকে প্রবিষ্ট করায়।' বিশ্বাস সাধারণ মানুষের সঙ্গে বুদ্ধিজীবীকে

একসূত্রে বাঁধে, গুরু-শিষ্যর, ঈশ্বরবিশ্বাসীর সঙ্গে পুরোহিতের সংযোগ স্থাপন করে। যেমনভাবে পথ দুর্ঘটনায় একটি লোকের পা বাদ গেলেও সেই বাদ যাওয়া পায়ের ব্যথা অনুভব করেছে, গুরুদেব মন্ত্র পড়া জল দিতে শান্ত হয়েছে। লোকবিশ্বাসের ক্ষেত্রটিও তো এমন। বিমলকে বাঁচাতে বেদে ছবিলাল নাগবংশীর মন্ত্র গান গেয়ে বিষমুক্ত করতে চেয়েছিল। বিমলের মা বিষহরির রক্তমাখা থানে পুত্রের জীবনভিক্ষা চাইতে চাইতে জ্ঞান হারিয়েছিল। এবং শেষ চেষ্টায়, বিমলের মৃতদেহকে সাজানো কলার মঞ্জুসে তুলে নৌকায় স্থাপন করেছিল পুরোহিত ও ওঝা। বিমলের কয়েকজন বন্ধু এবং গায়েনের দল মনসামঙ্গলের গান গেয়ে জীয়নমন্ত্রে বিমলকে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে ফুলহার নদীতে ভাসতে ভাসতে। 'জিয়াও, জিয়াও, জীবন ফিরিয়ে দেও হে ডংক হে বিষহরি, বালার জীবন ফিরিয়ে দেও!' সাঁতালি পাহাড়ে শালি বিশালি গাছড়া ছিল, ত্রিলোচন ধন্বন্তরি সেই গাছড়া চেনে, যার পাতা ছেঁচে হাতে ডলে ঠোঁটের নীচে রাখলে মরাও উঠে বসে। বালাকে সেখানেই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কোন অসীম বিশ্বাসে এমন দুঃসাহসিক অসম্ভব কাজেও ব্রতী হয় মানুষ, কিন্তু এরপরেও করন্ডির মানুষ একই বিশ্বাস রাখবে সাপ সম্পর্কে, বিষহরি সম্পর্কে, বিমলের মতো যুবকদের সম্পর্কে।

করন্ডির মেলায় নিমন্ত্রিত হয়ে আসার সময় ট্রেনে বেদেদের কাছে সাপের খেলা দেখেছিল অরুণাংশু ও বিনয়। সাপেরা নাকি বাঁশির তালে নাচে এমন লোকবিশ্বাস শুধু করন্ডিতে নয় অনেক জায়গাতেই আছে। বিনয় স্বীকার করেছে তার বাল্যকাল থেকে এই সংস্কার ছিল যে, সাপের স্বপ্ন দেখলে নাকি বংশবৃদ্ধি হয়। করন্ডির মেলায় বিশ পঁচিশজন সাপুরে ঝাঁপিতে, হাড়িতে, কলসীতে সাপ নিয়ে হাজির হয়েছে এবং মানুষ সাপের গায়ে হাত লাগিয়েছে। ধান, দুর্বা, সিঁদুর ছুড়ে দিয়ে কামনা বাসনার কথা জানিয়েছে, তারা মনে করেছে বিষহরি প্রত্যক্ষ দেবতা। বিষহরিকে উৎসর্গ করে পাঁঠা, হাস, কবুতর বলি দেওয়া হয়েছে এমনকি হাঁসের ডিম ভেঙে উৎসর্গ করাও হয়েছিল। নিরপেক্ষতা, সংস্কারহীতারও বোধহয় একটা সীমা থাকে তার উর্ধ্বেও মানুষের মনের কোনো অল্প স্থানে লোকবিশ্বাস, সংস্কার, ধর্মীয় ভাবনা সুপ্ত থাকে। সময়মতো বেরিয়ে এসে নিরপেক্ষ সংস্কারহীন মানুষটিকেই অবাক করে। অভিজিৎ সেন তার গল্প উপন্যাসে এমন অনেক চরিত্রকে এনেছেন। আমরা নানান যুক্তি ও বিজ্ঞান দিয়ে বিশ্বাস ও সংস্কারকে পর্যদুস্ত করতে পারি কিন্তু আজীবন উপেক্ষা করার ক্ষমতা হাতে গোনা মানুষের।

৭। মিথ

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মানবজীবনে মিথ অপরিহার্য একটি উপাদান। পুরাণ সৃষ্টির আগে থেকে পুরাকাহিনি ও মিথ জনজীবনে ছিল। পুরাণের কাহিনি ও পুরাকাহিনি দুটি আলাদা বিষয়। বাংলা পুরাকাহিনি প্রচলিত ভাষায় রচিত এবং লোকসাহিত্যের অংশ অন্যদিকে সংস্কৃত পুরাণ লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। মিথ মানুষের মুখে মুখে তৈরি হয়েছিল, আশুতোষ ভট্টাচার্য মিথের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—

> সৃষ্টির দুর্ভেদ্য রহস্য ভেদ করিবার কৌতূহল লইয়া অপরিণত-বুদ্ধি মানব একদিন যে সকল অলৌকিক কাহিনী রচনা করিয়াছিল, ইংরেজিতে তাহাদিগকে myth বলে—বাংলায় তাহা লৌকিক পুরাণ অথবা পুরাকাহিনী বলিয়া অনুবাদ করা যায়।[৯৭]

যদিও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মিথের সংজ্ঞা বদলেছে। মিথের কাহিনি যতই অলৌকিক অবিশ্বাস্য ও প্রাচীন হোক না কেন আদিম মানুষ ও লোকসমাজের কাছে মিথের কাহিনির সত্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা ছিল। অলৌকিক চরিত্র, পূর্বপুরুষ, প্রাণী এইসব নিয়ে তৈরি কাহিনির এবং এদের অলৌকিক আচরণই মিথে ঠাঁই পেয়েছে, মিথের সঙ্গে ধর্মীয় অনুষঙ্গ জুড়ে থাকে। দেব-দেবীর উদ্ভব, দেব-দেবী ও দানবের দ্বন্দ্ব, দেব-দেবীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, পাপ-পুণ্য গ্রহ-নক্ষত্র, মানুষের বিশ্বাস-সংস্কার ইত্যাদি একাধিক বিষয় নিয়ে মিথ তৈরি হয়েছে। প্রাচীন মানুষ মিথের গল্প চরিত্রকে সঙ্গত মনে করলেও আজকের দিনে অনেকসময় এগুলিকে উদ্ভট আজগুবি ভাবা হয়েছে। মিথকে 'প্রাগ্‌বৈজ্ঞানিক যুগের বিজ্ঞান' বলাও হয়।

মিথের কাহিনি ও চরিত্র যে, সাহিত্যের আখ্যান ও চরিত্র হয়ে উঠতে পারে এমন বিস্ময় কথাসাহিত্যে এসেছে অনেক পরে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসের আখ্যানে মিথকে যথাযথভাবে ব্যবহার করেছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময় থেকে সতীনাথ ভাদুড়ি, কমলকুমার মজুমদার, মহাশ্বেতা দেবী হয়ে একেবারে একালের অভিজিৎ সেন, ভগীরথ মিশ্র, কিন্নর রায় প্রমুখের কথাসাহিত্যে মিথের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। অভিজিৎ সেন তাঁর অনেক গল্প উপন্যাসে লোককথার আখ্যানকে এনেছেন, ফলে মিথের জগৎ সহজেই এসে গেছে। যেভাবে তিনি 'দেবাংশী' গল্পে লোককথা ও মিথের এক বাস্তব জগৎ তৈরি করেছেন। গল্পের সারবান লোহারের মুখ দিয়ে দৈববাণী হয়েছে কারণ সে দেবাংশী। মিথ আশ্রয়ী লেখার ক্ষেত্রে দুঃসাহস দরকার ছিল বলে মনে করছেন অভিজিৎ সেন। যেটা তিনি দেবাংশী লেখার আগে পাননি তাই তিনি বলেন—

> অনাবশ্যক একটা বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিয়ে মাঝে মধ্যে পাঠকের এতকালের যুক্তিবুদ্ধিসম্মত রুচির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হচ্ছিল।[৯৮]

অভিজিৎ সেন তাঁর ‘মিথ ও লোককথার সম্ভাবনা’ প্রবন্ধে জানিয়েছেন, লাতিন আমেরিকার গল্প উপন্যাস যখন আমাদের মফস্বলে এসে পৌঁছেছে তখন আমাদের সাহিত্যের লোকায়ত জীবন কিংবদন্তী, পুরাণ ইত্যাদি ব্যবহার ও ব্যবহারের পদ্ধতির সঙ্গে লাতিন আমেরিকার সাহিত্যের তুলনা করতে শুরু করি। তিনি সেই তুলনা করে দক্ষিণ আমেরিকার সাহিত্যে ‘লোককথার বাস্তবতা’ ও ‘সাহিত্যে নয়া আধুনিকতা’ দেখেছেন এবং তা অনুসরণ আমাদের সাহিত্যিক মুক্তির পথ হতে পারে বলে মনে করেছেন। প্রথমদিকে বাংলা সাহিত্যে লোককথা, পুরাণ, মিথের ব্যবহার ‘ল্যাবরেটরির বুদ্ধি ও যুক্তির আলোকে’ চলেছিল। প্রাগৈতিহাসিক মিথের ব্যবহার বাংলা সাহিত্যে নতুন দিক খুলে দেবে এসবই অভিজিৎ সেনের বাংলা সাহিত্যে মিথের ব্যবহার নিয়ে ভাবনা ছিল। অভিজিৎ সেনের বেশ কিছু উপন্যাসের দৃষ্টান্ত আনলেই বোঝা যাবে তাঁর মিথ ব্যবহারের প্রবণতা।

অভিজিৎ সেনের *রহু চণ্ডালের হাড়* উপন্যাসের মিথ গড়ে উঠেছে রহুকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ বাজিকর গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষকে কেন্দ্র করে। রহু মিথিক্যাল চরিত্র হয়ে উঠেছে এই গোষ্ঠীর কাছে। রহুকে আশ্রয় করে একটি গোষ্ঠী বেঁচে থাকার প্রেরণা পেয়েছে, আবার কখনো কখনো জাদুবাস্তবতার ঘোর তৈরি হয়েছে যাযাবর চরিত্রগুলোর মধ্যে। পীতেম চাঁদনী রাতে গাছের জায়গায় তার বাপ দনুকে দেখেছে, দনু পীতেমকে বলেছিল ঐ দেখ, রহু তোমায় দেখে, রহু সব বাজিকরকে দেখে, রহু হাড় দিয়েছিল বাজিকরদের এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে। দনু পীতেমকে রহুর গল্প শুনিয়েছিল যা বাজিকরদের মিথ। রহু তার গোষ্ঠী নিয়ে যে ভূখণ্ডে বাস করত সেখানে নদীর স্রোতের মতো চঞ্চল তাদের জীবন। কিন্তু বহিরাগতদের আঘাতে রহুর রক্তাক্ত দেহ নদীতে ভেসে যায়, রহুর দেহকে অধিকার করতে তার অনুগামীরা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। রহুর রক্তের প্লাবনে বহিরাগতদের নগর ও দলত্যাগীদের ভূখণ্ড ধ্বংস হয়েছিল। জলের বেগ কমতে রহুর কয়েকটা হাড় পেয়েছিল বাজিকররা। যাযাবর সমাজে রহুর এই মিথ প্রেরণা জুগিয়েছে। রহুর অলৌকিক কাহিনিতে আছে বাজিকরের পৌরাণিক ঐতিহ্য কারণ রহুর ক্ষমতাকে লৌকিক সীমায় ধরা যায়নি। লুবিনি তাই রহুর হাড়ের বৃত্তান্ত শুনিয়েছে, কীভাবে ঘোর অমাবস্যায় জন্মানো শিশু মরবে আমাবস্যার দিন এবং তার লাশ ভাসানো হবে অমাবস্যার রাতে। সেই লাশ গভীর রাতে

নদী থেকে উঠবে, তার কণ্ঠার হাড়ে ভান্‌মতির হাড় তৈরি হবে সেই হাড় দিয়ে হয়কে নয়, নয়কে হয় করা যাবে, সেটাই রহু চণ্ডালের হাড়। মিথের মধ্যে কল্পনা মূল জায়গা, এখানেও বাজিকরের নারী-পুরুষ সকলেই রহুর উপস্থিতি কল্পনা করেছে। রহুর মিথে ভরসা করে বাজিকর গোষ্ঠীর দু-পা সচল থেকেছে। রহুর কাহিনি বাজিকরের কাছে সত্য তাই তারা এর মধ্যে যুক্তি এনে হাজির করেনি। তার অতিমানবিক সত্তার নির্ভরযোগ্য ভিত্তি থাক বা না থাক, যাযাবরের কাছে যেন তা প্রামাণ্য সত্য।

লুবিনি, দনু, পীতেমের মতো শারিবার জীবনেও রহুর মিথ প্রভাব ফেলেছে, সে তার নানি লুবিনির কাছে রহুর কথা আবিষ্ট হয়ে শুনেছে যদিও সে সব কথার অর্থ ধরতে পারেনি। কিন্তু জানত একদিন সেও রহুকে দেখবে, রহু তার সামনে বিষণ্ন মূর্তিতে এসে হাজির হবে। শুধু শারিবা না সব বাজিকর জানত তারা একদিন রহুর মুখোমুখি হবে। আসলে রহুর কাল্পনিক ধারণা ও গল্প, রহুর অলৌকিকতা বাজিকরের সম্পদ। ‘রহু কি হামরাদের ভগবান?’ শারিবা আরও জানতে চেয়েছে—

> হিন্দুর ভগবান আছে, মোছলমানের আল্লা, খিস্টানের যেশু। তো হামরার বাজিকরের রহুই সি ভগবান, কি আল্লা, কি যেশু। লয়?[৯৯]

শারিবার এই প্রশ্নের উত্তর সে পেতে চেয়েছে নানি লুবিনির কাছে, লুবিনি নিজেই তো এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছিল। রহুর অস্তিত্ব একসময় তারা ভুলে হিন্দু-মুসলমান যে কোনো ধর্মে থিতু হতে চেয়েছিল তাতে বাজিকরের ক্ষতিই হয়েছে। রহুর মিথ বাজিকরের রক্তে আছে তাই তারা বিভাজিত হয়ে কোনো এক ধর্মে থিতু হবার পরেও বুঝে উঠতে পারেনি তারা ঠিক করল নাকি ভুল করল। তাদের পূর্ব পুরুষের পাপে তারা অভিশপ্ত সেই অভিশাপেই তারা ঠিকানাহীন। অভিজিৎ সেন, অঞ্জন সেনের নেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন রহু উপন্যাসের চরিত্র নয়, স্মৃতি, কিংবদন্তী ও মিথে তার অবস্থান, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস অবশ্য তাঁর ‘অভিজিৎ সেনের হাড়তরঙ্গ’ প্রবন্ধে রহুকে মানুষ বলেই চিহ্নিত করেছেন। দনু, পীতেম, জামির এদের দায়িত্ববোধ, ভাবনা উদ্বেগ দেখে তাদের পয়গম্বরের মতো বলেছেন। বাজিকরদের হিংস্রতা ও হিংসার শিকার হতে দেখে বাইবেলের কথা স্মরণ করেছেন। বাজিকরদের জাত, ধর্ম, দেশ, আত্মপরিচয় না থাকলেও, আছে থিতু হবার স্বপ্ন ও রহুর মিথ।

মিথ ও লোককথার মধ্যে একটা গোটা সমাজের সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে খুঁজে পাওয়া যাবে বলে মনে করেছেন অভিজিৎ সেন। যেভাবে রহুর মিথের মধ্যে বাজিকরদের ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে বোঝা যায়, যেভাবে দেবাংশী সারবানের মিথের জগৎ থেকে ইতিহাসে উত্তরণ। প্রাবন্ধিক পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধে *বর্গক্ষেত্র* উপন্যাস প্রসঙ্গে মিথের বাস্তবতা কীভাবে টাল খায় সে প্রসঙ্গে বলেছেন—

> আস্তিক মাল মিথের জগতে বাস করতো, অভিজিৎ দেখালেন ১৯৮০'র ঐ জগতের তথাকথিত বিরোধী শক্তিও মিথকেই নানা বিকৃতির মধ্যে ধরে রাখতে চায়।[১০০]

আইনিভাবে জোতদারের জমি বর্গা রেকর্ড করলে জোতদারের সঙ্গে বেইমানি করা এমন মনে করেছিল আস্তিক মাল, আস্তিকের এই শুদ্ধ বিশ্বাস ও আনুগত্যের কল্পকথার মধ্যে হয়তো মিথকে দেখেছেন প্রাবন্ধিক। দেবাংশী সারবান ও আস্তিকের ছেলে পরশুরাম এরা 'মিথের বাস্তবের মধ্য থেকেই নিজস্ব মানব প্রক্রিয়ায় ইতিহাসের মুক্তি পায়।'

অভিজিৎ সেন তাঁর 'দেবাংশী', 'লখিন্দর ফিরে আসবে' প্রভৃতি গল্পে যেমন মঙ্গল কাব্যের উপাদান ব্যবহার করেছেন তেমন ভাবেই *ছায়ার পাখি*, *বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর*, *নাগমঙ্গল* প্রভৃতি উপন্যাসে মঙ্গলকাব্যের মনসা, বেহুলা-লখিন্দরের মিথকে ব্যবহার করেছেন, মঙ্গলকাব্যের বাস্তবতা এবং লোককথার বাস্তবতাকে নতুন যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে। *বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর* উপন্যাসের মায়নোমতি ছেলের নাম রেখেছে বালা লখিন্দর। তাই সে বালাকে মনসামঙ্গলের লখিন্দরের মতোই ভাবত। বালার নদীতে ভেসে যাওয়ার স্বপ্নের অর্থ খুঁজতে চেয়েছে, 'সে নৌকায় যায়, না কলার মান্দাসে যায়,' এই চিন্তায় মগ্ন হয়েছিল মায়নোমতি। বালা বিষহরির দান তাই তাকে কোনোদিন কলার ভেলা চাপতে দেয়নি মায়নোমতি। এমনকি—

> একসময় মনে হয়েছিল ছেলের নামকরণের মধ্যে কি ভয়ংকর কিছু লুকিয়ে আছে? সত্যি তো, বালা লখিন্দর কি কোনো মানুষের সন্তানের নাম হওয়া উচিত? বালা লখিন্দররা তো মা-বাপকে খালি দুঃখ দিতে আসে। দুঃখ দেয়, যন্ত্রণা দেয়, তারপর তো মরেই যায়।[১০১]

মায়নোমতি যে তার সন্তানকে মনসামঙ্গলের লখিন্দরের আদলে দেখেছে তা স্পষ্ট। অভিজিৎ সেন তো বালার মধ্য দিয়ে লখিন্দরের আর্কিটাইপ ব্যবহার করেছেন। বেহুলা-লখিন্দরের লৌহবাসরে কালনাগের প্রবেশ এবং তারপর যা ঘটেছে তারই প্রতিরূপ যেন বালার তাঁতের

পাড়ডোবায় গোখরোর প্রবেশ এবং বালার পরবর্তী জীবন। যদিও এই সাপ বালার পরবর্তী যৌন জীবনের রূপক তবুও বালার পাড়ডোবায় সাপের প্রবেশ এবং তার পরবর্তী জীবন বিদ্যাধরীর সঙ্গে ভেসে যাওয়া বালার ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিয়ে গেছে। লেখক মায়নোমতিকে চাঁদ সওদাগরের স্ত্রী সনকার চারিত্রিক রূপ না দিলেও চাঁদের মিথকে এনেছেন। তাইতো মায়নোমতি ভেবেছে, দেবতাদের সঙ্গে তার কোনো বিরোধ ও রেষারেষি ছিল না, সন্তানপ্রাপ্তির মানতে কোনো শর্তও ছিল না তাহলে সন্তানের লখাই নামে বাধা কোথায়। তবুও—

> কোথায় যেন একটা মিল আছে। স্মৃতিতে সত্তায়, অস্তিত্বের গোপন অভ্যন্তরে, বিশ্বাসে কিংবদন্তীতে ওতপ্রোত একটা টোটেমে যেন নিয়তি স্থির হয়েই আছে।[১০২]

শুধু ছেলের নাম লখিন্দর এতেই আশঙ্কা হয়েছে তা নয়, মায়নোমতির সই শৈলী বারবার সাবধান করেছিল এমন জোয়ান ছেলেকে অবিবাহিত রাখা ঠিক নয়। মঙ্গলকাব্যের সেই আখ্যান তো মায়নোমতির ও শৈলীর অজানা ছিল না। মনসা বলেছিল 'বিহারাত্রে আনিব হরিয়া' তাই চাঁদ বালাকে বিয়ে দিচ্ছে না অন্যদিকে মদনবানে জর্জরিত বালার স্বপ্নে মনসার ছলনায় অপ্সরা কামসোনা কোশল্যার রূপ ধরে ছলনা করে গেছে। বালাকে দিঘিতে আমন্ত্রণ করে গেছে মনোবাসনা পূর্ণ করার। সম্পর্কে মামি কোশল্যাকে দিঘি থেকে স্নান করে উঠে আসতে দেখেছে বালা। যদিও বালা তাকে চিনত না, কোশল্যা অজাচারের পাপের কথা এবং সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়ে বালাকে আটকাতে পারেনি বরং বালা রাধা-কৃষ্ণের সম্পর্কের কথা বলে শাস্ত্রের দোহাই দিয়েছে। কোশল্যা বালাকে পাপ, বদনাম ও আয়ুক্ষয়ের কথা বলেছে, নিজ স্বামীর বীরত্বের কথা বলেছে তবু বালার কামবাসনা থেকে রেহাই পায়নি। এই ঘটনাকে মায়নোমতি দেবতাদের লীলাখেলা বলে মনে করেছে, 'কিন্তু কোথাও কোথাও মানুষ, দেবতা, প্রকৃতি সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।' মায়নোমতি একথা যে জানত না তা নয়।

বালা বিদ্যাকে নিয়ে রাতের নদীতে ভেসেছিল। অভিজিৎ সেন এই দুই নর-নারীর রাত্রিকালীন যাত্রার পরিবেশ এবং তাদের ভেসে যাওয়ার অপূর্ব বর্ণনা দিয়েছেন। জোৎস্নালোকিত শীতের রাতে পরিশ্রান্ত বালা শ্বাস টেনে টেনে লগি ঠেলছে, তার ঘাড় থেকে খদ্দরের চাদর পা অবধি ঝুলে পড়েছে। চাঁদের আলোয় বালাকে অপার্থিব দৈব পুরুষের

মতো লাগছিল, নৌকার মধ্যে বসে থাকা বিদ্যার কাছে। চারিদিকের স্তব্ধ নিসর্গের রূপ ও বালার নতুন রূপ মিশে বিদ্যাধরীকে বিহ্বল করেছে—

> কতকাল আগে সে যেন ভেসেছিল আরেকবার? সে কত জন্ম আগে? সে কি এই মানুষের সঙ্গে? মাছ, মকর, ঘরিয়াল-কুমির, পালে পালে শিশুমার ধেয়ে এসেছিল যে পচনধরা দেহটির লোভে, সে কি ওই দিব্যপুরুষটির, যার মাথা এই মুহূর্তে গাছপালা ছাড়িয়ে নক্ষত্রের গায়ে গিয়ে ঠেকেছে? ভয়, হতাশা, হাজার প্রলোভন জয় করেছিল কি বিদ্যা এই পুরুষের পথ চেয়েই?[১০৩]

আবার বালা বলেছে 'এ যাত্রায় তুমি সওয়ারি, হামি চড়নদার! আগ্‌লা জন্মের দেনা শোধ করমো।' অভিজিৎ সেন বেহুলা লখিন্দরের মিথকে বাস্তবের দুই নর-নারীর যৌবনতাড়না, প্রেম ও জীবনের কঠিন পথ পরিক্রমায় এনে হাজির করেছেন। উপন্যাসের অন্যান্য অংশের সঙ্গে এখানেও বিদ্যা ও বালার বেহুলা-লখিন্দর রূপ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

মালাকারের কন্যা ও মালাকারের বউ বকুলবালা সোলার ফুল তৈরি ও মনসার পট আঁকার কাজে খুবই দক্ষ ছিল। এই কাজে তার খ্যাতি প্রবল ছিল, প্রতিবছর আষাঢ় শ্রাবণ মাসে দুশো আড়াইশো পট সে আঁকত। বেহুলা পতিকে নিয়ে সাগরে ভাসবে, মালাকার হিসাবে তার এই মঞ্জুস নির্মাণ চমৎকার। মঞ্জুসপটের মাথায় অষ্টনাগের ভূষণে বিষহরি, সাপের বসন ভূষণ, সাপের ছাতা অন্যদিকে 'মেড়ঘরে দুর্লভ লখিন্দর সর্পাঘাতে কালঘুমে অচেতন,' কালঘুমে লখিন্দরকে হারিয়ে বেহুলা দিশেহারা, চাঁদের কুলস্ত্রীগণ জলের ঝারি, পাখা নিয়ে ছুটে আসছে অপূর্ব এসব নির্মাণ বকুলবালার। বেহুলা-লখিন্দরের মিথ বকুলবালার হাতে যেন প্রাণ পেয়েছে, বকুলবালা, বিদ্যাধরী, বালা ও মায়নোমতি এই মানুষগুলোর জীবনে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। উপন্যাসে দেবী কালী ধর্ম ও তাদের সন্তান কালমাশনার গল্প অভিজিৎ সেন খুব সংক্ষেপে বলেছেন। এলুয়ার দহে মানুষ বিপদে পড়লে মনে করা হত, কালমাশনার কোপ। দেবী কালী একদিন এলুয়ার দহে স্নান করতে নেমেছিল ধর্ম সেখানে হাজির হলে বিবস্ত্র যুবতী দেখে মোহিত হয়ে যায়, তাদের মিলনে জন্ম হয়েছিল জারজ কালমাশনার। অসম্ভব শক্তিশালী, দুর্দম যোদ্ধা কালমাশনা নানা রূপ ধারণ করতে পারত। দেবী কালী নিয়ে এমন একটি মিথ এসেছে বিশ্বাসী এই উপন্যাসে।

নাগমঙ্গল উপন্যাসে এসেছে মানুষের লোকবিশ্বাস, মঙ্গলকাব্য ও উপনিষদের কাহিনি। ফলে পৌরানিক চরিত্র, মঙ্গলকাব্য ও সাপের মিথ ফুটে উঠেছে। বাংলা বিহারের

সীমান্তবর্তী একটি গ্রামে কেউ কোনোদিন সাপের কামড়ে মরেনি, অথচ সেই গ্রামের যুবক বিমল সর্ববেদের মেলায় সর্পদংশনে মারা যায়। বিমলের মৃতদেহকে কলার মান্দাসে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল এই বিশ্বাসে যে সে আবার প্রাণ নিয়ে ফিরে আসবে। আসলে এখানে অভিজিৎ সেন মনসামঙ্গলের লখিন্দরের মিথকে তুলে ধরেছেন। বিমলকে যে মান্দাসে ভাসানো হয়েছিল তাতে যেসব পটচিত্র, ছবি ও নকসা ব্যবহৃত হয়েছে তা মনসামঙ্গলের লখিন্দরের ভেলার অনুরূপ। সোলা ও কাগজ দিয়ে মান্দাসের যত্রতত্র সাপ, কুমির, শুশুক, মাছ এমনকি বেহুলার স্বামী কোলে বসে থাকার চিত্রও। বিমলের গ্রাম করন্ডির বিষহরিতলার মনসা প্রতিমা অষ্টনাগে সজ্জিতা, কাগজের তৈরি বেহুলার ভেলার অনুরূপ মঞ্জুস, এসবের পিছনে সিজ গাছের ভীতি উদ্রেককারী প্রেক্ষাপট। এই সব সাপের চিত্র দেখে লেখক মহাভারতে নাগজাতি ও বিচিত্র পুরাণকাহিনির কথা মনে করেছেন। বিমলের মঞ্জুসের নাগরাজকে দেখে লেখক পুরাণের নাগরাজ তক্ষকের কথা মনে করেছেন, যে শক্তিশালী, বুদ্ধিমান, মায়াবী, চতুর। মহাভারতের আদিপর্বে উতঙ্ক তার গুরু বেদ ঋষিকে দক্ষিণা দিতে চেয়েছিল, ঋষি উতঙ্ককে তার স্ত্রীর কাছে পাঠিয়েছে দক্ষিণায় কি চায় তা জানতে, আচার্যাণী পৌষ্যরাজের মহিষির কানের কুণ্ডল চেয়েছিল। উতঙ্ক অনেক প্ররিশ্রম করে তা সংগ্রহ করলেও নাগরাজ তক্ষক তা চুরি করে পাতালে প্রবেশ করেছিল। উতঙ্ক ইন্দ্রের সাহায্যে পাতালে গিয়ে বহুকষ্টে সেই কুণ্ডল ফেরত পেয়েছে। তক্ষকের প্রতি ক্রোধে উতঙ্ক জনমেনজয়কে উস্কানি দিয়েছিল, পিতৃহত্যার দায়ে তক্ষককে সবংশে শেষ করার জন্য। এছাড়াও জনমেনজয়ের ভাইদের যজ্ঞে দেবকুক্কুরী সরমার সন্তানের প্রহারের ফলে সরমা দ্বারা জনমেনজয়ের অভিশপ্ত হওয়া এবং পরীক্ষিৎকে তক্ষকের দংশন, প্রমদ্বরাকে সর্প দংশন এসবের মধ্য দিয়ে সাপ ও মানুষের বিরোধের সম্পর্ক বোঝাতে চেয়েছেন লেখক। যমুনার তীরে খাণ্ডব যেখানে তক্ষকের বা্ সেখানেই তো কৃষ্ণ, অর্জুন তাদের সঙ্গীসহ প্রমোদের ব্যবস্থা করেছিল। কৃষ্ণ ও অর্জুনের খাণ্ডব দহনের ফলে তক্ষকের স্ত্রীর শরীর থেকে মস্তক ছিন্ন হয়েছে অর্জুনের তীরে। এর ফলে কৃষ্ণ, অর্জুন তক্ষকের শত্রু হতে পারত কিন্তু মহাভারতে তা ছিল না। প্রমদ্বরার জন্ম বৃত্তান্ত, রুরুর সঙ্গে প্রমদ্বরার বিয়ের আগেই সর্পাঘাতে প্রমদ্বরার মৃত্যু হয়েছে। রুরুর অর্ধেক আয়ু দিয়ে প্রমদ্বরার প্রাণ ফিরিয়ে আনা, এরপর রুরু প্রতীজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে সাপেদের ধ্বংস করতে। এই উদ্দেশ্যে রুরু ঢোঁড়া সাপকে মারতে উদ্যত হলে ঢোঁড়া প্রাণ ভিক্ষা করে রুরুকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে সে আসলে

সহস্রপাদ নামের এক ঋষি, খগমের অভিশাপের ফলে তার এই দশা। সে মানুষের মৃত্যুর কারণ নয়, রুরু সম্মুখে এলে সে শাপমুক্ত হবে। রুরুর যমের বাড়ি যাওয়া, নচিকেতার যমের বাড়ি অপেক্ষা ও যমের সাক্ষাৎ এবং বরলাভ, সেই বরের তৃতীয়টিতে নচিকেতা জানতে চেয়েছে মৃত্যুর পর জীবের কী ঘটে, যম এই প্রশ্ন থেকে বিরত থাকতে চাইলেও নচিকেতার জেদের কাছে হারতে বাধ্য হয়েছে। রুরুও যমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার আয়ুর সময়কাল জানতে চেয়েছিল। তা জানতে না পারলেও আশির্বাদ লাভ করে ফিরে গেছে। অভিজিৎ সেন মহাভারতে ব্যবহৃত পুরাণের এসব প্রসঙ্গের সংক্ষিপ্ত অবতারনা করে বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তক্ষক ও কৃষ্ণ অর্জুনের শত্রুতা কেন হল না, নচিকেতা কেন বাবার একটা কথাতেই বাড়ি ছেড়ে যমের বাড়ি গেল, এসব মিথের পাশাপাশি তিনি আসলেই সাপ ও মানুষের বিবাদকেই বোঝাতে চেয়েছেন। আসলে মানুষের বিশ্বাস, সাপ অভিশাপের থেকেও ভয়ংকর, নির্ঘাত, নিশ্চিত, মায়াবী কুটিল, সর্পদংশন বিধিনির্দিষ্ট।

মহাভারতের যুগে সর্পাঘাতে মৃত প্রমদ্বরার সহজে জীবন ফিরিয়ে আনতে পারে রুরু, আবার মঙ্গলকাব্যের যুগে লখিন্দরের জীবন ফিরিয়ে আনতে বেহুলাকে অনেকটাই কষ্ট করতে হয়েছে। কিন্তু এযুগের লখিন্দর বিমলের জীবন ফিরিয়ে আনার জন্য মঙ্গলকাব্য ও পুরাণকেন্দ্রিক মিথের ভাবনা উঠে এসেছে। বিমলের প্রেমিকা মৈথিলী মনসামঙ্গলের বিবর্তন বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে রুরু-প্রমদ্বরা ও যমের বৃত্তান্ত এনেছিল। বিমলের জীবন ফিরিয়ে আনার জন্য মানুষের সমবেত প্রচেষ্টা ও সমস্ত লৌকিক প্রতিক্রিয়াকে মৈথিলী তার গবেষোণাপত্রে ঠাঁই দিয়েছে। ঠাকুমার মুখে শোনা লোকগল্পের মানুষ ভাইদের মৃত্যুর বারো বছর পরে বোনেদের কাছে ফিরে আসার বৃত্তান্তে উপনিষদের নচিকেতার মিথের প্রতিফলন দেখা যায়। আবার দাদামশায়ের থেকে শোনা বৃদ্ধার গল্প যাতে বৃদ্ধা ভিক্ষা ও বনের কাঠের বোঝা ভারী হলে কাতর হয়ে যমকে ডেকেছিল তাকে নিয়ে যাবার জন্য কিন্তু যম এলে বৃদ্ধা তাকে দিয়ে কাঠের বোঝা তুলিয়ে নিয়ে বাড়ি গেছে। অভিজিৎ সেন বলেছেন এই গল্পের সঙ্গে ঋগ্‌বেদের ঋষিদের আকাঙ্ক্ষার মিল পাওয়া যায়। মৈথিলীর গবেষণাপত্র জুড়ে ছিল লোকগল্প, মঙ্গলকাব্য, পুরাণ, উপনিষদ কেন্দ্রিক মিথ। বাস্তবের সেই মুহূর্তের সাক্ষী হয়েছিল যখন তার প্রাণপুরুষ বিমলের প্রাণ ফিরিয়ে আনতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল ফুলহার নদীতে। মৈথিলীও একদিন আবিষ্ট হয়ে মনে মনে বলে উঠেছিল 'জিয়াও জিয়াও, সাধু তুমি ওকে জিয়াও!' করন্ডির সর্পবেদের মেলাতেও বিমলের পাশে সিন্থেটিক শাড়িতে বেশ

মানিয়েছিল মোইথিলীকে, ওই অঞ্চলে তাদের নাম বলা হবে 'বেন্যানি বিহুলা এবং বালা লখিন্দর' কিন্তু মৈথিলীকে বিষহরি মনসা মনে হয়েছিল, সর্পাবরণ ও অষ্টনাগের মুকুট থাকলেই হত। শাড়ির ডুরেগুলো অসংখ্য সাপ মনে হয়েছিল। বিমলের অধ্যাপক অরুণাংশু তার সহকর্মী বিনয়কে মৈথিলীর দিকে এগোতে নিষেধ করেছিল, মহাদেবের সভায় হেন্তাল হাতে চাঁদকে দেখে মনসার অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে। এখানে মৈথিলীকে মনসারূপেই দেখেছিল অরুণাংশু। আর বিমলকে তো লখিন্দর রূপেই দেখছে করন্ডির মানুষ। সর্পদংশনের পর লোকে বলাবলি করেছে যদি না বাঁচে তবে দেহটাকে গঙ্গায় ভাসিয়ে রাজনগর যাবে। অভিজিৎ সেন লিখেছেন—

> সাপের বা নাগের কত গল্প কত কাহিনিই যে এখানে প্রচলিত আছে, বিশ্বাস এবং সংস্কারের বেড়া ডিঙ্গিয়ে সেসব এখন আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ। এখান থেকে চম্পা বা চম্পালি নগর বেশিদূরে নয়। পন্ডিতেরাও ভাগলপুরকে প্রাচীন চম্পা বলেই জানেন। চম্পা মনসামঙ্গলের চাঁদ সওদাগরের রাজধানী। ...আজ মরল বিমল। মরল কী?[১০৪]

চাঁদের ও লখিন্দরের মিথ করন্ডির সমাজ, ইতিহাস ও মানুষের মনোভবের পরিচয় দিয়েছে। বিমলকে সত্যি চিরদিনের জন্য হারাল করন্ডির মানুষ, এমনটা ভাবতে পারেনি। বিমলকে নিয়ে তারা গিয়েছিল পঞ্চশিমুলি সংলগ্ন সাঁতালি পাহাড়ে। অনেকের বিশ্বাস এখান থেকে ধন্বন্তরি ওঝার শিষ্যরা তক্ষকের দংশন থেকে ধন্বন্তরি ওঝাকে বাঁচাতে বিশল্যকরণী সংগ্রহ করতে এসেছিল। মৃত লখিন্দরকে বাঁচাতে ধন্বন্তরিও এসেছিল। এখানে মনসা নানাভবে ধন্বন্তরিকে বাধা দিতে চেষ্টা এবং হুঁশিয়ার করেছিল। বিষপান করে বেঁচে থাকার ক্ষমতা দেখালেও ধন্বন্তরির সঙ্গে মনসার বিবাদ উপস্থিত হয়েছিল। মনসা চিন্তিত হয়েছে যে ধন্বন্তরির জন্য তার উদ্দেশ্য ব্যহত হবে, লখিন্দরকে মারতে না পারলে সমাজে তার পুজোর প্রসার হবে না, দেবসমাজে সে ব্রাত্য থেকে যাবে। মহাভারতের ধন্বন্তরিকে মনসামঙ্গলের ধন্বন্তরির থেকে আলাদা ভূমিকায় দেখা গেছে। মহাভারতের ধন্বন্তরি ছিল দেব চিকিৎসক। এই বিবাদের মতো পরীক্ষিৎ ও তক্ষকের বিবাদে কাশ্যপ উপস্থিত হয়েছে, সে যদিও তক্ষকের কাছে নিজের ক্ষমতা প্রমাণ করেও লোভে পড়ে তক্ষকের থেকে ধনসম্পদ পেয়ে ফিরে গেছে। মনসামঙ্গলের ধন্বন্তরি মনসার কোনো হুঁশিয়ারিতে কান দেয়নি, মনসাকে ছলে কৌশলে জানতে হয়েছিল কীভাবে পরাজিত করতে হবে এই ওঝাকে। তক্ষককে দিয়ে দংশন করানোর পরে মনসা নিজে বিশল্যকরণী ছিনিয়ে নিয়েছে ধন্বন্তরির শিষ্যদের হাত

থেকে। ওঝাকে হারাতে মনসাকে ওঝার বউ ও শালীর ছদ্মবেশ নিতে হয়েছে। এসব পুরাকাহিনির উল্লেখ আছে এই উপন্যাসে। বিমলের দেহ ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া হলেও দুর্যোগের কারণে ওঝার কাছে কেউ পৌঁছাতে পারেনি। শেষে বিমলের দেহ পুরোহিতের নানা উপচারের পর গঙ্গায় নামিয়ে দেওয়া হয়েছে, 'যা রে লখাই প্রাণ নিয়ে আবার ফিরে আসিস—'

বিনয়ের বলা গল্পের সেই বউটি যে সাপের ডিম এনে বাড়িতে রেখেছিল, সেই ডিম ফুটে বাচ্ছা হলে সেই সাপদের সঙ্গে বউটি ভাই-বোনের সম্পর্ক পাতিয়ে সাপের রাজ্যে ঘুরে এসেছে কয়েকদিন। মনসার বর নিয়ে ফিরে এসে নিজ বাড়িতে মনসার পুজো শুরু করেছে। সেই রাজ্যে সর্পভূষিতা মনসার দর্শন পেয়েছে, মনসা সাপ গিলছে আবার উগরে দিচ্ছে যেমন শ্রীমন্ত সওদাগর দেখেছিল পদ্মপুষ্পের উপর বসে ভগবতী হাতি গিলে আবার উগরে দিচ্ছে। ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল কাব্য রচনার পূর্ব প্রেক্ষাপট অর্থাৎ দেবী মনসার আদেশের যে গল্প, চাঁদের সর্পবিদ্বেষী ভূমিকা, আবার মনসামঙ্গলের কবিদের সর্পপ্রেম, মৃত্যুভয়ে মনসাকে আরাধ্য দেবী করা হয়েছে কিনা, জরুৎকার ও মনসার বিবাহপ্রসঙ্গ, মনসার পুজো প্রচলন, কালনাগের দংশনে লখিন্দরের মৃত্যু মনসামঙ্গল কেন্দ্রিক এমন একাধিক মিথের প্রসঙ্গ লেখক শুধু আনেননি, সেগুলোর যুক্তি ও বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মানুষ এসব করে তাদের নির্দিষ্ট বিশ্বাসের জায়গা থেকে, এই সঙ্গে ধর্মীয় একটা অনুষঙ্গ থাকবেই, মিথগুলো অনেকসময় ধর্মীয় অনুসঙ্গে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে।

নাগকেশর অক্ষবাট উপন্যাসে কিংবদন্তির দেশ নাগকেশর পূন্যভুমি, চৈতন্যদেব এখানে রাত্রিবাস করেছিলেন, যার আকাট্য প্রমাণ হিসাবে আছে বহুপ্রাচীন বৈষ্ণব অক্ষবাট। এখানের মানুষ মনোহর দাস হাসপাতালে শুয়ে মৃত্যুকালীন আচ্ছন্নতায় তার ছেলেবেলার দেখা ঘোড়ার পিঠে উঠেছে। অভিজিৎ সেন লিখেছেন—

> বিশাল দুই ডানা ঝটপট করে দু'পাশে মেলে ধরল ঘোড়া। মনোহর ঘোড়ার গলা ধরে ঝুলে উঠে বসে পড়লেন পিঠে। ঘোড়া ডানা ঝাপটিয়ে আকাশে উড়ল।[১০৫]

মনোহর নাগকেশর ছাড়িয়ে পক্ষীরাজে চড়ে অন্যদেশে পাড়ি দিয়েছিল। লেখক এই উপন্যাসের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে এখানে পক্ষীরাজের মিথ এনেছেন। অভিজিৎ সেন তাঁর গল্প উপন্যাসে লোককথা, রূপকথা, মিথের অলৌকিক বাস্তবতা দেখিয়ে সাহিত্যে নতুন

চেতনার সন্ধান করেছেন। সাহিত্য দিয়ে সামাজিক সাংস্কৃতিক বিন্যাসকে বুঝতে লোকজীবন লোককথা মিথ ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত মানুষকে খুঁজতে হবে একথা তিনি তাঁর 'উপন্যাস ভাবনা' তে জানিয়েছেন। অভিজিৎ সেন মনে করেছেন—

> কল্পকথা, অন্ধবিশ্বাসের জগতে মিথের বসতি। লোককথার জগতে লোকায়ত মানুষ এইসব কল্পকথা, অলৌকিক বস্তু-ব্যক্তি-ঘটনায় প্রত্যক্ষ্যভাবে নিত্য যাতায়াত করে। সেখানকার ঘটনা, চিন্তা এবং বিশ্বাস সেখানকার মানুষের কাছে খুবই প্রত্যক্ষ, খুবই বাস্তব।[১০৬]

বিশ্বাসের জগতের মানুষের সমগ্র জীবনযাপন লক্ষ্য করেছেন, তাদের সমগ্র বিশ্বাসের মধ্যে বাস্তবতার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন তাই তাঁর সাহিত্যভাবনায় মিথ মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে।

উল্লেখপঞ্জি

১। সেন, অভিজিৎ, *রহু চণ্ডালের হাড়, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ১৯

২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩০

৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩১

৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫২

৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫৭

৬। ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান, 'অভিজিৎ সেনের হাড়তরঙ্গ', রাহেল রাজিব (সম্পাদিত), *রহু চণ্ডালের হাড় প্রাসঙ্গিক পাঠ,* কথাপ্রকাশ, ঢাকা, বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ২০১৫, পৃষ্ঠা- ২৪

৭। সেন, অভিজিৎ, *রহু চণ্ডালের হাড়, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৬৩

৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৬৮

৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৭০

১০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৭৭

১১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৭৯-৮০

১২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৯১

১৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১২১

১৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১২৪

১৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৩৯

১৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৪২

১৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৬৩-৬৪

১৮। সেন, অভিজিৎ, *ছায়ার পাখি, দশটি উপন্যাস*, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩,

পৃষ্ঠা- ২৪৩

১৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৯৪-২৯৫

২০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৪৯

২১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৮৮

২২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৪২

২৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৭৪

২৪। শীল, বিকাশ, 'গন্তব্যের দিকে অথবা (*ছায়ার পাখি* নিয়ে একটি মানবী কথপোকথন)', বিকাশ শীল (সম্পাদিত), *জনপদপ্রয়াস,* (অভিজিৎ সেন সংখ্যা), চুচুড়া, হুগলী, বইমেলা ২০০৬, পৃষ্ঠা- ৮১

২৫। সেন, অভিজিৎ, *ছায়ার পাখি, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৩১৬

২৬। সেন, অভিজিৎ, *ঝড়, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৮২৮

২৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৮৫৪

২৮। সেন, অভিজিৎ, *মেঘের নদী, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৬৯৩

২৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৭১১

৩০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৭১২

৩১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৬৮৫-৬৮৬

৩২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৭১৫

৩৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৭১৭

৩৪। সেন, অভিজিৎ, *নিম্নগতির নদী,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৬, পৃষ্ঠা- ২৭

৩৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫৬

৩৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪০

৩৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫৩

৩৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৭৬

৩৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১০৫

৪০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১১৪-১১৫

৪১। সেন, অভিজিৎ, *পাশ, নগ্ন নির্জন হাত,* স্বস্তিক প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ১৭৬-১৭৭

৪২। সেন, অভিজিৎ, *নাগমঙ্গল,* অক্ষর প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০১৯, পৃষ্ঠা- ১৫

৪৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৩

৪৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১০৫

৪৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৩৪

৪৬। সেন, অভিজিৎ, *দিদারগঞ্জের যক্ষী,* অশোক দাশগুপ্ত (সম্পাদক), *আজকাল শারদ সংখ্যা,* ১৪২২, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ১১০

৪৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১১৫

৪৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৩০

৪৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৩৩

৫০। সেন, অভিজিৎ, *কার পদধ্বনি আসে? কার?*, সুমন চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক), *এই সময়* শারদীয়া, ১৪২২, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ২৭৪

৫১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৭১-২৭২

৫২। সেন, অভিজিৎ, *পাপীতাপী ও যোগিনী,* অরিন্দম বসু (সম্পাদক) *সুখপাঠ* (ওয়েব ম্যাগাজিন), শারদ সংখ্যা, ২০২০

৫৩। সেন, অভিজিৎ, *পাপীতাপী ও যোগিনী,* অরিন্দম বসু (সম্পাদক) *সুখপাঠ* (ওয়েব ম্যাগাজিন), শারদ

সংখ্যা, ২০২০

৫৪। অভিজিৎ সেনের সাক্ষাৎকার, বিকাশ শীল (সম্পাদিত), *জনপদপ্রয়াস* (অভিজিৎ সেন সংখ্যা), চুচুড়া, হুগলী, বইমেলা ২০০৬, পৃষ্ঠা- ২৪

৫৫। অভিজিৎ সেনের সাক্ষাৎকার, বজলুল করিম বাহার, সরকার আশরাফ (সম্পাদক), *নিসর্গ* (গদ্য সংখ্যা), বগুড়া, বাংলাদেশ, জুলাই ১৯৯৮, পৃষ্ঠা- ১৭৫

৫৬। অভিজিৎ সেনের সাক্ষাৎকার, বিকাশ শীল (সম্পাদিত), *জনপদপ্রয়াস* (অভিজিৎ সেন সংখ্যা), চুচুড়া, হুগলী, বইমেলা ২০০৬, পৃষ্ঠা- ২৩

৫৭। চট্টোপাধ্যায়, সাধন, 'মহাশ্বেতা দেবী: প্রস্তাব ও প্রহেলিকার পর্ব', দীপঙ্কর মল্লিক (সম্পাদক), *তবু একলব্য* (মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ সংখ্যা), কলকাতা, ২০১৬, পৃষ্ঠা- ২৬

৫৮। বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম, 'মহাশ্বেতা দেবী: ব্যক্তি ও ইতিহাসের মেল বন্ধন', সুবল সামন্ত (সম্পাদিত), *বাংলা উপন্যাস: বীক্ষা ও অন্বীক্ষা,* এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০১১, পৃষ্ঠা- ৯৬

৫৯। সেন, অভিজিৎ, 'মিথ ও লোককথার সম্ভাবনা', অঞ্জন সেন ও উদয়নারায়ণ সিংহ (সম্পাদিত), *মিথ সাহিত্য সংস্কৃতি,* ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩, পৃষ্ঠা- ১৪৫

৬০। বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, 'গল্পের আঙ্গিকে জীবনবোধের সারাৎসার', *আনন্দবাজার পত্রিকা,* (গ্রন্থপরিচয়), শনিবার ১৫ই জুলাই ২০১৫

৬১। চট্টোপাধ্যায়, ব্রজদুলাল, (ভূমিকা), *ঈশানী মেঘ ও অন্যান্য গল্প,* অভিজিৎ সেন, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নয়া দিল্লি, ২০০৮, পৃষ্ঠা- xvi

৬২। বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, *নাগিনী কন্যার কাহিনী, তারাশঙ্কর রচনাবলী* (অষ্টম খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৪, পৃষ্ঠা- ৫৭

৬৩। সেন, অভিজিৎ, *বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৪৬০

৬৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৭৫

৬৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৭৫-৪৭৬

৬৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৭৬

৬৭। সেন, অভিজিৎ, *ছায়ার পাখি, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৩০২

৬৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৫৮

৬৯। সেন, অভিজিৎ, *নিম্নগতির নদী,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৬, পৃষ্ঠা- ১২৭

৭০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১০৭

৭১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১০৯

৭২। সেন, অভিজিৎ, *হলুদ রঙের সূর্য, একের মধ্যে পাঁচ,* জে এন চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃষ্ঠা- ৩৮৫-৩৮৬

৭৩। সেন, অভিজিৎ, *রহু চণ্ডালের হাড়, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ২৭

৭৪। সেন, অভিজিৎ, *আঁধার মহিষ, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৩৭৭

৭৫। সেন, অভিজিৎ, *নিম্নগতির নদী,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৬, পৃষ্ঠা- ১১৫

৭৬। সেন, অভিজিৎ, *নাগমঙ্গল,* অক্ষর প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৯, পৃষ্ঠা- ৭৩

৭৭। সেন, অভিজিৎ 'আমার দুঃখী উপন্যাসের কয়েকটি', তাপস ভৌমিক (সম্পাদক), *কোরক সাহিত্য পত্রিকা,* (প্রাক্ শারদ সংখ্যা), ১৪১৫, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ১০৬

৭৮। সেন, অভিজিৎ, 'আমার দুঃখী উপন্যাসের কয়েকটি', তাপস ভৌমিক (সম্পাদক), *কোরক সাহিত্য পত্রিকা* (প্রাক্ শারদ সংখ্যা), ১৪১৫, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ১০৬

৭৯। চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল, *সাহিত্যের রূপরীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ,* রত্নাবলী, কলকাতা, পঞ্চম পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০১৫, পৃষ্ঠা- ২৭৩

৮০। সেন, অভিজিৎ, *ছায়ার পাখি, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ২৫৭

৮১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৮৫

৮২। সেন, অভিজিৎ *হলুদ রঙের সূর্য, একের মধ্যে পাঁচ,* জে এন চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃষ্ঠা- ৩৯০

৮৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৩৪

৮৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৬৩

৮৫। সেন, অভিজিৎ, *নিম্নগতির নদী,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৬, পৃষ্ঠা- ১৬৪

৮৬। সেন, অভিজিৎ, *ছায়ার পাখি, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ২৬৪

৮৭। সেন, অভিজিৎ, *হলুদ রঙের সূর্য, একের মধ্যে পাঁচ,* জে এন চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃষ্ঠা- ৩৯২

৮৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪২৪

৮৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪২৬

৯০। সেন, অভিজিৎ, *বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৪৪৯

৯১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৪০

৯২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৩৫

৯৩। সেন, অভিজিৎ, *নিম্নগতির নদী,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৬, পৃষ্ঠা- ১০৬

৯৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৬৭

৯৫। সেন, অভিজিৎ, *ঝড়, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৮৪৯

৯৬। সেন, অভিজিৎ, *নাগমঙ্গল,* অক্ষর প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৯, পৃষ্ঠা- ৩২-৩৩

৯৭। ভট্টাচার্য, আশুতোষ, *বাংলার লোক-সাহিত্য* (প্রথম খণ্ড : আলোচনা), ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৬২, পৃষ্ঠা- ৬০৯

৯৮। সেন, অভিজিৎ, 'মিথ ও লোককথার সম্ভাবনা', অঞ্জন সেন ও উদয়নারায়ণ সিংহ (সম্পাদিত), *মিথ সাহিত্য সংস্কৃতি,* ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩, পৃষ্ঠা- ১৪৪

৯৯। সেন, অভিজিৎ, *রহু চণ্ডালের হাড়, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৬৩

১০০। বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম, 'রহু চণ্ডালের হাড়-এ সময়, বাস্তব : সমগ্ররূপ', রাহেল রাজিব (সম্পাদিত), *রহু চণ্ডালের হাড় প্রাসঙ্গিক পাঠ,* কথাপ্রকাশ, ঢাকা বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৩৫

১০১। সেন, অভিজিৎ, *বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৪৪৯

১০২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৭৮

১০৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৮৫

১০৪। সেন, অভিজিৎ, *নাগমঙ্গল,* অক্ষর প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৯, পৃষ্ঠা- ১২৫

১০৫। সেন, অভিজিৎ, *নাগকেশর অক্ষবাট,* অশোক দাশগুপ্ত (সম্পাদিত), *আজকাল শারদীয়,* কলকাতা ১৪২০, পৃষ্ঠা- ১৫৮

১০৬। সেন, অভিজিৎ, 'মিথ ও লোককথার সম্ভাবনা', অঞ্জন সেন ও উদয়নারায়ণ সিংহ (সম্পাদিত), *মিথ সাহিত্য সংস্কৃতি,* ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩, পৃষ্ঠা- ১৫০

পঞ্চম অধ্যায়

অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের শিল্পরীতি

উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে শুধু বিষয়ের মূল ভূমিকা থাকে না, নির্বাচিত বিষয়কে কোন পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা হচ্ছে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। বিষয় ও আঙ্গিকের মেলবন্ধনে প্রকৃষ্ট সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি হয়। সত্তর দশকের কথাসাহিত্যিকরা তাঁদের লেখায় শুধু বিষয়গত পরিবর্তন আনেননি আঙ্গিকগত পরিবর্তনও এনেছেন। বিষয় ও আঙ্গিকগত নানান বৈচিত্র্যের ফলে পাঠক আরও বেশি বেশি করে বুঝতে পেরেছে সমাজ ও সাহিত্যের নানা স্তরকে। শুধু আখ্যানে মনোযোগ নয়, আখ্যান বিন্যাসের ধরন, নিখুঁত উপভাষা প্রয়োগ, চরিত্র উপস্থাপনের কৌশল, কথনের রীতি, বিভিন্ন প্রকার শব্দ ব্যবহার, উপন্যাসের আয়তনের তারতম্য, দৃষ্টিকোণ, সঙ্গীত ও অলংকারের ব্যবহার, বিভিন্ন প্রকার চরিত্রের ভিন্ন ভাষার ধরন, অশ্লীল শব্দের অসংকোচ ব্যবহার এসব দিকে নতুন নতুন পদ্ধতি রপ্ত করেছেন সত্তর ও সত্তর পরবর্তী কথাসাহিত্যিকরা। অভিজিৎ সেন তাঁর সিংহভাগ উপন্যাসে গ্রামবাংলাকে ধরেছেন আরও স্পষ্ট করে বললে উত্তরবঙ্গের গ্রামবাংলার চিত্র এঁকেছেন। কাহিনির ফাঁকে ফাঁকে সম্পূর্ণ উপকাহিনি, বর্ণনার নতুন রীতি, সমাজের নানা স্তরের মানুষের ভাষার বৈচিত্র্য, শব্দ ব্যবহারের নিপুণতা অভিজিৎ সেনকে স্বতন্ত্র করেছে। গ্রামীণ মানুষের সমগ্র জীবন ও সমাজের সঙ্গে তাদের রসায়নে যেভাবে সেই সব মানুষ তাদের ভাষা, সঙ্গীত, ব্যবহার করে তাও দেখিয়েছেন অভিজিৎ সেন।

১। প্লট নির্মাণ

উপন্যাস পাঠকের কাছে মূল আকর্ষণের জায়গা প্লট। ঘটনার সরল বিবরণ নয়, কার্যকারণ শৃঙ্খলা থাকবে প্লটে। কুন্তল চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—

> কেবলমাত্র কাল-পারম্পর্য বজায় রাখা কিংবা আকস্মিকতার চকিত চমক সৃষ্টিতে নয়, অনিবার্যতার নিয়মে চূড়ান্ত পরিণতির নির্দিষ্ট লক্ষ্যে প্লটকে চালিত করতে পারলেই উপন্যাসে প্লটের শর্ত রক্ষিত হবে। নানা ঘটনার বিশৃঙ্খলা থেকে কাহিনির উপাদান আহরণ করে তাকে এক সুচিন্তিত যৌক্তিক শৃঙ্খলা দেওয়া প্লট নির্মাণের সার কথা।[১]

উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে প্রধানত সরল ও জটিল বা যৌগিক প্লট প্রাধান্য পেয়ে থাকে। কাহিনির নিরিখে দু-ধরনের প্লট হয়ে থাকে, সরল প্লট ও জটিল বা যৌগিক প্লট। অভিজিৎ

সেন উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে এই দুই ধরনের রীতি ব্যবহার করেছেন। সরল প্লটে অর্থাৎ একটি মাত্র কাহিনির বিস্তারে লিখেছেন *আঁধার মহিষ* (১৯৯৩), *নগ্ন নির্জন হাত* (২০০৯), *পাশ* (২০০৯), *ধর্মায়ুধ* (২০২০), *নাগমঙ্গল* (২০১৯), *দিদারগঞ্জের যক্ষী* (২০১৫) প্রভৃতি উপন্যাস। এই উপন্যাসগুলির মূল কাহিনির সহায়ক কোনো পূর্ণাঙ্গ উপকাহিনি নেই। *আঁধার মহিষ* উপন্যাসের দুটি আলাদা ধর্মের নারী-পুরুষ অলকানন্দা ও কামাল, এদের প্রেম বিবাহ এবং একসঙ্গে থেকে সর্বধর্মের ঊর্ধ্বে একটা অন্য সমাজের অসম্ভব কল্পনা। আবার কখনো ধর্ম নিয়ে অন্তর্ভাবনা প্রকাশ করে একে অপরের সঙ্গে বিতর্কে গেছে আবার কখনো কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমাজের ধর্মীয় বিদ্বেষের একাধিক আঘাত সামলেছে। উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্ররা কামাল অলকানন্দার পরিস্থিতি উন্মোচনের সহায়ক হয়েছে কিন্তু অন্য কাহিনি গড়ে ওঠেনি। ঐতিহাসিক উপন্যাস *ধর্মায়ুধ* এর কাহিনি একটি সরলরেখায় নির্মিত হয়েছে। রাজা গণেশ সিংহাসনের অধিকার ধরে রাখতে পুত্র যদুকে এবং ধর্মকে আয়ুধ হিসাবে ব্যবহার করে পুত্রকে ইসলামে দীক্ষিত করেছে। সময় বুঝে আবার পুত্রকে হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে এনেছে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে। সব মিলিয়ে যদুর হিন্দু থেকে ইসলাম এবং ইসলাম থেকে পুনরায় হিন্দু এই পরিবর্তনের কারণ ও ফলাফল, অন্যদিকে গণেশের চাতুরতা ও ধর্মীয় রক্ষণশীলতা এবং গণেশের পুত্র যদুর ধর্মীয় ও মানসিক পরিবর্তনের পর্ব এই মূল কাহিনিতেই উপন্যাসের আখ্যান সীমাবদ্ধ। এছাড়াও কিছু ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কিত প্রাচীন কিছু তথ্য উপন্যাসের আখ্যানকে তথ্যনির্ভর করে তুলেছে অন্য কাহিনির সূত্রপাত হয়নি।

নগ্ন নির্জন হাত উপন্যাসে যুবক সুশান্তর কৈশোর থেকে যৌবন পর্যন্ত প্রেমকে বয়ে চলার কাহিনি এবং সেই প্রেম সময় পেলেই অন্তরে রক্তক্ষরণ করিয়েছে প্রেমিকার অপ্রাপ্তিতে। সেই প্রেমের প্রতিক্রিয়া দীর্ঘদিন অব্যক্ত থাকতে থাকতে শরীরী আবেদন তৈরি করেছে। এবং প্রেমিকার শরীরের স্পর্শ পেতেই সীমাহীন প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা উপলব্ধি করেছে সুশান্ত। এই একটি কাহিনিতেই উপন্যাসের পরিসমাপ্তি। পাশাপাশি অসংলগ্ন একতরফা একটি পৌঢ় প্রেম কাহিনির আভাস আছে মাত্র তবে কোনোভাবেই তা উপকাহিনি নয়। *নাগমঙ্গল* উপন্যাসেও দুজন যুক্তিবাদী অধ্যাপকের একত্রিশ বছর আগের স্মৃতিচারণে উঠে এল করন্ডি নামক গ্রামের সর্পবেদের মেলার কাহিনি। সেই গ্রামের মানুষের সর্পদংশন জনিত যুগবাহিত মিথ ভেঙে গেছে গ্রামের যুবক বিমলের সর্পাঘাতে মৃত্যুতে। এই কাহিনির

সঙ্গে মঙ্গলকাব্য, উপনিষদ, লোককথা মিলেমিশে একাকার হয়েছে। অভিজিৎ সেন পুরাণ ও মঙ্গলকাব্যে সাপের নানান ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। বিমলের দেহকে কলার মান্দাসে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে এই বিশ্বাসে যে সে আবার বেঁচে ফিরে আসবে। কিন্তু কাহিনি সরল প্লটের ধারায় একটি বিন্দুতে গড়িয়েছে। উপনিষদ পুরাণ, মঙ্গলকাব্যের কথা এলেও উপন্যাসের মূল কাহিনির সঙ্গে মিশে একটি কাহিনিই গড়ে উঠেছে আলাদা কোনো কাহিনি রূপ পায়নি। *দিদারগঞ্জের যক্ষী* উপন্যাসেও একজন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও পুলিশের সাহায্যে দেশের ঐতিহ্যবাহী সম্পদ পাচারের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। এই কাহিনিও সরল প্লটের ধারা মেনে নির্মাণ করেছেন অভিজিৎ সেন।

মুল কাহিনির সঙ্গে উপকাহিনি, উপন্যাসের বহুমাত্রিকতা, বাস্তবতা ও উপন্যাসের চরিত্রদের জীবনের গভীরতাকে প্রকাশ করে। যৌগিক প্লটে মূল কাহিনির সঙ্গে এক বা একাধিক উপকাহিনি থাকে, যা প্রধান কাহিনিকে শিল্পসমৃদ্ধ করতে উপযোগী হয়। অভিজিৎ সেন তাঁর অনেকগুলি উপন্যাসে মূল কাহিনির পাশে একাধিক উপকাহিনি এনেছেন। উপকাহিনিগুলি মূল কাহিনিতে বহুমাত্রিকতা এনেছে। উপকাহিনি দিয়ে তিনি চরিত্রগুলির জীবনের গভীর থেকে গভীরে প্রবেশ করেছেন। একাধিক কাহিনির সংস্থানে অভিজিৎ সেনের উপন্যাস ভারাক্রান্ত হয়নি। যেমন *রহু চণ্ডালের হাড়* (১৯৮৫) উপন্যাসে একটি যাযাবর গোষ্ঠীর দেড়শ বছর ধরে থিতু হবার লড়াই করেছিল, তার মাঝে তাদের সঙ্গে সাঁওতাল, মালো, ঝালোদের পরিচয় ঘটেছে। সাঁওতাল এবং মুসলমানদের সঙ্গে তারা চাষে ও বাসে একাত্ম হতে চেয়েছিল। ফলে উপন্যাসে সাঁওতালদের কাহিনি ও দেশ স্বাধীনের পর মুসলমানদের কাহিনি সংযোজিত হয়েছে। অন্যদিকে জমিদার বদিউল মালের একটি উপকাহিনি এনেছেন লেখক। আবার বাজিকরের পাঁচ পুরুষের জীবনযুদ্ধের লক্ষ্যমাত্রা স্থায়ী হলেও প্রতি পুরুষে জীবনযাত্রার রঙ বদলে গেছে। বাজিকর দনু, পীতেম, জামির, বালি, পরতাপ, সালমা, সারিবা, লুবিনি মূল কাহিনির সূত্রে গ্রন্থিত হলেও সব যেন স্বতন্ত্র এক একটি কাহিনির ধারক। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় স্থায়ী হওয়া ছাড়া আর কোনো ক্ষেত্রকে দেখতে বা বুঝতে চায়নি এরা। শুধু এই একটি উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্রোতে গা ভাসাতে চেয়েছে। কয়েকটি উপকাহিনির দ্বারা সমাজের মূল স্রোতের মানুষদের পাশাপাশি দেখিয়েছেন লেখক। সব মিলিয়ে যাযাবরের জীবনের সম্পূর্ণ লড়াই কত কঠিন এবং যাযাবর কীভাবে মার খেতে খেতে ঠকেছে, কূল খোঁজার চেষ্টা করেছে তা স্পষ্ট হয়েছে একাধিক কাহিনির আশ্রয়ে। *হলুদ*

রঙের সূর্য (১৯৯৬) উপন্যাসেও বাংলাদেশ থেকে আসা সহদেব বিশ্বাস তার গোষ্ঠীর জন্য বাসের ভূমির সন্ধানে লড়াই করেছে। পাশাপাশি সাঁওতালদের লোকবিশ্বাস ও তাদের ঠকিয়ে জোতদারের জমি দখলের কাহিনি, সহদেবের নতুন পত্তনিতে নকশাল যুবকদের সংগঠন বাড়ানোর কাহিনি আবার সুদেব ও মালবিকার প্রেমের একটি পর্ব এভাবে চারটি কাহিনি পাশাপাশি চলেছে উপন্যাসে। মূল কাহিনি সহদেব বিশ্বাসের লড়াই ক্ষুণ্ণ হয়নি অন্য কাহিনির জন্য বরং সহদেবের প্রতিপক্ষ জোতদার বনমালীদের আরও লোভী চক্রান্তকারী রূপ পরিস্ফুট হয়েছে। *স্বপ্ন এবং অন্যান্য নীলিমা* (২০০০) উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধ, দেশভাগ ও নকশাল আন্দোলনের কাহিনির রেশ সামন্তরালভাবে চলেছে। তিনটি কাহিনিকে একটি সময়ের প্রেক্ষাপটে ধরেছেন লেখক। *নিম্নগতির নদী* (২০০৫) উপন্যাসে বন্যায় গঙ্গা নদীর ভাঙনের ফলে যে ভয়াবহ রূপ ধারণ করে মানুষকে কষ্ট দেয় তার সঙ্গে রাজনৈতিক অস্বচ্ছতা উঠে এসেছে। উপন্যাসের মূল চরিত্র ত্রিদিব মিশ্রের নিঃস্বার্থপরতা এবং দাম্পত্যজীবনের পাশাপাশি দেয়াশিন লক্ষ্মীতারার প্রতি আসক্তির একটি কাহিনি, ত্রিদিবের বন্ধু অরুণ মজুমদারের প্রেম ও ইসলাম গ্রহণের বৃত্তান্ত, আব্দুল মতিন বিশ্বাসের দুঃখ ভরা জীবন এমন একাধিক উপকাহিনি যোগ হয়েছে। অভিজিৎ সেনের জটিল প্লটের উপন্যাসগুলির ঘটনার গঠন সুসংবদ্ধ, ঘটনাগুলি কার্যকারণ শৃঙ্খলাযুক্ত এবং উপন্যাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

২। দৃষ্টিকোণ (Point of View)

কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে দৃষ্টিকোণ বা নিরীক্ষণ-বিন্দু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপন্যাসের কাহিনির কথক যে অবস্থান থেকে কাহিনি বিন্যস্ত করে, তাতে বোঝা যায় ঔপন্যাসিকের জীবন ও মূল্যবোধকে। জীবনের বাস্তবতা থেকে ঔপন্যাসিক রসদ সঞ্চয় করেন। তাঁর দেখার যে দৃষ্টিকোণ অন্যদের থেকে আলাদা হবে বলাই বাহুল্য। তবে তাঁর দেখা বাস্তবতার সঙ্গে সচেতনভাবে কল্পনা মিশিয়ে আখ্যানের পূর্ণতা দিতে পারেন। তাঁর নিজস্ব বোধ থেকে কাহিনিকে উপাদেয় করে তুলতে পারেন। শিল্পের বাস্তবতা ও জীবনের বাস্তবতা একই বিন্দুতে থাকে না তাই দুই বাস্তবতাকে এক ছাঁচে ঢালাই করতে লেখকের দৃষ্টিকোণ অনেকটা কাজ করে। প্রথম পুরুষের নিরিক্ষণ-বিন্দু উপন্যাসের দৃষ্টিভঙ্গিগত প্রচলিত পদ্ধতি। লেখক বস্তুনিষ্ঠ ভঙ্গিতে উপন্যাসের চরিত্রদের কাহিনি বর্ণনা করেন। অভিজিৎ সেনের অধিকাংশ উপন্যাসে প্রথম পুরুষের জবানীতে আখ্যান বর্ণিত হয়েছে। তবে প্রথম

পুরুষ রীতির সর্বময় omniscience ন্যারেটরের মাধ্যমে আখ্যানভাগ বর্ণনা যেভাবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) অনেকেই করেছেন। অভিজিৎ সেন শুরুর দিকের *ক্রান্তিবলয়* এবং সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত *পাপীতাপী ও যোগিনী* (২০২০) উপন্যাসে এই রীতি অনুসরণ করেছেন, এক্ষেত্রে লেখকই সর্বদ্রষ্টা। এক্ষেত্রে লেখককে গল্প থামিয়ে Editorial omniscience রূপে কিছু ব্যাখ্যা দিতে হয়েছে, ফলে পাঠককে গল্পের রেশ থেকে একটু অন্যমনস্ক হতে হয়। এবং সব কাহিনি পাঠকের বিশ্বাসযোগ্য নাও হতে পারে, এই পদ্ধতির এটি প্রধান অসুবিধা। এই সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণকে কিছুটা বাস্তবমুখী করতে পরিবর্তিত পয়েন্ট অব ভিউ হিসাবে সীমিত সর্বজ্ঞতাকে ব্যবহার করেন লেখক। এটিতেও প্রথম পুরুষের জবানী ব্যবহৃত হয় তবে মূখ্য চরিত্রের চোখ দিয়ে কাহিনি ও চরিত্রের বিস্তার ঘটানো হয়ে থাকে। অভিজিৎ সেনের *নগ্ন নির্জন হাত* (২০০৯) উপন্যাসের সুশান্তর দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই উপন্যাসের সমগ্র কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। *নাগমঙ্গল* (২০১৯) উপন্যাসের বিনয় চরিত্রটিকেও এমনই এক ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে উপন্যাসের অধিকাংশ অংশে। শুধু একটি চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনা বিবৃত হবে এমন না, একই উপন্যাসে দৃষ্টিকোণ বদলাতে পারে, যে প্রক্রিয়াকে পরিবর্তমান নীরিক্ষণ-বিন্দু বা shifting point of view বলে। যেমন অভিজিৎ সেনের *শিরিন এবং তার পরিজন* (২০১৭) উপন্যাসে ডাক্তার অরিন্দম মল্লিকের দৃষ্টিকোণ থেকে অনেকটা কাহিনির বিবরণ শোনা গেছে তারপর আবার ন্যারেটরের বর্ণনা শুরু হয়েছে।

৩। বর্ণনারীতি

উপন্যাসের আখ্যানভাগ বর্ণনার ক্ষেত্রে লেখক কিছু কৌশল অবলম্বন করেন। মূলত তিনটি কৌশলে লেখক আখ্যান বর্ণনা করে থাকেন, উত্তম পুরুষ (First Person), মধ্যম পুরুষ (Second Person), প্রথম পুরুষ (Third Person)। মধ্যম পুরুষ এই রীতিতে ন্যারেটর গল্প বলেন শ্রোতাকে তুমি, আপনি সম্বোধন করে। তবে এই রীতি খুব বেশি ব্যবহৃত হয় না কারণ এখানে সম্বোধনকারী উত্তম পুরুষের বর্ণনাকারী। উত্তম পুরুষের রীতি অনুযায়ী সাধারণত আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস বর্ণনা করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ন্যারেটর হিসাবে থাকে সর্বজ্ঞ এক আমি। এই আমি কাহিনির কেন্দ্রবিন্দু এবং তার প্রত্যক্ষ পরোক্ষ উপলব্ধি থেকে গল্প এগিয়ে চলে, তার দৃষ্টিকোণ থেকেই ঘটনা ও চরিত্র বিবৃত হয়।

উপন্যাস রচনায় সর্বাধিক ব্যবহার হয়েছে প্রথম পুরুষ ন্যারেটর রীতি। অভিজিৎ সেনও তাঁর প্রায় সব উপন্যাসে এই রীতি ব্যবহার করেছেন। এক্ষেত্রে তিনরকম ভাবে ন্যারেটরের দ্বারা কাহিনি চিত্রিত হয়ে থাকে। ন্যারেটর যখন কোনো মত ও ব্যাখ্যা দেবেন না, শুধু কাহিনির বিবরণ দেবেন তখন সেটা নাটকীয় বা বস্তুনিষ্ঠ প্রথম পুরুষ বর্ণনারীতি (dramatic or third person objective)। আবার ন্যারেটরের দ্বারা আখ্যান বর্ণনা, ন্যারেটরের কাহিনি ও চরিত্র সবকিছুই জানা, তিনি সব জায়গায় উপস্থিত এমন পদ্ধতিকে বলে সর্বময় বা omniscient রীতি। বাংলার বেশিরভাগ উপন্যাস এই রীতিতে লেখা। অভিজিৎ এই রীতিতেই লিখেছেন *হলুদ রঙের সূর্য, মেঘের নদী* (২০০৫), *রহু চণ্ডালের হাড়, নক্ষত্র নদী ও নারী* (২০১৫) আরও অনেক উপন্যাস। এই উপন্যাসগুলিতে অভিজিৎ সেন ন্যারেটরের মধ্য দিয়ে কাহিনি ও চরিত্র বিবৃত করেছেন। ন্যারেটর চরিত্র, ঘটনা, পরিবেশ পরিস্থিতির সবটাই জানেন, তিনিই সব কিছুর নিয়ন্ত্রক। প্রথম পুরুষ রীতির তৃতীয় পদ্ধতিটি আংশিক বা সীমায়িত সর্বময় বিবরণরীতি বা Limited Omniscient। এখানে লেখক ঘটনার বর্ণনা তন্ময় রীতিতে করলেও একটি চরিত্রের উপর বেশি নজর দেন এবং তার মাধ্যমেই বর্ণনাকে একটা সীমার মধ্যে ধরে রাখেন। এখানে উত্তম পুরুষের 'আমি' নয় অন্য কেউ গল্প বলেন। এভাবে লেখকের সর্বজ্ঞতা থেকে একটু সরে এসে ঔপন্যাসিক বাস্তবতাকে আরো স্পষ্ট করতে চান। অভিজিৎ সেন তাঁর *শিরিন এবং তার পরিজন* এবং *নাগমঙ্গল* উপন্যাসে এই রীতি কিছুটা প্রয়োগ করেছেন। *শিরিন এবং তার পরিজন* উপন্যাসের মূল চরিত্র শিক্ষিতা আধুনিক নারী শিরিন। অভিজিৎ সেন এই উপন্যাসের আর একটি অন্যতম চরিত্র ডাক্তার অরিন্দম মল্লিকের বিবরণের দ্বারা শিরিনের পরিচয় দিয়েছেন। লেখক কাহিনির ফাঁকে ফাঁকে অরিন্দমকে হাজির করিয়ে তার মুখ দিয়ে বর্ণনা দিয়েছেন কাহিনির। প্রথম পরিচ্ছেদে উপন্যাস শুরু হয়েছে এভাবে—

> আমি শিরিনের ছ-সাত বছরের পুরোনো বন্ধু। বিগত ছ-সাত বছর ধরে আমরা পরস্পরকে জানি। ...ব্যাপারটা আর একটু পরিষ্কার করেই তাহলে বলি।[২]

এভাবে প্রথম থেকে তিন চারটি পরিচ্ছেদ শুরু হলেও আবার তা ন্যারেটরের বর্ণনায় চলে গেছে। আট নম্বর পরিচ্ছেদ আবার অরিন্দম মল্লিকের জবানীতে কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। নয় নম্বর আবার ন্যারেটরের বর্ণনায় চলে গেছে। এভাবে উপন্যাস এগিয়েছে এবং শেষে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র অরিন্দম মল্লিকের বর্ণনা দিয়েই উপন্যাস শেষ করেছেন লেখক। একইভাবে

নাগমঙ্গল উপন্যাসের প্রথম দিকের কয়েকটি অনুচ্ছেদ বর্ণিত হয়েছে উপন্যাসেরই একটি অন্যতম চরিত্র বিনয়ের স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে—

> একত্রিশ বছর পরে সঠিক মনে করতে পারছি না সব কথা। পুরোনো স্মৃতি সাধারণত মানুষ ভোলে না।[৩]

এভাবে শুরু হলেও আবার ন্যারেটরের ভূমিকাই দেখা গেছে আখ্যান বর্ণনায়। এভাবে আংশিক সীমায়তির সর্বময় বিবরণের মধ্য দিয়ে লেখক কাহিনির প্রথম পুরুষ বর্ণনার সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে চেয়েছেন। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে আধুনিক কালের ঔপন্যাসিকরাও বর্ণনারীতির বিভিন্ন প্রকার মিশ্রণের মধ্য দিয়ে আখ্যান বর্ণনাও করেছেন। যদিও অভিজিৎ এমন কোনো প্রয়াস করেননি।

উপস্থাপনের দিক থেকে অভিজিৎ সেন তাঁর অনেকগুলি উপন্যাসে ফ্ল্যাশ ব্যাক পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। *রহু চণ্ডালের হাড়* উপন্যাসের নানি লুবিনি তার নাতনি শারিবাকে শুনিয়েছে তাদের পাঁচপুরুষ আগের গল্প, যে গল্প লুবিনি শুনেছে তার পূর্বজদের কাছ থেকে। এভাবেই এই গল্পের ধারা যুগ যুগ বেঁচে থাকবে নয়তো বাজিকর সেই গল্পও 'বিসোরণ' হয়ে যাবে। লুবিনি তার 'কাঁপা কাঁপা গলায় প্রাচীন কথা বলে' দেড়শো বছর আগের বাজিকরের জীবনযাপন ও স্থায়িত্বের লড়াইয়ের কথা, দীর্ঘ চলে গেছে লুবিনি। *বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর* (১৯৯৫) উপন্যাসেও একটি পঞ্চায়েতের বিচার ব্যবস্থাকে প্রথম দৃশ্যে দেখানো হয়েছে যা উপন্যাসের মূল বিষয়ের উপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। পঞ্চায়েতের বিচার ব্যবস্থার পর ফ্ল্যাশব্যাকে মূল কাহিনিতে প্রবেশ করেছেন লেখক। *লাশকাটা ঘরের সামনে অপেক্ষা* (২০১১) উপন্যাসে শুভব্রত বিপ্লবী সন্তানের মৃতদেহ সনাক্ত করতে গিয়ে হাসপাতালের মর্গের সামনে বসে নিজের বিপ্লবী জীবনের দিনগুলিতে পৌঁছে গেছে। সেটাই এই উপন্যাসের মূল কাহিনি। *মৌসুমি সমুদ্রের উপকূল* (২০০৭) উপন্যাসেও ক্ষেমংকর ও মগের হাত থেকে উদ্ধার হওয়া শর্মিষ্ঠার ইসলাম গ্রহণ এরপর ইসলামি পদ্ধতিতে তাদের বিবাহ দিয়ে উপন্যাস শুরু হলেও পরের পরিচ্ছেদ থেকে ইতিহাসের ভয়ংকর দিনগুলিতে ফিরে গেছে উপন্যাসের কাহিনি। অর্থাৎ ষোড়শ-অষ্টাদশ শতকে বাংলার উপকূল অঞ্চলে মগদের দৌরাত্মের কাহিনিতে। শুধু বর্তমানে দাঁড়িয়ে অতীতে ফিরে যাওয়া নয়, বর্তমানে দাঁড়িয়ে একবার অতীতে ফিরে যাওয়া তারপর আবার বর্তমানের কাহিনি দিয়ে উপন্যাস

শেষ পর্যন্ত এগিয়েছে। যেমন *সবুজ শ্যাওলা ঢাকা জল* (২০০৯) উপন্যাসের অদিতি অপারেশন টেবিলে শুয়ে আচ্ছন্নতায় চলে গেছে পঁয়ত্রিশ বছর আগের দেশভাগের লাঞ্ছনায়, পূর্ববঙ্গের স্মৃতি থেকে আবার বর্তমানে নেমে এসে পথ চলেছে সঙ্গে উপন্যাসের কাহিনি এগিয়েছে। *নক্ষত্র নদী ও নারী, সমসাময়িক* (২০১২) উপন্যাস দুটির আখ্যান বর্তমান প্রেক্ষাপট থেকে পিছিয়ে গিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় চলে গেছে তারপর আবার বর্তমানের ভূমিতে এসে কাহিনি এগিয়েছে। এভাবেই অভিজিৎ সেন তাঁর উপন্যাসের আখ্যান বর্ণনাকে ধরনকে উপাদেয় করে তুলেছেন।

৪। চরিত্রচিত্রণ

উপন্যাসে যা, যাদের বা যাকে নিয়ে কাহিনি গড়ে ওঠে তাদের বা তাকে চরিত্র বলে। উপন্যাসে কাহিনি বেশি গুরুত্বপূর্ণ নাকি চরিত্র তা নিয়ে মতভেদ আছে। তবে কোনো মত অনুসারে কোনো একটিকে পৃথকভাবে প্রধান বলে দেগে দেওয়া যাবে না। উপন্যাসে কাহিনি ও চরিত্র দুইই প্রয়োজনীয় এবং দুটি একে অপরের সঙ্গে জড়িত। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে চরিত্রপ্রধান উপন্যাসও ক্রমে মনঃস্বত্ত্বমূলক উপন্যাসে রূপান্তরিত হয়েছে। সমালোচকরা চরিত্রের বহিরঙ্গের বৈশিষ্ট্য দেখে ক্ষান্ত হননি অন্তরের গহীনে উঁকি দিয়েছেন। অলোক রায় উপন্যাসের চরিত্র সম্পর্কে বলেছেন—

> একদা যে কাল পরম্পরা নির্দেশিত বিকাশধারা চরিত্রের মধ্যে অন্বেষণ করা হত, কিংবা অন্তরসংঘাত দ্বৈত সত্তার উদ্‌ঘাটনকে গুরুত্ব দেওয়া হত, তা আজকের উপন্যাসের চরিত্রের মধ্যে অনিবার্য নয়। চরিত্রকে কখনো ভালো-মন্দ শ্রেণিতে বিভক্ত করা, কখনো চরিত্রের মধ্যে ভালো মন্দের মিশ্রণ দেখানো এতদিন উপন্যাস-বিচারে প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক উপন্যাসে ভালো-মন্দ সম্বন্ধে কোনো শাশ্বত মূল্যবোধ স্বীকৃতি না পাওয়ায় শ্রেণিবিভাগও নিরর্থক হয়েছে।[৪]

নবযুগের ফলে উপন্যাসের চরিত্রে একাধিক বৃত্তির মানুষ যেমন এসেছে তেমন ব্যক্তিত্বের কারণে চরিত্র আপন মহিমায় হয়ে উঠেছে স্বাতন্ত্র্য। চরিত্রের অন্তরের দুয়ার পাঠকের কাছে অবারিত হয়ে গেছে। সত্তর পরবর্তী লেখক অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের এমন অনেক চরিত্রের মনোগহন না বুঝলে সেই চরিত্রকেই হয়তো বোঝা যাবে না। যেমন *নিম্নগতির নদী* উপন্যাসের ত্রিদিব মিশ্র চরিত্রটি, ছয় ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা ও নব্বই কিলো ওজনের এই মানুষটি দুর্বৃত্ত স্বভাবের সালাউদ্দিনের মুখোমুখি রুখে দাঁড়িয়েছে। আবার বন্যায় কয়েকটি গ্রামের দায়ভার মাথায় নিয়ে অসুস্থ শরীরে জলের মধ্যেই দাপিয়ে বেরিয়েছে এবং স্ত্রী

অনিমাকে নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে মিথ্যা আশ্বস্ত করেছে। ক্ষমতা প্রতিপত্তি কোনোকালেই চায়নি ত্রিদিব তাই অগাধ সম্পত্তি ও পরিবার দুই ছেড়েছে। আবার ক্ষমতাদখলের রাজনীতি থেকে আত্মসম্মান বজায় রেখে সরে এসেছে। অন্যদিকে বিশালদেহী কর্মবীর এই মানুষটি দেয়াশিন লক্ষ্মীতারার প্রতি প্রেমে দুর্বল। একেবারে বাস্তবমাখা স্বতন্ত্র একটি চরিত্র ত্রিদিব। অভিজিৎ সেন তাকে সম্পূর্ণরূপে উপস্থাপন করেছেন ফলে তার অন্তর বাহির পাঠকের বুঝতে সুবিধা হয়েছে।

উপন্যাসে চরিত্র দু-ধরনের হয়, নির্বিশেষ বা টাইপ (Type) চরিত্র অন্যটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা ইন্ডিভিজুয়াল (Indivisual) চরিত্র। যে চরিত্রগুলো ব্যক্তিপরিচয় ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য উপেক্ষা করে কোনো শ্রেণি, জাতি, গোষ্ঠী ও মতবাদ, তত্ত্ব, ভাষাকে ফুটিয়ে তুলেছে সেগুলো টাইপ চরিত্র। অভিজিৎ সেনের উপন্যাসে এই দুই শ্রেণির চরিত্রেরই সন্ধান মেলে। *রহু চণ্ডালের হাড়* উপন্যাসের পীতেম একটি গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করেছে, জীবিকা ভাষা সব ক্ষেত্রে একটা মিথকে আশ্রয় করে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছে বাজিকরের জীবন ও পরবর্তী প্রজন্মকে। *ক্রান্তিবলয়* উপন্যাসের রেংটা, *বর্গক্ষেত্র* উপন্যাসের পরশুরাম মাল নির্যাতিত কৃষক শ্রেণির প্রতিনিধি। অন্যদিকে *ক্রান্তিবলয়* উপন্যাসের হারা চৌধুরী লোভী জোতদার শ্রেণির প্রতিনিধি। *হলুদ রঙের সূর্য* উপন্যাসের সহদেব বিশ্বাস উদ্বাস্তু একটা গোষ্ঠীর প্রতিনিধি। সহদেবের প্রতিপক্ষ বনমালি ঘোষ লোভী আত্মকামী জোতদার। এই চরিত্রগুলো প্রত্যেকেই কোনো গোষ্ঠী বা শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করেছে। গঠনগত দিক থেকে চরিত্রগুলোর বিশেষ কিছু তফাৎ নেই। এদের সত্তাকে নির্দিষ্ট একটি মাপকাঠি থেকে লেখক নির্মাণ করেছেন। অন্যদিকে চরিত্রগুণ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে যে চরিত্রগুলিকে আলাদা ভাবে চিনে নেওয়া যায় সেগুলিকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা Individual চরিত্র বলে। অভিজিৎ সেন এই জাতীয় চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট। জীবনযুদ্ধের অনেকগুলি ক্ষেত্র থেকে তিনি তাঁর এই চরিত্রগুলিকে তুলে এনেছেন। প্রেম, ধর্ম, রাজনীতি, নীতি ও নৈতিকতার আধারে প্রতিটি চরিত্র স্বতন্ত্র। *বর্গক্ষেত্র* উপন্যাসের অনিল শিক্ষিত, কোনো পিছুটান ছিল না, আদিবাসী ভাগচাষির মর্মবেদনা অন্তরে উপলব্ধি করে তাদের হয়ে নিজের জায়গা থেকে লড়াই করেছে, সেই লড়াই দৈহিক পর্যন্ত পৌঁছেছে। শরীরে মনে ক্ষতবিক্ষত হয়েও আপস করেনি অনিল শক্তিশালী পক্ষের সঙ্গে। ভয় পায়নি, গরিব কৃষকের লড়াইয়ে অগ্রদূত হয়ে জীবন ভাসিয়েছে। *নিম্নগতির নদী* ও *ছায়ার পাখি* উপন্যাসের ত্রিদিব মিশ্র ও গোপাল অনেকটা

একইরকম। কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে জীবনপাত করা এই মানুষ দুটি ত্রাতা রূপে উপন্যাসে হাজির। আজীবন কষ্ট ভোগ করে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েও আদর্শ বিচ্যুত হয়নি। এক্ষেত্রে গোপালের বঞ্চনার ভাগ অনেক বেশি। রাজনীতিকে সেবার মন্ত্র করে পথ চলতে চলতে দেখেছে পার্টির আদর্শ বিচ্যুতি, চোখের সামনে নতুন নেতা তৈরি হয়েছে দুর্নীতির রসায়নে, অনৈতিকতা ঠেকাতে না পেরে সরে এসেছে গোপাল কিন্তু গা ভাসিয়ে দেয়নি অনৈতিকতার স্রোতে। পার্টি থেকে বঞ্চিত হয়েও ত্রিদিব ও গোপাল পার্টির ক্ষতি চায়নি, নিন্দা করেনি সুদিনের আশায় শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আশাকে জিইয়ে রেখেছে। উপন্যাস দুটির শেষ দৃশ্যে দুজনেই মৃত্যুপথযাত্রী আর সেই পথেও আজীবনের হিসাব করেছে কোথায় তারা পৌঁছাতে চেয়েছিল, জীবন তাদের কোন পথে নিয়ে গেছে। অভিজিৎ সেনের সমগ্র উপন্যাসের একক চরিত্র হিসাবে শ্রেষ্ঠ দুটি চরিত্র ত্রিদিব ও গোপাল। জীবনদর্শনের ক্ষেত্রে অনেকটা একই হলেও অভিজিতের নির্মাণ কৌশলে আবার একটু স্বতন্ত্র। *অন্ধকারের নদী* উপন্যাসের অশোক ও ইরাবতীও ঘুণ ধরা সামাজ ব্যবস্থায় নীতি ধরে বাঁচতে চেয়েছিল। ক্ষমতার অপব্যবহারের সঙ্গে আপস না করে, কর্তব্য ও দায়িত্ববোধের পথে অটল থাকতে গিয়ে ভ্রষ্ট রাজনীতির দ্বারা শারীরিক মানসিক নিগ্রহ জুটেছে বি.ডি.ও অশোক ও হাসপাতালের ডাক্তার ইরাবতীর। চরিত্রদুটির গুরুত্ব এখানেই যে, এরা প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে গিয়ে যাদের দ্বারা নিগৃহীত হয়েছে তাদের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেছে। কারণ এরা জেনেছে সিস্টেমে এমনভাবে ঘুণ ধরে আছে সেখান থেকে সমাজের সব স্তরের মানুষের ভাবনার স্তর ও প্রতিক্রিয়ার ভাষা তৈরি হয়েছে। এবং এটাও বুঝেছে একক প্রচেষ্টায় ঘুণ সারাতে গেলে লাভের থেকে ক্ষতি বেশি। ক্ষয়িত সমাজ ব্যবস্থার পাশে ব্যতিক্রমী মানুষ হিসাবে অশোক ও ইরাবতীকে সহজে চিনে নেওয়া যায়। *বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর* উপন্যাসের বিদ্যাধরী ও বালা এবং *নক্ষত্র নদী ও নারী* উপন্যাসের কাঞ্চনমালা মনের অবারিত আকাঙ্ক্ষাকে সামাজিকতার শিকলে বাঁধতে চায়নি বরং মনকে প্রশ্রয় দিয়ে, শরীরকে শাসন না করে ইচ্ছেকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় খান সেনাদের হাতে অত্যাচারিত নারী *নক্ষত্র নদী ও নারী* উপন্যাসের কাঞ্চনমালা জীবনের দুর্বিষহ পর্ব শেষ করে বহমান জীবনেও শান্তি পায়নি। জীবনকে বেপরোয়া করেনি কিন্তু পলাতক স্বামীর অপেক্ষা করতে করতে নতুন সঙ্গী বেছে নিয়ে নতুন করে বাঁচতে চাইলে ভাগ্য তার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। অন্যদিকে *বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর* উপন্যাসের বালা

লখিন্দর মায়ের রক্ষণশীল আঁচলের ছাতা থেকে বেরিয়ে এসে প্রেমের বৃষ্টিতে স্নাত হয়েছে। যৌবনের ধর্মকে উপেক্ষা না করতে পেরে বিদ্যার কাছে ধরা দিয়েছে। সমাজ জীবনের এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত চরিত্রগুলি উপন্যাসে আপন স্বতন্ত্রতা নিয়ে হাজির হয়েছে। অভিজিৎ সেনের এইসব ব্যক্তিকেন্দ্রিক চরিত্রগুলি আপন জগতে সার্থকতা ব্যর্থতা নিয়েই এগিয়ে চলার সংকল্প করেছে। একালের সমালোচকরা এই দুই প্রকার চরিত্রকে স্থির বা সমতলসদৃশ্য (static/flat/thin/disc/character) এবং বর্তুলাকার বা পরিবর্তনশীল চরিত্র (dynamic/round/thick character) বলে অভিহিত করেন। স্থির চরিত্রগুলোর বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় না। একটা নির্দিষ্ট ছকে বাঁধা মাত্র। তার মনোগহনের সন্ধান পাঠক পায় না যেমন আলোচিত পরশুরাম মাল, সহদেব, হারা চৌধুরীর মতো চরিত্ররা। কিন্তু পরিবর্তনশীল চরিত্র গুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত থাকবে গতি থাকবে যেমন গোপাল, ত্রিদিব, অশোক, বিদ্যা, বালা, অলকানন্দা।

৫। উপন্যাসের আয়তন

উপন্যাসে প্রতিপাদ্য বিষয় ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে উপন্যাসের আয়তন কিছুটা হলেও নির্ভর করে। আবার সবসময় যে আয়তনে এই ব্যাপারটা পুরোপুরি নির্ভর করে তা নয়। চরিত্র ও কাহিনি বৃহৎ পরিসর দাবি না করলেও জোর করে টেনে বাড়াতে গেলে শিল্পগত দিকে দুর্বল হয়ে পড়বে উপন্যাস। তাই অনেকক্ষেত্রে কলেবর বড়ো হলেও সফল উপন্যাস হয়ে উঠতে পারেনি অনেক লেখাই। আবার কলেবর বড়ো এবং প্রথম শ্রেণির লেখা হয়ে উঠেছে এমন দৃষ্টান্তও মেলে যেমন রবীন্দ্রনাথের *গোরা* (১৯১০), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের *পূর্ব-পশ্চিম* (১৯৮৮-৮৯), ভগীরথ মিশ্রের *মৃগয়া* (১৯৯৬-৯৮) উল্লেখযোগ্য। কথা সাহিত্যিক অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের আয়তন কোনো নির্দিষ্ট সীমায় বাঁধা নয়। এখনো পর্যন্ত তার প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা আঠাশটি, এক্ষেত্রে তাঁর উপন্যাসে সব রকমের আয়তন পাওয়া যায়। *মৃগয়া* ও *গোরা* উপন্যাসের মাপে তিনি উপন্যাস লেখেননি, তাঁর মোট উপন্যাসের মধ্যে দু-তিনটির আয়তন বড়ো *রহু চণ্ডালের হাড়, ছায়ার পাখি, স্বপ্ন এবং অন্যান্য নীলিমা, নক্ষত্র নদী ও নারী* ইত্যাদি। আবার অপেক্ষাকৃত একটু ছোটো *ক্রান্তিবলয়, মৃত মানুষের সঙ্গে বসবাস, পাশ* (২০০৯) ইত্যাদি। আবার একেবারেই ছোটো নভেলেট জাতীয় লেখা তিনি লিখেছেন বেশ কিছু যার মধ্যে *সমসাময়িক, দিদারগঞ্জের যক্ষী, পাপীতাপী ও যোগিনী* উল্লেখযোগ্য। অনেকসময় গল্পের কাহিনি যেগুলো বিস্তার পাবার দাবি রেখেছে লেখক

সেগুলোকে উপন্যাসে বিস্তার দিয়েছেন। যেমন 'বালা লখিন্দর' গল্প *বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর* উপন্যাসে, 'আনোয়ারা খুন হয়েছে' গল্প *শিরিন এবং তার পরিজন* উপন্যাসে, 'কালিন্দী নদীতে মান্দাসে' গল্প *নাগমঙ্গল* উপন্যাসে, 'বহুলাশিনী দেবীর ভৈরবী' গল্প *নগ্ন নির্জন হাত* উপন্যাসে, 'লক্ষ্মীতারা' গল্প *পাপীতাপী ও যোগিনী* উপন্যাসে রূপ পেয়েছে। অভিজিৎ সেন কোনো গল্পকে অযথা টেনে বাড়াতে চাননি গল্পের কাহিনি ও চরিত্র যতটা বিস্তারের দাবি করেছে ঠিক ততটাই বাড়িয়েছেন। ফলে নভেলেট জাতীয় উপন্যাসগুলো বেরিয়ে এসেছে তাঁর হাত থেকে।

অভিজিৎ সেনের উপন্যাসগুলি কাহিনিপ্রধান না হবার ফলে পাঠক হৃদয়ে বহুস্বরিক আবেদনের সাড়া জাগিয়েছে। অপেক্ষাকৃত বড়ো উপন্যাস *রহু চণ্ডালের হাড়, ছায়ার পাখি, স্বপ্ন এবং অন্যান্য নীলিমা* ইত্যাদির মতো অপেক্ষাকৃত ছোটো উপন্যাসগুলিতেও কোনো একটি কাহিনিতে সীমাবদ্ধ থাকেননি তিনি। এক ঝোঁকে পড়ে ফেলা যায় এমন আয়তনের উপন্যাসের ক্ষেত্রেও যেমন *নাগকেশর অক্ষবাট, সমসাময়িক* একাধিক ছোটো ছোটো কাহিনির মেলবন্ধন দেখা যায়। এবং ছোটো কলেবরের উপন্যাসগুলিকেও শিল্পগুণের দিক থেকে সার্থক করে তুলেছেন অভিজিৎ সেন।

৬। বর্ণনা ও সংলাপের ভাষার বৈশিষ্ট্য

অভিজিৎ সেন সংলাপ রচনা ও বর্ণনার ক্ষেত্রে খুব ছোটো ছোটো বাক্য ব্যবহার করেছেন। উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রকে ব্যক্তিগত ক্ষেত্র অর্থাৎ কখনও ব্যাংককর্মী, কখনও নকশাল আন্দোলনকারী রূপে হাজির করেছেন। বর্ণনার ক্ষেত্রে পাতার পর পাতা দীর্ঘ বর্ণনা না করে সংলাপকেই অনেক ক্ষেত্রে বর্ণনার কাজে লাগিয়েছেন। *আঁধার মহিষ* উপন্যাসে কামাল-অলকানন্দার দাম্পত্য নিয়ে মুসলিম সমাজের প্রতিক্রিয়া লেখক আলাদা করে বর্ণনা করেননি বরং কথোপকথনে পরিস্থিতি ব্যক্ত করেছেন—

> সুভদ্র দাঁড়ায়। তার প্রশ্নের উত্তরে রফিকুল জানিয়েছিল, হ্যাঁ, কামাল-অলকানন্দার বিষয় নিয়ে ঘরে-ঘরে আলোচনা হচ্ছে, জমায়েতেও আলোচনা হচ্ছে। ...একথাও জানা গেছে যে বিয়ের আগে কিংবা পরে অলকানন্দা পবিত্র ইসলামে দীক্ষিত হয়নি। ...রফিকুল সুভদ্রকে এসব কথা বলেছিল। বলেছিল, স্যার, কোনো শিক্ষিত মুসলমানের পক্ষে গ্রামে থাকা ভারী কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।[৫]

এভাবে সংলাপের মধ্য দিয়েই পুরো গ্রামের পরিস্থিতি বর্ণনা করেছেন অভিজিৎ সেন। আবার অনেকটা সময়কে খুব দ্রুত এগিয়ে পিছিয়ে নিয়ে গেছেন ছোটো ছোটো কয়েকটি বাক্যে। এক্ষেত্রেও বর্ণনার দরকার হয়নি, বাক্যই যথেষ্ট। যেমন—

> আগের অনেকবারের মতো শুভব্রত মনে মনে স্বীকার করল অন্যায় হয়ে গেছে। ...আজ থেকে বহুবছর আগে এই অন্যায়ের সূত্রপাত। সেই থেকে ছোটো-বড়ো নানাধরনের খেসারত তাকে এবং তার পরিবারকে দিয়ে যেতে হচ্ছে।[৬]

বাক্যগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে পাঠকের জন্য কিছু জিজ্ঞাসা থেকে গেছে এই জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে সহজেই লেখক পাঠককে নিয়ে কাহিনি এগিয়ে নিয়ে গেছেন। আবার খুব কম বাক্যেই দীর্ঘ সময়ের রেশকে টেনে এনে সাযুজ্য রক্ষা করেছেন। *ছায়ার পাখি* উপন্যাসে গর্ভবতী রাজেশ্বরীর কথা বলতে গিয়ে অভিজিৎ সেন লিখেছেন ‘রাজেশ্বরীর পা ফুলেছে, থেকে থেকে মাথা ঘুরে চোখে অন্ধকার দেখছে।’ অর্থাৎ রাজেশ্বরীর সন্তান জন্ম দেবার সময় এগিয়ে এসেছে। উপন্যাসের প্রথমদিকে রাজেশ্বরীকে গর্ভাবস্থা দেখানো হয়েছিল এরপর এই একটি বাক্যে অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। আবার যোগানের সম্পর্কে লিখেছেন—

> যোগানের এসবের নিজস্ব অভিজ্ঞতা নেই। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়সে সে সন্তানহীন অভিশপ্ত যোগিনী। সেই প্রথম বয়সে গানের নেশায় যখন সত্যি সে নাম হারিয়ে পুরোপুরি যোগান হয়ে গেল, তখন কখনো-কখনো দীর্ঘশ্বাস হয়তো পড়ত।[৭]

এখানেও যোগানের ব্যাক্তিগত জীবনের প্রায় অনেকটাই এখানে বলা হয়ে গেছে। লেখক এভাবেই বর্ণনাকে সংলাপের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন।

অভিজিৎ সেন উপন্যাসের চরিত্র যেহেতু তাঁর চেনা ক্ষেত্র থেকে নির্মাণ করেছেন ফলে চরিত্র উপযোগী সংলাপের দিকে সচেতন থেকেছেন তিনি। উপন্যাসের সংলাপের ভাষা চরিত্রের সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে নির্মাণ করেছেন। শিক্ষক, ডাক্তার, ব্যাংককর্মী, নকশাল বিপ্লবী, জোতদার, ভাগচাষি প্রত্যেকের সংলাপ এদের নির্দিষ্ট অবস্থানের নিরিখে নির্মিত। একই অঞ্চলের মানুষ হলেও শুধু সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে মুখের ভাষা বদলে গেছে। *হলুদ রঙের সূর্য* উপন্যাসের সাঁওতাল যুবক কানু বি.এ পাশ করে শিক্ষকতা করে, একই গোষ্ঠীর কৃষক সহা, কিন্তু সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে এদের দুজনের ভাষার পার্থক্য হয়ে গেছে। কানু বলেছে—

> আমি তো গ্রামের-ই ছেলে জেঠামশাই, তা ছাড়া সহা কিসকু তো আমার কাকাও হয়। আমি তার মুরুব্বি হয়ে আসিনি।[৮]

অন্যদিকে কানুর কাকা সহার ভাষা—

> খুব ঠিক কথা মালিক? আবার দ্যাখো আইন বুঝলে আইন না মানাও সহজ।[৯]

এখানে সহার ও কানুর সংলাপের ভাষা একই রকম। জোতদারের কাছে কানুর মতো করেই কথা বলেছে সহা কিন্তু সবসময় এইভাবে মার্জিত ভাষায় কথা বলে না, সাময়িক অবস্থান বদলেছে সে পরিস্থিতি বুঝে। সহা জোতদার বনমালীর ছেলের মোষের গাড়ি আটকালো, তাতে যে গণ্ডগোল হয় সেখানে সহা বলেছিল—

> —যে শালা হামার কাছেৎ আইসরে, আইজ তার এটটু ফ্যাট ম্যাটার ক্যাট— আইজ তার একদিন কি হামার একদিন।[১০]

সহার সামাজিক অবস্থানে এটাই সহার মুখের ভাষা, সে এই ভাষাতেই কথা বলেছে সবসময়। একটি বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ মানুষের মুখে আঞ্চলিক ভাষাই সেই চরিত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে।

অন্ধকারের নদী উপন্যাসের ইরাবতী, *শিরিন এবং তার পরিজন* উপন্যাসের অরিন্দম মল্লিক এরা দুজনেই ডাক্তার। উপন্যাস দুটির মূল কাহিনির পাশে এই দুজনের অবস্থান এবং তাদের নিজস্ব সামাজিক অবস্থানের সাযুজ্য রক্ষা হয়েছে তাদের সংলাপের দ্বারা। মুর্শিদাবাদের নারীপাচার চক্রের সক্রিয়তার যে কাহিনি তার সঙ্গে ডাক্তার অরিন্দম মল্লিকের যোগ পেশাগত দিকেই। একটি পরিবারের একাধিক নারীপাচার হয়ে যাওয়ার পর সেই পরিবারের মায়ের আত্মহত্যায় মৃত দেহের কাটাছেঁড়া করতে হয়েছে অরিন্দমকে। এসব ঘটনা স্তম্ভিত করেছে অরিন্দমকে, নিজের ও সমগ্র মানবজীবনের বিচিত্র সব অর্থ যেন তার কাছে নতুন করে ধরা দিতে লাগল। তার উপলব্ধি হয়েছিল—

> প্রাত্যহিক কাজকর্মের লেনদেনে মানুষকে তো সবাই কমবেশি চেনে। আমারও এমন আত্মপ্রসাদ লাভ যে কখনো হয়নি, এমন নয়।... আমার এই আত্মপ্রসাদ, এই বোধবিশ্বাস এবং বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হিসেবেও যে-অহংকার মনে জমে উঠেছিল, অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।[১১]

অন্ধকারের নদী উপন্যাসের ডাক্তার ইরাবতী রাজনৈতিক হিংসার শিকার হয়েছে। লাঞ্ছিত অপমানিত হয়েও ইরাবতী চিকিৎসা থেকে সরে আসেনি, তার বৌদ্ধিক ভাবনা থেকে নিজের নিপীড়নের ঘটনার ব্যাখ্যা খুঁজে পেয়েছে। সুন্দর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা না পেয়ে মানুষের ক্ষোভ মিথ্যা নয়, ইরাবতীকে শুধু সেই ক্ষোভের শিকার হতে হয়েছে। ইরাবতীর এ জাতীয় ভাবনা ও সংলাপ তার ব্যক্তিসত্তার পরিচায়ক। নকশাল বিপ্লবী রূপে *স্বপ্ন এবং অন্যান্য নীলিমা* উপন্যাসের সরোজ, *লাশকাটা ঘরের সামনে অপেক্ষা* উপন্যাসের শুভব্রত কিংবা *মৃত মানুষের সঙ্গে বসবাস* উপন্যাসের অশোক তাদের রাজনৈতিক অবস্থানের যুক্তি, ঠিক, ভুল নিয়ে কথা বলেছে। অভিজিৎ সেন তাঁর উপন্যাসের অত্যাচারিত বর্গা চাষিদের যন্ত্রণাদগ্ধ হৃদয়ের প্রকাশ ঘটিয়েছেন তাদের নিজস্ব সংলাপের মধ্য দিয়ে, জোতদারের অত্যাচারী সর্বগ্রাসী চেহারা শুধু তাদের চরিত্রে নয়, সংলাপেও ফুটে উঠেছে। *হলুদ রঙের সূর্য* উপন্যাসে জোতদার দয়া ঘোষ সহদেবের লোনের টাকা কৌশলে ভোগ করেছে আর সেই লোন সহদেবকেই শোধ করতে বলেছে—

> যে টাকা নিয়েছ, তার ওপরে সুদের হিসাব কইরে শোধ দিও। হিসাব না পারো, টাকা হাতে রাখো, প্রকাশ গিয়ে সুদের হিসাব কইরে নিয়ে আসবে।[১২]

এই উক্তিতে সহদেবকে প্যাঁচে ফেলে প্রতিশোধের যে পৈশাচিক উন্মাদনা অন্তরে সঞ্চারিত হয়েছে দয়া ঘোষের তা স্পষ্ট। প্রতিটা চরিত্রকে নিখুঁতভাবে আঁকতে শুধু লেখকের বর্ণনা নয়, চরিত্রগুলির নিজস্ব সংলাপ জরুরি হয়ে পড়ে। অভিজিৎ সেন তাঁর সমস্ত চরিত্রের ক্ষেত্রে সেটাই করেছেন। অতিদরিদ্র হতভাগ্য কৃষক, মূর্তিমান শয়তান জোতদারকে ফুটিয়ে তুলতে তাদেরকে অতিরঞ্জিত করতে হয়নি। *বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর* ও *নক্ষত্র নদী ও নারী* উপন্যাসের বিদ্যা-বালা এবং অমৃত-কাঞ্চনমালার মতো সমাজ চিহ্নিত আসামাজিক সম্পর্কের প্রেমিক প্রেমিকাকে আঁকতে লেখককে আলাদা করে দীর্ঘ বর্ণনা দিতে হয়নি। সমাজে তাদের অভিব্যক্তি ও সংলাপেই পরিচিতি পেয়েছে।

মৌসুমি সমুদ্রের উপকূল উপন্যাসে ষোড়শ-অষ্টাদশ শতকে গ্রামের গৃহবধু সত্যভামা মগ দ্বারা অপহৃত, সে মগদের অভিশাপ দিচ্ছে, তার ভাষা—

তোরা সেই অসহায় মানুষগুলোকে ধর্ষণ করে, বিক্রি করে মানুষের সমস্ত শুভবুদ্ধি, মানুষের যত মঙ্গল, মানুষের যত পবিত্রতা, সব তোরা ধ্বংস করিস! ঈশ্বর না থাকলেও ভূমিকম্প আছে! ...তোদের পরিণতি হবে এইসব মানুষের থেকেও ভয়ংকর![১৩]

এখানে সত্যভামার সামাজিক অবস্থানে দাঁড়িয়ে অভিশাপের যে ভাষা তাতে লেখকের উদ্দেশ্যই সাধিত হয়েছে সত্যভামার চরিত্রের স্বাভাবিকতা একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছে ভাষার দিক থেকে। সত্যভামার মুখে এই সংলাপ বেমানান। ষোড়শ-অষ্টাদশ শতকে গ্রামের নারীর এভাবে শব্দচয়ন বড়োই কৃত্রিম। এমন দু-একটি দৃষ্টান্ত বাদ দিলে অভিজিৎ সেনের সব চরিত্রের সংলাপ একেবারে চরিত্র উপযোগী এবং চরিত্রগুলির সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে নির্মিত।

৭। উত্তরবঙ্গের উপভাষা

অভিজিৎ সেনের অধিকাংশ উপন্যাসের পটভূমি উত্তরবঙ্গের দুই দিনাজপুর ও মালদা জেলা। সেখানের মানুষ, প্রকৃতি, জীবনযাপনের সম্পূর্ণ রূপ দিতে গিয়ে লেখক উপভাষাকেও সচেতনভাবে ব্যবহার করেছেন। ভাষিক রূপেতেই তাঁর উপন্যাসের চরিত্রের ক্ষেত্রকে বোঝা গেছে। সংলাপের ক্ষেত্রে অভিজিৎ সেন যেমন মার্জিত ভাষা বা শব্দ প্রয়োগ করে কৃত্রিমতা আনেননি, ভাগচাষি, মাঝি, শ্রমজীবী মানুষের ক্ষেত্রে। এইসব মানুষ একটি অঞ্চলকে আঁকড়ে ধরে বেঁচেছে, সেই অঞ্চলের ভাষা সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করেছে। উত্তরবঙ্গের মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরের মানুষের উপভাষা বঙ্গালী এবং উত্তর দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহারের মানুষের উপভাষা কামরূপী বা রাজবংশী। অভিজিৎ সেন এই উপভাষা নির্দিষ্ট অঞ্চলের চরিত্রের মুখে বসিয়েছেন ফলে চরিত্রগুলো সাবলীল হয়ে উঠেছে। অবিভক্ত দিনাজপুরের মানুষের মুখে বঙ্গালী ও কামরূপী দুই উপভাষাই ব্যবহৃত হয়েছে। আবার অঞ্চলভেদে একই ভাষার আঞ্চলিক রূপ বদলে যায়, তাঁর চরিত্রগুলোর ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্য দেখা গেছে। অভিজিৎ সেন মূলত দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, রাজশাহির কিছু অঞ্চলের ভাষাকে প্রাধান্য দিয়েছেন তাঁর উপন্যাসে।

কামরূপী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কখনো কখনো 'ও' 'উ' রূপে ব্যবহৃত হয়, 'তোর' থেকে 'তুর', 'তোমাকে' থেকে 'তুমাকে'। যেমন—

লাজ লাগে না <u>তুর</u>।[১৪]

মা বিষহরি <u>তুমাকে</u> ভালো রাখুক বালা নখাই।[১৫]

বরেন্দ্রী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য যেখানে 'র' থাকার কথা নয় সেখানে 'র' এর যেমন আগমন হয় আবার 'র' স্থানে 'অ' হয়। যেমন 'তিন হাজার টাকা হামি কুনঠি পামো? তবি তুমার অসিদ তুমার থাক।' এখানে যেমন 'রসিদ' থেকে 'অসিদ'। নির্মলেন্দু ভৌমিক তাঁর *প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষা* গ্রন্থে মালদা জেলায় উপভাষায় কিছু সর্বনামের ব্যবহার দেখিয়েছেন। যেমন 'হামি', 'হাম্মা', 'হামার' ইত্যাদি। অভিজিৎ সেন তাঁর উপন্যাসের চরিত্রের সংলাপে ব্যবহার করেছেন—

> জলে হাম্মার সাথে কেও পারে না![১৬]
>
> হামি যাব না, হামি যাব না, হামাকে নামাই দে তোরা।[১৭]

এখানে সর্বনাম 'হামি' ও 'হাম্মার' ব্যবহৃত হয়েছে। পঁচিশ তিরিশ বা তার বেশি বর্গ কিলোমিটার পরে পরে ভাষার পরিবর্তন দেখা যায়, উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোর ক্ষেত্রেও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। অভিজিৎ সেন তাঁর উপন্যাসে এই পরিবর্তিত ভাষাকেও ধরেছেন। কোচবিহারসহ উত্তরবঙ্গের যে জেলাগুলিতে কামরূপী ব্যবহৃত হয় সেখানে 'বোকদা', 'হাউস', 'চ্যাংড়া' শব্দগুলো প্রচলিত। আবার 'মানুষ' হয়েছে 'মানষি'। যেমন—

'—আমি এক বোক্দা রাজবংশীর বেটা, এগলা রাজনীতি এনা কম বুঝি। আর হোবেই বা না ক্যান্? 'মোর বাপ ছিল না আর এক বোক্দা?'[১৮]

'মানুষটার হাউস ছিল চ্যাংড়া মানুষ কইরবে। বইলত, মানষির জম্মো হামার, মাইনষির জম্মো দিবার পারমো না,...[১৯]

'বাজিকরের বিটি হামি বিহা করমো, তো বাজিকরের বেটাগুলো যাবে কুন্ঠি?'[২০]

'বাপ আইসে মোর করবেডা কী? মুই বাপের খাই, না পরি? হামাক্ হামার মতো থাকবা দি।'[২১]

'তুমার পাটি ইয়াদের মদত করে। হামার শ্বশুরোর আধি উচ্ছেদ করবা চায়, আর উয়ার বিটিক্ বেইজ্জত করবা চায়। তুমাক ইতোদিন কেছু না কহি কাকা, এখুন কহি, ইয়ার শ্যাষ হামরা দেখবা চাই।'[২২]

'সি বাজিকর রাজমহল ছাড়ি আবার রাস্তাত ঘুরবা বারাল। ...আর মাথার উপর তর্ক জ্বলে, শীতের হিম, বর্ষার জল। বাজিকরের গেঁহুর পারা অঙ তামার অঙ তামার বন্ন হোই গিল।'[২৩]

'পার্টিক্ ক'য়ে ক'য়ে তো জেরবার হোই গেলাম। পার্টি কহে, ইসব নাকি আপনাহোরের হাতে।'[২৪]

'আমি কী করে জানমো, কাইল তো তাই আসিছিল। অই তো আর একজনা কখন থিকা বসি আছে।'[২৫]

'পঞ্চের আদেশ, আগলা পনেরো দিন মধ্যে গৌরা সরকার বিমলের সাথ কথা পাকা করায়া হামাহোরে কবে কী বেবস্থা হয়।'[২৬]

৮। পূর্ববঙ্গের ভাষা

অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের এমন অনেক চরিত্র আছে যাদের জন্ম পূর্ব পাকিস্তানে। তারা পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে এসে বাস করেছে, দেশভাগের পর এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময়। লেখক সেইসব মানুষের কথা বলতে গিয়ে তাদের মুখের ভাষা অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের ভাষা ব্যবহার করেছেন।

সবুজ শ্যাওলা ঢাকা জল উপন্যাসের অধ্যাপক অদিতি অপারেশন টেবিলে শুয়ে পঁয়ত্রিশ বছর পিছিয়ে পূর্ববঙ্গের নদী, পথ-ঘাট ও মানুষগুলোকে যেন চোখের সামনে দেখেছে। সেই মানুষগুলোর একজন সুজাতার নিজস্ব ভাষা অভিজিৎ সেন এখানে ব্যবহার করেছেন—

> মাইয়ারে যখন জলের থেকে তোলে, আমারে কেউ কাছে যাইতে দে নাই। আমারে তোগো জেডিমা খুড়িমারা ঠাসিয়া ধরিয়া রাখছিল। কিন্তু ঠাকুরঝিরে কেউ ধরিয়া রাখতে পারে নাই। খুকি তো হেরও মাইয়া আছিল।[২৭]

এই উপন্যাসের কামার ঝি বলেছে—

> ঠান্ডা পরতাছে, চল ঘরে যাই, কার্তিক মাস বোধহয় আইজ শেষ হইল, না মাইয়া? চাঁদ উঠতাছে মাইয়া, রাসের চাঁদ?[২৮]

> তো মায় কইল এ বিদ্যা আমার জানা নাই ঠারইন। অন্ধকার থিকা বাইর করিয়া আলো দেখাই, এই আমার কাজ ঠারইন। তো মেন্দিগঞ্জ বা বইশ্যাল, কোথা থিকা এক কবিরাজ ডাকিয়া আনল।[২৯]

অভিজিৎ কামরূপী উপভাষা তাঁর উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন যা বর্তমান বাংলাদেশের রংপুর পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়। কামরূপীর পাশাপাশি পূর্ববঙ্গের অন্য ভাষাও তিনি ব্যবহার করেছেন। তবে বাংলাদেশের অনেক চরিত্র তাঁর উপন্যাসে থাকলেও মাত্র কয়েকটি উপন্যাসে এ ধরনের ভাষা ব্যবহার করেছেন। *শিরিন এবং তার পরিজন* উপন্যাসে দেখা যায় হিন্দু গোপাল ও মুসলিম মনসুরার বিবাহে বাধা দিয়ে গোপালের দিদি বলেছে—

> যে-শ্যাখের মাইরের কারণে দ্যাশ ছাড়লাম, হেই শ্যাখের মাইয়া লইয়া ঘর করতে পারুম না, আমার সাফ কথা, হ্যাঁ![৩০]

অভিজিৎ সেন কোনো চরিত্রের মুখে শুধু এই ভাষা দিয়ে উপস্থাপন করেছেন তা নয়, প্রসঙ্গক্রমে এই জাতীয় চরিত্র ও ভাষাকে উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন তিনি। অদিতির স্মৃতিচারণকে তাজা করতে গিয়ে তিনি যেমন এই ভাষা ব্যবহার করেছেন, এখানেও গোপালের দিদির বেদনার যে স্মৃতি তাকেই তার নিজস্ব ভাষায় রূপ দিয়েছেন। গোপালের দিদি বলতে চেয়েছে মুসলমানের অত্যাচারের কারণে দেশ ছাড়তে হয়েছে আর সেই মুসলমানের মেয়ের সঙ্গে ঘর বাঁধতে পারবে না। তার এই যন্ত্রণার স্মৃতি শুধু নিজস্ব ভাষাতে স্পষ্ট ব্যক্ত হয়নি স্মৃতিটাও যেন চোখের সামনে চলে এসেছে। এখানেই অভিজিৎ সেনের পূর্ব বঙ্গের ভাষা ব্যবহারের প্রাসঙ্গিকতা।

৯। চরিত্রগত ভাষার ধরন

৯.১ নিম্নবিত্ত গ্রাম্য নারী পুরুষের ভাষা

নারী

নারী চরিত্রের সরূপ উদ্‌ঘাটনে অভিজিৎ সেন সিদ্ধহস্ত। সাংসারিক অভাব অনটন, গ্রামীণ কেচ্ছা, প্রলোভন, নারীর পরিশ্রমী ও প্রতিবাদী সত্তার ধারক হয়ে উঠেছে তাঁর উপন্যাসের নারী চরিত্রের ভাষা। *বর্গক্ষেত্র* উপন্যাসের এক গ্রামীণ পতিতা মহিলা কৃষকের যৌবনবতী স্ত্রী সারিকে প্রলোভন দেখিয়েছে—

> —সারি লো সারি, জামাই খ্যাত্ দ্যায় তো মাও?
>
> —আঃ হা, বড়ো দুক্ষু গো পিসি, দ্যাখ্ না, শরীল ক্যান্‌কা হিলা কঞ্চির পারা হোই যাছে।...
>
> —আর অ্যান্‌কা শরীল তোর, এলা গাবুর মেয়েমানুষি হ্যালা চাষার ঘরোৎ মানায়? না আছে অ্যাকেখান গয়না, যা অ্যাটা ভালো কাপড়।[৩১]

অভিজিৎ সেনের গল্পের মতো উপন্যাসেও নারী ভিন্ন ভিন্ন সত্তা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। যতটা নিরীহ মনে করে সারিকে প্রলোভন দিয়েছে ততটা নিরীহ সে নয়, সময়ে জ্বলে উঠতেও পারত সে। তাই দেখা যায়, পুলিশ দ্বারা অত্যাচারিত স্বামীকে বাঁচাতে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। দা হাতে পুলিশের মুখোমুখি যখন দাঁড়ায় তখন সারির প্রতিবাদী সংলাপ—

> —খবরদার!
>
> হামাক্ চিনেন?...
>
> বিশ্ব মাল হামার বাপ আর আস্তিক মাল হামার জ্যাঠা—'[৩২]

শুধু সাংসারিক আবহে নয়, জমির লড়াইয়ে পুরুষের পাশে দাড়িয়েছে নারী। জোতদার জমির মামলায় হেরে যাবার পর ভাগচাষিরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছে। এমন এক

জমির লড়াইয়ের সৈনিক কৌশল্যা ওরাইনের প্রতিক্রিয়া অন্য পুরুষদের থেকে কম নয়। কৌশল্যা বলেছে—

> —না মাস্টের, না। তুমু যাও মাস্টের। তুমু যাও। কাল আসেন তুমু কাল তুমার কথা শুনমো। আঃ মাস্টের, হারা চোদরী হারি গিল হয়?[৩৩]

একান্ত আলাপচারিতায় যেভাবে আদিরসাত্মক সংলাপ ব্যবহার করে নারীরা লেখকের নিবিড় পর্যবেক্ষণে তা বাদ যায়নি। *বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর* উপন্যাসে বালার মা মায়নোমতি ও তার সই শৈলীর হাসি ঠাট্টায় উঠে এসেছে সেই আদি রসাত্মক সংলাপ—

> নদীর স্বপ্ন! হায় মাও, বালার বিহা দি' মায়নো, নাতে কোন্ দিন কোন্ ড্যানে টপ কইরে না গিলা ফেলায়। চ্যায়রাখান যা হইছে, সেকালে দেখা হইলে মঁয়ই খাইয়ে লিতাম হয়তো বা।
>
> ...হারামজাদি, মুখোৎ কেছু আটকায় না। দু-দুখান পুরুষ মানুষের নীচে শুয়েও তোমার শখ মিটে নাই, দিন-ভাতারি হলে তবে তেমোর খিদা মিটত।[৩৪]

আবার *বর্গক্ষেত্র* উপন্যাসে সুশীলা সারিকে বলেছে—

> —সারি লো সারি, জলে অঙ্গ শেতল না হয়, মাও। সব আগুন জলে নেবে না।[৩৫]

ছায়ার পাখি উপন্যাসের সাংসারিক এবং যৌনজীবনে অতৃপ্ত নারী কৌশল্যা ও যোগানের কথোপকথন ছুঁচ সুতোর আদিম রহস্যকে ইঙ্গিত করেছে—

> আমার কথা ছাড়ো, সুঁচের গোড়া ফাটা, সুতা আটকায় না। সে দুঃখতো সারাজীবন থাইকেই গেল।...
>
> কেংকা জানলু যে সুঁচেই দোষ, সুতাওতো পচা হবা পারে। ফোড় দিতে গেলেই পটাপট ছিঁড়ে এংকা সুতা যে লয় কেংকা জানলু?[৩৬]

অভিজিৎ সেন গ্রামীন মেয়েদের ভাষাকে অক্ষুণ্ন রেখেছেন এখানে, এমনকি 'হারামজাদি', 'দিনভাতারি' শব্দগুলো ব্যবহার করে গ্রাম্য নারীদের সংলাপের অকৃত্রিমতাকে বজায় রেখেছেন।

গ্রামের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া নারীর মুখের ভাষার থেকে গ্রামের শিক্ষিত নারীর মুখের ভাষার যে পার্থক্য সেদিকে সচেতন থেকেছেন অভিজিৎ সেন। *শিরিন এবং তার পরিজন* উপন্যাসে আছে মুর্শিদাবাদের দরিদ্র গ্রাম থেকে অশিক্ষিত মেয়েরা

নানা ধরনের কাজে বাইরে চলে যেত, অথচ একই গ্রামের একটি সম্পূর্ন শিক্ষিত পরিবারের মহিলার সংলাপ—

> শোন মনসুরা, মানুষকে সমাজে থাকতে হয়। অন্যায্য হলেও সমাজের সঙ্গে মাঝে মাঝে আপোশ করেও থাকতে হয়। কারণ মানুষ তো সমাজ ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে বাঁচতে পারবে না।[৩৭]

নিম্নগতির নদী উপন্যাসে শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অবস্থানে একই গ্রামের নারীর মুখের ভাষা বদলে গেছে, শিক্ষিকা সেভাবে বলেছে—

> ঠিকই তো কিন্তু সুবীর, কোথাও না কোথাও একটা দায় তো মানুষের থাকা উচিত। অন্তত মাস গেলে মাইনে নিচ্ছি এই কনসিডারেশনে—[৩৮]

শিক্ষিত নারীর ভাষার ক্ষেত্রে বিষয়, বোধ ও শব্দ ব্যবহারের অনেকটা তফাৎ থেকে গেছে অন্য নারীর ভাষার সঙ্গে। এমনকি উপভাষা ব্যবহারের ঝোঁক অনেকটাই কম শিক্ষিত নারীর ক্ষেত্রে।

<u>পুরুষ</u>

অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের নারীর মতো সমাজের পিছিয়ে পড়া পুরুষের সংলাপ আলাদা করে চিনে নেওয়া যায় অন্য পুরুষদের থেকে। *রহু চণ্ডালের হাড়* উপন্যাসে যাযাবর গোষ্ঠীর নির্দিষ্ট ভাষা নেই, তারা বুলি রপ্ত করে, রূপা সারিবাকে বলেছে—

> খবরদার, শারিবা, ওলা কথা মুখেত আনবুনা। হামি হিঁদু, হামার ঘরোৎ বিষহরির ঘট আছে, হামার বেটা হয়্যে তুইও হিঁদু।[৩৯]

দিনাজপুর, মালদা, রাজমহল ঘুরতে ঘুরতে এই বুলি রপ্ত করেছে বাজিকররা। আবার *বর্গক্ষেত্র* উপন্যাসে পরশুরাম মাল গ্রামের বর্গাচাষি, তার সংলাপ—

> হামার ঘরোৎ ডাকাইত পড়ল, হামি বাধা দিবার পারমো না, অ্যাংকা বুঝি না। হামার বোও বিটিক্ আন্ মানষি বেইজ্জৎ করবি, হামি মুখোৎ আও কাড়বা পারমো না...[৪০]

সারিবা, পরশুরাম মাল এরা সবাই নিম্নবিত্ত সমাজের মানুষ তাই নিম্নবিত্ত শ্রেণির পুরুষের সংলাপে জীবনসংগ্রামের তাগিদ মেশানো।

গ্রামের শিক্ষিত পুরুষেরা তাদের চিন্তাভাবনা, ন্যায়-নীতি আদর্শের পরিচয় দিয়েছে তাদের কথাবার্তায়। যেমন *ক্রান্তিবলয়* উপন্যাসে শিক্ষক অনিল বলেছে—

> তবে সব ভালো কাজেরই কিছু নিশ্চয়ই অবশিষ্ট থাকে, তা যত প্রতিবন্ধক নিয়েই থাকুক না কেন। তেভাগার লড়াইটার অবশিষ্ট কিছু আছে।[৪১]

আবার *ছায়ার পাখি* উপন্যাসের শিক্ষিত সচেতন গোপাল তার শ্রেণি থেকে বেরিয়ে একেবারে গ্রামের মানুষের সঙ্গে একাত্ম কিন্তু তার সংলাপ সময় বিশেষে আলাদা হয়েছে। কারণ সে শিক্ষিত, সমাজ বিষয়ে অনেক অভিজ্ঞ—

> —সর্বত্যাগী, জিতেন্দ্রিয়, কষ্টসহিষ্ণু—ভারতীয় কমিউনিস্টদের এই ত্রিপিটক আসলে কিন্তু কংগ্রেস দলের উত্তরাধিকার। অকারণে মানুষকে এইসব অবান্তর গুণের কদর করতে আমরা শিখিয়েছি।[৪২]

বস্তুত অভিজিৎ সেনের সংলাপ রচনাতেই নারী ও পুরুষ চরিত্রের অবস্থান চিহ্নিত করা যায়। খুব ভালো করে লক্ষ্য করলে শ্রেণি বিশেষে এমনকি লিঙ্গ বিশেষে ভাষার যে পার্থক্য তা সহজেই বোঝা যাবে।

৯.২ মুসলমান চরিত্রের ভাষা

অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের মুসলমান চরিত্রের ভাষাকে আলাদা ভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন এই কারণেই যে, গ্রামবাংলার অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশেষত হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ধর্মের একই শ্রেণির মানুষের মুখের ভাষা অনেকটা আলাদা হয়ে গেছে। এমনকি শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা থেকে চিনে নেওয়া যায় তাদের ধর্মগত অবস্থান। অভিজিৎ সেন অত্যন্ত সচেতনভাবেই মুসলমান চরিত্রের ভাষা ব্যবহার করেছেন তাঁর উপন্যাসে। তাই আরবি ফারসি শব্দের ব্যবহার ও বর্ণসংস্থানগত কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা গেছে এই জাতীয় চরিত্রগুলির সংলাপে। মুসলমান চরিত্রের সংলাপ তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পৃক্ত।
শিরিন এবং তার পরিজন উপন্যাসে আনোয়ারা বলেছে—

> দুনিয়ার যত নিয়ম আর নিষেধ কি শুধু মেয়েলোকের জন্যই ঠিক করে দিয়েছে আল্লা।[৪৩]

আনোয়ারার এই কথায় মুসলমান সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া গেছে। এভাবে সংলাপেই চরিত্রের ধর্মগত ও শ্রেণিগত পরিচয় যে পাওয়া যায় সেটা স্পষ্ট করতে আরও কয়েকটি ব্যবহৃত সংলাপের উদাহরণ আনা যাক—

> আমার কথা কোনো খোদার বান্দা আমির ছাহেবের ভাবতে হবে না।[৪৪]

আঁধার মহিষ উপন্যাসে মস্তান ইসকান্দার বলেছে—

ধমকাবেন না, কামাল মিঞা। বেওয়ারিশ আওরাত নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, আমার বাপভাইয়ের দয়ায় এখানে জায়গা পেয়েছেন, চাকরি পেয়েছেন।[৪৫]

এখানে 'কামাল মিঞা', 'বেওয়ারিশ আওরাত' শব্দবন্ধ থেকে বোঝা গেছে এই সংলাপ কোনো মুসলমান চরিত্রের এবং মুসলমান চরিত্রের উদ্দ্যেশে ব্যবহৃত। আবার *রাজপাট ধর্মপাট* উপন্যাসে মুকাবর বলেছে—

জনাব, অপরাধ নেবেন না, আদাব, ...একটা আরজি জাঁহাপনা, অনেকদিন হল এই কাজের সঙ্গে যুক্ত আছি, এবার যদি অন্য কোনো দফতরে আমাকে বদলি করেন, ভালো হয় হুজুর।[৪৬]

এক্ষেত্রেও 'আদাব', 'জাঁহাপনা', 'হুজুর' শব্দগুলো চরিত্রের ধর্মগত পরিচয় বহন করেছে।

লাশকাটা ঘরের সামনে অপেক্ষা উপন্যাসে আছে—

ও মা, কচিকে লিয়ে এসো, খেব্‌গে দি।[৪৭]

উপরিউক্ত চিহ্নিত নাম ও শব্দ ব্যবহারে সহজেই এই ভাষার সম্প্রদায়গত পরিচয় পাওয়া গেছে। তবে একথা ঠিক এই ধরনের সংলাপ বা শব্দ ব্যবহার বিশেষ অঞ্চলের মানুষের ধর্মীয় পরিচয় বহন করেছে মাত্র। এই বৈশিষ্ট্য অঞ্চলভেদেই সীমাবদ্ধ।

৯.৩ মাতালের ভাষা

মদ্যপ মানুষ সাময়িকভাবে অনেকটাই অস্বাভাবিক হয়ে যায়। তখন তার আচার-আচরণ, কর্মকাণ্ড, কথা বলা, অসংলগ্ন কখনো কখনো অর্থহীন ও অশালীন হয়ে পড়ে। তাই অভিজিৎ সেন তাঁর উপন্যাসে নেশাগ্রস্ত মানুষ বা মাতালের ভাষার ক্ষেত্রে সেই মাত্রা রেখেছেন যেটা বাস্তবের সঙ্গে মেলে। *বর্গক্ষেত্র* উপন্যাসে মদ্যপ ভগু পার্টির নেতা রাখালকে হাটে আটকে বলেছে—

—রাখ্যো তুমার হাট। হামার কুথাটা আগে শুন। হামার কুথাটা হচ্ছে, তুমার গোরমেনটা হামার লেগ্যে কী করল?

—আঃ! হামার কুথাটা হচ্ছে, ই গোরমেনটা হামার জন্য কী করল?[৪৮]

এখানে ভগুর কথার মধ্যে অসংলগ্নতা বোঝা গেছে একই বাক্য বার বার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির সংলাপের এটা একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। *হলুদ রঙের সূর্য* উপন্যাসে শুকরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় জোতদারের উদ্দেশ্যে বলেছে—

লাথি মারতে দে আমাকে। এই এক লাথি, এই আর এক লাথি, এই আরও এক লাথি। লাথি আধিতে, লাথি ধানে, লাথি আইন-কানুন-দারোগা-হাজত-সব কিছুতে, মুতের কেনা সব—[৪৯]

একেবারে গ্রামবাংলার পরিবেশ ফুটে উঠেছে *ছায়ার পাখি* উপন্যাসের মাতাল সুরেশ্বর যখন তার স্ত্রীর উদ্দ্যেশে বলেছে—

—অ্যাই অ্যাই—ম্যাগী, আলো জ্বলে নাই ক্যান্—অ্যাঁ—? ...অ' ত্যাল নাই, ত্যাল নাই— ...ত্যাল নাই তো তোর ইয়াৎ অ্যাটা সল্‌তা গুইজে জ্বালাবা পারলু না! ত্যাল নাই—ত্যাল নাই—[৫০]

লেখকের নিবিড় পর্যবেক্ষণে সুরেশ্বরের মতো *সমসাময়িক* উপন্যাসের অসমর্থ, রুগ্ন, নেশাগ্রস্ত জগন্নাথের মধ্যেও দেখা গেছে নেশাগ্রস্ত মানুষের শব্দ ব্যবহার। জগন্নাথ তার স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্ক নিয়ে বলেছে—

মাগি—, নাংচুনি মাগি! আমার ভিটায় আমার বিছানায় শুয়ে নাংকে সোহাগ করে! মাথায় বাজ পড়ে না মাগির![৫১]

উপরিউক্ত সংলাপগুলিতে ক্ষোভ প্রকাশ, সাংসারিক অশান্তির ক্ষেত্রে মদ্যপ গ্রামীণ মানুষের যা ভূমিকা অভিজিৎ হুবহু সেটাকেই ধরেছেন। মাতালের সংলাপের অন্যতম বৈশিষ্ট্য পুনরুক্তি ও অশ্লীল শব্দ ব্যবহার এই চরিত্রগুলির সংলাপে সেটাও লক্ষণীয়।

১০। শব্দ ও বাক্য ব্যবহার

১০.১ ইংরেজি

অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের ইংরেজি শব্দ ও বাক্য ব্যবহারকারী চরিত্রগুলো ডাক্তার, শিক্ষক, শিক্ষিত নকশাল কর্মী নয়তো ব্যাংক কর্মী। নিজস্ব অবস্থান থেকে ইংরেজি শব্দ ও বাক্য ব্যবহার চরিত্রগুলিকে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। যেমন *শিরিন এবং তার পরিজন* উপন্যাসের ডাক্তার অরিন্দম মল্লিক বলেছে—

স্ত্রীরোগীদের ওয়ার্ড থেকে বেরোবার পর করিডর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি, দেখি, হাসপাতালের কম্পাউন্ডের মধ্যে একটা টাঙ্গা এবং...[৫২]

সুপারিনটেনডেন্টের কাছে একখানা অফিসিয়াল দরখাস্ত লিখতে শুরু করলাম।[৫৩]

লেখক বরাবরই চরিত্রগুলির নিজস্ব অবস্থানগত ভাষা ব্যবহার করেছেন। ‘ওয়ার্ড’, ‘কম্পাউন্ড’, এসব ইংরেজি শব্দ হাসপাতাল সংলগ্ন ফলে ডাক্তারের মুখে মানানসই।

লাশকাটা ঘরের সামনে অপেক্ষা উপন্যাসে একটি সহিংস আন্দোলনে যুক্ত অমিতাভ তার বাবাকে বলেছে—

তোমার সঙ্গে এইসব ইনফরমেশনের সোর্স তো বুর্জোয়া প্রেস ও বুর্জোয়া মিডিয়া?[৫৪]

শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজি ব্যবহৃত হয়, অভিজিৎ সেন এই ক্ষেত্রকে তাই ভাষা দিয়েই আলাদা চিহ্নিত করেছেন। একটি কলেজে অফিসের কর্মচারী বলেছে—

হু ইজ স্ট্যান্ডিং বিহাইন্ড মাই চেয়ার?[৫৫]

একটি নামী ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর স্টাফ বলেছে—

দে ডোনট নো হোয়াট ইজ লাভ! আই নো, আই হ্যাড আ পাইরেট অফ আ লাভার।[৫৬]

স্বপ্ন এবং অন্যান্য নীলিমা উপন্যাসে আছে—

শি ওয়াজ ডেস্পারেট অ্যান্ড কুড ফাইন্ড অ্যান অলটারনেটিভ ইজিলি।[৫৭]

মেঘের নদী উপন্যাসে শিক্ষিত সফল ব্যাবসায়ী মহিমের মুখে বেশ কয়েকবার ইংরেজি শব্দ ও বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে, মহিম বলেছে—

দ্যাট ইজ হার ফল্‌ট। শি শুড নো হাউ টু বিহেভ।[৫৮]

বিপ্লবী, কলেজ অসিসের কর্মচারী, ব্যাবসায়ী এই মানুষগুলি সমাজের যে অবস্থানে থাকে সেখান থেকে তাদের মুখে ইংরেজি শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার তাদের সংলাপে যথাপোযুক্ত হয়েছে এবং তাদের চারিত্রিক অবস্থানকে স্পষ্ট করেছে।

১০.২ হিন্দি

অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের হিন্দিভাষী ও হিন্দি মেশানো বাংলা বলা চরিত্রগুলো কোনো নৈতিক-অনৈতিক ব্যাবসায়ী কিংবা অবাঙালি চরিত্র। আবার বাঙালি চরিত্ররাও খোশ মেজাজে হিন্দি সংলাপ বলেছে বিশেষ ক্ষেত্রে। *শিরিন এবং তার পরিজন* উপন্যাসের অবাঙালি পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় বলেছে—

ইসমাইল মিঞা, এই তিন আওরত কতদিন ধরে মঞ্জিলে আছে?[৫৯]

পতিতালয়ে যেহেতু বিভিন্ন ভাষা ভাষীর মানুষের যাতায়াত সেখানে এবং সেখানের মেয়েরা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে এক জায়গায় মিশেছে, ফলে সেখানের অধিক প্রচলিত ভাষা হিন্দি। আবার বাংলা বললেই তা হিন্দি মেশানো বাংলা। পতিতালয়ের মহিলা পরিচালক বলেছে—

> হাঁ— হাঁ— লে যাও! ইসব ভালাই করনেয়ালি ম্যাডাম লোগোকো গাঙ্গিবাই আচ্ছাসে জানতা হ্যায়! ইধার সে লেড়কি লেকে লানডান্, আমরিকা ট্রাফিক কর দেগা।[৬০]

মৃত মানুষের সঙ্গে বসবাস উপন্যাসের গোপাল খোশগল্প করতে গিয়েই হিন্দি সংলাপ ব্যবহার করেছে—

> নেহি ছোড়ে তো কেয়া করে গা? রুপিয়া হ্যায় উসকা পাস? এ সির্‌সির্‌বাবু, হায় কেয়া রুপিয়া জেবমে? তব যাও, সাথ লেকে যাও, লেকে শাদি কর লেও।[৬১]

এখানে ব্যবহৃত বাক্য একেবারেই মজার ছলে। আবার *দিদারগঞ্জের যক্ষী* উপন্যাসে পাচার হওয়া ভারতীয় মূর্তি উদ্ধার করতে গিয়ে অবাঙালি পুলিশের উক্তি—

> অ্যাকশন কে পহেলে কিতনা টাইম মিলেগা, স্যার?[৬২]
>
> দেখাইয়ে, লামাজি, আপকা হাজার সাল কা পুরানা কিতাব।[৬৩]

এক্ষেত্রে উপন্যাসের পটভূমি বিহার তাই সেখানের মানুষের দৈনন্দিন ভাষাই লেখক ব্যবহার করেছেন। আবার পতিতালয়ে নিত্য নানান প্রদেশের মানুষের যাতায়াত সেখানের ভাষা জাতীয় ভাষা হলেই সুবিধা তাই অভিজিৎ সেন এক্ষেত্রে হিন্দি ব্যবহার করেছেন এই জাতীয় চরিত্রের মুখে।

১০.৩ সংস্কৃত

অভিজিৎ সেন পাশ্চাত্য সাহিত্য এবং প্রাচ্যের বেদ, পুরাণ, উপনিষদ, সংস্কৃত সাহিত্য পাঠ করেছেন লেখার মান ঠিক রাখতে। এই পাঠের সুফল তাঁর লেখায় পাওয়া গেছে। বিশেষত ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাসগুলিতে অধিক সংস্কৃত শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করেছেন।

রাজপাট ধর্মপাট উপন্যাসে অনেক স্থানে সংস্কৃত বাক্য দেখা গেছে। *চৈতন্যচরিতামৃত* থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন—

> মনো মে কালিন্দী পুলিন বিপিনায় স্পৃহয়তি।[৬৪]

উক্ত উপন্যাসে চৈতন্যদেবের মুখে উচ্চারিত হয়েছে—

তর্কোহপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না

নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নং।

ধর্মস্যতত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং

মহাজনো যেন গতঃ সপন্থাঃ।।[৬৫]

খোদাই করা প্রাচীন লিপি থেকে উদ্ধৃতি—

সিদ্ধিরস্তু যে ধর্ম্মাহেতুপ্রভবাহেতুস্তেষাং তথাগতহ্যবদ-ত্তেসাঞ্চযোনিরোধ এবংবাদীমহাশ্রমণঃ—[৬৬]

কবি জয়দেবের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতি জাতম্

সদয়হৃদয় দর্শিত পশুঘাতম্

কেশবধৃত বুদ্ধ শরীরে জয় জগদীশ হরে।[৬৭]

অভিজিৎ সেন *রাজপাট ধর্মপাট* উপন্যাসে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ব্যবহার করলেও চৈতন্যদেব যে একটা আধ্যাত্মিক চরিত্র এবং সমাজে তাঁর যে একটা আলাদা স্বরূপ আছে এই ধারণা উপন্যাসে বজায় রেখেছেন। চৈতন্যদেবের আধ্যাত্মিক পরিচয় স্পষ্ট হয়েছে চৈতন্যজীবনী, কবি জয়দেবের উদ্ধৃতি সর্বোপরি শ্রীচৈতন্যর নিজের মুখের সংস্কৃত বাক্য ব্যবহারে।

বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর উপন্যাসে যতীন কথার মাঝে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেছে—

কুটুম্ব মানে তাই? তার ধারণা ছিল বসুধৈব কুটুম্বকম্।[৬৮]

অভিজিৎ সেন *পাশ* উপন্যাসে ব্যাংক কর্মীদের ফলের আশা না করে নিরলস কাজ করার প্রসঙ্গে মজা করেই গীতা থেকে ব্যবহার করেছেন—

কর্মন্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।[৬৯]

নাগমঙ্গল উপন্যাসে তিনি বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, মহাভারত, মঙ্গলকাব্য নানান জায়গার সাপের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন। ফলে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। যেমন—

> অহিংসা পরমোধর্মঃ সর্বপ্রাণভৃতাং স্মৃতঃ।[৭০]

১০.৪ অশ্লীল শব্দ

অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের অধিকাংশ অশ্লীল শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে পুরুষ চরিত্রের মুখে। নারীরা সরাসরি অশ্লীল শব্দ ব্যবহার না করলেও তাদের আদিরসাত্মক সংলাপে শরীরের অঙ্গ কেন্দ্রিক অশ্লীল ইঙ্গিত আছে যা পুর্বে আলোচিত হয়েছে। চরিত্রের বাস্তবতাকে ধরতে লেখক অনেক চরিত্রের মুখে এসব শব্দ ও বাক্য বসিয়েছেন। এই ধরনের বেশিরভাগ চরিত্রই গ্রামীণ।

প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে গিয়ে দু-একটা অপশব্দ ব্যবহার করে তৃপ্তি পায় অনেকে। যেমন, *বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর* উপন্যাসে বিদ্যার বাবা বিদেশী অবৈধ সম্পর্কের জেরে খুন হয়েছে। বিদেশীর প্রণয়িনীর বাড়ির লোক কেদার ও তার লোকজন প্রকাশ্যে বিদেশীকে খুন করতে এসে বলেছে—

> —বিদেশী বাউদিয়া— মা বেটির নাং, আইজ তোরে কোন বাপে বাঁচায়— ...ভাগ শা-লা— কোনও চুদির বেটা কাছে আগালে দু-আধাখান কইরে ফালামো—[৭১]

নক্ষত্র নদী ও নারী উপন্যাসের কাঞ্চনমালাকে খান সেনা সাবির তালুকদার উপপত্নী করার উদ্দেশ্যে বেশ কিছুদিন আটকে রেখেছিল। তারপর কাঞ্চনমালা সাবিরকে আঘাত করে পালাতে চেষ্টা করেছে। এখানে সাবির কাঞ্চনমালার আঘাতে ব্যথা পায়নি বরং ক্ষোভে জ্বলে উঠেছে তাই বীভৎসভাবে কাঞ্চনমালাকে ধর্ষণ করার আগে বলেছে—

> শালি, এই তংকে তমরার ইয়াত্ গোস্ত-ভাত সেন্ধালাম দু-দিন ধরে। ...ঠাইসে ধর্ মাউগিক্, খাটেত্ ঠাইসে ধর্।[৭২]

এখানে চিহ্নিত শব্দগুলিকে সরাসরি অশ্লীল বলা না গেলেও অশ্লীল ইঙ্গিত অনেক বেশি স্পষ্ট, যা সরাসরির থেকেও বেশি।

কিছুক্ষেত্রে নারীদের সম্পর্কে কলঙ্ক চিহ্ন দেগে দেওয়ার মতো বেশ কিছু শব্দ সমাজে প্রচলিত। যা সাধারণত সেই নারীর আশেপাশের লোকেরা ব্যবহার করে থাকে। সেইসব শব্দ কিছু নারীর বিশেষণ হয়ে যায়। *নক্ষত্র নদী ও নারী* উপন্যাসের কাঞ্চনমালার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল—

> আরে হাটভাতারি এক মাগি—কী যে বলব দাদা— জাত-মান, ঘেন্না-পিত্তি—নাই বলতে কিস্‌সু নাই হারামজাদার।[৭৩]

অন্ধকারের নদী উপন্যাসে আছে—

> —বেঁকিক্ চিনেন না? বেঁকি— বেঁকি খানকি, মোর ভাস্তি নাগে...[৭৪]

দিদারগঞ্জের যক্ষী উপন্যাসে আছে—

> জানি না, যাওয়ার সময় ও হারামজাদি এখান থেকে কী কী হাতিয়ে নিয়ে যাবে। মুশকিল হচ্ছে কি, ও আর ওর ওই নাংয়ের টিকিট কাটা হয়েছে আমাদের সঙ্গে।[৭৫]

চিহ্নিত শব্দগুলি নারীকে উদ্দেশ্য করেই বলা, এই শব্দগুলি নারীর চারিত্রিক কলঙ্ককে চিহ্নিত করেছে। আবার *ছায়ার পাখি* উপন্যাসের নরেন মালো রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় খুন হয়ে যায়। নরেনের ছেলের বালকসুলভ মানসিকতায় এই খুনের বৃত্তান্ত বোঝা সম্ভব ছিল না। সে তার বাবার কাছে যেতে চেয়ে বাধা পেলে গালাগাল দিয়েছে—

> শালা, খানকি, ...মোক্ বাপোর কাছে যাবা দিবে না! শালার বেট্‌টা শালা—[৭৬]

গ্রামীণ মানুষের অকৃত্রিম চরিত্র ও গ্রামীণ সংস্কৃতি অভিজিৎ সেন দক্ষতার সঙ্গে বার বার তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরেছেন, এক্ষেত্রে এই জাতীয় চরিত্রগুলির মুখে তাঁর ব্যবহৃত অশ্লীল শব্দ বিশেষ উপযোগী।

১১। সঙ্গীতের ব্যবহার

উপন্যাসে গানের ব্যবহার খুব সচেতনভাবে করেছেন অভিজিৎ সেন। গানগুলি সংলাপের মতোই যথার্থভাবে ব্যবহার করেছেন। মানুষের ফসল ফলার আনন্দ, জোতদারের সঙ্গে বিবাদের ফলে দুঃখ, সাঁওতালদের উৎসবের গান, বিষহরির গান, মাঝির গান ক্ষেত্র বিশেষে ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর উপন্যাসে ব্যবহৃত গানগুলির মধ্যে লোকজ উপাদান আছে এবং

অনেকসময় কোনো একটি বিশেষ অঞ্চলের মানুষ তাদের আনন্দ বেদনায় গানগুলি বেঁধেছে এবং বিশেষ দিনে একাকী ও দলবদ্ধভাবে গেয়েছে।

মহাজন ও মালিকের শোষণে সাঁওতালরা নিঃস্ব হয়ে গেছে তাই নির্দিষ্ট সময়ে শহরা উৎসব হয়নি, নতুন ধান ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে শহরা উৎসবের জন্য। *রহু চণ্ডালের হাড়* উপন্যাসে তাই দেখা গেছে সাঁওতালরা নিজেদের বাঁধা গান এই উৎসবে গাইছে, যে গানে মানুষের দুঃখই বেশি। কিভাবে হালের মোষ বিক্রি করে জীবিকার জন্য শহরে চলে যেতে হয়েছে—

রাজমহল পাহাড়ে,
গাড়ি চলে লহরে
চার হালের মোষ বেচে
হায়রে, হায়রে্
মরদ গেল শহরে।[৭৭]

দারোগা ও মহাজনের বিচারে কীভাবে সাঁওতালদের পরাজয় হয়েছে এবং সেই পরাজয়ে লক্ষ্মণ সোরেনের মতো সাঁওতাল দলপতি তার নিজের গোষ্ঠীর মানুষকে রক্ষা করতে পারেনি। শুধু বিচার ও তাতে সাঁওতালের পরাজয় দাঁড়িয়ে দেখেছে, সেই কথা উঠে এসেছে এই গানে—

পারগানার কাছে নালিশ জানালাম,
পারগানা চুপ করে থাকে।
আমার বিচার করে দারোগা,
আমার বিচার করে মহাজন,[৭৮]

জীবিকার জন্য নিজের জাতের পেশা ও সংস্কৃতিকে ভুলে মনসার গান গেয়েছে রূপা বাজিকর। নতুন সংস্কারকে রপ্ত করতে চেয়েছে সে, শরমী শুয়ে শুয়ে সেই গান শুনেছে, যদিও সে এই গানের কিছুই বোঝেনি। রূপার গানটা ছিল এমন—

মেনকা বলে ওগো বাপ
বড়ো পালু মনস্তাপ
কেনে আইলে বেললি ছাড়িয়া
অমূল্য রতন মোর
ভাসিয়া যায় সাগর—[৭৯]

ছায়ার পাখি উপন্যাসে সাগরের দোতারা ঝংকার দিয়ে উঠেছে। সাগর বুঝতে চেয়েছে মানুষের জন্ম মৃত্যু, জীবাত্মা, পরমাত্মার অস্তিত্ব অনস্তিত্ব সম্পর্কে। সাগর গেয়ে উঠেছে—

আগম মন্দির মধ্যে মগম দুয়ার,

তথা হইতে নিদ্রা আইসে ঘোর অন্ধকার।[৮০]

বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর উপন্যাসে নর-নারীর অবৈধ সম্পর্ক বা কেচ্ছা নিয়ে বাঁধা গান ব্যবহৃত হয়েছে। বিদ্যার বাবা বিদেশী ও পরস্ত্রী সনেকার সম্পর্ক, তাদের ঘরছাড়া নিয়ে তৈরি গান গাওয়া হয়েছে আসরে। সেই গানে সনেকা যেন তার স্বামীর উদ্দেশে বলেছে—

নাই যাম কেদারের বাড়ি,

নাই খাম কেদারের ভাত,

শাংকা খারু ভাঙ্গি দিমো দশের মাথাৎ।[৮১]

মৌসুমি সমুদ্রের উপকূল উপন্যাসে মুসলমান বিয়ের আসরে গাওয়া হয়েছে গান—

উজান বাইয়া আইলোরে নাও আল্লা
ভাটি বাইয়া যায়।
আল্লা ধর ধর ধরবে নাও
ধরণ নাহি যায়।[৮২]

বর্গক্ষেত্র উপন্যাসে জমিদারের পাছুয়া সুশীলা মেয়েমানুষের দালালি করেছিল। নিজে যেহেতু অকেজো হয়েছে তাই এখন সে অন্য মেয়েদের টেনে আনতে চেয়েছে জমিদারকে খুশি করতে এবং নিজে উপার্জন করতে। ফলে তাকে ছল চাতুরি কম করতে হয়নি। সুশীলা বর্গাচাষির মেয়ে সারিকে ফাঁসিয়ে ফেলেছে তার জালে এমন ভেবে একটু প্রগলভ হয়ে গান ধরেছে—

নাক ডাংরার ব্যাটাটা চক্ষু ফড়কার নাতিটা
মোক্ ভুলালু শতের খাড়ু দিয়া।
তখনও না কইছং তুই রে—
মোটা চাউল খাই না, সরু চাউলের নেখায় জোখায় নাই?[৮৩]

নাগমঙ্গল উপন্যাসে সর্পাঘাতে মৃত যুবক বিমলের দেহ ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল যেভাবে মঙ্গলকাব্যে লখিন্দরের দেহ ভাসানো হয়েছে। বিমলের দেহ ভাসাতে গিয়ে বৈকুণ্ঠ গুণমান মনসার গান গাইতে থাকে—

আরে চিয়াও না— আরে— হে—

চান্দোর পুত্ররে ডংক চিয়াও চিয়াও—

বিবাদা চান্দোর পুত্রক্ চিয়াও চিয়াও—[৮৪]

এই উপন্যাসে একাধিক বিষহরির গান ব্যবহার করেছেন লেখক। এমন আরও একটি বিষহরির গান—

কত মায়া জান তুমি— কত মায়া জান তুমি,
দেবী বিষহরি, কত মায়া জান তুমি—
দেবের দেবতী তুমি অখিল ঈশ্বরী!
কত মায়া জান—

১২। অলংকার

ভাষা ও সঙ্গীতের পাশাপাশি অভিজিৎ সেন যথাযথ ভাবেই বিভিন্ন প্রকার অলংকার ব্যবহার করেছেন তাঁর উপন্যাসে। যেমন—

অশোকের প্রাগৈতিহাসিক গিরিগিটির মতো লেজ-আছড়ানো পশ্বাচার—[৮৬]
চন্দ্রাবলী ছিলা ছেঁড়া ধনুকের মতো লাফ দিয়ে ওঠে।[৮৭]
ঋজু শালবল্লার মতো দেহকান্ড তার লখাইয়ের।[৮৮]

সদ্য মৃত স্বামীর শোকে বিহ্বল চন্দ্রাবলীর ছেলে যখন তার বাবাকে খুঁজেছে তখন চন্দ্রাবলী প্রবল শোকে হাহাকার করে ছেলের কাছে ছুটেছে। এখানে লেখক তাকে ছিলা ছেঁড়া ধনুকের সঙ্গে তুলনা করেলেন। আবার বালা লখিন্দর সুঠাম চেহারার যুবক, তার শরীরকে শালবল্লার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অভিজিৎ সেন যথার্থভাবেই উপমা অলংকারের ব্যবহার করেছেন।

অস্তগামী সূর্য গঙ্গার জলে রক্ত গুলে দিয়েছে।[৮৯]

অস্তগামী সূর্যের আভা নদীর জলে পড়েছে, লেখক প্রকৃতির অপরূপ শোভাকে অর্থাৎ সূর্যের উপর মানুষের গুণ আরোপ করে যথাযথ সমাসোক্তি অলংকারের ব্যবহার করেছেন। এছাড়াও ব্যতিরেক অলংকারের ব্যবহার করেছেন—

> তর্কের ঘুড়ির অশেষ সুতোর লাটাইটা সে হাত থেকে নামিয়ে দিয়েছে মাটিতে।[৯০] (ব্যতিরেক অলংকার)

আরও কয়েকটি উপমার অলংকারের উদাহরণ—

> পরক্ষণেই তার অহং কেউটে সাপের ফণার মতো ঝাঁপির মাথা টেনে শূন্যে দাপিয়ে উঠল।[৯১] (উপমা অলংকার)

> ঈশ্বরকে যেন প্রভু রূপে, বন্ধু রূপে, সন্তান রূপে, দয়িত রূপে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে ভক্ত।[৯২]

এখানে মালোপমা অলংকারের ব্যবহার করেছেন অভিজিৎ সেন, ঈশ্বর ও ভক্তের সম্পর্ক বোঝাতে গিয়ে ঈশ্বরকে কতরূপে দেখা যায় তা বলেছেন। এক্ষেত্রে ঈশ্বর উপমেয়কে একাধিক উপমান দ্বারা অভেদ কল্পনা করা হয়েছে। এছাড়াও আরও কয়েকটি অলংকারের দৃষ্টান্ত দেওয়া হল—

> ঘন করে জ্বাল দেওয়া দুধের মতো রঙ।[৯৩] (উপমা অলংকার)

> একটা রেল ইঞ্জিনের শব্দ 'চিয়াও চিয়াও চান্দোর পুত্ররে...[৯৪] (সমাসোক্তি অলংকার)

> একটা লাল রঙের অন্ধকার তার চেতনার সমস্তটা জুড়ে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।[৯৫] (উপমা অলংকার)

> শাসকের গুলি-বন্দুকের থেকে একশোভাগ বেশি হিংস্র।[৯৬] (সমাসোক্তি অলংকার)

উল্লেখপঞ্জি

১। চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল, *সাহিত্যের রূপ রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ,* রত্নাবলী, কলকাতা, পঞ্চম পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৫, পৃষ্ঠা- ২৪০

২। সেন, অভিজিৎ, *শিরিন এবং তার পরিজন,* অক্ষর প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৭, পৃষ্ঠা- ৭

৩। সেন, অভিজিৎ, *নাগমঙ্গল,* অক্ষর প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৯, পৃষ্ঠা- ৯

৪। রায়, অলোক, *সাহিত্যকোষ: কথাসাহিত্য,* সাহিত্যলোক, কলকাতা, সংশোধিত মুদ্রণ মার্চ ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৬৬

৫। সেন, অভিজিৎ, *আঁধার মহিষ, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৩৮৩

৬। সেন, অভিজিৎ, *লাশকাটা ঘরের সামনে অপেক্ষা,* জে. এন. চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৯

৭। সেন, অভিজিৎ, *ছায়ার পাখি, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ২৮২

৮। সেন, অভিজিৎ, *হলুদ রঙের সূর্য, একের মধ্যে পাঁচ,* জে. এন. চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃষ্ঠা- ৪১১

৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪১২

১০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪২২

১১। সেন, অভিজিৎ, *শিরিন এবং তার পরিজন,* অক্ষর প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৭, পৃষ্ঠা- ২৭৮

১২। সেন, অভিজিৎ, *হলুদ রঙের সূর্য, একের মধ্যে পাঁচ,* জে. এন. চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃষ্ঠা- ৩৯৭

১৩। সেন, অভিজিৎ, *মৌসুমি সমুদ্রের উপকূল, একের মধ্যে পাঁচ,* জে. এন. চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃষ্ঠা- ২১০

১৪। সেন, অভিজিৎ, *ক্রান্তিবলয়,* জে. এন. চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৫, পৃষ্ঠা- ২১

১৫। সেন, অভিজিৎ, *নাগমঙ্গল,* অক্ষর প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৯, পৃষ্ঠা- ৫৮

১৬। সেন, অভিজিৎ, *নিম্নগতির নদী,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ২০০৬, পৃষ্ঠা- ৫৭

১৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩০

১৮। সেন, অভিজিৎ, *অন্ধকারের নদী, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ২৩৫

১৯। সেন, অভিজিৎ, *বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৪৬৬

২০। সেন, অভিজিৎ, *রহু চণ্ডালের হাড়, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ১৭৩

২১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৪৬

২২। সেন, অভিজিৎ, *বর্গক্ষেত্র, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৮০৮

২৩। সেন, অভিজিৎ, *রহু চণ্ডালের হাড়, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৬৪

২৪। সেন, অভিজিৎ, *অন্ধকারের নদী, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ১৮৫

২৫। সেন, অভিজিৎ, *ছায়ার পাখি, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৩১৭

২৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩২৭

২৭। সেন, অভিজিৎ, *সবুজ শ্যাওলা ঢাকা জল, নগ্ন নির্জন হাত,* স্বস্তিক প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৭২

২৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৪৩

২৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৪৪

৩০। সেন, অভিজিৎ, *শিরিন এবং তার পরিজন,* অক্ষর প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৭, পৃষ্ঠা- ৯৬

৩১। সেন, অভিজিৎ, 'বর্গক্ষেত্র', *দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৭৯৪

৩২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৮০৮

৩৩। সেন, অভিজিৎ, *ক্রান্তিবলয়,* জে. এন. চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৫, পৃষ্ঠা- ১৮

৩৪। সেন, অভিজিৎ, *বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৪৩৬

৩৫। সেন, অভিজিৎ, *বর্গক্ষেত্র, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৭৯৫

৩৬। সেন, অভিজিৎ, *ছায়ার পাখি, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ২৮৫

৩৭। সেন, অভিজিৎ, *শিরিন এবং তার পরিজন,* অক্ষর প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৭, পৃষ্ঠা- ৯১

৩৮। সেন, অভিজিৎ, *নিম্নগতির নদী,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ২০০৬, পৃষ্ঠা- ১১৭

৩৯। সেন, অভিজিৎ, *রহু চণ্ডালের হাড়, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ১৪৩

৪০। সেন, অভিজিৎ, *বর্গক্ষেত্র, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৮১৩

৪১। সেন, অভিজিৎ, *ক্রান্তিবলয়,* জে.এন. চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৫, পৃষ্ঠা-৭৮

৪২। সেন, অভিজিৎ, *ছায়ার পাখি, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৩৭২

৪৩। সেন, অভিজিৎ, *শিরিন এবং তার পরিজন,* অক্ষর প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৭, পৃষ্ঠা- ৮৩

৪৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৭৯

৪৫। সেন, অভিজিৎ, *আঁধার মহিষ, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৪১০

৪৬। সেন, অভিজিৎ, *রাজপাট ধর্মপাট, একের মধ্যে পাঁচ,* জে. এন. চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃষ্ঠা- ৮৬

৪৭। সেন, অভিজিৎ, *লাশকাটা ঘরের সামনে অপেক্ষা,* জে. এন. চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৪৩

৪৮। সেন, অভিজিৎ, *বর্গক্ষেত্র, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৮০৫

৪৯। সেন, অভিজিৎ, *হলুদ রঙের সূর্য, একের মধ্যে পাঁচ,* জে. এন. চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃষ্ঠা- ৩৯৪

৫০। সেন, অভিজিৎ, *ছায়ার পাখি, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ২৮৭

৫১। সেন, অভিজিৎ, *সমসাময়িক,* অশোক দাশগুপ্ত (সম্পাদক), *শারদীয় আজকাল,* আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৪১৯, পৃষ্ঠা- ২২৬

৫২। সেন, অভিজিৎ, *শিরিন এবং তার পরিজন,* অক্ষর প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৭, পৃষ্ঠা- ১৬৯

৫৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২০৪

৫৪। সেন, অভিজিৎ, *লাশকাটা ঘরের সামনে অপেক্ষা,* জে. এন. চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৫৯

৫৫। সেন, অভিজিৎ, *মৃত মানুষের সঙ্গে বসবাস,* জে. এন. চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ বৈশাখ ১৪২৪, পৃষ্ঠা- ৪৩

৫৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫৭

৫৭। সেন, অভিজিৎ, *স্বপ্ন এবং অন্যান্য নীলিমা, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৬১৭

৫৮। সেন, অভিজিৎ, *মেঘের নদী, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৬৯২

৫৯। সেন, অভিজিৎ, *শিরিন এবং তার পরিজন,* অক্ষর প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৭, পৃষ্ঠা- ২৬৫

৬০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৭০

৬১। সেন, অভিজিৎ, *মৃত মানুষের সঙ্গে বসবাস,* জে. এন. চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ বৈশাখ ১৪২৪, পৃষ্ঠা- ২৫

৬২। সেন, অভিজিৎ, *দিদারগঞ্জের যক্ষী,* অশোক দাশগুপ্ত (সম্পাদক), *শারদ সংখ্যা আজকাল,* আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৪২২, পৃষ্ঠা- ১২৯

৬৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৩২

৬৪। সেন, অভিজিৎ, *রাজপাট ধর্মপাট, একের মধ্যে পাঁচ,* জে. এন. চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃষ্ঠা- ১১

৬৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১১২

৬৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৬৩

৬৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৩৯

৬৮। সেন, অভিজিৎ, *বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৪৮০

৬৯। সেন, অভিজিৎ, *পাশ, নগ্ন নির্জন হাত,* স্বস্তিক প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ১৬০

৭০। সেন, অভিজিৎ, *নাগমঙ্গল,* অক্ষর প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৯, পৃষ্ঠা- ১০৭

৭১। সেন, অভিজিৎ, *বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৪৬৩

৭২। সেন, অভিজিৎ, *নক্ষত্র নদী ও নারী,* স্বস্তিক প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৫, পৃষ্ঠা- ১৪২

৭৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৭৯

৭৪। সেন, অভিজিৎ, *অন্ধকারের নদী, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ২১৭

৭৫। সেন, অভিজিৎ, *দিদারগঞ্জের যক্ষী,* অশোক দাশগুপ্ত (সম্পাদক), *শারদ সংখ্যা আজকাল,* আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৪২২, পৃষ্ঠা- ১২৪

৭৬। সেন, অভিজিৎ, *ছায়ার পাখি, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ২৫৫

৭৭। সেন, অভিজিৎ, *রহু চণ্ডালের হাড়, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৩৫

৭৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৫

৭৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৪৪-১৪৫

৮০। সেন, অভিজিৎ, *ছায়ার পাখি, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৩৫২

৮১। সেন, অভিজিৎ, *বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৪৫৫

৮২। সেন, অভিজিৎ, *মৌসুমি সমুদ্রের উপকূল, একের মধ্যে পাঁচ,* জে. এন. চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃষ্ঠা- ১৪৬

৮৩। সেন, অভিজিৎ, *বর্গক্ষেত্র, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৭৯৪

৮৪। সেন, অভিজিৎ, *নাগমঙ্গল,* অক্ষর প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৯, পৃষ্ঠা- ১৩৮

৮৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৩০

৮৬। সেন, অভিজিৎ, *অন্ধকারের নদী, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ২২১

৮৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৫৫

৮৮। সেন, অভিজিৎ, *বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৪৯০

৮৯। সেন, অভিজিৎ, *মেঘের নদী, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৫২৬

৯০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫৩০

৯১। সেন, অভিজিৎ, *স্বপ্ন এবং অন্যান্য নীলিমা, দশটি উপন্যাস,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৬১৭

৯২। সেন, অভিজিৎ, *রাজপাট ধর্মপাট, একের মধ্যে পাঁচ,* জে. এন. চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃষ্ঠা- ৪৫

৯৩। সেন, অভিজিৎ, *দিদারগঞ্জের যক্ষী,* অশোক দাশগুপ্ত (সম্পাদক), *শারদ সংখ্যা আজকাল,* আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৪২২, পৃষ্ঠা- ১০৮

৯৪। সেন, অভিজিৎ, *নাগমঙ্গল,* অক্ষর প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৯, পৃষ্ঠা- ১১৭

৯৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১১৭

৯৬। সেন, অভিজিৎ, *নাগকেশর অক্ষবাট,* অশোক দাশগুপ্ত (সম্পাদক), *শারদীয় আজকাল,* আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৪২০, পৃষ্ঠা- ১৪৫

উপসংহার

বাংলা কথাসাহিত্য বিশেষত উপন্যাস স্বাধীনতার পর থেকে নানাভাবে বাঁকবদল হতে থেকেছে, এই পরিবর্তনের ধারায় বাংলা উপন্যাসে বিষয় আঙ্গিকে অনেকটাই পরিবর্তন এসেছিল। এই পরিবর্তন শুধু পরিবর্তনের জন্য নয়, এক্ষেত্রে সামাজিক পরিবেশ অনেকাংশে ভূমিকা নিয়েছে। সত্তর দশকের বাংলার সামাজিক পরিবেশ সেই সময়ের ঔপন্যাসিকদের প্রথাগত সাহিত্য রচনা অনুসরণ থেকে বিরত রেখেছিল। তাঁদের বিবেকবোধ, সমাজ ও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা লেখার মধ্য দিয়ে প্রকাশ হতে থেকেছে। নামী পত্রিকায় অনেকেরই জায়গা হয়নি ঠিকই, খ্যাতির দিক থেকে বেনামী পত্রিকায় কম সংখ্যক পাঠকের উৎসাহ দেখেই পরবর্তীকালে তাঁরা সাহিত্যের ইমারত দাঁড় করিয়েছেন। শুধু মধ্যবিত্তের জীবন নিয়ে নয়, রাজনৈতিক ও আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট ও সেই প্রেক্ষাপটে সমাজের আপামর মানুষের জীবন এমনকি জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্র যে সাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠতে পারে তা সত্তর দশকের কথাকাররা বেশি করে দেখিয়েছেন। পাঠকের মনোরঞ্জনের দায় ঝেড়ে বৈচিত্র্যের সম্ভার নিয়ে এসেছেন। অভিজিৎ সেন যে এই ধারার লেখকদের অন্যতম তা তাঁর উপন্যাস আলোচনার মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে।

'অভিজিৎ সেনের উপন্যাস: বিষয়বৈচিত্র্য ও শিল্পরীতি' আলোচনার অভিপ্রায়ে দেখা গেছে অভিজিৎ সেনের উপন্যাস দেশ কাল ও মানুষের সংস্পর্শে মৃত্তিকাগন্ধী হয়ে উঠেছে সেকথার দৃষ্টান্ত স্বরূপ শুরুতেই তাঁর ব্যক্তিজীবনকে জানার চেষ্টা করা হয়েছে। কারণ যে সব মানুষের কথা অভিজিৎ সেন বলেছেন সেসব মানুষ তাঁর কল্পিত নয়, সংস্পর্শে থাকা লড়াকু মানুষ। ছন্নছাড়া জীবনে নিজের লড়াই কম ছিল না লেখকের, স্বাধীনতার পর বরিশাল ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসার পর পড়াশোনা, চাকরি তারপর নকশাল আন্দোলনে যোগদান, কর্মসূত্রে উত্তরবঙ্গে দীর্ঘদিন বসবাস এসবের মধ্য দিয়ে দেখেছেন প্রচুর মানুষ এই সমাজ আর দেশকালের নানান পরিস্থিতি। সত্তর দশকের লেখক অভিজিৎ সেন, সত্তর দশকেই উপস্থিত লেখকের যৌবনকাল, কালের উদ্দামতার সঙ্গে বয়সের উদ্দামতা মিশে সমাজবিষয়ক চিন্তা চেতনায় প্রভাব ফেলেছে। এসব থেকেই গড়ে উঠেছে অভিজিৎ সেনের সাহিত্যভাবনা। সেই ভাবনার জগতে ইতিহাস, জমি অধিকারের লড়াই ও অপারেশন বর্গা,

রাজনীতি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, নকশাল আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, নারীপাচার, নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনসংগ্রাম, লোকবিশ্বাস, মিথ, মঙ্গলকাব্য, কৃষি, নদী, প্রেম যৌনতা, নারী চরিত্রের ভিন্নমাত্রা রূপ পেয়েছে তাঁর লেখায়।

একটি সময়ের প্রেক্ষিতে অভিজিৎ সেনের কথাসাহিত্যকে বেঁধে ফেলা দুঃসহ হয়েছে, সত্তর দশকের কথাকার তিনি ফলে তাঁর সময়ের অর্থাৎ সত্তরের অপারেশন বর্গা, নকশাল আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ এসব সামাজিক রাজনৈতিক ইতিহাসকে ছুঁতে গিয়ে স্বাধীনতার আগের তেভাগা, দাঙ্গা এমনকি স্বাধীনতার কালের দেশভাগকেও স্পর্শ করতে হয়েছে। আবার এসব ছাড়িয়ে চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ শতকের ইতিহাসে ফিরে যেতে হয়েছে। সত্তর দশকে শুধু অভিজিৎ সেন নয় তাঁর সমকালীন ঔপন্যাসিকরাও স্বাধীনতার আগে পরের দীর্ঘ সময়কে পেয়েছেন তাঁদের লেখার উপাদান হিসাবে ফলে কথাসাহিত্য তাঁদের হাতেই মধ্যবিত্তের আঙিনা মুক্ত হয়েছে। সময় ও জীবনের নির্বাচিত অংশ থেকে সত্তরের কথাসাহিত্যিকরা মানুষের জীবনের সমগ্রতাকে সাহিত্যে হাজির করেছেন। এবং বিষয়ের ক্ষেত্রে আধুনিকতা এসেছে। যদিও এক্ষেত্রে তাঁদের পূর্বসূরী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), সতীনাথ ভাদুড়ি (১৯০৬-১৯৬৫), মহাশ্বেতা দেবীর (১৯২৬-২০১৬) মতো কথাকাররা। অভিজিৎ সেন তাঁর কথাসাহিত্যের আখ্যান নির্মাণে বৈচিত্র্য এনেছেন, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আছে চতুর্দশ পঞ্চদশ শতকের বাংলার শাসনব্যবস্থা, ষোড়শ-অষ্টাদশ শতকে বাংলার উপকূল অঞ্চলে মগদের অত্যাচার। ভূমি অধিকারের লড়াইয়ের ক্ষেত্রে এসেছে তেভাগা থেকে সত্তর দশকের অপারেশন বর্গা আইনের ফলে জোতদার ও বর্গাদারের সংঘাত। এবং বসবাসের ভূমির চাহিদার ক্ষেত্রে যাযাবর ও উদ্বাস্তুদের সংগ্রাম। নকশাল আন্দোলনের ক্ষেত্রে ব্যক্তি অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বিপ্লবের মত ও পথের কথা ব্যক্ত করেছেন। মুক্তিযুদ্ধ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রসঙ্গক্রমে হাজির হয়েছে। পাশাপাশি মুর্শিদাবাদের নারীপাচারের চক্র কীভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে এবং নারীরা প্রেম, প্রতারণা, লোভে কীভাবে হারিয়ে যেত তারই ইতিবৃত্ত। আবার মানবজীবনে প্রেম ও যৌনতা কীভাবে পরিপূরক হয়ে উঠেছে, নারী-পুরুষের প্রেমের ক্ষেত্রে যৌনতা ও যৌনতার ক্ষেত্রে প্রেম স্বাভাবিকভাবে এসেছে। বিষয়ের এত বৈচিত্র্যের ফলে সাতটি পর্বতেও অভিজিৎ সেনের সব উপন্যাসগুলো ধরা যায়নি, আবার বিষয়ের

নিরিখে একই উপন্যাস দুটি বা তিনটি পর্বে আলোচিত হয়েছে। তাই পরবর্তী অধ্যায় বিষয়বৈচিত্র্যের অন্যদিকগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি তাঁর উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ কিছু বৈশিষ্ট্য উঠে এসেছে, যেমন বিভিন্ন প্রকার চরিত্রের ধরন, উপন্যাসে নদী ও সাপের প্রসঙ্গ, আঞ্চলিকতা, লোকবিশ্বাস, মিথ ইত্যাদি। রীতিগত দিকে অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের পয়েন্ট অব ভিউ, উপন্যাসে আয়তন, প্লট নির্মাণ, উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের ভাষা ব্যবহার, সঙ্গীত ও অলংকার প্রয়োগ দ্বারা অভিনবত্ব এনেছেন এসব বিষয় এই অভিসন্দর্ভের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পরিশিষ্ট অংশের সাক্ষাৎকারটি সেই অর্থে সাক্ষাৎকার নয়, অভিজিৎ সেনের সঙ্গে দীর্ঘদিন আলাপ আলোচনার মধ্য থেকে নেওয়া বিভিন্ন সময়ে কিছু বিষয় সম্পর্কিত তাঁর মতামত। অনুমতি ক্রমে সেসব কথা যন্ত্রস্থ করার সুবাদে অভিসন্দর্ভের অন্যান্য ক্ষেত্রে কাজে লেগেছে, বিশেষত তার ব্যক্তিজীবন নিয়ে বলার ক্ষেত্রে।

অভিজিৎ সেনের উপন্যাসগুলি প্রথম পত্রিকা ও গ্রন্থাকারে প্রকাশের তথ্য দিতে গিয়ে ২০০৬ সালে প্রকাশিত *জনপদপ্রয়াস* পত্রিকার অভিজিৎ সেন সংখ্যা এবং লেখকের নিজের হাতে লেখা একটি নোটবুক অনুসরণ করে একটি ক্রম তৈরি করার প্রয়াস করা হয়েছে। অভিজিৎ সেনের প্রকাশিত উপন্যাসগুলির বিষয়বৈচিত্র্য ও শিল্পরীতি এই অভিসন্দর্ভের লক্ষ্য ফলে এমন কয়েকটি বিষয় শুধু বিষয়বৈচিত্র্য রূপেই আলোচিত হয়েছে এখানে, কিন্তু সেই বিষয়গুলো ভিন্ন পরিসরে আলোচিত হবার দাবি রাখে। যেমন— ক। অভিজিৎ সেনের উপন্যাসে উঠে আসা জমি আন্দোলন, নকশাল আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, দাঙ্গা ও দেশভাগ খ। অভিজিৎ সেনের উপন্যাসে উত্তরবঙ্গের জনজীবন গ। অভিজিৎ সেনের উপন্যাসে লোকবিশ্বাস ও মিথ।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

সেন, অভিজিৎ। *একের মধ্যে পাঁচ* । জে এন চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০১৪

সেন, অভিজিৎ। *ঈশানী মেঘ ও অন্যান্য গল্প* । ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট। নয়াদিল্লি। প্রথম প্রকাশ ২০০৮

সেন, অভিজিৎ। *ক্রান্তিবলয়* । জে এন চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০১৩

সেন, অভিজিৎ। *দশটি উপন্যাস* । প্রতিভাস। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩

সেন, অভিজিৎ। *ধর্মায়ুধ* । সুপ্রকাশ। নদীয়া। প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা ২০২০

সেন, অভিজিৎ। *নক্ষত্র নদী ও নারী* । স্বস্তিক প্রকাশন। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৫

সেন, অভিজিৎ। *নগ্ন নির্জন হাত* । স্বস্তিক প্রকাশন। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৩

সেন, অভিজিৎ। *নাগমঙ্গল* । অক্ষর প্রকাশন। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৯

সেন, অভিজিৎ। *নিম্নগতির নদী* । দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ কলকাতা পুস্তকমেলা জানুয়ারি ২০০৬

সেন, অভিজিৎ। *মৃত মানুষের সঙ্গে বসবাস* । জে এন চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১ বৈশাখ ১৪২৪

সেন, অভিজিৎ। *লাশকাটা ঘরের সামনে অপেক্ষা* । জে এন চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৫

সেন, অভিজিৎ। *শিরিন এবং তার পরিজন* । অক্ষর প্রকাশন। কলকাতা। নভেম্বর ২০১৭

সেন, অভিজিৎ। *সেরা পঞ্চাশটি গল্প* । দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১৪

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা গ্রন্থ

অসক্তানন্দ, স্বামী (প্রকাশক)। *জগতের ধর্মগুরু* । রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম। নরেন্দ্রপুর, কলকাতা। ২০০৪

আচার্য, অনিল (সম্পাদিত)। *সত্তর দশক দ্বিতীয় খন্ড* । অনুষ্টুপ। কলকাতা। তৃতীয় মুদ্রণ নভেম্বর ২০১৪

আচার্য, অনিল (সম্পাদিত)। *সত্তর দশক প্রথম খণ্ড* । অনুষ্টুপ। কলকাতা। পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত অনুষ্টুপ সংস্করণ ২০১৪

ইসলাম, নজরুল। *সঞ্চিতা* । ডি এম লাইব্রেরি। কলকাতা। একসপ্ততিতম সংস্করণ মাঘ ১৪১৭

ইসলাম, মকবুল। *লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান: তত্ত্ব, পদ্ধতি ও প্রয়োগ* । বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ রথযাত্রা ২০১১

কালকূট। *জ্যোতির্ময় শ্রী চৈতন্য* । রীডার্স কর্ণার। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৩৬৬

গুপ্ত, ক্ষেত্র। *বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস* । ষষ্ঠ খণ্ড । গ্রন্থনিলয়। কলকাতা। দ্বিতীয় প্রকাশ আগস্ট ২০১২

ঘোষ, নির্মল। *নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য* । করুণা প্রকাশনী। কলকাতা। তৃতীয় মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০১৬

চক্রবর্ত্তী, শ্যামাপদ। *অলঙ্কার-চন্দ্রিকা* । কৃতাঞ্জলি প্রকাশণী। কলকাতা। পুনর্মূদ্রণ ২০১৮

চক্রবর্তী, বরুণকুমার। *লোক-বিশ্বাস ও লোকসংস্কার* । পুস্তক বিপণি। কলকাতা। তৃতীয় সংস্করণ ১৯৫৯

চক্রবর্তী, বরুণকুমার। *লোকসংস্কৃতির সুলুকসন্ধান* । বুক ট্রাস্ট। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯

চক্রবর্তী, সুধীরকুমার (সম্পাদিত)। *বুদ্ধিজীবীর নোটবই* । পুস্তক বিপণি। কলকাতা। তৃতীয় মুদ্রণ ২০১৪

চৌধুরী, নাজমা জেসমিন। *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি* । চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা। প্রথম প্রকাশ ২০০১

চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল। *সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* । রত্নাবলী। কলকাতা। পঞ্চম পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ আগস্ট ২০১৫

দাশ, উদয় চাঁদ ও চট্টোপাধ্যায়, অরিন্দম (সম্পাদিত)। *দেশবিভাগ ও বাংলা উপন্যাস* । বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। বর্ধমান। ১৫ আগস্ট ২০০৫

দাশ, নির্মল। *উত্তরবঙ্গের ভাষাপ্রসঙ্গ* । সাহিত্য বিহার। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৮৪

দাশগুপ্ত, অমিতাভ। *শ্রেষ্ঠ কবিতা* । দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। চতুর্থ সংস্করণ জুন ২০০৮

দাশগুপ্ত, রাহুল। *বাংলা উপন্যাসকোশ* । প্রতিভাস। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ২০১৫

দাস, অমিতাভ। *আখ্যানতত্ত্ব*। ইন্দাস। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১০

দাস, অরূপকুমার। *ষাট ও সত্তর দশকের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলা কথাসাহিত্য* । করুণা প্রকাশনী। কলকাতা। অক্টোবর ২০১২

দত্ত, সন্দীপ। *ইতিহাসের দিকে ফিরে ছেচল্লিশের দাঙ্গা* । র‍্যাডিক্যাল। কলকাতা। প্রথম র‍্যাডিক্যাল প্রকাশ জানুয়ারি ২০০০

বিশ্বাস, জয়ন্ত। *বাংলা উপন্যাসের পুনর্বিচার* । অক্ষর প্রকাশনী। কলকাতা। ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর। *তারাশঙ্কর রচনাবলী* । (অষ্টম খণ্ড)। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ২২শে শ্রাবণ ১৩৮১

বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিমল। *ভূমি ও ভূমিসংস্কার সেকাল একাল* । দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। পুনর্মুদ্রণ মার্চ ২০১৭

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা* । মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা। পুনমুদ্রণ ২০১৮-২০১৯

বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ। *দেশভাগ-দেশত্যাগ* । অনুষ্টুপ। কলকাতা। বইমেলা জানুয়ারি ১৯৯৪

বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ। *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর* । দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। ষষ্ঠ সংস্করণ ২০১২

বন্দ্যোপাধ্যায়, হিমবন্ত। *গল্প নিয়ে উপন্যাস নিয়ে* । বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৪১২

বসু, প্রদীপ (সম্পাদিত)। *মননে সৃজনে নকশালবাড়ি* । সেতু প্রকাশনী। কলকাতা। অগাষ্ট ২০১২

ভৌমিক, নির্মলেন্দু। *প্রান্ত উত্তরবঙ্গের উপভাষা* । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। কলিকাতা। ১৯৮৫

ভট্টাচার্য, আশুতোষ। *বাংলার লোকসাহিত্য প্রথম খণ্ড আলোচনা* । ক্যালকাটা বুক হাউস, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৬২

মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। *কালের প্রতিমা, বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর বছর* **১৯২৩-১৯৯৭**। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। চতুর্থ সংস্করণ ২০০৫

মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। *বাংলা কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা* । দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ২০০৪

মুখোপাধ্যায়, জগমোহন। *গবেষণা-পত্র অনুসন্ধান ও রচনা* । আনন্দ পাবলিশার্স। কলকাতা। ষষ্ঠ মুদ্রণ আগস্ট ২০০৬

মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র। *গোষ্ঠীজীবনের উপন্যাস* । বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। কলকাতা। বইমেলা ২০০৯

মার্কেস, গাব্রিয়েল গার্সিয়া। *নিঃসঙ্গতার একশ বছর* । অনুবাদ- জি এইচ হাবীব। প্যাপিরাস। কলকাতা। তৃতীয় মুদ্রণ ২০১৩

মজুমদার, অভিজিৎ। *শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব* । দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ কলকাতা পুস্তকমেলা জানুয়ারি ২০০৭

মজুমদার, রমেশচন্দ্র (সম্পাদিত)। *বাংলাদেশের ইতিহাস। দ্বিতীয় খণ্ড* (মধ্যযুগ)। জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা। পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৮০

মণ্ডল, দীনবন্ধু। *সত্তর উত্তর বাংলা উপন্যাসে অন্ত্যজ জীবন* । আশাদীপ। কলকাতা। জুলাই ২০১৫

মণ্ডল, পুলকেশ ও মিত্র, জয়া (সম্পাদিত)। *সেই দশক নকশালপন্থী আন্দোলন : ফিরে দেখা*। প্যাপিরাস। কলকাতা। পুনর্মূদ্রণ ২০১২

রাজিব, রাহেল (সম্পাদিত)। *রহু চণ্ডালের হাড় : প্রাসঙ্গিক পাঠ* । কথাপ্রকাশ। ঢাকা, বাংলাদেশ। আগষ্ট ২০১৫

রায়, অনিরুদ্ধ। *মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস সুলতানী আমল।* ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা। ২০১০

রায়, অলোক। *সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য* । সাহিত্যলোক। কলকাতা। সংশোধিত মুদ্রণ মার্চ ২০১৫

রায়, দেবেশ। *উপন্যাস নিয়ে*। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। তৃতীয় সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০১৬

রায়, নীহাররঞ্জন। *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব* । দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। পঞ্চদশ সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫

লাহিড়ী, রণবীর। *আখ্যানতত্ত্বের আখ্যান।* চর্যাপদ। কলকাতা। ডিসেম্বর ২০১১

শ্রীপান্থ। *ক্রীতদাস* । আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা। পঞ্চম মুদ্রণ মে ২০১৬

শ', রামেশ্বর। *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা* । পুস্তক বিপণি। কলকাতা। তৃতীয় সংস্করণ। অগ্রহায়ণ ১৪০৩

সামন্ত, সুবল (সম্পাদিত)। *বাংলা উপন্যাস বীক্ষা ও অন্বীক্ষা* । এবং মুশায়েরা। কলকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১১

সামন্ত, সুবল (সম্পাদিত)। *বাংলা গল্প ও গল্পকার ৪* । এবং মুশায়েরা। কলকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ জুলাই ২০১০

সিকদার, অশ্রুকুমার। *ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য* । সাহিত্যলোক। কলিকাতা। প্রথম প্রকাশ ২০০০

সেন, অঞ্জন ও সিংহ, উদয়নারায়ণ (সম্পাদিত)। *মিথ সাহিত্য ও সংস্কৃতি*। ভাষাবন্ধন প্রকাশনী। কলকাতা। ২০১৩

সেন, নবেন্দু (সম্পাদিত)। *পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা* । রত্নাবলী। কলকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ অক্টোবর ২০১২

সেনগুপ্ত, অমলেন্দু। *উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব* । পার্ল পাবলিশার্স। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৯৫৭

সেনগুপ্ত, চন্দ্রমল্লী। *মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়া* । পুস্তক বিপণি। কলকাতা। পরিবর্ধিত দ্বিতীয় প্রকাশ ২০১৫

হোড়, সোমনাথ। *তেভাগার ডায়েরী ও চা-বাগিচার কড়চা* । সুবর্ণরেখা পাবলিশার্স। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৯৯১

ইংরেজি গ্রন্থ

Kosambi, D.D. *Myth and Reality*. Studies In the Formation of Indian Culture. Frist Printed 1962

Czarniawska, Barbara. *Narratives in Social Science Research*. SAGE Publications Ltd, New Delhi, Frist published 2004

সহায়ক অভিধানপঞ্জি

দত্ত, মিলন। *চলিত ইসলামি শব্দকোষ।* গাঙচিল। কলকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ মে ২০০৮

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। *আকাদেমি বানান অভিধান।* কলকাতা। পঞ্চম সংস্করণ ২০০৫

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। *আকাদেমি বিদ্যার্থী বাংলা অভিধান।* প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯ চতুর্থ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১০

বাংলা পত্র-পত্রিকাপঞ্জি

অমৃতলোক, সমীরণ মজুমদার (সম্পাদক), মেদিনীপুর, ৩১ বছর ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০৬

আজকাল (শারদ সংখ্যা), অশোক দাশগুপ্ত (সম্পাদক), আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৪২২

আজকাল (শারদ সংখ্যা), অশোক দাশগুপ্ত (সম্পাদক), আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৪১৯

আজকাল (শারদ সংখ্যা), অশোক দাশগুপ্ত (সম্পাদক), আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৪২০

আজকাল, 'উৎসব', কলকাতা, শনিবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০০৭

আনন্দবাজার পত্রিকা, 'পুস্তক পরিচয়', কলকাতা, শনিবার, ১৪ মার্চ ২০২০

আনন্দবাজার পত্রিকা, 'পুস্তক পরিচয়', কলকাতা, শনিবার, ১৫ জুলাই ২০০০

উত্তরাধিকার (সাম্প্রতিক বাংলা গল্প সংখ্যা : এক), অমিত দাস ও অনিরুদ্ধ ভৌমিক (সম্পাদিত), ১৯৯৬

এই সময় (শারদীয়া), সুমন চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক), কলকাতা, ১৪২২

এই সময়, 'উত্তর সম্পাদকীয়' কলকাতা, রবিবার, ৭ জুন ২০২০

এই সময়, 'উত্তর সম্পাদকীয়', কলকাতা, রবিবার, ৩ অক্টোবর ২০২১

এবং অন্যকথা (শিল্প সাহিত্য ও সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক ষাণ্মাসিক), বিশ্বজিৎ ঘোষ ও জলধি হালদার (সম্পাদক), বনগাঁ, উত্তর চব্বিশ পরগণা, উনিশ বর্ষ, জানুয়ারি ২০১৭

এবং মুশায়েরা (গল্প ও গল্পকার বিশেষ সংখ্যা), সুবল সামন্ত (সম্পাদক), নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলকাতা, ষষ্ঠ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৯

কোরক সাহিত্য পত্রিকা (প্রাক্ শারদ সংখ্যা), তাপস ভৌমিক (সম্পাদক), বাগুইআটি, কলকাতা, ১৪১৫

কৃত্তিবাস (কবিতা ও সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক), কৌষিকী দাশগুপ্ত ও অন্যান্যরা (সম্পাদক মণ্ডলী), প্রতিভাস, কলকাতা, ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০১৭

চিহ্ন, শহীদ ইকবাল (সম্পাদিত), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ, ৩৫ তম প্রকাশ বর্ষ ১৮, আগস্ট ২০১৮

জনপদপ্রয়াস (অভিজিৎ সেন সংখ্যা), বিকাশ শীল (সম্পাদিত), চুচুড়া হুগলি, অষ্টম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, বইমেলা ২০০৬

তবু একলব্য (মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ সংখ্যা), দীপঙ্কর মল্লিক (সম্পাদক), দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, একাদশ বর্ষ বাৎসরিক সংখ্যা, ২০১৬

নিসর্গ (গদ্য সংখ্যা), সরকার আশরাফ (সম্পাদক), বগুড়া বাংলাদেশ, বর্ষ ৯ সংখ্যা ১, জুলাই ১৯৯৪

পশ্চিমবঙ্গ (তেভাগা সংখ্যা), দিব্যজ্যোতি মজুমদার (সম্পাদক), তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা, বর্ষ ৩০ সংখ্যা ৪২-৪৬, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ

বঙ্গদর্শন ২ (শীত সংখ্যা), সত্যজিৎ চৌধুরী (সম্পাদিত), নৈহাটি উত্তর চব্বিশ পরগণা, ষাণ্মাসিক, ফেব্রুয়ারি ২০০১

বাংলা বই (মাসিক আলোচনা পত্র), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি, কলকাতা, মে ২০০৫

বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, রাজ্যেশ্বর সিন্‌হা (সম্পাদক), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২৩ তম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০২১

বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, শেখর সমাদ্দার (সম্পাদক), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, একবিংশতি সংখ্যা, মার্চ ২০১৮,

মল্লার (সাহিত্য এবং সাহিত্য বিষয়ক ষাণ্মাসিক), শুভময় সরকার (সম্পাদক), রবীন্দ্রসরণি শিলিগুড়ি, ত্রয়োদশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা, ১৪১৬-১৪১৭

শালুক (এক যুগ পূর্তি বিশেষ সংখ্যা), ওবায়েদ আকাশ (সম্পাদক), ঢাকা, বাংলাদেশ, বর্ষ ১৩ সংখ্যা ১৪, ফেব্রুয়ারি ২০১২

শুভশ্রী (ছোটগল্পকার: স্মরণে বিস্মরণে সংখ্যা, শান্তনু সরকার (সম্পাদিত), বহরমপুর মুর্শিদাবাদ, ৫০ বর্ষ, ২০১১-২০১২

সংকেত (ছোটগল্প আলোচনা সংখ্যা), প্রবীর রায়চৌধুরী (সম্পাদক), প্রতাপপুর, হুগলী, ঊনবিংশ বর্ষ, বইমেলা ২০০৩

সুখপাঠ (ওয়েব ম্যাগাজিন), অরিন্দম বসু (সম্পাদক), কলকাতা, শারদ সংখ্যা, ২০২০

বৈদ্যুতিন তথ্যসূত্র

1. https://barta24.com/details/arts-literature/63871/collage-montage-episod-sixteen

2. https://bn.vikaspedia.in/social-welfare/9a89be9b09c0-993-9b69bf9b69c1-9899a89cd9a89af9bc9a8

3.https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%B0_%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE

4.https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE_%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE

5. https://parabaas.com/PB74/LEKHA/bMihir74.shtml

6. https://philarchive.org/archive/CHAASM-3

7. https://roar.media/bangla/main/book-movie/rohu-chandaler-har-a-tale-of-noamd-bajikars

8. https://roar.media/bangla/main/history/history-of-naxal-movement

9. https://roar.media/bangla/main/history/tebhaga-movement-for-the-rights-of-the-peasants

10. https://www.guruchandali.com/comment.php?topic=18217

11. https://www.guruchandali.com/comment.php?topic=21973

12. www.bangodesh.com/2021/04/naxalism-in-india-1/

পরিশিষ্ট: ১

অভিজিৎ সেনের সাক্ষাৎকার

এটি পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে লেখকের সাক্ষাৎকার নয়, লেখকের সঙ্গে কয়েক বছরের কথোপকথনের নির্যাস। বিগত দু-তিন বছর ধরে বিভিন্ন সময় লেখক অভিজিৎ সেনের সঙ্গে সরাসরি ও টেলিফোনে তাঁর সাহিত্য ও ব্যক্তিজীবন নিয়ে যেসব আলোচনা হয়েছে তা লেখকের অনুমতি নিয়েই যন্ত্রস্থ করেছি। এবং তা থেকেই আমার গবেষণার প্রয়োজনীয় লেখকের কিছু বক্তব্য এখানে লিপিবদ্ধ করেছি। অভিজিৎ সেন তাঁর কথাসাহিত্যে সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, কৃষকের জমিকেন্দ্রিক লড়াই, গ্রামীণ মানুষের বিশ্বাস ও সংস্কারকে নিপুনভাবে উপস্থাপন করেছেন। শিল্পের বাস্তবতা আর সাহিত্যের বাস্তবতা যেহেতু এক মাত্রায় থাকে না, তাই উপন্যাসে এবং লেখকের ভাবনায় এই বিষয়গুলি সম্পর্কে একই ধারণা বিরাজ করছে নাকি অন্য কিছু তা জানা যাবে এই কথোপকথনে। এক্ষেত্রে ২০১৯ সাল থেকে যে কথোপকথন শুরু হয়েছিল তা থেকেই নির্বাচিত অংশ এখানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। লেখকের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে যেসব তথ্য লেখকের মুখেই শুনেছি এবং যন্ত্রস্থ করেছি তা গবেষণাপত্রের প্রথম অধ্যায়ে ব্যবহৃত হয়েছে। যেহেতু অনেকটা সময় জুড়ে এই কথোপকথন এবং পরিকল্পনা মাফিক কোনো প্রশ্নপত্র হাতে নিয়ে বসিনি তাই আমার কিছু প্রশ্ন অস্পষ্ট থেকে গেছে। গবেষণার কাজ চলাকালীন যেসব প্রশ্ন মনে এসেছে তার উত্তরও তিনি দিয়েছেন। আমার পরম সৌভাগ্য যে, অনেকটা সময় তিনি আমাকে দিয়েছেন। এবং এই কথোপকথন লিপিবদ্ধ করার পর তিনি ধৈর্য সহকারে সংশোধনও করেও দিয়েছেন।

প্রশ্ন : আপনি মনে করেন বাংলা সাহিত্যের প্রকৃত পাঠক খুবই কম, কিন্তু ওই কম পাঠকই যখন বড়ো পত্রিকায় সিরিয়াস লেখা খুঁজতে যায় এবং পণ্য সাহিত্যের রমরমার ভিড়ে হারিয়ে যায়। একথার সঙ্গে আপনি কতটা সহমত হবেন?

অভিজিৎ সেন : হ্যাঁ, একথার সঙ্গে আমি একমত।

প্রশ্ন : এমনটা দেখা গেছে কোনো লেখা পত্রিকার অফিস থেকে অথবা প্রকাশকের ঘর থেকে ছাপার অযোগ্য বিবেচিত হয়ে ফিরে আসে, আবার সেই লেখাই কোনোভাবে প্রকাশের

পর প্রবল জনপ্রিয়তা পেয়েছে এমনকি পুরস্কৃতও হয়েছে, তাহলে পত্র-পত্রিকা বা প্রকাশকের বিচারের মানদণ্ড কোন অবস্থানে আছে? এখনকার পত্র-পত্রিকা ও প্রকাশকদের বিচার বিবেচনা বিষয়ে আপনার মতামত জানতে আগ্রহ বোধ করছি।

অভিজিৎ সেন : পত্র-পত্রিকা যাঁরা প্রকাশ করেন তাঁরা প্রধানত এটাকে ব্যাবসা হিসাবেই ধরেন। একমাত্র পরবর্তীকালে লিটিল ম্যাগাজিন নামে যে পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হল তার মধ্যে এই ব্যাবসা ব্যাপারটা গৌণ ছিল। মুখ্য ছিল ব্যাবসায়ী পত্র-পত্রিকা বা বহুল প্রচারিত পত্রিকায় যাঁদের লেখা প্রকাশ হয় না বা প্রকাশ হওয়া কঠিন তারা নিজেদের একটা প্রকাশের মাধ্যম খুঁজে নিয়েছিল এই লিটিল ম্যাগাজিনের মাধ্যমে। কাজেই যে কথাটা তুমি বলেছ সেখানে ব্যাবসায়ী প্রকাশক যে ম্যাগাজিন বা পত্রিকা তৈরি করেন বা প্রকাশ করেন, তাতে বড়ো বা তাদের নামধাম বেশ ছড়িয়েছে বা জনরুচির জন্য লেখে এ ধরনের লেখকদের লেখাই বেশি প্রকাশ করেন। যেটা বেশি লোককে আকৃষ্ট করে কিন্তু সাহিত্যকে যাঁরা গুরুত্ব দিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন বা করেন বা চেষ্টা করেন তাদের লেখা প্রাথমিকভাবে বড়ো পত্র-পত্রিকা গ্রহণ করে না এটাই আমার বিশ্বাস।

প্রশ্ন : আপনার বেশ কিছু গল্প উপন্যাসে শারীরিক সম্পর্ক দেখানোর ক্ষেত্রে এবং বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে সাপের আগমন ঘটিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ *নাগমঙ্গল, নিম্নগতির নদী, বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর* তো আছেই কিন্তু *আঁধার মহিষ* উপন্যাসের কামাল-অলকানন্দার অন্ধকার ঘরের মেঝেতে বিসাক্ত সাপ...। আমার সাধ্যমতো বুঝে এই দৃশ্যে সাপের ভূমিকা আলোচনা করেছি। এ সম্পর্কে আমার বোধের সঙ্গে আপনার মতামত মেলাতে চাই।

অভিজিৎ সেন : কামাল অলকানন্দার যে বিপর্যয় হয়েছে জীবনে, সে বিপর্যয়টার মূল কারণ তারা স্বামী-স্ত্রী হলেও দুজনে দুই বিপরীত ধর্মের মানুষ। সেইখানে আমাদের সমাজ এখনো এত উদার হয়নি যে এইসব ব্যাপার নিয়ে কোনো সমস্যা তৈরি হবে না। তারা ভেবেছিল যে তাদের জীবনে এটা কোনো সমস্যা হবে না কিন্তু নানা জায়গা থেকে সমস্যা তৈরি হতে শুরু করে। ফলে এই প্রসঙ্গ এসেছে ওইভাবে যে, সাপটা কোথায় আছে কোথা থেকে ছোবল মারবে অন্ধকারে টের পাচ্ছে না। বিষয়টা তাদের কাছে যেন সাপের মতো, আগে যেটা অন্ধকারের মধ্যে ছিল এখন প্রকৃত ঘটনার সংস্পর্শে আস্তে আস্তে ব্যাপারটা পরিস্কার হচ্ছে।

প্রশ্ন : এখানে সামাজিক সমস্যাটাই কি সাপ?

অভিজিৎ সেন : হ্যাঁ, আমি সেটাই বলেছি এখানে। সাপ এখানে ধর্মাশ্রয়ী বিরোধ যেটা দুই ধর্মের বিরোধ। সেটা বিভিন্নভাবে আসবে সমাজের মধ্যে, কিন্তু এদের ক্ষেত্রে এরা ধরেছিল এটা বড়ো সমস্যা হবে না কিন্তু কোথা থেকে যে সমস্যা আসবে, অন্ধকার ঘরে সাপ থাকলে মেঝেতে নামলে কোথা থেকে যে সাপ ছোবল মারতে পারে এই কান্ডজ্ঞানটা তাদের আগে ছিল না। কামাল সেটাই বলছে বা অলকানন্দা সেটাই বলছে।

প্রশ্ন : সাপকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয়েছে...

অভিজিৎ সেন : এখানে সাপের যে প্রাকৃতিক চেহারা এবং পার্থিব সাপ হিসাবে আমার উপন্যাসে যে ব্যবহার দেখেছ সেটা এক্সজ্যাকটলি একরকম নয় কিন্তু সাপ বিশেষ করে বিষধর সাপ যে মানুষের একটা বিপদ সেই বিপদটাই সমস্যা, বিভিন্নক্ষেত্রে এভাবে বলা হয়েছে।

প্রশ্ন : সত্তরের রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা ভাবলেই নকশাল আন্দোলনের কথা প্রথম মনে আসবে। এই আন্দোলনকারীদের ঠিক ভুল পদক্ষেপের বিচারে না গিয়ে শুধুমাত্র *লাশকাটা ঘরের সামনে অপেক্ষা* উপন্যাসের শুভব্রত, যার স্মৃতিচারণায় মনে হয়েছিল এই আন্দোলনে প্রবেশ ভুল হয়েছিল, কোনো বিষয়েই জীবন দ্বিতীয় সুযোগ দেয় না। আবার *মৃত মানুষের সঙ্গে বসবাস* উপন্যাসের অশোক শেষে নিজেকে প্রশ্ন করেছে, কী পেলাম? এদের এই আক্ষেপ শুধু কী ব্যক্তিজীবনের অস্থিরতা নাকি রাজনৈতিক মতাদর্শে মোহভঙ্গ?

অভিজিৎ সেন : মোহভঙ্গ নয়, জীবনের রাজনৈতিক পথ নির্বাচনে যে ভুল হয় তার ফলে জীবনের একটা বিরাট অংশ ব্যয় হয়ে যায়। মোহভঙ্গ সেই অর্থে হতে পারে যে জীবনটা ব্যয় হয়ে গেল, সময়টা চলে গেল অথচ ফলপ্রসূ কিছু হয়নি। সেই আক্ষেপ হতে পারে এটা উপন্যাসের চরিত্রে শুধু, লেখকের সাথে মিশিয়ে ফেলবে না।

প্রশ্ন : এর সঙ্গে আর একটি চরিত্রের কথা আনছি, *ছায়ার পাখি* উপন্যাসের গোপাল সে কিন্তু এমন অবস্থায় কোনো আক্ষেপ করেনি জীবনটাকে সে মেনেই নিয়েছে...

অভিজিৎ সেন : মেনে নিয়েছে এবং সে একটি স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে চেয়েছে। সে যে আদর্শতে বিশ্বাস করত সেইসব আদর্শের মানুষের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত সে জীবন কাটিয়েছে। এবং আক্ষেপ গোপালও যে করছে না তা নয়, শেষে সেও বলছে, যেখানে পৌঁছাতে চেয়েছিলাম সেটা হয়নি।

প্রশ্ন : এটা কি মতাদর্শগত ব্যাপার অর্থাৎ মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি তাই...

অভিজিৎ সেন : মতাদর্শকে সমাজের সঙ্গে যারা মিলিয়ে নেয় যে মতাদর্শ অর্জন করার জন্য যারা পুরো জীবনটা ব্যয় করে তাদের কাছে এটা আক্ষেপই। সেই হাইটে তারা উত্তীর্ণ হতে পারল না তাই আক্ষেপ, এবং যে লক্ষ্য নিয়ে তাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল অর্থাৎ সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন সেটাও বাস্তবায়িত হল না তাই আক্ষেপ। গোপাল ভেবেছিল কোথায় যাওয়ার কথা ছিল আমাদের, কেন যেতে পারলাম না। গোপাল অনেক পরিণত অনেক বেশি বয়স্ক পুরো জীবনটাই রাজনীতির মধ্যে আছে দিস ওয়ে অর দ্যাট ওয়ে। কমিউনিস্ট পার্টি আমাদের দেশে বা সারা পৃথিবীতেই যে লাইনগুলো নিয়েছে আমি এই উপন্যাসে তিন ব্যক্তিকেই তিনটা লাইনে এনেছি। গোপাল হচ্ছে এক্সট্রিম লেফট, ভবানীচরণ প্রাথমিক লাইনটায় আছে যেটা একেবারে এভাবে ভাবতে পারো সি.পি.আই, সি.পি.আই.এম, সি.পি.আই.এম.এল। কিন্তু তিনজনের কেউই সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি।

প্রশ্ন : প্রথমদিকের *ক্রান্তিবলয়, বর্গক্ষেত্র, অন্ধকারের নদী, আঁধার মহিষ, ছায়ার পাখি* উপন্যাসে বর্ণিত যে রাজনীতি তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা *রাজপাট ধর্মপাট* উপন্যাসের রাজনীতি। দলীয় থেকে একেবারে ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে পদার্পণ। আপনার উপন্যাসের এই রাজনৈতিক ক্রম এবং বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে ধর্মীয় রাজনীতি সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাইছি।

অভিজিৎ সেন : প্রথম যে চারটি উপন্যাসের কথা তুমি বলেছ এই চারটি উপন্যাস প্রায় একই সময়ের অর্থাৎ একটা ধারাবাহিক সময়ের। যেটা আশির দশকের পুরোটা ধরে লেখা। নব্বইয়ের দশকে এর মধ্যে একটাও লেখা নেই। এটা সবসময়ই আছে, ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছে রাজনীতিতে। কোনো কোনো ধর্মের বৈশিষ্ট্যই রাজনীতি, এবং ইসলামের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে রাজনীতি ও ধর্ম ওতপ্রোত। নবি হজরত মহম্মদ তিনি তাঁর প্রতিপক্ষকে জয় করে তাঁর এই ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করেছেন, সারা জীবনের অনেকটা সময় লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে

কেটেছে। কাজেই ধর্ম আর রাজনীতি সেখানে ওতপ্রোত। হজরত মহম্মদ শুধু ধর্মীয় নেতা নন তিনি রাজনৈতিক নেতাও। কাজেই সেটা এখানে দেখেছ একরকম অন্যান্য ধর্মের হিন্দুদের মধ্যে, বৌদ্ধদের মধ্যে ধর্মের প্রভাব যে রাজনীতিতে আসেনি তা নয়, ব্যাপকভাবে এসেছে। বৌদ্ধদের ইতিহাস পড়ে দেখবে যে, প্রথমে সনাতন হিন্দু ধর্ম থেকে বৌদ্ধধর্ম যখন পৃথক অস্তিত্ব নিয়ে দাঁড়াল তখন ব্যাবসায়ী শ্রেণির লোকেরা এই ধর্মতে আকৃষ্ট হল। শ্রেষ্ঠী বা ব্যাবসায়ী গোষ্ঠী তারপরে রাজা এবং সম্রাটরা এই আদর্শ গ্রহণ করেছিল। অশোকের ক্ষেত্রেই আছে, যখন তাঁকে চন্ডাশোক বলা হত তখন ব্যাপকভাবে তিনি হিংসার রাজনীতি করতেন। নিজের প্রায় সব ভাইকেই তিনি হত্যা করে রাজা হয়েছিলেন...

প্রশ্ন : মহাভারতের কাহিনিতেও কি ধর্ম রাজনীতির ব্যাপারটা এভাবে ভাবব...

অভিজিৎ সেন : মহাভারত তো মহাকাব্য তার কথা আলাদা, সেখানে তো ধর্ম এবং শাসন দুটোই একেবারে ওতপ্রোত, ভীষণভাবে আছে। বেদব্যাসগোষ্ঠী যাঁরা মহাভারত লিখেছেন তাঁরা যে এটাকে সাপোর্ট করেছেন এমনটা নয়। প্রতিটা জায়গায় দেখবে, যেমন গীতার অংশটা সেটাতো একটা অধ্যায় মহাভারতের। তার মধ্যে যে আদর্শ মানুষের জন্য বা রাজার জন্য সেটা যে সবাই বিশ্বাস করবে, গ্রহণ করবে এমনতো নয় কিন্তু তার একটা যুক্তি পরম্পরা আছে। মহাভারতের পুরো ব্যাপারটাতেই ধর্মের সঙ্গে বিরোধ, কোনটাকে গ্রহণ করবে কোনটাকে গ্রহণ করবে না এটা আছে। কিন্তু *রাজপাট ধর্মপাট* উপন্যাসে যেটা বলতে চেয়েছি ইসলামি জাতিগুলো যখন ভারতে এসে রাজ্য বিস্তার করতে শুরু করল তখনকার একটা সঙ্কটকালীন অবস্থা। লক্ষ্মণ সেনকে তাড়িয়ে গৌড় দখল করল বখতিয়ার খলজি এবং তারপর থেকে দেখবে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব তিনি রূপ সনাতনের সঙ্গে যখন কথা বলছেন তখন যুক্তি দেখাচ্ছেন, তোমাদের লাইন অফ থিঙ্কিং আমার সঙ্গে একরকম নয়। তোমরা ভাবিত হচ্ছ দেশের এই কর্তৃত্ব বিদেশিদের হাতে চলে গেছে, ঠিক সেই অর্থে বিদেশি তো বিদেশি থাকছে না, তারা সব ব্যাপারে ওতপ্রোত না হোক ধর্ম ছাড়া অন্য সব ব্যাপারে মিশতে চেষ্টা করেছে। চৈতন্যের সময় হচ্ছে ষোড়শ শতকের প্রথম দিক, ১৫১০ এ তিনি সন্ন্যাসী হন। আর ১৩ শতকের প্রথম দিকে পূর্বভারতের রাজ্যগুলোতে মুসলমান আক্রমণ হয়। বখতিয়ার গৌড় অধিকার করেছে ১২০৩ সাল নাগাদ তখন লক্ষ্মণ সেনের রাজত্ব, তাকে উৎখাত করে গৌড় অধিকার করেছে কিন্তু এই চারশো বছরের মধ্যে ১২০৩

থেকে চৈতন্যের সময় অব্দি। চৈতন্য বলছেন এই সময়ের মধ্যেই বাংলার চারভাগের একভাগ মানুষ বা তিন ভাগের এক ভাগ মানুষ তারা মুসলমান বা ইসলাম ধর্মের আওতায় চলে গেছে। বাকি আরও একভাগ হয়তো আগামী একশ বছরের মধ্যে বা তার বেশি চলে যাবে। কাজেই এইভাবে তোমাদের যদি কোনো পরিকল্পনা থাকে যে কোনো একজন হিন্দু নরপতিকে বা রাজাকে দাঁড় করিয়ে তাকে শক্তিশালী করা এবং ইসলামকে উচ্ছেদ করা আমার মনে হয় না তাতে তোমরা সফল হবে। কিন্তু আমিও চাই আমার ট্রাডিশন, আমার ঐতিহ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি এগুলোকে রক্ষা করতে। আমরা ভালোবাসি, তোমরা যেমন ভালোবাসো অন্তত তার মধ্যে যা ভাল আছে। কাজেই আমি সেটাকে রক্ষা করতে চাই, হয়তো একটা জায়গায় তোমাদের সঙ্গে আমি এই ব্যাপারে একমত, এই সেই জায়গাটা। আমার ধারণা তোমরা যেভাবে ভাবছ ব্যাপারটা সফলভাবে হবে ঠিক নয়।

প্রশ্ন : ইতিহাসের ওই কাল পেরিয়ে এখনের কথায় যদি আসি, ধর্ম আর রাজনীতি মানুষের কাছে প্রধান দুটি জায়গা, যদি এ দুটোকে মিশিয়ে ফেলা হয় তাহলে একটা ভয়ংকর পরিস্থিতি দাঁড়াতে পারে...

অভিজিৎ সেন : ভয়ংকর তো হবেই। দেখতেই পাবে তোমরা, পশ্চিমবঙ্গে যা হচ্ছে সারা ভারতবর্ষ তো দেখতেই পাচ্ছে। যদিও পশ্চিমবঙ্গ এর থেকে বাইরে ছিল।

প্রশ্ন : শিক্ষিত সচেতন মানুষের মধ্যে এ যুগে ধর্ম সম্পর্কে ব্যাখ্যা অন্যরকম হওয়াই স্বাভাবিক, ভাবনায় এবং আচরণে। আবার এমনটা সবসময় নাও হতে পারে। আপনার *আঁধার মহিষ* উপন্যাসের প্রতিটি হিন্দু-মুসলিম শিক্ষিত চরিত্র কেউ স্পষ্টভাবে গোঁড়ামি দেখিয়েছে কেউ আবার সাম্যের কথাও বলেছে। এখানে হিন্দু-মুসলিম বিবাহটা আমি সাম্যের দিক দিয়ে দেখছি না, ভালোবাসার পরিণতি ভাবছি। এটা বাদ দিয়ে প্রতিটি চরিত্রের মধ্যে স্বধর্মের বা স্বজাতির প্রতি একটা বিশেষ টান লক্ষ্য করি...

অভিজিৎ সেন : ধর্ম সম্পর্কে গোঁড়ামি তো আছেই বহু লোকের, আমাদের প্রধান দুই ধর্মের মধ্যে উদারতাও আছে, উদার মানুষও দেখতে পাবে। তবে স্বজাতি ও স্বধর্মের প্রতি টান মানুষের স্বাভাবিক। উদারমনা মানুষ আছে, যারা মনে করে তোমার ধর্ম তোমার কাছে আমার ধর্ম আমার কাছে। তারা জীবনযাত্রাও সেভাবেই করে। যে ধর্ম একটি গ্রন্থ বা দুটি গ্রন্থের মধ্যে আবদ্ধ সেই ধর্মে সাধারণত গোঁড়ামি বেশি দেখা যায়। যেমন শিখ ধর্ম, ইসলাম

ধর্ম এদের মধ্যে এই গোঁড়ামিগুলো বেশি দেখা যায় কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে তুমি দেখবে যে, হিন্দু ধর্মকে ওইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। এটা আমি বহু জায়গায় বলেছি, লিখেওছি। একটা লোক সারাজীবন ধরে তুলসীগাছে সকালবেলা দুপুরবেলা এক ঘটি জল দেয় সূর্যের দিকে তাকিয়ে, এটাই তার ধর্ম সে অ্যাক্সেপ্ট করে অ্যাজ এ হিন্দু, সে নিজেও মনে করে সে হিন্দু, সমাজ মনে করে তাকে হিন্দু। আবার বিরাট জাঁকজমক করে মন্দির বানিয়ে বিশাল মূর্তি বানিয়ে ঢাকঢোল বাজিয়ে যে পূজা করে সেও হিন্দু... এই বৈচিত্র্যটা হিন্দু ধর্মে আছে কিন্তু যখন এক বা দুইটি গ্রন্থে ধর্ম নির্দিষ্ট করা থাকে তাদের মধ্যে এই ব্যাপারটা সাধারণত দেখিনি আমি ...।

প্রশ্ন : নির্দিষ্ট করার ফলেই কি বাইরে যেতে পারে না নাকি অন্যকিছু...

অভিজৎ সেন : পারে না মানে করে না তা নয়, আসলে ওদের সামাজিক ধর্মীয় প্রেসারটা অনেক বেশি বিশেষ করে ইসলামি যারা... বাংলাদেশের আমার এক বন্ধু সামিম সে যখন কোনো উৎসব উপলক্ষে গ্রামের বাড়িতে যায় তার মা তাকে তিরস্কার করে তার পয়সায় খেতে চায় না। এবং ও মসজিদে যতক্ষণ না যাবে ততক্ষণ মসজিদ থেকে ওর নাম ধরে ডাকতেই থাকবে, ওকে গিয়ে নামাজে দাঁড়াতে হবে তারপর অন্যরা নামাজ পড়বে। এটা ওদের কম্পালসারি। এটা হিন্দুদের ব্যাপারে যায় না। তবে হিন্দুদের মধ্যে একেবারে গোঁড়ামি নেই তা নয় কিন্তু যদি কেউ গোঁড়ামি পালন না করে তাকে ব্যাপক সমাজ নিন্দিত করে না। হিন্দুদের মধ্যে যে ব্যক্তি নাস্তিক সেও কিন্তু হিন্দু ধর্মে গৃহীত অর্থাৎ নাস্তিকতাও হিন্দু ধর্মে গৃহীত হয়। কিন্তু বেদে অবিশ্বাসীকে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে না।

পরিশিষ্ট: ২

অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের কালানুক্রমিক তালিকা

উপন্যাস	প্রথম পত্রিকায় প্রকাশ	প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশ
বর্গক্ষেত্র	*এক্ষণ* বর্ষা সংখ্যা ১৯৮১	জে এন চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, ২০১৩
ক্রান্তিবলয়	*পরশুরাম* (আংশিক প্রকাশিত) *লাল নক্ষত্র* (সম্পূর্ণ) ১৯৮৫	জে এন চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, ২০০৯ (*নগ্ন নির্জন হাত* সংকলন)
রহু চণ্ডালের হাড়	—	সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৯৮৫
অন্ধকারের নদী	*লাল নক্ষত্র* শারদীয় সংখ্যা ১৯৮৬	একুশে, কলকাতা, ১৯৮৮
আঁধার মহিষ	*বসুমতি* পুজো সংখ্যা ১৯৯২	দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৩
ছায়ার পাখি	—	দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৩
ঝড়	*রক্তকরবী* শারদ সংখ্যা ১৯৯২ (*ঝড় ও নীল বিদ্যুৎ* নামে)।	পুনশ্চ, কলকাতা, (*ঝড়* নামে) ১৯৯৩
হলুদ রঙের সূর্য	*দৈনিক বসুমতি* শারদ সংখ্যা ১৯৯৪	দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৬
বিধ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর	—	দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৫
স্বপ্ন এবং অন্যান্য নীলিমা	*প্রতিক্ষণ* শারদ সংখ্যা ১৯৯৭	দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০০
মেঘের নদী	*অনুষ্টুপ* শারদ সংখ্যা ২০০২	দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৫
নিম্নগতির নদী	*নন্দন* শারদ সংখ্যা ২০০৩ (*গঙ্গাপুত্র* নামে)	দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৫
মৌসুমি সমুদ্রের উপকূল	*সুবর্ণরেখা* ঈদ সংখ্যা (বাংলাদেশ) ২০০৫	গাংচিল, কলকাতা, ২০০৭

পাশ	*নন্দন শারদ* ২০০৫	জে এন চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, ২০০৯ (*নগ্ন নির্জন হাত* সংকলন)
রাজপাট ধর্মপাট	*সুবর্ণরেখা* (বাংলাদেশ) ঈদ সংখ্যা ২০০৬	দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ২০০৮
সবুজ শ্যাওলা ঢাকা জল	*আজকাল* পুজো সংখ্যা ২০০৮	জে এন চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, ২০০৯ (*নগ্ন নির্জন হাত* সংকলন)
নগ্ন নির্জন হাত	*ভোরের কাগজ,* ঈদ (বাংলাদেশ) ২০০৯	জে এন চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, ২০০৯ (*নগ্ন নির্জন হাত* সংকলন)
নক্ষত্র নদী ও নারী	*আজকাল* শারদ সংখ্যা ২০০৯ (*কাঞ্চনমালা* নামে)	স্বস্তিক প্রকাশন, কলকাতা ২০১৫
মৃত মানুষের সঙ্গে বসবাস	*আজকাল* পুজো সংখ্যা ২০১০	জে এন চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, ২০১৭
লাশকাটা ঘরের সামনে অপেক্ষা	—	নান্দনিক, বাংলাদেশ, ২০১১
সমসাময়িক	শারদীয় *আজকাল* ১৪১৯ (২০১২)	অগ্রন্থিত
নাগকেশর অক্ষবাট	শারদীয় *আজকাল* ১৪২০ (২০১৩)	অগ্রন্থিত
শিরিন এবং তার পরিজন	*এই সময়* শারদ (*শিরিন এবং তার পরিজনেরা* নামে) ২০১৪	অক্ষর প্রকাশন, কলকাতা ২০১৭
ধর্মায়ুধ	*আজকাল* শারদ ২০১৪ (*ধর্ম ও সিংহাসন* নামে)	সুপ্রকাশ, নদীয়া, ২০২০
কার পদধ্বনি আসে? কার?	*এই সময়* পুজো সংখ্যা ১৪২২ (২০১৫)	অগ্রন্থিত

দিদারগঞ্জের যক্ষী	*আজকাল* শারদ সংখ্যা ১৪২২ (২০১৫)	অগ্রন্থিত
নাগমঙ্গল	*এই সময়* শারদ ২০১৬ (বড় গল্পাকারে)	অক্ষর প্রকাশন, কলকাতা ২০১৯
পাপীতাপী ও যোগিনী	*সুখপাঠ* (ওয়েব ম্যাগাজিন) শারদ সংখ্যা ২০২০	অগ্রন্থিত

উপন্যাস সংকলন

১। *নগ্ন নির্জন হাত* - জে এন চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, ২০০৯

২। *নগ্ন নির্জন হাত* - স্বস্তিক প্রকাশন কলকাতা, ২০১৩

৩। *দশটি উপন্যাস* - প্রতিভাস, কলকাতা, ২০১৩

৪। *একের মধ্যে পাঁচ* - জে এন চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, ২০১৪

ঋণ: *জনপদপ্রয়াস* (অভিজিৎ সেন সংখ্যা), বিকাশ শীল (সম্পাদিত), চুচুড়া হুগলী অষ্টম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বইমেলা জানুয়ারি ২০০৬